উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পিএইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত
গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক
মৌসুমী দাস

তত্ত্বাবধায়ক
ড. দীপক কুমার রায়
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

LIBRARY
NBU, DARJEELING

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ২০১৪

Th 80.2
[illegible]

278435

31 MAR 2016

Declaration

I declare that the thesis entitled 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর' has been prepared by me under the guidance of Dr. Dipak Kumar Roy, Assistant Professor of Department of Bengali, University of North Bengal. No Part of this thesis has formed the basis for the award of any degree or fellowship Previously.

Mousumi Das 23.12.14
(Mousumi Das)
Research Scholar
Department of Bengali
University of North Bengal
Rajarammohanpur
Darjeeling-734013

Dr. Dipak Kumar Roy
Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

P.O. North Bengal University
Raja Rammohunpur, Dist.
Darjeeling, Pin- 734013
West Bengal, India

Certificate

I Certify that Mousumi Das has prepared the thesis entitled 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর' for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal, Under my guidance. She has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Dipak Kumar Roy
23/12/2014

[Dr. Dipak Kumar Roy]
Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal
Rajarammohanpur
Darjeeling -734013

Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

(Abstract)

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর

ভূমিকা

লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক পরিমণ্ডলে লোকনাটক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। এই লোকনাটক সাধারণত লোকসমাজের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত ও সমষ্টিগত প্রকাশ। লোকনাটকের মধ্যে নৃত্য, গীত ও বাদ্য - এই তিনের বিশেষ সম্মিলন ও প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। লোকনাটকগুলি বিস্তৃত বা সংকীর্ণ পরিসরে দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশিত হয়, কিন্তু তা সবসময় ব্যক্তিসর্বস্বতা বর্জিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত নাটকের উৎসমূলে রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের প্রকাশ। তেমনি লোকনাটকও এমন কতগুলো বিশিষ্ট প্রকরণ ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় যা মূলত গোষ্ঠি বা সমাজ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত।

লোকনাটক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিখিত থাকে এবং এগুলি বংশপরম্পরায় লোকমুখে প্রচলিত। যার ফলে সমাজ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকেরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। মানুষ যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল, তেমনি সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা সবকিছুই পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তন থেকেই আসে রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, বিশেষ করে তে-ভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিকও রাজনৈতিক ধারা লোকনাটককে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই সঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের লোকনাটক। এই রূপান্তর শুধু লোকনাটকের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র লোকসংস্কৃতির মধ্যেও অনিবার্যভাবে এসে যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত প্রধান প্রধান লোকনাটকগুলিকে কেন্দ্র করেই এইরূপ রূপান্তর অনুসন্ধান করা হবে। এই লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল মালদহের 'গম্ভীরা', উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খন', দার্জিলিং-এর 'নটুয়া', জলপাইগুড়ির 'পালাটিয়া' এবং কোচবিহারের 'কুশান' লোকনাটক প্রভৃতি।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

'উত্তরবঙ্গ' বলতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ - এই ছ'টি জেলার সমষ্টিকে সাধারণভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু প্রশাসনিক দিক থেকে এই ছ'টি জেলার পরিচয় হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের 'জলপাইগুড়ি বিভাগ'। এই অঞ্চলের প্রধান নদীগুলির মধ্যে তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, কালজানি, রায়ডাক পূর্ববাহিনী হয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে; মহানন্দা,

নাগর, কালিন্দী, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, আত্রাই সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ বাহিনী হয়ে গঙ্গা বা পদ্মায় মিলিত হয়েছে। 'উত্তরবঙ্গ' তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনের পূর্বে অসম রাজ্য এবং পশ্চিমে নেপাল ও বিহার রাজ্য অবস্থিত। উত্তরে ভুটান ও সিকিম রাজ্য এবং দক্ষিণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও প্রবহমান গঙ্গা নদী রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জনসমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি এখনও কৃষিভিত্তিক ও গ্রামীণ। তবে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের তরাই ও ডুয়ার্সের অধিবাসীরা মূলত চা-শিল্পে নিযুক্ত রয়েছেন। পরবর্তীকালে যোগাযোগ ও যাতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার প্রবণতা বেড়েছে। তেভাগা, বেরুবাড়ি, নকশাল ইত্যাদি আন্দোলনের ফলেও এখানকার জনজীবনে পরিবর্তন ঘটেছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জাতি-জনজাতির লোকেদের লোকাচারের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছে। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকেও রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' নামক অধ্যায়ে গবেষণা প্রকল্পের দিকে লক্ষ রেখে মূলত পাঁচটি লোকনাটককে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন—কোচবিহার জেলার কুশান, জলপাইগুড়ি জেলার পালাটিয়া, দার্জিলিং জেলার নটুয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খন এবং মালদহ জেলার গম্ভীরা। এছাড়াও লোকনাটকের রূপান্তর প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার জন্যে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য লোকনাটকগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর। লোকনাটকে কোন না কোন কাহিনি থাকে। আবার উপস্থাপনের সময় ও পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা একই লোকনাটকের উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কাহিনির সংকোচন ও প্রসারণ ঘটানো হয়ে থাকে। তাই লোকনাটকের আকার বা আয়তন নিত্য পরিবর্তনশীল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির পরিবর্তন যেমন ঘটেছে, তেমনি লোকনাটকের কাহিনিতে নতুন বিষয় ও আঙ্গিক লক্ষ করা যায়। আবার স্থান বিশেষেও লোকনাটকগুলির কাহিনিতে বড় রকমের রূপান্তর দেখা যায়। উৎস থেকে বর্তমান পর্যন্ত লোকনাটকগুলির কাহিনির বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বে লোকনাটকগুলিতে পৌরাণিক বা ধর্মীয়, সামাজিক, অলৌকিক প্রভৃতি কাহিনি প্রাধান্য পেলেও বর্তমানে

সমাজে ঘটিত বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর ঘটনা, উদ্ভূত সমস্যা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি কাহিনি হিসেবে লোকনাটকে উঠে আসে। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর যেভাবে ঘটে চলেছে তারই বিশ্লেষণ আছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর

চতুর্থ অধ্যায় উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর। সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে উঠে এসেছে জমিদার-জোতদার চরিত্র। পুরুষেরাই একসময় নারী সেজে অভিনয় করত। সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের পাশাপাশি লোকনাটকেও চরিত্রগত রূপান্তর ঘটেছে। যেমন— নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ ইত্যাদি চরিত্রগুলি যেমন উঠে এসেছে, ঠিক তেমনি নারী চরিত্রের ভূমিকায় নারীরাই প্রত্যক্ষভাবে আসরে নেমেছে। বিভিন্ন লোকনাটকে এভাবে চরিত্রগত রূপান্তর আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর

পঞ্চম অধ্যায় লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে মানুষের রুচি ও চাহিদা উত্তরোত্তর বদলে যায়। আর তাই কালের গণ্ডী পেরিয়ে সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে আঙ্গিক ও প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর ঘটে চলেছে। দর্শক ও শ্রোতার রুচি এবং চাহিদামত এতে নতুন নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়ে চলেছে। সর্বোপরি আধুনিক নাটক, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়ছে জনসাধারণের মনে। ফলে রুচির দিক থেকে দর্শক ও শ্রোতা আরও বেশি সচেতন হয়ে পড়েছে। আর এই আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকরা প্রদর্শন শৈলীগত দিক থেকে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের প্রেক্ষাপটে প্রদর্শন শৈলীগত এইরূপ রূপান্তর আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর

ষষ্ঠ অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে সাধারণত স্থানবিশেষে আঞ্চলিক লোকভাষা প্রচলিত। বর্তমানে শিষ্ট বাংলার প্রভাব পড়ায় বাংলা শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন— 'পালাটিয়া'র ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় পূর্বে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজবংশী বা কামরূপী ভাষা ব্যবহৃত হত। কিন্তু এখন সমাজ ও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শহুরে পরিমণ্ডলে শিষ্ট বাংলা ভাষা সেখানে

প্রবেশ করছে। ঠিক তেমনি দার্জিলিং জেলার নটুয়া গানের ভাষাতেও আছে হিন্দির প্রভাব। কোচবিহারের কুশান গানের ভাষায় পরিশীলিত বাংলা ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। ভাষাগত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লোকনাটকের ভাষাগত রূপান্তর আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

উপসংহার অংশে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তরের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ করা হয়েছে। গ্রামীণ পরিবেশে চারদিক উন্মুক্ত; একেবারেই অনাড়ম্বর প্রাঙ্গণে প্রায় নিরক্ষর দর্শক দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসত লোকনাটকের আসর। যারা আসর পরিচালনা করতেন সেই দোহারবৃন্দ, বাদ্যযন্ত্রী এমনকি অভিনেতারাও দর্শকদের সাথে মিলেমিশে বসতেন। অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকত না। দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন হত। ক্রমশ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে কিভাবে লোকনাটকে রূপান্তর ঘটেছে তার সামগ্রিক মূল্যায়ণের নিরিখে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে। রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লোকনাটকে প্রভাব বিস্তার করেছে যাত্রা। কুশান হয়ে উঠেছে কুশানযাত্রা। পালাটিয়াতেও একই প্রভাব, যা রূপান্তরের অন্যতম নিদর্শন।

সংগ্রহ ও সংকলন

পরিশেষে লোকনাটকের সংগ্রহ ও সংকলন সন্নিবেশিত হয়েছে এই গবেষণা প্রকল্পে। যা 'পরিশিষ্ট' নামে চিহ্নিত। এখানে প্রতিটি লোকনাটকের পালা তুলে ধরা হয়েছে।

মৌসুমী দাস

তাং - ২৩.১২.১৪

(মৌসুমী দাস)

নিবেদন

উত্তরবঙ্গের যে সংস্কৃতির সঙ্গে আমি আজন্ম পরিচিত, সেই লোকসংস্কৃতিকে এভাবে গবেষণার আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে কোনদিন ভাবতে পারিনি। বিশেষ করে লোকনাটক। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর পরিবারে জন্ম হওয়ায় কম বেশি এখানকার লোকনাটক সম্পর্কে পরিচয় লাভ করেছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম জনপ্রিয় লোকনাটক বিষহরা। প্রতিটি বিবাহ উপলক্ষে আমাদের পরিবারে বংশপরম্পরায় এই লোকনাটক অভিনীত হয়ে আসছে। তাই শৈশব থেকেই আমি এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই লোকনাটকটির বিবর্তিত রূপ প্রত্যক্ষভাবে আমার চোখে ধরা পড়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ভাব গভীর আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিনি। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর পড়াকালীন লোকসাহিত্য বিষয় পড়ার ফলে পুরনো কৌতূহল নতুন করে জেগে ওঠে। সেই সময় থেকেই কেবল কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি নয়, পাশাপাশি অন্যান্য জেলাগুলির লোকনাটক সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মায়। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর লোকনাটক নিয়ে গবেষণাকর্মের জন্য ড. দীপক কুমার রায় মহাশয়ের কাছে দিক নির্দেশ পেয়ে যাই। তিনি এই বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও আকর গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন এবং লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেন। এছাড়া উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সেখানকার বিশিষ্ট লোকনাটকগুলি স্বচক্ষে অনুধাবন করার সুযোগ পাই। এরপর সবদিক বিচার করে আমার প্রকল্পধৃত গবেষণাকর্মের শিরোনাম স্থির হয় 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর।'

লোকসাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করার ক্ষেত্রে যাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও অসম্ভব পরিশ্রমের সামর্থ আমাকে প্রথম থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. দীপক কুমার রায়। এই বিস্তৃত পর্যালোচনার তত্ত্বাবধান ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের মাধ্যমে তিনি আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছেন। তাঁর অদম্য প্রেরণা ও উৎসাহ আমার জীবনের মূল্যবান পাথেয়। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। পাশাপাশি আমার শিক্ষক এবং বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নিখিলেশ রায় বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ সহকারে লোকনাটকগুলির সংগ্রহ ও সংকলনের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দিয়েছেন তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। এছাড়া বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. সুবোধকুমার যশ লোকসাহিত্য বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করে বিষয়টিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই। এছাড়াও যাঁরা আমার গবেষণাকর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন তাঁরা হলেন বাংলা বিভাগের (প্রাক্তন) অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট ও অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুলা বেরা মহাশয়া। তাঁদের জ্ঞানগর্ভ নিরলস আলোচনা আমাকে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের কাছে আমি সর্বদা কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি বাংলা বিভাগের দুই অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল ও ড. তপন মণ্ডল মহাশয়ের সস্নেহ বিভিন্ন পরামর্শ এই গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছে। এই সুযোগে তাঁদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিক্ষায়তনের বাইরে যাঁরা আমাকে গবেষণাকর্মে উৎসাহ ও পরামর্শ দানে সমৃদ্ধ করেছেন, সেইসব লোকসংস্কৃতি প্রেমীরা হলেন স্বর্গীয় দিলীপ দাস, দীপ্তি রায়, সবিতা দাস, দিলীপ বর্মা, প্রদীপ সিংহ রায়, জ্যোতির্ময় রায়, অসমের দ্বীজেন ভকত প্রমুখ। তাঁদেরকে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংস্কৃতি গবেষক বিশেষত দীনেশ রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, তারণ সিংহ, খুশী সরকার, রমনীমোহন বর্মা, জীতেন বর্মণ, গর্জন মল্লিক, গুরুদাস সিংহ প্রমুখরা যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমার এই গবেষণাকর্মকে তথ্যবহুল করেছেন তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে আমাকে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছে। এই সময় যাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, আবার অনেক সময় অযাচিতভাবে আমাকে সাহায্য করেছে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। লোকনাটকের দলগুলির মূল গায়ক, দোয়ার, নর্তকী, বাদ্যযন্ত্রী প্রমুখদের কাছ থেকে লোকনাটক বিষয়ে যত ধরনের সাহায্য পেয়েছি, তা এককথায় অবর্ণনীয়। কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়, কেবল লোকসংস্কৃতিকে ভালোবেসে তাঁরা বিভিন্ন তথ্যের যোগান দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সকল খ্যাতনামা ও অনাম্নী লোকশিল্পীদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

ক্ষেত্রসমীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেভাবে আমাকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও নানা তথ্য দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার প্রভৃতি। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি আমার গবেষণাপত্রের সহায়ক হয়েছে। এখানকার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাব্যক্তিদের প্রতিও রইল আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের অন্তর্গত রাজীব গান্ধী জাতীয় বৃত্তি [No. F.14-2 (Sc)/2008 (SA-III)] লাভ করে আর্থিক দিক থেকে গবেষণা কর্মে সহায়তা পেয়েছি।

এছাড়া যাদের কথা না বললেই নয়, ক্ষেত্রসমীক্ষায় সঙ্গদানসহ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রুফ সংশোধন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নানা কাজে সাহায্য করেছে আমার জীবনসঙ্গী বিশ্বজিৎ ও ভাই সুশান্ত। বর্ণ সংস্থাপন ও অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছে প্রিয় ভাইপো সুজিৎ। বিভিন্ন সময়ে বিরক্ত করা সত্ত্বেও সহস্রাধিক পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ও সংশোধন কর্মে সময় দিয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের অবয়ব দান করেছে। তাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। সবশেষে বলব তাদের কথা যাদের অনলস প্রচেষ্টা ও আশীর্বাদ ছাড়া আজ এ জায়গায় হয়তো কোনদিনই পৌছতে পারতাম না সেই বাবা ও মা, তাদের শতকোটি প্রণাম।

মৌসুমী দাস

তারিখ- ২৩.১২.১৪ (মৌসুমী দাস)

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	i - ii
প্রথম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।	১ - ১১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	১২ - ৫৬
তৃতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর।	৫৭ - ৯৭
চতুর্থ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর।	৯৮ - ১০৪
পঞ্চম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর।	১০৫ - ১১৩
ক) মঞ্চরীতি	
খ) সাজসজ্জা	
গ) পোশাক-পরিচ্ছদ	
ঘ) বাদ্যযন্ত্র	
ঙ) আলোকসজ্জা	
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর।	১১৪ - ১২৬
উপসংহার ঃ	১২৭ - ১৩০
পরিশিষ্ট ঃ ক) লোকনাটকের সংগ্রহ ও সংকলন।	১৩১ - ৫০০
খ) আলোক চিত্র	৫০১ - ৫০৩
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ	৫০৪ - ৫১১
নির্ঘন্ট ঃ	৫১২ - ৫১৬

ভূমিকা

লোকসংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিক। সেই লোকসাহিত্যের বিচিত্র ধারার অন্তর্গত লোকনাটক। পৃথিবীর সমস্ত নাটকের উৎসমূলে রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের প্রকাশ। তেমনি লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত লোকনাটকও এমন কতগুলি বিশিষ্ট প্রকরণ ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, যা মূলত গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক গৃহীত বা অনুমোদিত। বলা যেতে পারে লোকসমাজের অভিজ্ঞতার সমষ্টিগত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এই লোকনাটক। লোকনাটকগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিখিত থাকে এবং এগুলি বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগত ভাবে মুখে মুখে প্রচলিত। ফলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তনের ধারা চলে আসছে তা লোকনাটকেও অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল, তেমনি সমাজব্যবস্থা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তন থেকেই আসে রূপান্তর। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, বিশেষ করে তে-ভাগা আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ধারা লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই সঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের লোকনাটক। গবেষণা অভিসন্দর্ভে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি বিশিষ্ট লোকনাটক যথাক্রমে মালদহ জেলার 'গম্ভীরা', উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার 'খন', দার্জিলিং জেলার 'নটুয়া', জলপাইগুড়ি জেলার 'পালাটিয়া' এবং কোচবিহার জেলার 'কুশান' লোকনাটকের বিবর্তিত রূপ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, স্থান ও কাল বিশেষে এই লোকনাটকগুলি কত বিচিত্র হতে পারে তারও চিত্র উঠে এসেছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে।

'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে রূপান্তর' শিরোনামে গবেষণা করতে গিয়ে গবেষণা প্রকল্পকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

প্রথম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর।

প্রথম অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়' আলোচনা করতে গিয়ে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানকার ভৌগোলিক অবস্থান এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য অঞ্চলের মতো উত্তরবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, কামরূপ, কোচ, বৈকুণ্ঠপুর

প্রভৃতি রাজবংশের শাসনাধীন ছিল। এছাড়া উত্তরবঙ্গে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোট-চীনীয় —এই চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির সংমিশ্রণে সে সমাজ গঠিত হয়েছিল তাতে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে।

'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' নামক অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোকনাটকগুলি আলোচনার পূর্বে এগুলিকে পূজা-পার্বণমূলক বা আনুষ্ঠানিক ও আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল— ষাইটোল, সত্যপীর, কাতিপূজা, তিস্তাবুড়ি, হুদুম দ্যাও, সোনা রায় প্রভৃতি এগুলিকে পুরোপুরি লোকনাটক বলা না গেলেও লোকনাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যই এতে চোখে পড়ে। আবার অনানুষ্ঠানিক বা আমোদ-প্রমোদমূলক লোকনাটকগুলি হল পালাটিয়া, গম্ভীরা, খন, চোরচুন্নি, কুশান, নটুয়া প্রভৃতি। গবেষণা কর্মের এই অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত উল্লেখযোগ্য লোকনাটকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর' শিরোনামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এখানে শুরুতেই লোকনাটকের উদ্ভবসূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। লোকনাটকগুলি সৃষ্টির প্রাক্‌মুহূর্তে কোনো না কোনো পূজা-পার্বণ বা উৎসব-অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে যুক্ত ছিল। তাই কাহিনি হিসেবে স্থান পেয়েছিল বিভিন্ন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য। পরবর্তীকালে অবশ্য লোকনাটকের বিষয়বস্তুতে এসেছে রূপান্তর। উৎস থেকে বর্তমান পর্যন্ত লোকনাটকের এই কাহিনিগত রূপান্তর আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

এর পরবর্তী অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর'। লোকনাটকগুলিতে মূল যিনি গায়ক বা গীদাল ও তার সহকারী অভিনেতা দোহার বা দোয়ারী চরিত্র দুটি মিলে লোকনাটক উপস্থাপন করত, সেখানে নতুন নতুন চরিত্রের আগমন ঘটেছে। নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছে। লোকনাটকের চরিত্রগত রূপান্তরের দিকটি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকরা প্রদর্শন শৈলীগত দিক থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। লোকনাটকের অভিনয়ের ক্ষেত্রে যে সব উপাদানের রূপান্তর হচ্ছে সেগুলি হল— মঞ্চরীতি, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র ও আলোকসজ্জা। গবেষণাপত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তরের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর' নামক অধ্যায়ে লোকনাটকগুলিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষা যেমন— বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার প্রভাবে ভাষাগত রূপান্তর কিভাবে ঘটছে তা আলোচনা করা হয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বস্তুতপক্ষে যুগ ও জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে এই রূপান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে। ফলে পূর্ববর্তীকালের সাথে পরবর্তীকালের লোকনাটকে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমকালীন লোকসমাজ কিভাবে এই রূপান্তরকে গ্রহণ করেছে, তারা এর সঙ্গে কতখানি আত্মিক যোগ অনুভব করেছেন তার প্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের ধারায় প্রধান প্রধান কয়েকটি লোকনাটকের সামগ্রিক রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরে একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করা হয়েছে উপসংহার অংশে। মূল গবেষণা প্রকল্পের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরিশেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা থেকে সংগৃহীত লোকনাটকগুলির সংকলন তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

ভৌগোলিক পরিচয় ঃ

পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম ক্ষুদ্র অংশ হল উত্তরবঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে 'উত্তরবঙ্গ' নামে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডের উল্লেখ নেই ভারতের জাতীয় মানচিত্রে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ আমল থেকেই লোকমুখে 'উত্তরবঙ্গ' নামটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড. নির্মল দাশ বলেছেন, " 'উত্তরবঙ্গ' বললে এখন সাধারণভাবে দেশের যে-এলাকাকে আমরা বুঝি, সুদূর অতীতে তো বটেই, এমনকি অদূর অতীতেও সেই এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে ছিল। সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখণ্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসনকর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মূলত ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা-সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাক্‌রূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে।"[১] পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে এই ভৌগোলিক এলাকার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গার উত্তরদিকের অংশটিকেই বলা হয় উত্তরবঙ্গ। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ এই ছয়টি জেলা একত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামে পরিচিত। প্রশাসনিক দিক থেকে এই ছয়টি জেলার সরকারি নাম 'জলপাইগুড়ি ডিভিশন' হলেও, কিন্তু এই প্রশাসনিক নামটি সরকারি নথিপত্রে কেবল লিখিত ভাবেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, মৌখিকভাবে এর নাম বাংলায় 'উত্তরবঙ্গ' এবং ইংরেজিতে 'নর্থবেঙ্গল'।[২]

ভূ-প্রকৃতিগত দিক দিয়ে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ক. উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, খ. তরাই অঞ্চল, গ. উত্তরের সমভূমি অঞ্চল। শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে প্রায় সমগ্র দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল পর্বতময় হওয়ায় বন্ধুর। দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে তরাই অঞ্চল। 'তরাই' নামটি এসেছে ফার্সি শব্দ থেকে, যার অর্থ স্যাঁতস্যাতে ভাব। এছাড়া জলপাইগুড়ির

অধিকাংশ অংশ, সমগ্র কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলা উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলির পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চল। উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতির মতো জলবায়ুর তারতম্যও লক্ষণীয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন অঞ্চলের গড় উষ্ণতা ৩০-৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট হয়ে থাকে। আবার শীতকালে পার্বত্য অঞ্চলে মাঝেমাঝেই তুষারপাত হয় এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রচুর নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় সারাবছরই এই নদীগুলিতে জল থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পেয়ে এই নদীগুলি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। খরস্রোতা হওয়ায় নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উপযুক্ত। উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান নদীগুলি হল তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা, কালজানি, আত্রাই, রায়ডাক প্রভৃতি।

কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের অন্যতম ফসল হল ধান ও পাট। এছাড়া গম, আখ, তিল, সরিষা, চা, তুঁত, রেশমকীট, ডাল প্রভৃতি শষ্য চাষ করা হয়। দার্জিলিং-এর চা জগদ্বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮০ ভাগ রেশম মালদহ জেলায় উৎপাদন হয়। জলবায়ু অনুকূল হওয়ায় আর্দ্র ও শুষ্ক চিরহরিৎ এবং আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য রয়েছে উত্তরবঙ্গে। এখানকার প্রধান প্রধান বৃক্ষগুলি হল - শাল, সেগুন, শিশু, শিমুল, শিরিষ, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের অভাব, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জমির অপ্রতুলতা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের শিল্পে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। তবে কোথাও কোথাও চা, কাঠ, রেশম ও পর্যটনশিল্প গড়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনের মোট আয়তন ২১, ৬২৫˙০ বর্গ কিমি। এর মধ্যে দার্জিলিং ৩,১৪৯˙০ বর্গ কিমি, জলপাইগুড়ি ৬,২২৭˙০ বর্গ কিমি, কোচবিহার ৩,৩৮৭˙০ বর্গ কিমি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যথাক্রমে ৩,১৪০˙০ বর্গ কিমি ও ২,২১৯˙০ বর্গ কিমি এবং মালদহ ৩,৭৩৩˙০ বর্গ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ১,৪৭,২৪,৯৪০ জন। ক্রমাগত জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৭২,০৪,২৩৯ জন।

জেলা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
কোচবিহার	২৮২২৭৮০	১৪৫৩৫৯০.	১৩৬৯১৯০
জলপাইগুড়ি	৩৮৬৯৬৭৫	১৯৮০০৬৮	১৮৮৯৬০৭
দার্জিলিং	১৮৪২০৩৪	৯৩৪৭৯৬	৯০৭২৩৮
উত্তর দিনাজপুর	৩০০০৮৪৯	১৫৫০২১৯	১৪৫০৬৩০
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৬৭০৯৩১	৮৫৫১০৪	৮১৫৮২৭
মালদহ	৩৯৯৭৯৭০	২০৬১৫৯৩	১৯৩৬৩৭৭

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির লোক পাশাপাশি বাস করে। এদের মধ্যে অন্যতম হল বাঙালি, রাজবংশী, মেচ, ওরাও, মুসলমান, লোধা, নেপালি, ভুটিয়া, গোর্খা, টোটো প্রভৃতি জাতি-জনজাতি।

উত্তরবঙ্গের উত্তরে রয়েছে সিকিম রাজ্য ও ভুটান দেশ, পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও দেশ নেপাল, পূর্বে অসম রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ। এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা ততটা উন্নত না হলেও এই অঞ্চলের উপর দিয়ে গিয়েছে ৩১ ও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। এছাড়া পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ এবং বাগডোগরা বিমান বন্দরের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা হয়। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছিল। মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায় যে উত্তরবাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এবং খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাংলা গুপ্তরাজগণের অধীন ছিল। ৬৩৮ খ্রিঃ চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং এদেশে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য, তিনি বলেছিলেন— "য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ভ্রমণ-ব্যপদেশে পুন্ড্রবর্ধনেও আসিয়াছিলেন। তখন এই দেশে সমৃদ্ধ জনবহুল, প্রতি জনপদে দীঘি, আরামকানন, পুষ্পোদ্যান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; ভূমি সমতল এবং জলীয় শস্যসম্ভার সুপ্রচুর, জলবায়ু মৃদু।"[৩] য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ সে সময় বাংলাকে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখেছিলেন। যথা— কজঙ্গল, পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট। এ থেকে অনুমান করা যায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে সুদৃঢ় রাজশক্তির অভাবে বঙ্গদেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত পুন্ড্রবর্ধন, গৌড়, কামরূপ, কোচ, বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি রাজতন্ত্রগুলি উত্তরবঙ্গের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। আর প্রতিটি রাজবংশ যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এতে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, এই উত্তরবঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গৌড়ীয় শাসনের কথা, যা বৃহৎ বঙ্গদেশকে একসময় পরিচালিত করেছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাক্-আর্য ভারতে উত্তরবঙ্গের 'পুন্ড্রবর্ধন' ছিল একটি অন্যতম শক্তিশালী রাজতন্ত্র। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে, পুন্ড্র উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান জাতি। ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এই পুন্ড্ররাজ্য ও পুন্ড্রজাতির উল্লেখ রয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "মোটামুটি সমস্ত উত্তরবঙ্গই বোধহয় ছিল পুন্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত।"[৪] এর কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, য়ুয়ান্-চোয়াঙ কজঙ্গল থেকে পুন্ড্রবর্ধন এসেছিলেন এবং করতোয়া পার করে গিয়েছিলেন কামরূপ। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, "কজঙ্গল এবং করতোয়া-মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই তাহা হইলে পুন্ড্রবর্ধন;"[৫] সুতরাং করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রাচীন স্থানের নাম 'পুন্ড্র' বলা যেতে পারে।

পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নগর। 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ আমরা পাই "এই নগরের বর্তমান নাম পাণ্ডুয়া বা স্থানীয় ভাষায় পাঁড়ুয়া। মালদহ জেলায় ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে কেহ কেহ বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় বলিয়া নির্ণয় করেন।"[৬] জৈনদের কল্পসূত্রে খ্রিস্টপূর্ব বহু শতাব্দী আগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কাছে পুন্ডরীক নামে বণিক শাখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মালদহ থেকে বগুড়া পর্যন্ত এক বিশাল এলাকায় একসময় প্রচুর রেশম উৎপাদন হত। এই রেশম উৎপাদনের কাজে যুক্ত লোকেদের সে সময় পুণ্ড্রীক বলা হত। তবে এই পুণ্ড্রীকদের অন্তর্গত বেশিরভাগ মানুষ পরবর্তীতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত এবং চাষবাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' সম্পাদনাকালে ভূমিকা অংশে ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র সরকারের 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিকে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন যে মহাস্থানগড়ে অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলায় মৌর্যব্রাহ্মী লিপিখণ্ডের উদ্ধার এবং কলুইকুড়ি সুলতানপুর তাম্রশাসনের আবিষ্কার হওয়ার পর এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পুণ্ড্রনগর মহাস্থানগড়েই অবস্থিত ছিল।[৭] আবার রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে হোয়েন সাঙ-এর পুণ্ড্রবর্ধনে আগমনের কিছুকাল আগে রাজা শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন গৌড় ও পুণ্ড্ররাজ্যের অধিপতি। এরপর পালবংশ পুণ্ড্রবর্ধন অধিকার করলে শূরবংশীয়রা দক্ষিণে চলে যান। পালবংশের পর গৌড় অধিকার করেন সেনবংশ। তবে এ সমস্ত তথ্য নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। সে সময় পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি নামে পরিচিত হয়েছিল।

W.W. Hunter-এর মতে নীলধ্বজ নামে কোন এক ব্যক্তি পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাজিত করে কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। কথিত আছে উনিই মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসে কামরূপে স্থাপন করেন। 'আসাম বুরুঞ্জি' ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থকে অনুসরণ করে বলা যায় যে রাজা নীলধ্বজের পরে চক্রধ্বজ ও তারপরে নীলাম্বর রাজা হন। বুকানন হ্যামিল্টনকে অনুসরণ করে W.W. Hunter জানিয়েছেন, "It is there stated that Raja Nilambhar of Kamatapur (now a ruin within the present state of Kuch Behar) was the last independent Hindu rular of the country; and that, after his defeat and capture by Husain shah, one of the Afghan Kings of Gour, in the beginning of the sixteenth century, anarchy prevailed for several years, and the land was overrun by wild tribes from the North-east."[৮] এদের মধ্যে কোচ জনজাতি ছিল খুব শক্তিশালী। কামতাপুর রাজ্যের অরাজকতার সুযোগে কোচজাতীয় হাজো নামে এক ব্যক্তি কামরূপের কাছাকাছি তাঁর রাজত্ব স্থাপন করেন। যোগিনীতন্ত্রে এদের 'কুবাচ' বলা হয়েছে। সম্ভবত এরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলায় প্রবেশ করে। তিনি কোচ ও মেচ জাতির ঐক্যসাধনের জন্য কোচ দলপতি হাড়িয়ার সাথে নিজের দুই মেয়ে হীরা ও জীরার বিয়ে দেন। কথিত আছে হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ ও জীরার গর্ভে শিশুসিংহের জন্ম হয়। তবে এ বিষয়ে মতান্তর লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে বিশ্বসিংহ নিজের বাহুবলে সম্পূর্ণ কামরূপ জয় করে রাজ্য বৃদ্ধি করেন। এরপর শিশুসিংহকে রায়কত অর্থাৎ মন্ত্রীপদ প্রদান করে বৈকুণ্ঠপুরের রাজত্ব প্রদান করেন। মেজর ফ্রান্সিস জেনকিংস-এর মতে বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ পূর্বদিকে অসমের তলদেশ, দিনাজপুরের বৃহত্তর অংশ, রঙপুর এবং সম্পূর্ণ কামরূপ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

এদিকে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরা বংশধারা অনুযায়ী কামরূপের মহারাজাকে বার্ষিক নজরানা দিতেন এবং অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণ করতেন। কিন্তু অষ্টম রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর যখন ন্যায্য উত্তরাধিকারীর সিংহাসন লাভে বাধা আসছিল, ঠিক সেই সময় ভুজ দেও ও জগ দেও কামরূপের সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে বলে জেনকিংসের লেখা থেকে জানা যায়। তবে রূপনারায়ণের কাছে তারা পরাজিত হয়। কিন্তু রায়কতদের মনে কোচবিহারের রাজত্ব লাভ করার যে আকাঙ্খা জন্মেছিল তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় রায়কত দর্পদেবের সময়ে। এরপর ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে চুক্তি করে করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয় কোচবিহার। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৈকুণ্ঠপুরের রাজাদের জমিদার হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে কোচবিহারের সাথে রায়কতদের অবশিষ্ট সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়।[৯] অবশেষে বৈকুণ্ঠপুর এবং ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন বৃহৎ বঙ্গদেশে পাল ও সেন বংশের পতনের পর মুসলিম রাজত্ব শুরু হয়। কথিত আছে রাজা গণেশ মুসলিমদের হাত থেকে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। অনেকের ধারণা রাজা গণেশের উপাধি 'দনুজমর্দন দেব' থেকেই দিনাজপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ১৪১৬-১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে দনুজমর্দন দেব নামে বাংলায় একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "The name of the North Bengal district of Dinajpur, given as Dinawj or Danoj (Danuj) in persain histories, unquestionably preserves his name : a large principality thus came to be associated with him, and the people have remembered him in this way."[১০] আবার উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা দার্জিলিঙের প্রাচীন নাম ছিল 'দর্জেলামা'। কথিত আছে, দর্জে নামে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লামার নামে এই নামকরণ হয়েছিল।[১১] এখনকার দার্জিলিং জেলা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা— পার্বতীয় অংশ ও পর্বততল অর্থাৎ মোরঙ বা তরাই অঞ্চল। যা একসময় সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সিকিম ও নেপালের সীমানা নিয়ে যুদ্ধ বাধলে সিকিমরাজ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিকিমের পক্ষ নেয়। ইংরেজদের হাতে নেপালের গুর্খা (গোর্খা) সৈন্য পরাজিত হলে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপাল সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্তানুসারে মোরঙ অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকৃত হয়। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মোরঙ বা তরাই অঞ্চল সিকিম রাজার হাতে তুলে দেন।[১২] এর কয়েক বছর পর দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য ও মনোরম আবহাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিকিমরাজের কাছে দার্জিলিং দাবি করেন। প্রথমদিকে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সিকিমের মহারাজা ব্রিটিশদের হাতে দার্জিলিং প্রদেশ সমর্পন করেন।[১৩] এদিকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নেপালের কাছ থেকে বালাসন ও ছোট রঙ্গিতের পশ্চিম ও মেচী নদীর পূর্ব পর্যন্ত ভূখণ্ড ব্রিটিশরা লাভ করেন।[১৪] ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ডাঃ ক্যাম্বেল

দার্জিলিঙের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। দার্জিলিঙের পরিবর্তে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিকিমের রাজাকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা কর দিতে শুরু করেন। এরপর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভুটান থেকে প্রাপ্ত বর্তমান কালিম্পং মহকুমা দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৫] বিশ্বের বাজারে ইউরোপের অভিজাত শ্রেণির কাছে বাংলার মসলিনের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপীয়ান কোম্পানীগুলি নতুন বাজার খুঁজতে মালদহে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনের পর ভারতের স্বাধীনতা আসে দ্বিখণ্ডিত হয়ে। প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মালদহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশেষে তিন দিনের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর জেলার ১৫ টির মধ্যে ১০ টি থানাসহ মালদহ জেলা ভারতের সাথে যুক্ত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্য ভারত ইউনিয়নের বাইরে ছিল। ১৯৪৯ সালে কোচবিহারের কোচ রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর এক চুক্তির দ্বারা কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার ভারত ইউনিয়নের হাতে তুলে দেন। আর তখন থেকেই কোচবিহার রাজ্যে কোচ রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। এরপর স্বাধীনতা অর্জনের অনেক পরে ১৯৯২ সালে দিনাজপুর জেলাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে দুটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে, যথা— উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে যখন সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, সেই ঝড়ের ঝাপটা উত্তরবঙ্গে কিছুটা হলেও এসে লেগেছিল। কিন্তু কোচবিহারের ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ তা মূলেই কঠোরভাবে দমন করেন। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি উত্তরবঙ্গের সব এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে কোচবিহার রাজ্যও বাদ পড়েনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তরবঙ্গের জনমানসকে যে প্রভাবিত করেছিল, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অহিংস-অসহযোগ ও ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে। ইংরেজদের কঠোর দমননীতি এই অঞ্চলের বহু দেশপ্রেমিকের কণ্ঠরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই উত্তরবঙ্গ নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। আর এর ফলেই একের পর এক নানা গণ আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে এ অঞ্চলে। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম হল তেভাগা আন্দোলন, তিনবিঘা ও বেরুবাড়ি আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, উতজাআস আন্দোলন, কামতাপুর আন্দোলন, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, বঞ্চনা, হতাশার ফল এই আন্দোলনগুলি। কিন্তু ইতিহাস তো থেমে থাকে না, চলমানতাই তার ধর্ম। তাই এক একটি মূল্যবান ঘটনা সময়ের স্রোতে একসময় ভেসে ওঠে, আবার পরক্ষণেই অতলে ডুবে যায়। তবে এসব ঘটনা যে দীর্ঘস্থায়ী ফল রেখে যায়, তা তার পারিপার্শ্বিক সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিবর্তিত করে। অন্যভাবে বলা যায় উত্তরবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পেছনে এ সমস্ত গণ আন্দোলনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলির সামাজিক কাঠামো বিশেষ ধরনের, যা আর্যাবর্ত থেকে আলাদা। আর এই সমাজের মূল চালিকাশক্তি ছিল ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠী, যাকে আর্যরা তাঁদের সাহিত্যে 'কিরাত' নাম দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গেও মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

ভারতে অন্যত্র যখন বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময় উত্তরবঙ্গকে পুরোপুরিভাবে কোন বিদেশী শক্তি জয় করতে পারেনি। এই অঞ্চলের লোকেদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। তবে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা পরবর্তীকালে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকালে আর লক্ষ করা যায়নি। এর কারণ হিসেবে সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা সেই সময় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রচার এই অঞ্চলের লোকেদের মনে বীররস অপেক্ষা চৈতন্যের প্রেমবাদ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। ফলে তাদের মধ্যে সেই 'Spirit' নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এই ধর্ম সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তাই এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই উত্তরবঙ্গের সামাজিক কাঠামোতে বর্ণভেদ প্রথা কোন কালেই তেমন প্রচলিত ছিল না, বর্তমানেও নেই। আবার এর পাশাপাশি একথাও সত্য যে, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রথা এই অঞ্চলের অনেক প্রথাকে প্রভাবিত করলেও বর্ণাশ্রমহীন প্রথাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। আর এক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক গণতন্ত্রের বীজ বপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। ঐতিহাসিকদের ধারণা তিনি নিজে মঙ্গোলয়েড ছিলেন বলেই হয়তো মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত দেশে বা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই অঞ্চলে যেহেতু মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য, তাই এখানে নারীর মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত, যা মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রমাণ।

ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে আসার আগে এটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া, কলেরা, জ্বর প্রভৃতি রোগ ছিল এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। ইংরেজরা এই কারণে উত্তরবঙ্গকে যমপুরীর মতো ভয় করতেন।[১৬] তাই যে সমস্ত পরিব্রাজকেরা এই অঞ্চলে এসেছিলেন প্রত্যেকেই একে আপাদমস্তক জঙ্গলে ঘেরা বলে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৩০ সালে ডেপুটি সারভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন হারবার্ট, ১৮৩৭ সালে ক্যাপ্টেন লয়েড, ১৮৪৮ সালে স্যার হুকার প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতগণ। ইংরেজরা এই অঞ্চলটি অধিগ্রহণ করে এখানকার সুবিশাল অরণ্যভূমিকে চাষযোগ্য এবং চা-বাগানের উপযুক্ত তৈরি করে রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা করেন। আর সেই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জনসমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি মূলত কৃষি ও চা-বাগিচাকেন্দ্রিক। এখানকার অধিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ কৃষি ও চা শিল্পের সাথে যুক্ত। একদিকে ক্রমাগত জঙ্গল হ্রাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘনবসতি যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনও দেখা দিয়েছে। কৃষি ও চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত দাঁড়িয়ে থাকলেও কৃষি ও চা-শিল্প ছাড়া ব্যবসায়ী, তাঁতি, কুম্ভকার, কামার, ছুতোর, জেলে, শিক্ষকতা, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে এই অঞ্চলের বহু মানুষ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এনেছে কৃষিকাজে পরিবর্তন। এসেছে লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর, উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার ও উন্নত মানের কীটনাশক ঔষধ। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রাম ও চা-বাগানকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিতে রাস্তাঘাট ও শিল্পের প্রসারের ফলে পাকা রাস্তা, পাকা বাড়ি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার সাথে সাথে বেড়েছে শিক্ষার প্রসার। ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে জ্ঞানের আলো। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও চাকরির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের মানুষ আগের তুলনায় সাফল্যের সাথে অনেক এগিয়ে গেছে। আধুনিক অবসর বিনোদনের দ্রব্য যেমন - টেলিভিশন, সাউণ্ড সিস্টেম, কম্পিউটার প্রভৃতি ছোট-বড় শহরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকেদের বার্ধক্য ভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রভৃতি নানা ধরনের আর্থিক সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। এর ফলে শহরাঞ্চলের মতো গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ঃ

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা রঙ-রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ এই উত্তরবঙ্গ। যেখানে প্রকৃতির স্নিগ্ধতাকে মুছে ফেলতে পারেনি নগর সভ্যতার যান্ত্রিকতা। এখনও পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে সৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তের সেইসব সংস্কৃতি, যা মনকে মুগ্ধ করে, মাধুর্যে ভরিয়ে দেয়। সংস্কৃতির পরিভাষা হিসেবে Culture শব্দটি স্বীকৃত। আর Culture শব্দের মূলে রয়েছে লাতিন Cultura 'কুলতুরা' শব্দ। যা Col ধাতু থেকে এসেছে। Col অর্থে চাষ করা, কৃষ বা যত্ন করা বোঝায়। তবে Culture -এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষসাধন' অথবা 'উৎকর্ষ' কোনটি ব্যবহার করা চলে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে বলেছেন, "চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে।.... দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ।"[১৭] অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকের আচরণই হল মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, "সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত-সেই জন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য ব'লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার।"[১৮] এক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিটি মানুষের জীবন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটি চলমান প্রবাহ। আর এই প্রবাহ প্রতিনিয়ত গতিশীল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থের 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছিলেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা

দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।"

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সম্মিলনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "As a matter of fact, from time immemorial peoples of different races and languages and cultures have come to India, and after an initial period of hostile contact in some cases, finally settled down for a peaceful commingling and cultural as well as racial fusion with their predecessors in the land".[১৯] সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অচীন মহাপথ দিয়ে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য, নেগ্রিটো, মঙ্গোলয়েড, পার্শি, গ্রীক, শক, হুন, তুর্কী প্রভৃতি জনধারা ভারতে প্রবেশ করেছে। জলধারা বয়ে গেলে যেমন পলি রেখে যায়, তেমনি জনধারা চলে গেলে রেখে যায় ভাষা ও সংস্কৃতি। তাদের সেই ভাষা ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল ধরে পুষ্ট করে চলেছে। তাই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই একসময় অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা আর্য ভাষাভাষীদের সাথে মিশে উত্তর ভারতে হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পরস্পরের মিলনের ফলে আর্য ও অনার্য জাতির নিজেদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "প্রাচীন অনার্য্যভাষা, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এগুলি আর্য্যভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে; এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে।"[২০] এর ফলে অনার্য সভ্যতার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে।

অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গেও বিভিন্ন জাতি-জনজাতির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। তাই উত্তরবঙ্গকে অনেকে 'মিনি ভারতবর্ষ' অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে থাকেন। উত্তরবঙ্গেও আমরা চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সন্ধান পাই। যথা— অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোট-চীনীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই অঞ্চলে ভোট-চীনীয় অর্থাৎ মঙ্গোলয়েড ভাষাগোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী একসময় অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব ভারতে লক্ষ করা যায়। এরা ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে এসে মধ্য ও পূর্ব নেপাল, উত্তর বিহার, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং অসমে সীমাবদ্ধ। তাই উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাথে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভাষার দিক থেকে এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা বেশি প্রাধান্য পেলেও কামরূপী (রাজবংশী), নেপালি, হিন্দি, সূর্যপুরিয়া প্রভৃতি ভাষা পাশাপাশি সমপরিমাণে চলে।

উত্তরবঙ্গের সীমানার দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখি এটি একেবারে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অঞ্চলটি সবদিক থেকে বিভিন্ন দেশ ও রাজ্য দ্বারা পরিবৃত। উত্তরবঙ্গের যেসব অঞ্চল বাংলাদেশ,

নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্রের লাগোয়া, সেই এলাকাগুলিতে এসব দেশের সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজপরিবার যেমন গৌড়, কামরূপ, বৈকুণ্ঠপুর, কোচবিহার প্রভৃতি এবং এগুলির রাজধানীগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজবৃত্তিধারী মানুষ ভিন্ন দেশ থেকে এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে সেই সমস্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে যে সমাজ গঠিত হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার মিলন হয়েছে। এরা বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা স্থান থেকে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে একসাথে বসবাস করার ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই সংস্কৃতির বিনিময় হয়েছে। আর এই বিনিময়ের ফলে উত্তরবঙ্গে এক বিচিত্র মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে।

এই অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের আচরণে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকি মন্দির ও গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ প্যাগোডার ধাঁচ পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে এখানকার অধিবাসীরা হয়তো প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং পরে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ একসময় দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান শাসনাধীন ছিল। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় পাশাপাশি অবস্থানের ফলে তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও আদান প্রদান লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়দ্বয় পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে ঐশ্লামিক কিছু ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিতে দেখা যায় যাহা বাঙালী হিন্দুর অপরাপর শাখাগুলিতেও অল্পবিস্তর সংঘটিত হইয়াছে।"[২১] আর এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে সত্যপীর, মাদারপীর প্রভৃতি মুসলিম দেবতার পূজা উৎসব এবং শিরনীদান। এছাড়া এই অঞ্চলের জনমানসের মধ্যে পুরাণের দেবদেবীর পাশাপাশি বিভিন্ন লৌকিক দেবী-দেবতাও শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে স্থান পেয়েছে। যেমন - বিষহরি, ষাইটোল, মাশান, মদনকাম প্রভৃতি।

সমাজের সাথে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই সমাজের পরিবর্তনের হাওয়া সংস্কৃতির মধ্যেও এসে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত উত্তরবঙ্গের গণ আন্দোলনগুলি সমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল। ফলে জনজীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন জাতি-জনজাতির লোকাচারের মধ্যেও। সভ্যতার প্রাক্-মুহূর্তে সংস্কৃতির যে রূপ ছিল সেসবের কিছু লুপ্ত হয়েছে, আবার কিছুর পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে। তাই একথা স্বীকার্য যে, উত্তরবঙ্গের জনজীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও রদবদল লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. ড. নির্মল দাশ, উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ, পৃ. ১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৩. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ১০২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৬. ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদনা, গৌড়ের ইতিহাস - রজনীকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ৪২-৪৩।

৭. প্রাগুক্ত, ভূমিকা অংশ, পৃ. অনুল্লিখিত।

৮. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol -X, p. 402.

৯. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১০. Suniti Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, P. 116.

১১. কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, দার্জিলিঙের ইতিহাস, পৃ. ১৪৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯.

১৩. L S S O'Malley, Bengal District Gazetteers Darjeeling, p. 21.

১৪. কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, দার্জিলিঙের ইতিহাস, পৃ. ৮১।

১৫. L S S O'Malley, Bengal District Gazetteers Darjeeling, p. 27.

১৬. কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, দার্জিলিঙের ইতিহাস, পৃ. ২৯।

১৭. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৪১।

১৮. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, পৃ. ১১।

১৯. Suniti Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, p. 2.

২০. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, পৃ. ২৪।

২১. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, পৃ. XXVII.

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান লোকনাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

লোকসংস্কৃতির বিরাট অঙ্গনে লোকনাটক একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তবে লোকনাটক সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে লোকনাট্য ও লোকনাটক বিষয় দুটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ লোকনাট্য হল 'Folk-theatre' এবং লোকনাটক হল 'Folk-drama'। পক্ষান্তরে বলা যায়, লোকনাটক হল 'Text', আর লোকনাট্য হল তার 'Performance'। লোকনাটকের প্রতিশব্দ রূপে লোকনাট্য কথাটি দীর্ঘদিন ধরে পণ্ডিত ও গবেষকগণ ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু লোকনাট্য ও লোকনাটকের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। লোকনাটক মূলত লোকসংস্কৃতির বাক্‌কেন্দ্রিক পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো লোকনাটকেরও কেন্দ্রভূমি হল লোকসমাজ। লোকসমাজের 'লোক' শব্দটি লোকসংস্কৃতির আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। যদিও গ্রাম্য সমাজই লোকসমাজের ভিত্তিভূমি। 'লোক' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে 'Folk' ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'লোক' শব্দটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন, "লোক শব্দটির আভিধানিক অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি হলেও বর্তমানে বিশেষ অর্থে নাগরিক মানবসম্প্রদায় থেকে ভিন্ন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ঐতিহ্যধারাবাহী গ্রামীণ মানবসম্প্রদায়কেই বোঝায়।"[১]

আবার ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় 'লোক' শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি হল— "লোক-নাট্যের অন্তর্গত 'লোক' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। এর অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে লোকনাট্যকেও ঠিক বোঝা যাবে না। একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ যে মানবগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে জাতিগত একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, সেই মানবগোষ্ঠীই হল 'লোক'-গোষ্ঠী।"[২]

বরুণ কুমার চক্রবর্তী 'লোক' শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে— " 'লোক' বলতে সাধারণভাবে বোঝায় অপরিচিত Unidentified ব্যক্তি। ...কিন্তু 'লোক-সংস্কৃতি'র লোক নিছক তা নয়। একই ভৌগোলিক পরিবেশে কম বেশি একই রূপ জীবন দর্শনের অধিকারী পরম্পরা অনুসরণকারী সংহত সমাজের সদস্যকে বলা হয় লোক।"[৩]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, 'লোক' অর্থ ব্যক্তিমানুষ নয়, গোষ্ঠী তথা লোকসমাজ। 'লোক' বলতে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন ধরে সুনির্দিষ্ট একটি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী জনসাধারণকে বোঝানো হয়।

আবার 'নাটক'-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন, "... রঙ্গভূমিতে অভিনয় দ্বারা যে কার্যের প্রদর্শন হইয়া থাকে, তাহাকে নাটক কহে।"[৪] অর্থাৎ নাটক হল এমন এক ধরনের দৃশ্যবদ্ধ শিল্পপ্রকরণ, যা অভিনয় এবং আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে মানুষের দ্বারা রচিত ও পরিবেশিত হয়।

বাংলায় লোকনাটক ও লোকনাট্য শব্দ দুটি যেহেতু প্রায় অভিন্ন ও সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাই পণ্ডিত ও গবেষকেরা লোকনাট্যের সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্নীত হয়নি। লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক। কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী তার ভিতরে প্রবেশ করা সঙ্গত নয়, তার কাহিনীতে পূর্ববর্তী কোন ধারা কিংবা ঐতিহ্যও থাকে না।"[৫] আবার তিনি অন্যত্র বলেছেন, "গ্রামীণ সমাজে জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে নাটকধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখে প্রচারিত হয়, তাই লোকনাট্য।"[৬] এই সংজ্ঞা দুটিতে তিনি জনসাধারণের বা লোকজীবন আশ্রিত কাহিনি এবং মৌখিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সব লোকনাটকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ এমন অনেক লোকনাটক আছে যেগুলি পুরাণ, ইতিহাস ও কাল্পনিক বিষয় নির্ভর। যেমন - কুশান, বিষহরা, দোতরা, নটুয়া প্রভৃতি। এছাড়া লোকনাটকের একটি বৈশিষ্ট্য মৌখিকতা হলেও বর্তমানে অনেক লোকনাটক লিখিত রূপ পেয়েছে। এর পেছনে যে কারণটি সক্রিয়, সেটি হল ক্রমবর্ধমান সাক্ষরতা। তাই অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পালা লিখিত হলেও তা লোকনাটক বলে বিবেচিত হয়।

নির্মলেন্দু ভৌমিক 'লোকনাট্য'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "কোনো লোকগোষ্ঠীর সংহতি জ্ঞাপক Myth, Ritual, জীবনচর্যার সকল দিক যখন তাদের অভিনয় ও সংলাপে প্রতিফলিত হয়, তখন তা লোকনাট্য হয়।"[৭] এ প্রসঙ্গে বলা যায় Myth-এর ব্যবহার সব লোকনাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। আর জীবনচর্যার সকল দিকের প্রতিফলন কেবল লোকনাটকের ক্ষেত্রেই নয়, যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 'লোকনাট্য'-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেটি হল, "আমাদের দেশে লোকনাট্য বলিতে সাধারণত যাত্রানাটককেই বুঝায় এবং এই অর্থেই শব্দটি আজও প্রচলিত রহিয়াছে।"[৮] কিন্তু এই মতটি একেবারে ভ্রান্ত। কারণ যাত্রা ও লোকনাটকের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও এরা কখনই এক বস্তু নয়। আর এই মতের সমালোচনা করে বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন, "কিন্তু আমরা জানি লোকনাট্য বলতে বিশেষ এক শ্রেণীর নাট্যগুণ সম্পন্ন মৌখিক সৃষ্টিকে বোঝায় যা সংহত সমাজে যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি সংহত সমাজ এর দ্বারা অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করে। যাত্রার সঙ্গে লোকনাট্যের বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।"[৯]

লোকনাটক স্রষ্টার স্বতঃস্ফূর্ত রচনা, কিন্তু যাত্রা রীতিসন্মত এবং পরিকল্পনাপ্রসুত। নাট্যকার সুপরিকল্পিতভাবে যাত্রা রচনা করেন।

তিনি আর এক জায়গায় 'লোকনাট্য'-এর সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, "আমরা গণতন্ত্রের সংজ্ঞার অনুকরণে বলতে পারি লোকেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকেদের জন্য অভিনীত, লোকেদের দ্বারা আদৃত মূলত লোক বিষয়ক যে নাটক তাই হ্ল লোকনাট্য।"[১০]

লোকনাট্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ধ্রুব দাস বলেছেন, "লোকনাট্য হ'ল সমাজের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষ দর্শন-সজ্ঞাত অভিজ্ঞাত দ্বারা সঞ্চালিত নাট্য। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে লোকনাট্য হ'ল লোকধর্মী আচরণের বা সংস্কারের এমন এক নাট্যরূপ যা তার আপন ক্ষেত্রের জনমানসকে আনন্দিত, উল্লসিত এবং অনুপ্রাণিত করে।"[১১]

আবার 'The New Encyclopaedia Britanica' গ্রন্থে 'Folk-Drama' সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Belonging only remotely to Oral Literature is folk drama. Dances, many of them elaborate with masks portraying animal or human characters, and sometimes containing speeches on songs, are to be found in many parts of the preliterate world. Though the action and the dramatic imitation is always the most prominent part of such performances, these may be part of ritual and involve speaking or chanting of sacred texts learned and passed on by world of mouth."[১২]

শিশির মজুমদার বলেছেন, "লোকনাট্য লোকসমাজের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত এক যৌথ সৃষ্টি যা লিখিত বা অলিখিত এবং মুখে মুখে প্রচারিত হতে পারে।...."[১৩] কিন্তু গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট গ্রামীণ জীবনভিত্তিক মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হলেই তা লোকনাটক হয় না। লোকসাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই কথাগুলি প্রযোজ্য হতে দেখা যায়।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলির আলোচনার নিরিখে আমরা বলতে পারি, যে দৃশ্যকলা লোকভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট বা লিখিত, ঐতিহ্যপরম্পরায় স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক লোকসমাজ, উন্মুক্ত আসরে অভিনীত, বাদ্য-নৃত্য-গীত-সংলাপে পুষ্ট, সামাজিক- পৌরাণিক-কাল্পনিক বিষয়নির্ভর, চরিত্র-সাজসজ্জা-অভিনয় রীতি প্রভৃতির মাধ্যমে লোকজীবন ও লোকমানসকে আনন্দ দান করে তাই লোকনাটক।

এই সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

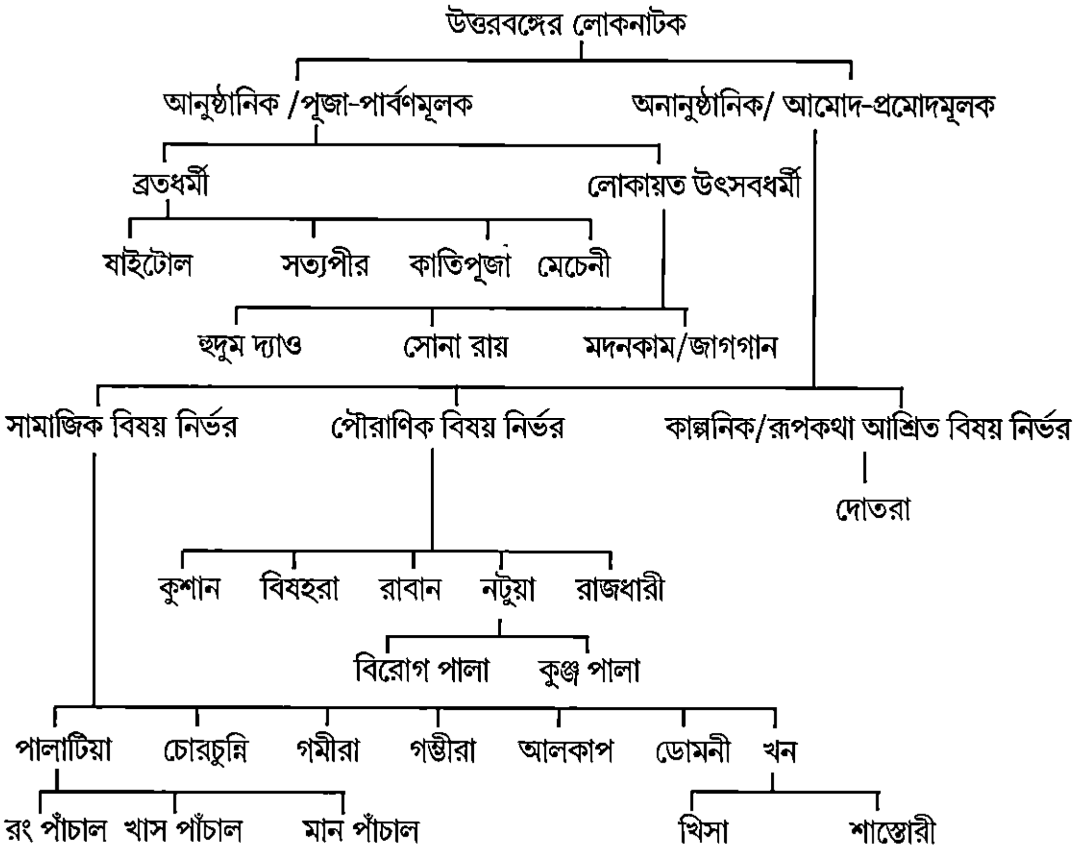

লোকনাটকের প্রকৃতি অনুসারে আমরা একে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি— (i) পূজা-পার্বণমূলক বা আনুষ্ঠানিক, (ii) আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক। "লোকনাট্য সুস্পষ্টভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। তবে বিস্মৃত হলে চলবে না যে লোকনাট্যের উৎসের বিচারে তার মূলতঃ আনুষ্ঠানিকরূপেই আত্মপ্রকাশ।"[১৪] তাই আনুষ্ঠানিক বা পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটক আমরা সেগুলিকেই বলব যা বিশেষ কোনো ধর্মীয় আচার-আচরণের সাথে যুক্ত। কিন্তু অনানুষ্ঠানিক বা আমোদ-প্রমোদমূলক লোকনাটকে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্য মুখ্য হয়ে ওঠে না। উদ্যোক্তার ইচ্ছানুসারে যে কোন সময় এ ধরনের লোকনাটক অভিনীত হয়। অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতেও এই দু'টি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

আনুষ্ঠানিক লোকনাটক ঃ

সভ্যতার প্রাক্-মুহূর্তে প্রকৃতির কাছে আদিম মানুষ ছিল শিশুর মতোই অসহায়। হাতিয়ারের মাধ্যমে তারা পশুকে বশে আনতে পারলেও প্রাকৃতিক শক্তি যেমন ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি ঘটনার কারণ তাদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। তাই এসব ঘটনাকে তারা খুব ভয় পেত এবং এগুলি দেখে বিস্মিত হত। তারা বিশ্বাস করত কোনো অলৌকিক শক্তিই এসব ঘটনা ঘটায়। প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ভয়, বিশ্বাস প্রভৃতি থেকে তাদের মনে ধীরে

ধীরে ধর্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। সেই অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট রাখার জন্য শুরু করে নানা ধর্মীয় আচার-আচরণ। যা পরবর্তীকালে 'পূজা' নামে পরিচিতি পেতে শুরু করে। একে একে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দেবতার। "ধর্মের দুইটি মূল দিক আছে - বিশ্বাসের (belief) দিক আর সক্রিয়তার (action) দিক। বিভিন্ন ধর্মীয় আচার আচরণ এই সক্রিয়তার দিকটিকে প্রকাশ করে। পূজা বলতে আমরা দেবতা বা অতিপ্রাকৃত শক্তির উদ্দেশে কিছু প্রতীকী ক্রিয়া (symbolic action) বলতে পারি।"[১৫] অর্থাৎ পূজা বলতে বিশেষ ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণকে বোঝায়, যা দেবতা বা অদৃশ্য অথবা অলৌকিক কোন শক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। পূজায় মন্ত্রপাঠ ও বিশেষ ধরনের কিছু ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সেটি পরিবেশিত হয়। এই পূজা ব্যক্তি ও সমষ্টির মঙ্গল কামনায় করা হয়ে থাকে। পূজাকে কেন্দ্র করে মন্ত্রপাঠ, ব্রতকথা ও বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যে সব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করা হয় তার মধ্যেই রয়েছে লোকনাটকের আভাস। তবে এই পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটকগুলি মূলত দেব-দেবী নির্ভর হলেও মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ও এতে স্থান পায়। এ ধরনের লোকনাটকগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — (ক) ব্রতধর্মী লোকনাটক (খ) লোকায়ত উৎসবধর্মী লোকনাটক।

ব্রতধর্মী লোকনাটক ঃ

ঋগ্বেদে 'ব্রত' শব্দটির অর্থ হল 'কর্ম'। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ সংকুচিত হয়ে পরিণত হয়েছে 'প্রার্থনানিষ্ঠ কর্ম'। বুৎপত্তিগত অর্থ বৃ = প্রার্থনা করা + অত = কর্ম। ব্রতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।"[১৬] অর্থাৎ ব্রত হল এমন কর্ম যার মধ্য দিয়ে ব্রতীর কামনা মূর্ত হয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর মঙ্গল সাধিত হয়। পরিবার ও সমাজের কল্যাণের জন্য প্রাক্‌বৈদিক কাল থেকেই আদিম কোম সমাজে এই ব্রতকর্ম প্রচলিত ছিল। "ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয় পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"[১৭] অর্থাৎ প্রকৃতিকে তুষ্ট রাখার সাধনা থেকেই ব্রতের উৎপত্তি হয়েছিল। আর এই সাধনায় মানুষ নিজের আশা-আকাঙ্খা, কামনা প্রভৃতিকে ব্যক্ত করে। অনুমান করা হয় আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যাঁরা ব্রাত্য বা পতিত বলে পরিচিত ছিল, ব্রতধর্ম পালন করতেন বলেই হয়তো তাদের ব্রাত্য বলা হত।[১৮] আবার যে আর্যরা অনার্যদের 'অন্যব্রত' বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল পরবর্তীতে দেখা যায় ব্রত পালন ও ধর্মানুষ্ঠানের দিক থেকে আর্য-অনার্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "নানা ঋতুর মধ্য দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানা রকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্য-কামনায়- এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে কী আর্য কী অন্যব্রত সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।"[১৯] মনস্কামনা পূরণের ইচ্ছা থেকেই মানুষ যে আদিম জাদু আচার সৃষ্টি করেছিল, ব্রত হল তারই লৌকিক রূপ। ব্রতের মধ্য দিয়েই ব্রতীর কামনা বাসনাগুলি ফুটে ওঠে। তবে ব্রত কেবল ব্রতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা দশের মঙ্গলের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।

ব্রত অনুষ্ঠানে পূজার পাশাপাশি ব্রতীরা ব্রতের অঙ্গ হিসেবে ব্রতকথা, ছড়া বা গান করে থাকেন। ব্রতকথার কাহিনিগুলিতে নাটকীয়তাও লক্ষ করা যায়। সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় এই ব্রতকথায়। কোন কোন ব্রতের কথা সংলাপ প্রধান। ব্রতকথা পাঠের সময় ব্রতীমনে কাহিনির দৃশ্যপট ভেসে ওঠে।

ব্রতগুলিতে নাটকের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "ব্রতে এই-সবই রয়েছে - কবিতা চিত্র উপাখ্যান গদ্য পদ্য এবং মণ্ডলশিল্প। এর মধ্যে ছড়াগুলি সব এক-রকম নয়; কোথাও দেখব সেগুলি নাটকের মতো পাত্রপাত্রী এবং নানা দৃশ্য ও অঙ্কভেদে সাজানো। ...ব্রতের মধ্যে পুরাকালের ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে চিত্রকলা নাট্যকলা নৃত্যকলা গীতকলা উপন্যাস উপাখ্যান পর্যন্ত পাচ্ছি।"[২০] তাই বিভিন্ন ব্রতে আমরা নাটকের মত পাত্রপাত্রী লক্ষ করে থাকি। কখনও কখনও ব্রতীরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে। আবার কিছু কিছু ব্রতে ছড়ার গঠন ও বাঁধুনি রীতিতে নাট্যকলার লক্ষণ রয়েছে। এগুলি কেবল মন্ত্রের মত করে বলা হত না, নাটকের আকারেও অভিনীত হত।

উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত ব্রতগুলি প্রচলিত, সেগুলির বেশিরভাগই নারীসমাজের ব্রত । তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয় । ব্রতগুলি সাধারণত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মঙ্গল কামনায় পালন করা হয় । আর এগুলির মধ্যেও এমন কিছু ধর্মীয় আচার-আচরণ, মন্ত্র, গান প্রভৃতি লক্ষ করা যায়, যার ভেতর আমরা লোকনাটকের সুত্র খুঁজে পেতে পারি ।এই অঞ্চলে প্রচলিত ব্রতধর্মী পর্যায়ের লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল— ষাইটোল, সত্যপীর, কাতিপূজা, মেচেনী প্রভৃতি ।

ষাইটোল ঃ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় ষষ্ঠীদেবীর পূজা ষাইটোল পূজা নামে পরিচিত। আবার অনেকের মতে শিবকন্যা 'নেতা'ই এই ষাইটোল দেবী। তবে এই ষাইটোল দেবীই ষষ্ঠীদেবী কিনা এ বিষয়ে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "দেবী ষাইটোন এখানে রঙপুর জেলার মতো পুরোপুরি ষষ্ঠী দেবী নহেন কিংবা কোচবিহার জেলার মতো বসুধাকে শস্যশালিনী করিবার জন্য লিঙ্গ-পূজাও নহে।

জলপাইগুড়িতে ষাইটোনের পূজা করা হয় সাধারণত বিবাহাদির পূর্বে। রঙপুরের মতো সন্তানাদির মঙ্গল কামনায় জাত্যাশৌচের পরও ইঁহার পূজা করা হইয়া থাকে। এই দিক দিয়া দেখিলে ষাইটোন যথার্থই ষষ্ঠীদেবী এবং কাহিনী লক্ষ করিলে দেবী ষাইটোনকে ষষ্ঠীদেবীই বলিতে হয়।"[২১] ষাইটোল ব্রতের নির্দিষ্ট কোন দিনক্ষণ নেই। যে কোন শুভ দিনে পূজা করা যায়।

ষাইটোল পূজার প্রতিমূর্তি 'ষাইটোলের ডোল' শোলা দিয়ে তৈরি করা হয়। যার বাড়িতে এই পূজা হয় তাকে মারেয়া বলা হয়। মারেয়া ছাড়াও এই ব্রতে আরও দুই-তিনজন সহকারী ব্রতী বা বৈরাতি থাকেন। ব্রতকামী গৃহস্থের বাড়িতে গৃহকর্ত্রী একজন অভিজ্ঞা মাঝবয়স্কা মহিলা অর্থাৎ যাকে গীদালি বলা হয়, তাকে নিমন্ত্রণ

3 1 MAR 2016

LIBRARY N.B.U. DARJEELING
278435

করেন ব্রতানুষ্ঠান করার জন্য। গীদালির পরিচালনায় যাইটোল ব্রতের গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গৃহস্থের বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনে এই পূজার আয়োজন করা হয়। পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রতকথা সুর ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে গান ও নাচ থাকে। যেমন— পূজা ওচানি (আয়োজন), ফুলবাড়ানি, বন্দনা, মূল গান, ঘট তোলা এবং ঘট ভাসানি। পূজার বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক ক্রিয়াকলাপগুলি নির্দিষ্ট গানের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। গীদালির সঙ্গে চার-পাঁচজন দোহারও থাকেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ গীদালির সঙ্গে 'হুকাতি-ককাতি'র মাধ্যমে কথার খেই ধরে রাখেন। পূজা শেষ হলে যাইটোল ব্রতকথা ও ব্রতগান পরিবেশিত হয়। ব্রতকথার সংলাপগুলি গীদালি ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারী মহিলারা নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেশন করে। এই সংলাপ কখনো গদ্যে, আবার কখনো পদ্যে রচনা করে থাকেন দলের সদস্যরা। এছাড়া ব্রতকথার মাঝে লোকনাটকের মত খোসা গান ব্যবহার করতেও দেখা যায়। যেমন—

'নীলা— হায়রে দারুণ বিধি তোর জইন্যে পাঙ্
আনি দে বিষের ভাণ্ড মুই খায়া মরি যাঙ।
ভগবান এত দুঃখ কি নীলার কপালত দিচিস্।
হায় রে দারুণ বিধি।

মণিহার — যেলা মুই কাচারিত বইসোঙ, তোর নীলার কান্দন শোনঙ্
আসিলুঙ মুই কাচারি ছাড়িয়া, তুই কেনে কান্দিস নীলা?
তোর কান্দনে মনটা মোর বাইরাঙ বাইরাঙ করে
নীলা তুই কীসের দুক্ষে কান্দিস?

নীলা — সাধুরে মুই কি করিয়া খাইম ভাত।'

সংগ্রহসূত্র ঃ জীতেন বর্মণ (৫৮), ১৬৪ গোপালপুর, জামালদহ, কোচবিহার।

সত্যপীর ঃ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সত্যপীরের কাহিনি বা গানগুলির মধ্যে যে অলৌকিকতা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলেও সত্যপীর দেবতা সম্পর্কে তেমন কোন প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ-এর মতে, "সত্যপীরের পিতৃমাতৃদত্ত নাম কেহই অবগত নহে, কিন্তু 'সত্যপীর' একটী উপাধি বলিয়াই অনুমিত হয়। ...পুথির লিখিত বিবিধ অলৌকিক বৃত্তান্তের মধ্যে সত্যপীরের প্রকৃত জীবনী অনুসন্ধান করিলে প্রতীতি হয় যে, সত্যপীর হিন্দুবংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার প্রচারে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।"[২২] এক্ষেত্রে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়, "মনে হয়, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর কোন অলৌকিকতাসিদ্ধ মুসলমান ফকির বা পীরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমসাময়িক কাল কিংবা তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তীকাল হইতেই এই পাঁচালিগুলি রচিত হইতে আরাম্ভ করে।"[২৩] এ প্রসঙ্গে

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গে সত্যপীর এবং সত্যনারায়ণ দু-ধরনের ব্রত লক্ষ করা যায়। স্বভাবতই এখানে একটি প্রশ্ন জাগে সত্যনারায়ণ এবং সত্যপীর কি একই দেবতা? তবে শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, "...গ্রাম্যদেবতার পুজোগুলি, যেমন মনসা, শীতলা, সত্যপির এগুলিকে শাস্ত্রীয় করে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা কিছু সুবিধা করে নিলেন। মুসলমানের পিরকে লোকে যেমনি পুজো দিতে আরম্ভ [করল] অমনি তাঁকে সত্যনারায়ণ ব'লে প্রচার ক'রে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন।"[২৪] তবে সত্যপীরের পূজা, মন্ত্র, ফকিরের পোশাক লক্ষ করলে দেখা যায় যে, তাতে মুসলমানী ছাপ কিছুটা রয়ে গিয়েছে। এছাড়া সত্যপীরের সিন্নি এবং সত্যনারায়ণের সিন্নির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায় যে, সত্যনারায়ণ আসলে সত্যপীরেরই অপভ্রংশ।

সত্যপীরের মূলত মুসলিম পীর হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পরম শ্রদ্ধার সাথে পূজিত হন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সমতল দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে সত্যপীর পূজার প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ করে মুসলিম প্রধান এলাকায় গ্রামাঞ্চলের দিকে এই পূজা ব্যাপক প্রচলিত। পৌষ থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত চলে এই পূজা। গৃহস্থের মঙ্গল কামনায়, অসুখ-বিসুখ, মামলা মোকদ্দমার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং মনস্কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুরাও সত্যপীরের পূজা করেন।

গৃহস্থের সামর্থ্য অনুযায়ী পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই পালাগান অনুষ্ঠিত হয় বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম। পালার মূল গায়ক হলেন একজন ফকির। এই 'ফকির' সম্পর্কে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন, "হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ফকির হইয়া থাকেন।"[২৫] তাঁর হাতে থাকে একটি চামর। এছাড়া দলে থাকেন দোয়ার এবং ছুকরী। পালাগানের আসরে দলের সদস্যরা গোল হয়ে বসে। বন্দনা দিয়ে পালা শুরু হয়। ফকির বন্দনা শেষ করে পাঁচালির কাহিনি সংলাপের মাধ্যমে গেয়ে যান। ছুকরী ও দোয়ার গানের ধুয়া ধরে এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সত্যপীরের পালাগুলির মধ্যে অন্যতম হল— আলঙ্গীর বাদশা, ধর্মী রাজার পালা, আমরুল বাদশার পালা, মালঞ্চার পালা, হীরামুচির পালা, যশমন্ত সাধুর পালা প্রভৃতি। যেমন—

'ফকির — বিদায় দে মা মোক দেরি না সয় আর।
ভর দুনিয়াত যাইম মুই জহুত করিবার।।
খোদাতাল্লা কইছে যদি না যাইস জহুত করিবারে।
শত বংশ ডালি দিবে দোজোগ মাঝারে।।
সইন্ধা — না দিম না দিম বাছারে না দিম ছাড়িয়া।
হিয়ার মাঝরে তোকে রাখিম রে বান্দিয়া।।
ফকির — ভাল করিয়া কইতে যদি না দিবু ছাড়িয়া।
আন্ধার রাইতোত ছাড়ি যাইম তোক না যাইম কয়া।।' (আলঙ্গীর বাদশা)

সংগ্রহসূত্র ঃ জীতেন বর্মণ (৫৭), ১৬৪ গোপালপুর, জামালদহ, কোচবিহার।

কাতিপূজা ঃ কাতিপূজা হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে। তবে মানত করা থাকলে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এই কাতিপূজা হতে পারে। সন্তান কামনা করে এই ব্রত পালন করা হয়। উত্তরবঙ্গে কামরূপ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এই পূজার প্রচলন লক্ষ করা যায়। মূলত মহিলারাই এই ব্রত পালন করেন। ব্রতীরা নিজেরাই ব্রতের আয়োজন করে। একজন অভিজ্ঞা গীদালি পৌরহিত্য করেন। পূজার সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াগুলি, যেমন— পূজার ঘট বসানো, চাইলোন সাজানো, পুরোহিত, ঢাক প্রভৃতি বরণ করেন গীদালি। এছাড়া গীদালিকে পূজার কাজে সাহায্য করেন কয়েকজন বৈরাতি। পূজার জন্য নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক গানগুলি করে থাকেন এক বা একাধিক বৈরাতি।

পূজানুষ্ঠান শেষ হলে সারারাত ধরে চলে বিভিন্ন রঙ্গরসে পরিপূর্ণ ব্রতকথা, নৃত্য ও সঙ্গীত। এই গানগুলিতে আদি-রসাত্মক কথা প্রচুর পরিমাণে থাকে। কার্তিকের বিবাহ এবং তার সঙ্গে মা-ঝিয়েদের রঙ্গ তামাসা এসব নিয়েই গানগুলি রচিত হয়। মাতা বসুধার বন্দনা দিয়ে শুরু হয় গান। বন্দনা শেষে মূল গানে প্রবেশ করেন গীদালি। যেমন—

'শিব — শোনেক কাত্তি কয়া বুজাঙ তোক
সাতালী না পর্বততলে আছে রে বালাবতীর কইনা
উনায় আছে রে হরির কমণ্ডুলে
সাতালী না ফাটেয়া বালাবতীক বিয়াও করা তুই
গীদালি (গান) — ও কি ও রে হায় হায়
কান্দে কাতি মোর শিবের চরণ ধরি রে।
কার্ত্তিক — সইত্য করি কইচোঙ রে বাপো বিয়াও না করিম
শিব — শোনো শোনো কাত্তিরে কুমার
তোর এই কাথা যদি চণ্ডী শুনিবারে পায়
দেব নারী ধরি রে কাত্তি বিয়াও দিবে তোর।'

সংগ্রহসূত্র ঃ সরস্বতী রায় (৫৮), বরুয়াপাড়া, ঘুঘুমারী, কোচবিহার।

বৈরাতিগণ সেই গানের ধুয়া ধরেন এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। গান ও নাচ চলাকালীন আড়ালে গিয়ে ঢাকি ঢাক বাজায়। আবার অঞ্চল বিশেষে কোথাও কোথাও দেখা যায় গানের পরের ভাগে একজন বৈরাতি হাঁটু গেড়ে বসে গরুর ভূমিকায় অভিনয় করে। এমন সময় একজন বাঘ সেজে বেরিয়ে এসে হালের গরুকে ধরে নিয়ে যায়। কৃষকরূপী নারী বাঘের কবল থেকে গরুকে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করতে থাকে। এরপর পুরুষ

বেশধারী গীদালি লাঠি নিয়ে বাঘ তাড়াবার চেষ্টা করে। এভাবে ধান লাগানো, বিয়ে, ধান কাটা প্রভৃতি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়।

তিস্তাবুড়ি পূজা বা মেচেনী ঃ তিস্তা উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নদী। আর এই তিস্তাকে কেন্দ্র করে যে পূজা প্রচলিত, তাকে তিস্তাবুড়ি পূজা বলা হয়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে রাজবংশী রমণীরা ঝড়ঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা পেতে এই ব্রত পালন করেন। এই পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান অঞ্চলভেদে মেচেনী বা ভেদেইখেলি নামে পরিচিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য-এর মতে, "উত্তরবাংলার সবচাইতে দুরন্ত নদী তিস্তা; নৃত্য ও বাদ্যভান্ড সহকারে তিনি গ্রীষ্মকালে স্ত্রী সম্প্রদায়ের দ্বারা পূজিত হন। ....মেচ সম্প্রদায়ের আধা হিমালয়বাসী এক জাতি একদিন ঐন্দ্রজালিক ও আচার নৃত্যে এবং সঙ্গীতে তার পূজো করত। সেই জন্য এখন পর্যন্ত এই নৃত্যের নাম মেচেনি নাচ অর্থাৎ মেচ মেয়েদের নাচ।"[২৬] এই একই ধরনের মতামত জ্ঞাপন করেছেন ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, তিনি বলেছেন, "মেছেনী' নামের মধ্যে আসাম ও জলপাইগুড়ির সীমান্তস্থিত মেচ উপজাতির নামের ছোঁয়া আছে বলিয়া মনে হয়। ...যে কোনো নদী বা জলাশয়কেই পূজা করিবার প্রথা মেচদের মধ্যে খুবই দেখা যায়।"[২৭] আবার ড. চারুচন্দ্র সান্যাল এই 'মেচেনী' সম্পর্কে বলেছেন, "It is said that the worship had its origin from the mechs who inhabited this part of the country before the Rajbansis settled in this area."[২৮] তবে এ সকল মত খণ্ডন করে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় মনে করেন, "বেশ কয়েক পুরুষ পূর্বে মেচী নদী তীরবর্তী অধিবাসীরা এই নদীকে পূজা দিবার প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন এবং পূজার সহিত একটি গীতিউৎসব যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে গীতিশাখাটির নাম হইয়া যায় মেচেনী খেলা এবং পরে তাহা তিস্তাবুড়ি পূজার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। এই কারণেই সম্ভবতঃ মেচীনদীর পূজাটি তিস্তানদীর পূজায় রূপান্তরিত হইলেও গীতিশাখাটির নাম মেচেনী খেলাই থাকিয়া গিয়াছে।"[২৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বহুকাল পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলায় দোমহনী অঞ্চলে তিস্তা নদীর একটি শাখা নদী ছিল মেচী নদী।

মেচেনী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের একটি নারীকেন্দ্রিক ব্রতানুষ্ঠান। বৈশাখ মাসে এই পূজা হয়ে থাকে। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস এই যে, তিস্তাবুড়ির পূজা করলে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই পূজার নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন আগে থেকেই মেচেনীর দল বাড়ি বাড়ি নাচ ও গান করে বেড়ায়। ১০-১৫ জন মহিলা নিয়ে এক-একটি মেচেনীর দল গঠিত হয়। দলের মধ্যে থেকে একজন অভিজ্ঞা রমনী দলনেত্রী নির্বাচিত হন, তাকে বলা হয় মাড়েয়ানী। একটি বাঁশের ডালার মধ্যে একদলা এঁটেল মাটি হল দেবী তিস্তার প্রতীক। সেখানে কিছু ফুল, আতপচাল, কাঁচা দুধ, সিঁদুর প্রভৃতি দেওয়া থাকে। এরপর একটুকরো সাদা কাপড় দিয়ে সেটিকে ঢেকে নেওয়া হয়। মাড়েয়ানী একটি ছাতা মাথায় ধরে ডান কাঁধে ডালা নিয়ে যান। সেই ছাতাটিকেও খড়িমাটি দিয়ে আলপনা এঁকে সিঁদুরের ফোটা এবং শোলার ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

এই ব্রতে কতগুলি আনুষ্ঠানিক পর্যায় রয়েছে। ব্রতের প্রথম দিন অর্থাৎ 'ফটা মারার দিন' মাড়েয়ানীর নিজের বাড়ির উঠোনে পিঁড়ি পেতে ডালাসহ ছাতাটি তার মধ্যে রাখা হয়। তিস্তাবুড়িকে স্বর্গ থেকে মর্তে আনার জন্য ধূপ-দীপের সাহায্যে বন্দনা গান করেন মাড়েয়ানী। দলের অন্যান্য সদস্যরা সেসময় তার গানের ধুয়া ধরেন এবং নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই গানের সময় কোন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় না। কেবল হাতে তালি দিয়ে তাল ধরা হয়। সেজন্য এই গানের তালকে 'থাপুরি' বলা হয়। এরপর দেবীকে মর্তে নেমে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, সেই গানকে বলে 'নামানী'। 'বসানী' গানের মাধ্যমে দেবীকে আসন দেওয়া হয়। একে একে তিস্তাদেবীকে জাগানোর 'জাগানী' গান এবং গ্রামদেবতাকে স্মরণ করে অন্য বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন পথ দিয়ে চলার সময় যে গানগুলি পরিবেশিত হয়, যা পাথারিয়া গান নামে পরিচিত সেগুলি গাওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে চলার পথে যেসব খণ্ড বিক্ষিপ্ত চিত্র তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই উপাদান নিয়েই তারা গান বাঁধে। যেমন—

'হি বাড়ির গিরথানীটা
বড়য় খেচেরী গে।
বাহির হয়া জোগাড় দেও
আঙ্গিনাৎ মেচেনি গে।।'

অথবা

'নয়া নয়া কুলাখান
বেতের বনে গে বেতের বান।
কোটকী দিলে ধান গে
কোটকী দিলে ধান।
এই গুটিক ধান দিয়া
নাচালো গে শিকোই ঢুলী
ভাতার শুনিলে ডাঙাবে তোক।'

সংগ্রহসূত্র ঃ সন্ধ্যা রায় (৪০), সদাগর পাড়া, কাদোবাড়ি, জলপাইগুড়ি।

মেচেনীর দলকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলেই গৃহস্থেরা বাড়ির উঠোনে অবস্থিত দেবস্থানে অর্থাৎ তুলসীমঞ্চের সামনে পরিষ্কার জল ঢেলে সেখানে একটি পিঁড়ি পেতে দেন। গৃহস্থেরা দেওয়া তেল সিঁদুর দিয়ে দেবীকে বরণ করা হয়, তাকে বলে 'চুমানী'। দলটি পিঁড়ির ওপর ছাতা রেখে 'নাচানী' পর্বের গান গায় এবং সেই জল ঢালা জায়গাটিতে দলের কিশোরীরা নাচতে থাকে। সেই নাচের জায়গাটিতে বালতি দিয়ে সামান্য জল ঢালা হয়, যাতে জায়গাটি পিছল হয়। নাচনীরা দু'পা জোড়া করে মাটিতে ঘষতে ঘষতে বিশেষ একপ্রকার ভঙ্গীতে বৃত্তাকারে

ঘুরে নাচে। এই গানগুলিতে দেবতার স্তুতি ছাড়াও সমসাময়িক ঘটনা এবং নিকটবর্তী গ্রামের নানা ঘটনা গানে উঠে আসে। তাই দেখা যায় পাথারিয়া ও নাচানিয়া গানের বিষয়বস্তু প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়। 'নাচানী' পর্বের শেষে গৃহকর্ত্রীর কাছে মাঙ্গন আদায় করে মেচেনীর দল ডালায় রাখা পুটলি থেকে আতপ চাল ও ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করেন। পিঁড়ি থেকে ছাতা ওঠানোর সময় 'উঠানী' গান গাওয়া হয়। সারাদিন গ্রাম পরিক্রমার পর সন্ধ্যার সময় দলটি মাড়েয়ানীর বাড়িতে ফিরে এসে তুলসীমঞ্চে ছাতা রেখে 'ঘরবৈঠানী' গান গেয়ে ঐ দিনের অনুষ্ঠান শেষ করে। সারা বৈশাখ মাস বাড়ি বাড়ি নাচ-গান করে মাঙ্গন আদায় করার পর অন্তত একদিন কোন হাটে যেতে হয়। একে 'হাটঘুরানী' পর্ব বলা হয়। মাসের শেষে কোন জলাশয়ে বা নদীতে কলার ভেলায় দেবীকে স্থাপন করে পূজা দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে মেচেনীর দল ডাঙায় বা নদীর চরে যে নৃত্যগীত পরিবেশন করে, তাকে 'ভুরাভাসানী' গান বলে। সেই দিন বা পরের দিন মাড়েয়ানী নিজের বাড়িতে 'দেহর'-এর আয়োজন করে। বাড়ির উঠোনে দেবস্থানে শিব ও তিস্তাবুড়িকে পূজা দেওয়া হয়। এই পূজা চলাকালীন মেচেনী দলের সদস্যরা নামানী, জাগানী এবং নাচানী পর্বের গান পরিবেশন করে। অবশেষে বিভিন্ন বাড়ি থেকে সংগৃহীত চাল রান্না করে খাওয়ার মাধ্যমে মেচেনী ব্রতের সমাপ্তি হয়।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক মেচেনী ব্রতে লোকনাট্যের আভাস খুঁজে পেয়ে বলেছেন, "লোকনাট্যের একটি বড় দিক হল, এতে বিনা প্রস্তুতিতে কোন বিশেষ বিষয়-প্রসঙ্গ, চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়। Improptue রীতির বিশেষ প্রয়োগ এখানে দেখা যায়। যদি অনুষ্ঠানটিকে 'খেলা' বলে মনে করা হয় এবং চলতে চলতে , যেতে-যেতে, সেই দৃশ্য-ঘটনা-চিত্রকে বিনা প্রস্তুতিতে গানে ভেতরে নিয়ে নেবার সুযোগ বা প্রথা বা অবকাশ থাকে, তবে সহজেই তা লোকনাট্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।... মেছেনী গানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্যায় হ'ল 'নাচানিয়া' ও 'পাথারিয়া' পর্যায়। 'নাচানিয়া' পর্যায় অনুষ্ঠিত হয় গৃহের অঙ্গনে; নামের থেকেই বোঝা যায়, তা নৃত্য সম্বলিত গান। আর, 'পাথারিয়া' গান গাওয়া হয় পথে চলতে-চলতে। গুরুত্বের দিক বিবেচনা করলে, আমার মতে, 'নাচানিয়া' পর্যায়ের তুলনায় 'পাথারিয়া' পর্যায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। নাচানিয়া যেহেতু গৃহাঙ্গনের গান, সেহেতু তা ফর্মের দিক থেকে নৃত্য জড়িত বলে কিছু বাঁধাবাঁধির অন্তর্ভুক্ত, সেই কারণেই উপস্থিত ক্ষেত্রে রচনার সুযোগ 'পাথারিয়া'র তুলনায় কম। অপর দিকে, 'পাথারিয়া' পথচলতি দৃশ্য-ঘটনা-চিত্রের বিবরণ ও রূপায়ণ বলে তাতে প্রসঙ্গগুলির তাৎক্ষণিক অন্তর্ভূক্তি সহজেই ঘটে, যা লোকনাট্যেরই একটি বিশেষ দিক। পথে দুই মেছেনী দলের সাক্ষাৎ হয়ে গেলে দুই দলে তৎক্ষণাৎ গানে-গানে লড়াই ও বিতর্ক বেঁধে যায়। নাটক তখন পুরোমাত্রায় এসে পড়ে।"[৩০] মেচেনীর বিভিন্ন পর্বে গানের মাধ্যমে মেচেনী দলের উক্তি-প্রত্যুক্তি, মাড়েয়ানীর মধ্য দিয়ে তিস্তাবুড়ির বক্তব্য পরিবেশন এবং নাচানী পর্বে গৃহকর্ত্রীর অভিব্যক্তি প্রকাশ প্রভৃতি লোকনাটকের বৈশিষ্ট্যকেই মনে করিয়ে দেয় । এই মেচেনী খেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও সমতল দার্জিলিং জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে প্রচলিত।

লোকায়ত উৎসবধর্মী লোকনাটক ঃ

ধর্মীয় আচার-আচরণের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উৎসব। বলা যায় এই উৎসবের মধ্য দিয়েই মানুষের যৌথ অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, "...একদল মানুষ যখন যৌথভাবে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ উপলক্ষে নির্দিষ্ট তিথিতে পৌনঃপুনিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে পালন করে তখন সেই অনুষ্ঠান উৎসবে পরিণত হয়।"[৩১] অর্থাৎ কোন জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনাই উৎসবকে সার্থকতা দান করে। যে সব উৎসব লোকসমাজে প্রচলিত, সাধারণ মানুষ যেখানে আনন্দে মূর্ত হয় তাকে লোকউৎসব বা লোকায়ত উৎসব বলা যেতে পারে। আর লোকসমাজ বলতে আমরা মূলত গ্রামীণ জনসাধারণকে বুঝি। এই উৎসবের আদি রূপ হল পার্বণ।

উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোকউৎসবগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাক্-আর্য সংস্কৃতির ধারাকে বহন করে এসেছে। তাই লোকসংস্কৃতিবিদ্ ড. দুলাল চৌধুরীর মতে, "পরবর্তীকালে এই উৎসবগুলিতে আর্যসংস্কৃতি ও সভ্যতা কিছুটা পেলবতা দান করলেও এগুলির মধ্যে মূল আদিম ভাবটি এখনও থেকে গেছে।"[৩২] তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই আদিম ভাবটি থেকে যাওয়ার ফলে লোকউৎসবগুলি অনেকটা বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। এই লোকউৎসবগুলির আনুষ্ঠানিক বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিতেও লোকনাটকের অনেক বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। এই অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন লোকউৎসবগুলির মধ্যে অন্যতম হল— হুদুম দ্যাও, সোনা রায়, জাগগান প্রভৃতি।

হুদুম দ্যাও ঃ 'Fertility' অর্থাৎ 'উর্বরতা' জীবজগতের একটি অতি আবশ্যিক বিষয়। এর অভাবে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। এবং তখন থেকেই জীবজগতে প্রজননের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আচার-আচরণ। এ প্রসঙ্গে ড. রেবতীমোহন সরকার মনে করেন, "বনে পশুপাখির বৃদ্ধি, ক্ষেতে ফসল বৃদ্ধি এবং ঘরে ঘরে মানব সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মানুষের প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য বিষয় হল উর্বরতা সংক্রান্ত নানা ধরনের জাদু-ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন যা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল।"[৩৩] আর সেই অনুষ্ঠানগুলি আজও অবিচ্ছিন্ন গতিতে আমাদের সমাজে টিকে রয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষিকে কেন্দ্র করে যে সকল দেবতা উদ্ভব হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই প্রজনন শক্তি ও উর্বরতার প্রতীক। এখানে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে ভূমিকে। নারীরূপী ভূমিকে উর্বরতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের জাদুধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করা হয়, যা 'Fertility cult' অর্থাৎ 'উর্বরতা আচার' নামে পরিচিত।

জল প্রকৃতির এক অন্যতম উপাদান, যা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। আবার জল ছাড়া পৃথিবীতে কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না, তাই জলের অপর নাম জীবন। আমাদের ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আর এই কৃষিকাজ বৃষ্টিপাতের উপরেই নির্ভরশীল। তবে অতিবৃষ্টি যেমন ফসলের ক্ষতি করে, তেমনি অনাবৃষ্টির

ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। অনাবৃষ্টি বা খরার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নানাধরনের যাদুধর্মীয় আচার-আচরণ পালিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার তাঁর 'The Golden Bough' গ্রন্থে এ ধরনের অনেক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি প্রাচীনকাল থেকেই ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি আদি-বৈদিক দেবতাকে পূজা করার নিয়ম চলে আসছে। রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখিত রাজা জনকের হালকর্ষণ, সীতার জন্ম এবং খাণ্ডব দহনে ইন্দ্রের বারিবর্ষণ অর্থাৎ সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় যে জলদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল তা অনুমান করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশে মেঘরানীর ব্রত, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রব্রত ও বসুধরা ব্রতের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে বৃষ্টির দেবতা হলেন হুদুম দ্যাও। 'হুদুম' শব্দটির উৎস সম্পর্কে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "হুদুম শব্দটি উলঙ্গ অর্থে 'উদুম' হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ...এই গান গাহিবার সময় মেয়েরা একেবারে উলঙ্গ হইয়া থাকে। উলঙ্গ হইয়া যে গান গাওয়া হইয়া থাকে, তাহাই হুদুমার গান এবং সেই দেবতার নাম 'হুদুমা' বা 'হুদ্‌মা' বা 'হুদুম-চুকা'।"[৩৪] অনাবৃষ্টি, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গ্রাম্যসমাজে বৃষ্টির প্রার্থনায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এটি নারীকেন্দ্রিক লোকাচার, তাই পুরুষের প্রবেশাধিকার ও দর্শন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ড. চারুচন্দ্র সান্যাল মনে করেন, "No men are allowed to go near the dancing place. If somebody ventures noone will abuse the women if they attack the man with the 'daos' they possess or even kill him."[৩৫] লোকালয় থেকে দূরে চাষের জমিতে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কথিত আছে, পুরুষেরা এই অনুষ্ঠান দর্শন করলে পূজানুষ্ঠান ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাজবংশী সমাজে এই হুদুম দ্যাও সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বৃষ্টির দেবতা হুদুম দ্যাও কোন কারণে রুষ্ট হলে তিনি বৃষ্টি বা জল দেন না। নারীদেহের মাধ্যমে এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই বৃষ্টি হবে, কৃষিকাজ হবে, ফসল রক্ষা পাবে। তাই কোন এক অমাবস্যার রাতে সধবা মহিলারা এলো চুলে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে পূজা শুরু করে। এই হুদুম দ্যাও সম্পর্কে W.W. Hunter লিখেছেন, "A singular relic of old superstition is the worship of the God called Hudm-deo. The women of a village assemble together in some distant and solitary place, no male being allowed to be present at the rite, which is always performed at night; a plantain or a young bamboo is stuck in the ground, and the women, throwing off their garments, dance round the mystic tree, singing old songs and charms. This rite is more especially performed when there is no rain, and the crops are suffering from drought.'"[৩৬] স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "To put an end to drought and bring down rain, women and girls of the village of ploska are wont to go naked by night to the boundaries of the village and there pour water on the ground."[৩৭] অর্থাৎ 'হুদুম দ্যাও' অনুষ্ঠানটির মতো 'polska'-র একটি গ্রামে মহিলারা উলঙ্গ অবস্থায় একই ধরনের আচার পালন করে। সারা পৃথিবী জুড়ে এরূপ 'Fertilety Cult' ধর্মী লোকাচার প্রচলিত আছে।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার সমতল অংশ ও দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই পূজা প্রচলিত। হুদুম দ্যাও পূজায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন একজন নারী পূজা দেন এবং মন্ত্রপাঠ করেন। তাদের মধ্যে আর একজন যিনি একমাত্র সন্তানের জননী তিনি এক নিশ্বাসে একটি ছোট কলাগাছ তুলে আনবেন। অন্যান্য মহিলারা সেই কলাগাছটিকে কিছুটা দূরে পুঁতে দেয়। এরপর সেই কলাগাছটিকে ঘিরে শুরু হয় নাচ ও গান। যেমন—

'কানায় শুনে হুদুমে দ্যাখে
ওরে হুদুম ধোকড়া ধরি আয়।
খেকরি দিয়া খ্যাওড়ে তুলেক মাছ
দেওয়ারও ম্যাঘ ম্যাঘালি
ঝড়ি গেইছে আইজ।'

অথবা

বাড়া ভুখাঙ বাড়া ভুখাঙ রে
ভাতো বেলায় আন্দোং।
সেই ভাতো খাবে এলা মোর
হ্যানা হুদুম দ্যাও।
সেই ভাতো খাবে হুদুম দ্যাও
মইধ্য আইনাত বসি রে মইধ্য আইনাত বসি।'

সংগ্রহসূত্র ঃ কল্পনা দাস (৬৫), বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

নৃত্য গীতের মাধ্যমে ব্রতীদের এ ধরনের অভিনয় লোকনাটকের ফর্মকেই মনে করিয়ে দেয়। কোথাও কোথাও কাঁদামাটি ও গোবর দিয়ে তারা হুদুমের মূর্তি তৈরি করে পূজা করেন। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, "তিস্তার তীরবর্তী পাহাড়পুর ও বালাপাড়া অঞ্চলের হুদুমার অনুষ্ঠান বেশ মনোরম। এই সকল স্থানে হুদুমার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে।"[৩৮] আবার ড. চারুচন্দ্র সান্যালের মতে অঞ্চলবিশেষে দেখা যায়, "Two women kneel on the ground like cows and draw a plough to scratch a few feet of the land. Into the furrow thus formed they spread some paddy seeds or plant a few paddy seedlings."[৩৯] পূজা শেষ হলে তারা দলবদ্ধ হয়ে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায়। এক বাড়ি থেকে অন্যবাড়ি যাওয়ার সময় তারা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে আড়ালে যান। সে সময় তারা যৌনসংগমকালীন ভাবগুলি নিজেদের দেহে ফুটিয়ে তোলে। যে বাড়িতে দলটি প্রবেশ করে, সেখানকার পুরুষেরা অন্যত্র চলে যান। বাড়ির উঠোনে দলটি যে নৃত্য সহকারে গান করেন তার মধ্যে যৌন আবেদন ও শৃঙ্গার রসাত্মক ভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সোনা রায়ঃ উত্তরবঙ্গ একসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ফলে বাঘ-ভালুকসহ অন্যান্য বন্যজন্তুর আক্রমণের ভয়ে এখানকার মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। এদের মধ্যে বাঘের ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যাঘ্রভীতি দূর করার জন্য গ্রামাঞ্চলে সোনা রায় দেবতার উদ্ভব হয়। আর তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য সোনা রায়ের পালাগানের প্রচলন। ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায় সম্পর্কে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ লিখেছেন, "মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা তৎপূর্ব্বে, কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপারায় নামক দুইজন ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহাদের প্রকৃত বিবরণ বিবিধ অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে।"[৪০] কিন্তু সোনারায় ও রূপারায় ধর্মসংস্কারক হয়ে কিভাবে ব্যাঘ্রদেবতায় পরিণত হলেন, তা স্বতন্ত্রভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। তবে যাই হোক এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "...সোনারায় ও রূপারায় হয়তো ধর্মসংস্কারকই ছিলেন। ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদে, শ্রীকৃষ্ণ শ্বেত মাছির রূপ লইয়া গোয়ালিনী নন্দরানীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহারাই সোনারায় এবং রূপারায় এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে ইঁহারাই জনগণকে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ জনগণের মনে মুসলমান প্রতাপ এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, মানুষের চেয়ে অধিক প্রতাপশালী ব্যাঘ্রের আশ্রয় লইয়া, কল্পনায় সেই দুর্দান্ত মোগল সৈন্যদের পরাভূত করা হইয়াছে। বস্তুত সোনারায় ঠাকুরের গান দেশের ধর্ম-ইতিহাসের এক বিশেষ দিককে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে, এই লৌকিক গানের সাহিত্যিক মূল্য না থাক, ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"[৪১] এই পূজা সাধারণত কৃষক, রাখাল ও গো-পালকদের মধ্যে বেশি প্রচলিত। অঞ্চলভেদে শিব চতুর্দশী অথবা পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে এই পূজা হয়ে থাকে। পূজার প্রায় ৭-৮ দিন আগে ভক্তরা দলবেঁধে মাঙ্গন সংগ্রহের জন্য বাড়ি বাড়ি মাহাত্ম্যজ্ঞাপক গান গেয়ে বেড়ায়। দলের একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি সোনারায়ের পালাগান সুর করে গেয়ে যান। অন্যেরা সেই গানের ধুয়া ধরেন। দলের প্রত্যেকের হাতে মাঝারি আকারের একটি বাঁশের লাঠি থাকে। সেই লাঠিকে কাপড়, ফুল ও রঙ দিয়ে সাজানো হয়। এছাড়া একজনের হাতে থাকে চামর এবং অন্য জনের কাছে একঘটি দুধ মেশানো জল ও ফুল। কোন কোন দলে খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র থাকে। আবার কোন দলে দেখা যায় বাদ্যযন্ত্র ছাড়া খালি হাতে গান গেয়ে মাঙ্গন সংগ্রহ করা হয়। সোনারায়ের পালাগানের প্রথম ধারায় সোনারায় ও রূপারায়ের জন্মকাহিনি এবং মুসলিম মোগল সৈন্যদের পরাজিত করে নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার, এবং দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে পূজার জন্য মাঙ্গন সংগ্রহ করা। যেমন—

সত্য ঠাকুর সোনা রায় মাগিয়া বেড়াং তোক।
তিন দিন হাতে চায়া বেড়াং নাগাল না পাং তোক।।
সত্য ঠাকুর সোনা রায় গিরস্তক দেও রে বর।
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাংকর।।
গোয়ালিতে বাড়ুক গরু ধান বাড়িতে ধান।

দেওয়ানে দরবারে গিরি পাউক ফুল পান।।

পদ — সোনা রায় সন্নাসী হৈল রূপা রায় চেলা।

ধীরে ধীরে দুই ভাই পন্যে দিল সেলা।।

গৌরবন ছাড়ি ঠাকুর নামিল ঘোড়াঘাট।

ঠাকুরের সঙ্গে চলে বিশশত বাঘ।।

বিশশত বাঘ ঠাকুর অরণে রাখিয়া।

ঘরে ঘরে ফেরে ঠাকুর হরির নাম দিয়া।।'

সংগ্রহসূত্র ঃ স্বর্গীয় দিলীপ দাস, উত্তর ভাটিবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি।

গানগুলিতে রাজবংশী সমাজের জীবনযাত্রা ফুটে উঠেছে। সোনারায়ের পূজা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, সমতল দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। গাথাধর্মী এই গানের মধ্যেও নিহিত আছে লোকনাট্যের ভাববীজ।

মদনকাম বা জাগগান ঃ উত্তরবঙ্গের একটি অন্যতম লোকউৎসব হল মদনকাম বা বাঁশপূজা। এই পূজা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত। চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথি উপলক্ষে চারদিন ধরে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মদনকাম পূজা সম্পর্কে ড. চারুচন্দ্র সান্যাল বলেছেন, "The first day of this puja (khela) is called Bas Jagao (Bas Dzagao) day. Some boys dress as girls and some boys take fancy dress of various descriptions. The bamboo poles are carried by some members of the party and the persons in fancy dress sing and dance with music of drum and bell-metal gong. When they arrive at the house of a villager they keep aside the bamboos on a piece of cloth and then begin their song and dance. It is called Birsani Khela".[৪২] মদনকাম উৎসবটি মূলত উর্বরতাকেন্দ্রিক আচারের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য বাঁশকে কামদেবতার প্রতীকরূপে গণ্য করে পূজা করা হয়। বাঁশের মাথায় চামর বেঁধে লাল শালু কাপড় বাঁশগুলোতে জড়িয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে। এরপর সেগুলিকে বাড়ির বাইরের কিংবা ভেতরের উঠোনে মাটিতে গেঁড়ে পূজা দেওয়া হয়ে থাকে। পূজা শেষে কোন জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে বাঁশগুলোকে জল খাওয়ানো হয়। পরে সেই বাঁশগুলোকে হাতে নিয়ে চলে নৃত্যগীত। এই মদনকাম উৎসবের দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, যথা— মাঙ্গনের গান ও পালা গান বা জাগ গান।

মদনকাম ঠাকুরের বাঁশ ও কাম-লিঙ্গ নিয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ছোট থেকে বড় বিভিন্ন দল গান ও নাচ দেখিয়ে মাঙ্গন আদায় করে। বাঁশপূজার উদ্দেশ্য যেহেতু নর-নারীর কাম-উর্বরতা বৃদ্ধি, তাই এখানে নারী-পুরুষের কাম-উদ্দীপনার গান গাওয়া হয়। তবে একথা স্বীকার্য, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি মাঙ্গনের সময় দলগুলি

শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে না। দলের সদস্যরা মুখে ভুষাকালি মেখে নাচগানের মাধ্যমে মানুষের মনোরঞ্জন করে। গানের ভাব, দলের লোকসংখ্যা, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য ও সাজসজ্জা অনুসারে দলগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– পেন্টা বান্ধা দল, ক্যাঙবাজানী দল, ঢুলুয়া ও খ্যামটালী দল। দলগুলির পরিবেশিত গানে আদি-রসাত্মক ভাব ও যৌন আবেদন পূর্ণমাত্রায় থাকে। পেন্টাবান্ধা দল দু'একজন বৃদ্ধ বা মাঝবয়সী লোককে নিয়ে গঠিত হয়। এদের মধ্যে একজন টিন বা ক্যানেস্ত্রা বাজিয়ে গান করে, অপরজন সেই গানের সাথে নেচে থাকে। এই দলের লোকের হাতে ও পায়ে পেন্টা বাঁধা থাকে, তাই এদের পেন্টাবান্ধা দল বলে। উল্লেখ্য খড় ও দড়ি দিয়ে বেনীর মতো পাকানো গোলাকার বন্ধনীকে আঞ্চলিক স্থানীয় ভাষায় পেন্টা বলা হয়। এই দল যৌবনের রসে ভরা গান গেয়ে থাকে। ক্যাঙবাজানী দলে আট-চোদ্দ বছর বয়সী ১২-১৫ জন ছেলে লক্ষ করা যায়। এই দলে দু'জন ক্যানেস্ত্রা বাজায় এবং বাকী সকলেই গান ও নাচ করে বেড়ায়। আবার ঢুলুয়া ও খ্যামটালী দলে ১৫-২০ জন সদস্য থাকে। এদের মধ্যে একজন গীদাল, যার হাতে থাকে চামর, একজন দোহার বা মতিহারি এবং দু'জন থাকে ছোকরী। দোয়ারীর হাতে থাকে 'কামলিঙ্গ'। দুটি বাঁশের মাঝখানে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের গাছের বাঁকা ডালের মাথায় লিঙ্গাকৃতি করা হয়। একেই মদনের 'কামলিঙ্গ' বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে দুটি ঢোল, হারমোনিয়াম, আঁড়বাঁশী, মুখাবাঁশী ও জুড়ি। গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি মাঙ্গনের সময় এই দলটি চটুল বা খ্যামটা সুরে দ্রুত লয়ে গান পরিবেশন করে। এরা কামঠাকুরের গান ছাড়াও সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে গান রচনা করে থাকেন।

মদন উৎসবের অপর একটি ধারা হল পালাগান বা জাগগান। এ ধরনের গানকে জাগগান বলা হয় কেন এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। সুখবিলাস বর্মার মতে, "কামকে জাগানোর কথা ও অঙ্গভঙ্গি জড়িত বলেই বোধ হয় এই গানের নাম জাগ গান।"[৪৩] আবার অনেকে মনে করেন, এই গান রাত জেগে গাওয়া হয়, তাই একে জাগগান বলে। তবে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, যে দলের গানবাজনা কামদেবকে জাগ্রত করে অর্থাৎ মানুষের কাম ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে, তাকে জাগ গান বলে। বন্দনা দিয়ে জাগ গানের শুরু হয়। যেমন–

'ও রে বন্দং জগৎ গুরু বাঞ্ছা কল্পতরু দয়াল হরি হে
ও রে দীন দয়ালের ভরসা হরি
তোর চরণ তুলি দে মোর মাথে
ভক্তি করঙ হরি নারায়ণে
ওরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃষ্টি স্থিতি লয়
সৃজন পালন মরণ বাঁচন
তিন জনাতে হয় হে।

ও রে সভাত দাঁড়েয়া রে মুই
সগারে চরণ বন্দং ভাবিয়া ঈশ্বর
ও রে সভা করিয়া বসিয়া আছেন
তোমরা দশজনা
দশের চরণত মুই পরনাম জানাঙ্
নানান জাতের আছেন হেন্দু মোছলমান
সগারে চরণ বন্দং ভাবিয়া নিরঞ্জন।।
এ হে বন্দনা গানের কাথা রইল ভালে ভালে
শিরি রাধার মান ভঞ্জনের কাথা এলা
শুনিয়া ন্যাও সকলে।।'

সংগ্রহসূত্র ঃ জীতেন বর্মন (৫৭), ১৬৪ গোপালপুর,
জামালদহ, কোচবিহার।

এই দল সারারাত জেগে থাকার জন্য জাগগানের ব্যবস্থা করে। জাগগানের দলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– ছোট ও বড় জাগের দল এবং ডাকালী ডাংগা বা মোটা জাগের দল। ছোট ও বড় জাগ দলের পালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মালাগিরিবর পাঁচালি, কানাই ধামালি, রাধা ধামালি, দোয়ারী-ছোকরা ধামালি, ভাঙ্গা টিনের বাঁকালি প্রভৃতি। মূল গানের মাঝে দর্শক ও শ্রোতাদের ড্রামাটিক রিলিফ দেওয়ার জন্য গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কুকীর্তি ও কেচ্ছা বর্ণনা করে। "গ্রামে সারাবছর কী ধরণের ঘটনা ঘটেছে – কোন্ "মহাপুরুষ" কী অপকর্ম করেছেন– অর্থাৎ ভালো মন্দ ঘটনার উল্লেখ ও বিবরণ কবিত্বগুণসম্পন্ন শিল্পীরা মুখে মুখে রচনা করে তাতে সুর সংযোজন করে এই উৎসবে পরিবেশন করে।"[৪৪] আবার ডাকালী ডাংগা দলকে অনেকে মোটা জাগের দল বলে থাকেন। এই দলের গানগুলি যৌন আবেদনমূলক ও কুরুচিপূর্ণ হওয়ায় অল্পবয়স্ক বালক এবং মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। জাগের পালাগুলিতে গীদাল, মতিহারি ও মহিলাবেশধারী ছোকরী মিলে বিভিন্ন ধরনের কামোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গি ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে দর্শক ও শ্রোতার মনোরঞ্জন করা হয়।

অনানুষ্ঠানিক লোকনাটক ঃ

আনুষ্ঠানিকরূপে লোকনাটকের উদ্ভব হলেও এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে মূলত অনানুষ্ঠানিকরূপেই। তাই আনুষ্ঠানিক বা পূজা-পার্বণমূলক লোকনাটকের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক লোকনাটক দেখা যায়। লোকনাটকগুলি Myth ও Ritual-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবটি অর্থাৎ পূজা-পার্বণ-ব্রত এসবের গন্ডী পার করতে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে যত দিন যাচ্ছে তত ধর্মনিরপেক্ষ

হয়ে মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছে লোকনাটক। এর মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তনকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের পারিপার্শ্বিক সমাজ। লোকনাটকের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ, পুরাণ, কল্পনা, রোমান্স প্রভৃতি। জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য গড়ে ওঠা এই লোকনাটকগুলিকে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি, যেমন– (ক) সামাজিক বিষয় নির্ভর, (খ) পৌরাণিক বিষয় নির্ভর ও (গ) কাল্পনিক বা রূপকথাশ্রিত বিষয় নির্ভর।

সামাজিক বিষয় নির্ভর লোকনাটক ঃ

সামাজিক বিষয় নির্ভর লোকনাটকের কাহিনি গড়ে ওঠে সমাজকে কেন্দ্র করে। সমাজের ভালো-মন্দ দুটি দিকই তুলে ধরে জনসাধারণকে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সচেতন করা হয় এ ধরনের লোকনাটকে। এগুলি একদিকে যেমন জনমনোরঞ্জনকারী, অপরদিকে নীতিশিক্ষামূলক। "সমাজের মানুষজনকে আনন্দদান, গোষ্ঠী-চেতনার-বিস্তার, সরাসরি গুরুমশায়গিরি না করেও লোকশিক্ষার ব্যবস্থা এসব যেমন লোকনাট্যের মাধ্যমে সাধিত হয়, তেমনি সামাজিক ন্যায়-নীতির আদর্শটিও লোকনাট্যে রক্ষিত হয়।"[৪৫] তাই প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লোকনাটক অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, শোষণ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ধরনের লোকনাটকের নায়ক-নায়িকা মূলত গ্রামের সাধারণ নর-নারী। গ্রামজীবনের টুকরো টুকরো ছবি এতে ধরা পড়ে। পালাকারেরা গ্রামীণ চলমান জীবনের কোন আবেগঘন বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ঘটনাকে পালাগানে রূপ দেয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত নানা ধরনের সংবাদ এর মাধ্যমে দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে এসে পৌঁছয়। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির বিষয় হল, পালাগুলিতে দুষ্ট ও খল চরিত্রগুলিকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে নৈতিকতার মান বৃদ্ধি করা হয়। যা দর্শক ও শ্রোতার মনকে প্রভাবিত করে। যাই হোক, সামাজিক লোকনাটকের গুরুত্ব জনমানসে যে অপরিসীম তা অস্বীকার করার উপায় নেই। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সামাজিক বিষয় নির্ভর লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম পালাটিয়া, চোরচুন্নি, গমীরা, খন, গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনী প্রভৃতি।

পালাটিয়া ঃ পালাটিয়া লোকনাটক জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং-এর সমতলভূমি ও উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক পালাটিয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, "প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে 'পাঁচালি গান' বলিতে সাধারণত পূর্ণাঙ্গ নাট্য-কাহিনীকে বুঝায়। কাহিনী-ঘটনা-চরিত্র সম্বলিত নাট্য-কাহিনীকে বাঙলায় 'পালাগান'-ও বলা হয়। 'পালা'-র সহিত 'টিয়া' এই তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া প্রান্ত-উত্তরবঙ্গে উহাকে 'পালাটিয়া গান'-ও বলা হইয়া থাকে। 'পাঁচালি' গানেরই অপর নাম 'পালাটিয়া গান'।"[৪৬] কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিংবা বিভিন্ন নাট্যদলের প্রতিযোগীতার উদ্দেশে একদিন বা তার বেশি সারারাত ধরে পালাটিয়া গান অনুষ্ঠিত হয়। আবার পালাটিয়া কখনও কখনও ধামগুলিতেও উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এ থেকে অনেক

সমালোচক পালাটিয়া গানকে ধামগান বলেছেন। তবে 'ধাম' বলতে দেবস্থানকে বোঝায়। "সাধারণত বিশেষ-বিশেষ উৎসবে অথবা কয়েকটি গ্রামের নাট্যদলের অভিনয় প্রতিভার উৎকর্ষ বিচারের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক রাত্রিব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হইয়া থাকে, আঞ্চলিক ভাষায় তাহাকে বলে 'ধাম'। 'ধাম' ছাড়া বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে পালাটিয়া গানের আসর বসিয়া থাকে।"[৪৭] আবার শিশির মজুমদারের মতে, "দেবতার অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলে বলা হয় ধাম। ...ধামে শুধুমাত্র পালাটিয়া নয়, অন্যান্য যে সব 'গান' উপস্থিত করা হয় তাকেও ধামগান বলা হয়।"[৪৮] সুতরাং ধামে যেহেতু পালাটিয়া ছাড়া অন্যান্য গান উপস্থাপিত হয়, তাই পালাটিয়াকে ধামগান বলা যায় না।

২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে পালাটিয়ার দল গঠিত হয়। দলকে যিনি পরিচালনা করেন, তাঁকে বলা হয় হাঁদি। আর যিনি পালার কাহিনি রচনা করেন, তিনি হলেন ওস্তাদ। কোন কোন সময় এঁরা একই ব্যক্তি হতে পারে। আবার কখনও হাঁদি ওস্তাদের কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে কাহিনি সংগ্রহ করেন। তবে ওস্তাদের কাছে মূল কাহিনি ও সংশ্লিষ্ট গানগুলিই কেবল লিখিত থাকে। সেখানে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ লেখা থাকে না। এক্ষেত্রে কুশীলবেরা অভিনয় চলাকালীন আসরে উঠে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা ও পরিবেশন করেন। দেবস্থান বা ধাম ছাড়া গৃহস্থের উঠোনেও পালাটিয়ার আসর বসে। এর আসর সাধারণত গোলাকার হয়। আসরের ওপর চট বা ত্রিপলের আচ্ছাদন দেওয়া থাকে। আসরের মাঝখানে বসেন বাদ্যযন্ত্রী ও কুশীলবেরা। পালাগান পরিচালনা করেন হাঁদি। তিনি বন্দনা দিয়ে গান শুরু করেন। এছাড়া থাকে দোহার বা বতেয়া ও ছুকরী। আগেকার দিনে সমস্ত চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করত। কিন্তু এখন নারীচরিত্রে নারীদেরও অভিনয় করতে দেখা যায়। বতেয়া ও ছুকরী ছাড়া অন্যান্য কুশীলবেরা খুব সামান্য মেক-আপ নেয়। তবে পালা চলাকালীন অভিনেতারা বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আসরেই বসে থাকেন। যার যখন অভিনয়, সেখান থেকে উঠে সংলাপ বলে আবার বসে পড়েন। পালাটিয়ার অভিনয়ে নির্মলেন্দু ভৌমিক-এর মতে একটি বিশেষত্ব রয়েছে সেটি হল, "যখন গানের মধ্যে দিয়া নায়ক বা নায়িকা পরস্পরকে কিছু বলিতেছে, তখন কখনই সেই গান সে একা গাহিবে না, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গাহিবে। ... বক্তা ও শ্রোতা একই সঙ্গে প্রশ্ন ও উত্তরাংশ গাহিয়া থাকে।"[৪৯] অর্থাৎ পালাটিয়ায় যার উদ্দেশ্যে সংলাপ, তিনিও সেই গানে গলা মেলান। এখনও পর্যন্ত এই রীতিটি পালাটিয়ায় প্রচলিত রয়েছে।

বিষয়বস্তু অনুসারে তিন ধরনের পালাটিয়া দেখা যায়, যথা– রঙ্ পাঁচাল, খাস পাঁচাল ও মান পাঁচাল। রঙ্ পাঁচালে প্রেমই মুখ্য। তবে তা কাল্পনিক। "রঙ্ পাঁচালি'-তে যে প্রেম-কাহিনী থাকে, সেই কাহিনীর সবটাই কাল্পনিক। প্রেমের সহিত হাস্যরসের খোরাক জোগাইবার জন্য ইহার মধ্যে নিছক রঙ-কৌতুকও কিছু ভরিয়ে দেওয়া হয়।"[৫০] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "হাস্যরস দিয়ে তার সূচনা, হাস্যরসে তার শেষ। কিন্তু তার অন্তরালে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী আছে, তা বাস্তবজীবন ভিত্তিক।"[৫১] অর্থাৎ রঙ্পাঁচালে কল্পনা মেশানো প্রেম

হাস্যরস কিংবা রঙ্গরসের মোড়কে উপস্থাপন করা হয়। গিল্টিমিঞা ভেজালশ্বরী, হ্যাজাকবাবু মেন্টালশ্বরী প্রভৃতি রঙ্‌পাঁচালের পালার উদাহরণ।

খাস পাঁচালের কাহিনিতে সমাজের প্রতি শ্লেষ ও ব্যঙ্গই প্রাধান্য লাভ করে। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, " 'খাসপাঁচালি' হইল নিকট বা দূর অতীতে নিজ বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে ঘটিয়া যাওয়া কলঙ্ক-কাহিনীর নাট্যরূপ।"[৫২] সুতরাং এই পালাগানে অতীতে ঘটে যাওয়া নিজের বা কাছাকাছি কোন অঞ্চলের কলঙ্কজনক ঘটনা ফাস করে দেওয়া হয়। তবে এতে কেবল সামাজিক ঘটনা নয়, বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাও এতে স্থান পায়। যেমন– ভেস্টেশ্বরী পালা, দশ নম্বর আরি ঢেনা অধিকারী প্রভৃতি খাস পাঁচালের উদাহরণ।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনিকে অবলম্বন করে রচিত হয় মান পাঁচাল। পালাটিয়ার এই ভাগে পুরাণ ও শাস্ত্র আলোচনা করা হয় বলে একে 'শাস্তোরী' গানও বলা হয়। "ইহা মূলত পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। পুরাণ বা 'শাস্ত্র' গানও বলা হইয়া থাকে। মান পাঁচালি গানের মধ্যে কাহিনী ও আসরের বিশেষ গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলা হয়। ...'মান' অর্থাৎ সম্ভ্রম করিয়া, গাম্ভীর্য-পূর্ণ পরিবেশে যে নাট্য-কাহিনীর অভিনয় করা হয়, তাহাকেই বলে 'মান পাঁচালি'।"[৫৩] উল্লেখ্য মান পাঁচালে কাহিনি ও চরিত্র অপেক্ষা শাস্ত্রীয় আলোচনাই প্রধান। জ্ঞানবালা ও পটপটি গোঁসাই, সিরাজদৌল্লা প্রভৃতি মান পাঁচালের উদাহরণ।

চোরচুন্নি ঃ উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় লোকনাটক হল চোরচুন্নির গান। এই চোরচুন্নি জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে বহুল প্রচলিত। সাধারণত কালীপূজার আট থেকে দশ দিন আগে চোরচুন্নির দল বাড়ি বাড়ি পালাগান গেয়ে বেড়ায়। চোরচুন্নি গানের উৎসমূলে রয়েছে একধরনের জাদুধর্মীয় লোকবিশ্বাস। লোকসমাজে এর প্রচলিত লোকবিশ্বাসটি হল, মহালয়ার দিন কোন গৃহস্থের বাড়ি থেকে কিছু জিনিস চুরি করে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন সেটা গৃহস্থের অলক্ষে চুপ করে ফিরিয়ে দিয়ে এলে সারাবছর ধরে ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ চোরটি সাফল্যের সাথে চুরি করতে পারবে। এই চোরচুন্নি প্রসঙ্গে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা রাখিয়া রচিত চোরচুন্নীর গানগুলি সুন্দর। জীবনের আনন্দ-বেদনা, সরস উষরতা, নির্নিরীক্ষ্য কোমলতা, স্নিগ্ধ কারুণ্য, চিরদুর্লভ প্রেম, অপ্রাপনীয় সুখ, মর্মান্তিক বিরহ, সবই এই গানগুলির সুরে ও শব্দে চিত্রিত হইয়াছে।"[৫৪] আবার সনৎকুমার নস্করের মতে, "চোর-চুন্নি গানের উৎসে ছিল চৌর্যবৃত্তি। কিন্তু বর্তমানে সেই বৃত্তিকে পটভূমিতে রেখে কৃষকজীবনের সুখদুঃখের কথাই বেশি উঠে আসে এ ধরনের গানে।"[৫৫] অর্থাৎ এই চোরচুন্নি গানে চৌর্যবৃত্তিকে পটভূমিকা করে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহ প্রভৃতি ফুটে ওঠে।

১০-১৫ জন কিশোর ও যুবকদের নিয়ে এক-একটি চোরচুন্নির দল গঠন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন একজন মূল গায়েন, কয়েকজন দোহার, ছোকরা ও বাদ্যযন্ত্রী। আগে মূল গায়েনই চোর ও চুন্নি উভয় ভূমিকায়

অভিনয় করতেন । কিন্তু এখন দলের মধ্যে কোন একজনকে বিচিত্র ধরনের বেশে চোর এবং আর একজনকে শাড়ি-গয়না পরিয়ে চুন্নি সাজানো হয়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে খোল, করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশী প্রভৃতি। চোরচুন্নির দল এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ির উঠোনে নাচ, গান ও অভিনয় দেখিয়ে বেড়ান। গৃহস্থেরা খুশি হয়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শস্য কিংবা নগদ অর্থ প্রদান করেন। মূল গায়েন আসর বন্দনার মাধ্যমে চোরচুন্নি গানের সূচনা করেন। বন্দনা অংশে হিন্দু দেবতার পাশাপাশি মুসলিম পীরের উদ্দেশ্যেও স্তুতি করা হয়। চোরচুন্নি গানে হিন্দু-মুসলমানের এই পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়, "চোর-চুরণী পালাগান এমন রসের বিষয় ও অসাম্প্রদায়িক ও উপভোগ্য, রমণীয় যার ফলে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর শ্রোতৃমণ্ডলী এই আসরে উপস্থিত থেকে চোর-চুরণী পালার রসাস্বাদন করেন।"[৫৬] অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় চোরচুন্নি পালার গানগুলি পরমানন্দে উপভোগ করে। আসর বন্দনার পর চোরচুন্নির গানগুলি চাপান ও উতোর রীতিতে পরিবেশিত হয়। চোরচুন্নির গানে গদ্য সংলাপের ব্যবহার খুব কম, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গীতই সংলাপের ভূমিকা নেয়। যেহেতু চোরচুন্নি প্রান্ত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় (জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে) প্রচলিত, ফলে এই অঞ্চলগুলির রাজবংশী কথ্যভাষা ও সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "চোর-চুরণী পালায় যে গানগুলি গাওয়া হয়, সেগুলির সবই ভাওয়াইয়া। পালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে ভাওয়াইয়া গান প্রয়োগ করা হয়।"[৫৭] প্রতি বছর নতুন নতুন গান রচনার পাশাপাশি পুরনো অনেক জনপ্রিয় গানও এতে স্থান পায়। পালাটিয়ার মতই চোরচুন্নিতেও যার উদ্দেশে সংলাপ, তিনিও বক্তার সাথে সাথে গান গেয়ে থাকেন।

চোরচুন্নি গানকে বিষয়বস্তু অনুসারে আমরা তিনভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম অংশে রয়েছে চোরচুন্নির সুখ-দুঃখে ভরা গার্হস্থ্য ও দাম্পত্যজীবন।

'চুরনি — (গোর) ওরে মনের কথা তোক রে চড়া
কবার চাছ মুই আজি
ওরে মোক কনেক দেখেয়া আনেক বড় ভান্ডানি।

চিতান — আহার এই সন কনেক নিগারে মোক
ও চড়া বড় ভাণ্ডানি
ওরে কত মানসি জাছে চড়া
মটরত চরি কেমন হই হই করি।

চোর — (গোর) ওগে তোর কথা শুনিয়া চুন্নি হাসি বিরাছে মোর
ওগে প্রতেকবার দেখিছিত ঠাকুর
হাউস নাই মিটে তোর।

চিতান— ওগে বছরে বছরে চুন্নি গে ও তোক নিগাছ মলানি
ওগে এক বছরে না ছারিস পিচ্ছা
জাছিত ভাণ্ডানি ও তুই মটরত চরি।'

সংগ্রহসূত্র ঃ যতীন্দ্রনাথ রায় (৫৮), সাং চক মৌলানী,
মালবাজার, জলপাইগুড়ি।

চোর ও চুন্নির নিরপেক্ষ কথোপকথনের মাধ্যমে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয় দ্বিতীয় অংশে। তৃতীয় অংশে চোর লীলারসিক কৃষ্ণে এবং চুন্নি শ্রীরাধায় উন্নীত হয়েছেন। এই অংশের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এভাবে, "চোর-চুরণী গানের বেলায় এই সম্প্রসারণ ঘটেছে বিষয়ের দিকেও বটে, আবার বিষয়ের ব্যাখ্যার দিকেও বটে। যেমন— 'চোর' বলতে লৌকিক চোর থেকে ননীচোরা বাল্যলীলার গোপাল এবং তার থেকে বস্ত্রহরণকারী পূর্ণবয়স্ক শ্রীকৃষ্ণ।"[৫৮] আবার অঞ্চলবিশেষে চোরচুন্নি গান চকচুন্দী, নটুয়া চকচুন্দি প্রভৃতি নামে পরিচিত। চোরচুন্নির গানগুলিতে চোরেদের জীবনের আশা-আকাঙ্খা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা প্রভৃতি দিকগুলি কবিরা তাদের সহজাত দক্ষতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে চোরচুন্নি সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে লোকসাধারণকে সচেতন করে লোকসাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে থাকে । এদিক থেকে বিচার করলে চোরচুন্নির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

গমীরা ঃ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলে এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার রাজবংশী সমাজে গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় গমীরা খেলা। চৈত্র সংক্রান্তির প্রায় এক সপ্তাহ আগে, আবার কোন কোন অঞ্চলে দশ-বারো দিন আগে গমীরা নামক ব্রতানুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজার মধ্য দিয়ে গমীরার সমাপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে দেউসি বা দেউড়ি মন্ত্রপুত জল দিয়ে ১০-১২ জন যুবককে নির্বাচন করেন। তাদের শিবের ভক্ত বা 'খেলটুক' বলা হয়। 'ফটা মারার দিন' বা শিবঠাকুরকে জাগানোর দিন থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঢাকের বাজনার তালে গমীরা দলের যুবকেরা নৃত্যগীত পরিবেশন করে। সমালোচকদের মতে, 'গমীরা' শব্দটি এসেছে 'গম্ভীরা' শব্দ থেকে। যেমন– গম্ভীরা > গম্মীরা > গমীরা। রাজবংশীদের উচ্চারিত ভাষায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেয়ে পরবর্তী ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘতর হয়েছে। "গমীরা নামটির সঙ্গে গম্ভীরা শব্দের কোন না কোন ভাবে যোগ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, উত্তরবাঙলার লোকসংস্কৃতির উপকরণ সাধারণত উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। লৌকিক শৈবধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং গমীরা শব্দটিই ক্রমে সংস্কৃতের প্রভাবের বশবর্তী হইয়া গম্ভীরায় পরিণত হইয়া থাকিবে, গম্ভীরা শব্দ হইতে গমীরার উৎপত্তি হয় নাই তাহা সত্য।"[৫৯] সুতরাং গম্ভীরা শব্দটি

যুক্তাক্ষর লোপ পেয়ে গমীরা হয়েছে কিংবা গমীরা শব্দটি সংস্কৃতায়িত হয়ে গম্ভীরায় পরিণত হয়েছে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তবে আর যাই হোক, মালদহ জেলার গম্ভীরার সাথে গমীরার পার্থক্য লক্ষণীয়। গমীরা শুরু হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগে এবং শেষ হয় চৈত্র সংক্রন্তির দিনে। এছাড়া নৃত্য-গীতের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মালদহের গম্ভীরা ও অন্যান্য অঞ্চলের গমীরা খেলা উভয়ই শৈবানুষ্ঠান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গমীরার দল অনেক সময় কাহিনিধর্মী কতগুলি গান এবং অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালনের মাধ্যমে এক একটি পালা পরিবেশন করে। কোথাও কোথাও গমীরার দলের লোকেরা কাঠের এবং শোলার মুখোশ পরে শিব ও কালী এবং কয়েকজন নর্তক-নর্তকী সেজে নাচ ও গান পরিবেশন করে। শিব চরিত্রটির উপস্থাপনা থাকলেও শিবকে কেন্দ্র করে কোন সঙ্গীত পরিবেশিত হয় না। বন্দনা দিয়ে মূল গায়েন গান শুরু করলে অন্যান্য সঙ্গীরা সেই গানের ধুয়া ধরেন। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে দোতরা, ঢোল, বাঁশী, খোল, করতাল প্রভৃতি। গমীরা গানের কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই। গম্ভীরা গানের বন্দনা অংশে শিবের ভূমিকা রয়েছে। শিবকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরা হয়। কিন্তু গমীরায় শিবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। গাজন উপলক্ষে এই গমীরা পালা অনুষ্ঠিত হলেও এর বিষয়বস্তু ধর্মনিরপেক্ষ। গমীরার কোন আসর হয় না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে এর অভিনয় হয়। তাই গমীরা গানে স্থান পায় সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা। আবার কখনও কখনও আদিরসাত্মক বা প্রেমমূলক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

খন ঃ 'খন' শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, এ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন, " 'খন' শব্দটি সংস্কৃত 'ক্ষণ' থেকে এসেছে।"[৬০] কারণ এই গান তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয়। আবার নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, " 'খন' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'খণ্ড ' থেকে। খণ্ড> খন্ন > খন। উত্তরবঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি যুগ্ম ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়ে শেষে একক ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। Episode অর্থাৎ খণ্ড কাহিনী থেকে।"[৬১] এ প্রসঙ্গে শিশির মজুমদারও বলেছেন যে, " 'খণ্ড' হলো ঘটনা। একটি নির্দিষ্ট কৌতুহলজনক ঘটনা বোঝাতে সাধারণ বাংলায় 'কান্ড' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ একটা কান্ড হয়েছে। তেমনি উক্ত অঞ্চলের দেশী-পলিরা বলেন 'খণ্ড'। ....এই খণ্ড যখন গানে বাঁধা পড়ে, তখন তা 'খন'।"[৬২] কিন্তু পুষ্পজিৎ রায় মনে করেন, " 'খন গান' হচ্ছে উৎসবের গান, উৎসবকালের গান, অবসর-অবকাশ বা বিরামকালের গান;"[৬৩] সুতরাং বলা যায়, এই 'খন' শব্দটি অঞ্চলবিশেষে বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে।

খন গান উত্তরবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় বহুল প্রচলিত। অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাস পর্যন্ত চলে এই খন গানের আসর। আবার কোথাও কোথাও কার্তিক মাসের শেষের দিকেও এই পালা শুরু হয়। মোটামুটি ১২-১৫ জনকে নিয়ে একটি খনের দল গঠিত হয়। গ্রামের সম্পন্ন কোন গৃহস্থের

উঠোনে কিংবা উন্মুক্ত মাঠে এই খন গানের আসর বসে। আসর সাধারণত বৃত্তাকার হয়ে থাকে। এই বৃত্তাকার আসরের চারিদিকে দর্শকেরা ঘিরে বসেন। বৃত্তাকার স্থানের মাঝে কুশীলব ও বাদ্যযন্ত্রীদের স্থান। ঢোল, ডুগি, তবলা, বাঁশী, করতাল, খোল, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয় এই পালানাটকটিতে। আসরে হাস্যরসের যোগান দেয় 'ওসিয়া' অর্থাৎ 'রসিয়া'। 'ওসিয়া' চরিত্রটি মুখে সাদা রঙ মেখে আসরে নামে। ছোকরা চরিত্রগুলিও নারীর মত বেশভূষা করে। গীদাল ও ওসিয়া চরিত্রদুটিকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যায়। অভিনেতারা আগে অভিনয়কালে আসর থেকে উঠে অভিনয় করতেন। তবে বর্তমানে গ্রিনরুম বা সাজঘর ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। আসর থেকে সাজঘরে যাওয়া-আসার জন্য একটি সরু পথ রয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের পর বন্দনা দিয়ে খন গানের আসর শুরু হয়। বন্দনাংশে কালী, সরস্বতী, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে মুসলিম পীর-পয়গম্বরদের উদ্দেশ্যেও শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর পালাগানের অভিনয় চলে। প্রতিবছর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নতুন নতুন পালা রচনা করা হয়। আবার কখনো কখনো বহু বছরের পুরনো কোন পালা দীর্ঘদিন সমান জনপ্রিয়তা লাভ করে। সংলাপ মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হলেও খনের গানগুলো প্রায় সবই লিখিত থাকে। তবে সংলাপ ও গানগুলি রচিত হয় আঞ্চলিক ভাষায়।

খন লোকনাটককে বিষয়বস্তুর দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— খিসা খন এবং শাস্তোরী খন। খিসা খন সাধারণত সামাজিক বা পারিবারিক নানাপ্রকার অবৈধ বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ঢাকোশোরী, সুমিতা যোগীর গান, মাইয়্যাবন্ধকী প্রভৃতি। অপরদিকে শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলেও প্রেমের কাহিনিই মুখ্য হয়ে উঠেছে শাস্তোরী খন পালায়। যেমন— নয়নশোরী, বর্মোশোরী প্রভৃতি। এ ধরনের লোকনাটকে নায়কের তুলনায় নায়িকারই প্রাধান্য বেশি। তাই এই পালাগুলির নামকরণেও 'শোরী' অর্থাৎ নায়িকার নাম প্রাধান্য অর্জন করে।

গম্ভীরা ঃ গম্ভীরা লোকনাটক মালদহের ইংরেজবাজার, বামনগোলা, মানিকচক, হাবিবপুর, রতুয়া, কালিয়াচক প্রভৃতি থানায় প্রচলিত। মূলত চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন বা চড়ক পূজার চার-পাঁচদিন আগে থেকেই গম্ভীরা উৎসবের সূচনা হয়। আর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে যে অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাই হল গম্ভীরা পালা বা লোকনাটক। শিবপূজাকে কেন্দ্র করে এই লোকনাটক গড়ে উঠলেও ধর্মকে ছাপিয়ে সামাজিক, কখনো বা রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এতে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে এখন চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়া অন্যান্য মাসেও গম্ভীরা পরিবেশিত হয়।

'গম্ভীরা' শব্দটির উৎস নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে এই 'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ হল 'বাড়ির অন্তঃপ্রকোষ্ঠ'। তবে এই শব্দটি চৈতন্যযুগে বিশেষ অর্থে প্রচলিত ছিল। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃত'- এ আমরা পাই—

(ক) "গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।" [৬৪]

(খ) "গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল।"[৬৫]

গম্ভীরা সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "গম্ভীরার গান এক অতি জনপ্রিয় লোকনাট্য, তার এই নাম, কারণ সাধারণতঃ লৌকিক সূর্যোৎসব বা শিবের গাজন উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । শিবের গাজন বা সূর্যোৎসবকে এই অঞ্চলে গম্ভীরা বলে।"[৬৬] আবার 'আদ্যের গম্ভীরা' গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস পালিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন গম্ভীরার অর্থ শিবমন্দির । তাঁর মতে, "পূর্ব্বকালে চন্ডী-মন্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে এতদ্‌ঞ্চলে গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। ...সেই গম্ভীরাতেই শৈব প্রভাবকালে 'হরগৌরীর' পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।"[৬৭] তিনি আরও বলেছেন, "পূর্ব্বে শিবালয় গম্ভীর বা পঙ্কজ দ্বারা শোভিত হইত। ইহাই তাহার গম্ভীরা নামোৎপত্তির অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।"[৬৮] তবে এ প্রসঙ্গে প্রদ্যোত ঘোষ মনে করেন, "সূর্যপূজা পরবর্তী পর্যায়ে শৈবধর্মের প্রভাবে আদিবাসীদের হাতে গম্ভীরা নাম নিয়েছে— একথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা।"[৬৯] বাংলাদেশের যশোহর-খুলনা অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় গাজনের শিবের ঘরকে 'গম্ভীরা ঘর' বলা হয়। চন্ডীমন্ডপের ন্যায় দেবতার মন্দিরগুলি ক্রমে শৈবপ্রভাবে শিব মন্দিরে পরিণত হয়েছিল। আর সেগুলিতে একসময় শিবপূজা প্রাধান্য পেয়েছিল বলেই সেগুলিকে 'গম্ভীরা' বলা হত। এখনও পর্যন্ত গম্ভীরার মন্ডপ কাগজের পদ্মফুল দিয়ে সাজানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং এসব থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিবকে উপলক্ষ করে গাজন বা চড়কের সময় গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হয়, আর এই উৎসবে শিব প্রধান ভূমিকা পালন করে। গম্ভীরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসবগুলি চৈত্রসংক্রান্তির চারদিন আগে থেকেই শুরু হয়। এগুলি যথাক্রমে— ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাসা এবং সবশেষে আহারা ও বোলবাই।

গম্ভীরার আসর সাধারণত বৃত্তাকার হয়। গোলাকার অংশের চারদিকে গোল করে দর্শকেরা বসে থাকেন। মাঝে বসেন কুশীলব ও বাদ্যযন্ত্রীরা। জায়গাটি চট, ত্রিপল বা পলিথিন দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। এই পালায় পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তবলা, ডুগী, বাঁশী, হারমোনিয়াম প্রভৃতি প্রধান। গম্ভীরা লোকনাটক কয়েকটি পর্যায়ে পরিবেশিত হয়। যথা— ক) মুখপাদ, খ) বন্দনা, গ) ডুয়েট ও চারইয়ারী, ঘ) পালাবন্দী গান, ঙ) রিপোর্ট বা সালতামামি। প্রতিটি চরিত্র মুখপাদ পর্যায়ে আসরে এসে গানের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দিয়ে যান। এই পর্যায়ের প্রথম অংশের নাম ধুয়া এবং দ্বিতীয় অংশের নাম চিতানি।

বন্দনা পর্যায়ে একজন শিব সেজে আসরে উপস্থিত হয়। এই পর্যায়ে মূলত থাকে শিববন্দনা। অন্যান্য চরিত্রেরা জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে শিবের কাছে তাদের সমস্যা ও অভিযোগ তুলে ধরেন। গম্ভীরা পালাগানে বন্দনা পর্যায়ে এই শিব চরিত্রটিকে আনা হয়েছে অনেক পরে। জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, একসময় মালদহ জেলায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আগমনের কথা শুনে সে সময়ের বিখ্যাত গম্ভীরাশিল্পী মোহম্মদ সূফী তাঁর সামনে গম্ভীরা পরিবেশন করার সিদ্ধান্ত নেন। শিবের অপর নাম যেহেতু আশুতোষ, তাই মানব আশুতোষের সামনে একজনকে দেবতা আশুতোষ সাজিয়ে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কোন

এক কারণে স্যার আশুতোষ মালদায় আসতে না পারায় তাঁর এক প্রতিনিধি এসে হাজির হন। শেষপর্যন্ত মোহম্মদ সূফী সেই প্রতিনিধির সামনে পূর্ব-পরিকল্পিত গম্ভীরা পরিবেশন করেন।[৭০] তখন থেকেই শিব চরিত্রটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সাথে গম্ভীরায় পরম্পরা হিসেবে চলে আসছে।

ডুয়েট পর্যায়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীচরিত্র থাকে। এক্ষেত্রে প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সামাজিক দিকগুলিকেই তুলে ধরা হয়। নারীচরিত্রে পুরুষেরাই মহিলা সেজে অভিনয় করে। অপরদিকে চারইয়ারীতে চারজন ইয়ার বন্ধুর সমাবেশ দেখা যায়। সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে পালাটি এগিয়ে চলে। চরিত্রানুযায়ী তারা হাস্যরস সৃষ্টি করে। আবার দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য কখনো কখনো তারা ভাঁড়ামির আশ্রয় নেয়। অনেক সময় কৌতুক রসাত্মক অভিনয়ের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেওয়া হয় এই চারইয়ারীর মাধ্যমে।

ফণীগোপাল পালের মতে, গম্ভীরায় পালাবদ্ধ গানের প্রচলন করেছিলেন মোহম্মদ সূফী বা সূফী মাস্টার। সমসাময়িক কালে আলকাপের জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি আলকাপের গানের অনুকরণে গম্ভীরায় পালাবদ্ধ গানের প্রবর্তন করেন।[৭১] এই পালাবন্দী গানে চারজনের বেশি চরিত্র থাকতে পারে। চরিত্রগুলির মধ্যে একজন উচিত বক্তা চরিত্র থাকে, যিনি জনগণের হয়ে জনগণের কাছে জনগণের কথা তুলে ধরেন। গম্ভীরা গানের পালা কখনো ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় না। এই পালার মাধ্যমে সমাজের কোন ঘটনা বা দুর্নীতিকে তুলে ধরা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ঘটনাই প্রাধান্য পায়। তবে পালাবন্দী গানের মাধ্যমে যেসব সমস্যা জনগণের কাছে উত্থাপিত হয়, তার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়।

গম্ভীরা পালার সবচেয়ে শেষ পর্যায় হল রিপোর্ট বা সালতামামি। এই পর্যায়ে দুটি চরিত্র সংলাপ ও গানের মাধ্যমে সেই বছরের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ দর্শক ও শ্রোতার কাছে তুলে ধরেন। এখানে উল্লেখ্য যেখানে অর্থাৎ যে অঞ্চলে গম্ভীরা গান পরিবেশিত হয়, সেই অঞ্চলের সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনাবলীই সেখানকার গম্ভীরা গানে তুলে ধরা হয়। এই অংশের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। মালদহ জেলার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর দলিল বলা যেতে পারে গম্ভীরার রিপোর্ট অংশটিকে। এই পর্যায়ের গান ও বিষয় প্রতিবছর পরিবর্তিত হয়। তাই কোন নির্দিষ্ট ঘটনা বা কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গম্ভীরা চিরস্থায়ী হয় না।

আলকাপ ঃ 'আলকাপ' শব্দটির মধ্যেই এই লোকনাটকটির অনেক বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, "আলকাপ পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তাকে গ্রাম্য জীবনচিত্রভিত্তিক নাটকীয় নক্সা বলা যেতে পারে। আলকাপ শব্দটিতে সামাজিক ব্যঙ্গ বোঝায়; শব্দটি সম্ভবতঃ আরবি ভাষা থেকে গৃহীত।"[৭২] 'আলকাপ' শব্দটি সম্পর্কে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন, " 'আলকাপ' নামটি এসেছে উত্তরবঙ্গ থেকে। 'আল' প্রাচীন বাংলা শব্দ, এর অর্থ হল রঙ্গরস। 'কাপে'র অর্থও তাই কৌতুক নাটিকা। অতএব আলকাপের অর্থ রঙ্গরসাত্মক

নাটিকা।"[৭৩] আবার হরিপদ চক্রবর্তীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, "সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, দেশী সব ভাষাতেই 'আল' শব্দ পাওয়া যায় বিভিন্ন অর্থে। আরবী 'আল' শব্দ মানে 'মস্তান', ফারসী মানে লাল রং, সীসা, মদ্য; বাংলা মানে হুল, কীলক, কন্টক, বেড়া ইত্যাদি। 'কাপ' কথাটি বোধহয় দেশী। অর্থ কৌতুককারী, ছদ্মবেশ, তামাসা, সং ইত্যাদি। অনেকে বলেন সংস্কৃতের কাপট্য থেকে 'কাপ' এসেছে। আল ও কাপ দুটো মিলে সূক্ষ্ম তামাসা, ধারালো কৌতুক, রঙ্গব্যঙ্গ অর্থ পাওয়া যায়। দেশী অর্থ দিয়েই এই ব্যাখ্যা মেলে। আর বিষয়ধর্মের দিক দিয়েও কোন অসুবিধা থাকে না।"[৭৪] সুতরাং অর্থ যাই হোক আলকাপ যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক লোকনাটক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও দিনাজপুর জেলা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বিহারের পূর্ব সীমান্ত সাহেবগঞ্জ এবং বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলকাপ লোকনাটকটি প্রচলিত। এই লোকনাটকটির অভিনয়ের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। তবে দুর্গাপূজার পর থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এটি অভিনীত হয়। লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে ফাঁকা মাঠে মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করে আসর তৈরি করা হয়। এই আসর বৃত্তাকার বা বর্গাকার হয়ে থাকে। আসরের ওপর চট বা ত্রিপল টানানো থাকে। দলের লোকেরা এমনভাবে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসে যাতে আসরের মাঝখানে অভিনয়ের জন্য দশ-বারো হাত জায়গা ফাঁকা থাকে। আলকাপের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে হারমোনিয়াম, ডুগি তবলা, করতাল প্রভৃতি। যিনি আলকাপের ছড়া, কাপ ও পালা রচনা করেন, তাকে খলিফা বলা হয়। এবং যে চরিত্রটি এই লোকনাটকে হাস্যরসের খোরাক জুগিয়ে থাকে, তাকে বলা হয় 'ল্যাবার' বা 'লাব্বার'। মুর্শিদাবাদে একে আবার কপ্যা বা সঙাল বা সঙদার বলা হয়। এছাড়া থাকে দু'জন ছোকরা, চারজন দোহারকি, বাজানদার প্রমুখ নানান ধরনের কুশীলব। ১৫-২০ জন সদস্য নিয়ে একটি আলকাপ দল গড়ে ওঠে। ছোকরা ছাড়া অন্যান্য কুশীলবদের তেমন বেশভূষা দেখা যায় না। আলকাপ গানের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে, সেগুলি হল — (i) বন্দনা, (ii) বৈঠকী গান, (iii) ভোলার বন্দনা, (iv) কাপ বা আলকাপ, (v) ছড়া, (vi) পালাগান।

আসর বন্দনা শুরু হওয়ার আগে দু'বার যন্ত্রসঙ্গীত ও মাঝে জয়ধ্বনি করা হয়। খলিফার সাথে সাথে অন্যান্য কুশীলবেরা সমবেত কণ্ঠে বন্দনা গানের ধুয়া ধরেন। দেবী সরস্বতী ছাড়া অন্যান্য দেব-দেবীদের উদ্দেশেও স্তুতিমূলক গান গাওয়া হয়। স্তুতিমূলক গান হওয়ায় এই গানের ভাব ও ভাষা গম্ভীর হয়।

বৈঠকীগানে দর্শকদের আসরে ধরে রাখার জন্য মনোরঞ্জনমূলক গান ও নাচের ব্যবস্থা করা হয়। ছোকরাদের লাস্যময়ী নৃত্য এতে ফুটে ওঠে। বৈঠকী গানে সাধারণত প্রেমমূলক গানই প্রাধান্য পায়। গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুমুর, খেমটা, টপ্পা, জনপ্রিয় বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালী, কবিগান প্রভৃতি। আবার কখনো কখনো ওস্তাদ নিজেই গান রচনা করে সুর দিয়ে থাকেন।

'ভোলার বন্দনা' অংশে দলের খলিফা উঠে দাঁড়িয়ে শিবের বন্দনা শুরু করেন। এই বন্দনায় শিবের স্তুতির পাশাপাশি ব্যঙ্গ-কৌতুক, অভিযোগ ও সমস্যা তুলে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আলকাপের 'ভোলার বন্দনা' অংশের সাথে গম্ভীরার 'শিববন্দনা' অংশের অনেকাংশে মিল রয়েছে।

এরপর শুরু হয় আলকাপের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যায় 'কাপ' বা 'আলকাপ'। ল্যাবার ও ছোকরাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকা সম্পর্ক ধরে সংলাপ ও অভিনয়ের মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। এই 'কাপ'-কে স্থানীয় ভাষায় 'চাঁচোর' বলা হয়। এই পর্যায়ে ল্যাবারের অভিনয় দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এতে পারিবারিক অশান্তি, স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমান প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও গ্রাম বা দেশের বিশেষ কোন ঘটনার সমালোচনা করা হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের মধ্যে বহু আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর মোড়লের কাছে যায় তারা। উল্লেখ্য আলকাপে মোড়লের ভূমিকা নেন খলিফা। শেষে মোড়ল সেই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করেন।

'কাপ'-এর পরে শুরু হয় ছড়া কাটা। এক্ষেত্রে খলিফা কিংবা দলের অন্য কোন দক্ষ কুশীলব ছড়া কাটেন। এই ছড়াগুলি খলিফা নিজেই তৈরি করেন। কোনো কারণে ছড়া আগে রচিত না থাকলে আসরে উঠে তাৎক্ষণিকভাবে রচনা করা হয়। একের বেশি দল আসরে উপস্থিত থাকলে কবিগানের মত চাপান-উতোরের সাহায্যে ছড়া কাটা হয়। ছড়াগুলি যে কোন বিষয় নিয়ে রচিত হতে পারে।

সবশেষে শুরু হয় আলকাপের পালাগানগুলি। বর্তমানে এগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে আলকাপে। এই পালাগুলির বিষয় সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রোমান্স জাতীয় হলেও এক্ষেত্রে সামাজিক বিষয়ই প্রাধান্য পায়। কারণ দর্শক ও শ্রোতার চিরপরিচিত সমাজজীবন থেকেই কাহিনিগুলি নেওয়া হয়। আর এতে লাব্বারের রঙ্গরস পরিবেশনের সুযোগ থাকে বেশি। পালাগানটির কাহিনির প্লট ও গান আগে থেকেই তৈরি থাকে। কিন্তু চরিত্র অনুযায়ী সংলাপ লিখিত থাকে না। অভিনেতারা আসরে দাঁড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সংলাপ রচনা করে পরিবেশন করেন।

তবে শিল্পী ঝাঁকসুর পরবর্তীকাল থেকেই আলকাপে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। আলকাপের প্রতিষ্ঠাতা বোনাকানা থেকে ঝাঁকসুর পূর্বসূরী পর্যন্ত আলকাপ তিনটি পর্যায়ে অভিনীত হত— আসর বন্দনা, দ্বৈতগীতি ও কাপ। কিন্তু শিল্পী ঝাঁকসু যাত্রার অনুকরণ করে আলকাপে নিয়ে আসেন পাঁচটি পর্যায় যা 'পঞ্চরস' বা 'পঞ্চরস অপেরা' নামে পরিচিত।

ডোমনী ঃ মালদহ জেলার উল্লেখযোগ্য লোকনাটকগুলি হল গম্ভীরা, আলকাপ, ডোমনী। তবে গম্ভীরা ও আলকাপের তুলনায় ডোমনী লোকনাটকটি আবহমান অর্থাৎ লোকসংস্কৃতি প্রেমী জনসাধারণের কাছে খুব কম পরিচিত। এই ডোমনী গান মালদহ জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলিতে জনপ্রিয়।

তবে বর্তমানে এই গান রতুয়া ও মানিকচক অঞ্চলে কোনক্রমে টিকে রয়েছে। বাংলা ও বিহারের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের লোকসমাজের ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি, জাতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক ধরনের মিশ্ররূপ লক্ষ করা যায়। আর এসবের প্রতিফলন যে ডোমনী গানে পড়বে তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তাই সম্ভবত ভাষার দুর্বোধ্যতার কারণেই ডোমনী গান তেমন পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। কেননা ডোমনী গানের ভাষা 'খোট্টা'। সাধারণত মালদার দিয়ারা অঞ্চলের অর্থাৎ ডোমনী প্রচলিত এলাকার স্থানীয় ভাষা 'খোট্টা'। প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ গীয়ারসনের মতে হিন্দি মগহী (মাগধী) উপভাষার একটি কথ্যরূপই হল 'খোট্টা' নামক বিভাষা। ফলে এই দিয়ারা অঞ্চলের বাইরে ডোমনী গানের ভাষা দুর্বোধ্য।

'ডোমনী'-র উৎস সন্ধান করতে গিয়ে সুবোধ চৌধুরী কতগুলি সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন, তা এখানে তুলে ধরা হল। তিনি বলেছেন, (i) "এক্ষেত্রে সুপ্রচলিত একটি অভিমত এই যে, লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভের পর বেহুলা কর্তৃক তার শ্বশুর ও শাশুড়ির সংগে ডোমনারীর ছদ্মবেশে সাক্ষাতের ঘটনার সাথে এই গানের উৎপত্তি জড়িত।"[৭৫] (ii) "ডোম-নারীর জন্মগত নৃত্যগীত কুশলতা ও রঙ্গপ্রিয়তার ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই ধীরে ধীরে এই সংগীতধারা বিবর্তিত হতে হতে তার বর্তমানরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে। ... এমত অনুমানের পেছনে কিছু যুক্তিগ্রাহ্যতা বিদ্যমান, চর্যাপদে দেখি ডোম পুরুষ ও নারী নৃত্যগীতে সুপটু ছিল।"[৭৬] (iii) "...বোলওয়াহির এই খোট্টা ধারা থেকে ডোমনির সৃষ্টি এবং ডোমনিকে তাই বোলওয়াহির উত্তরসূরী বলা যায়।"[৭৭] (iv) "মূলতঃ কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের উর্বরতাসূচক যাদুবিশ্বাসের সংগে এই ডোমনি গানের যোগ থাকা স্বাভাবিক। প্রাচীনকালের কিছু কিছু ডোমনি গানে আদিরসাত্মক বিষয়ের খোলামেলা প্রকাশ দেখা যায়।"[৭৮] (v) "...এককালের শরৎ ঋতুর বর্ষারম্ভের 'শবরোৎসব' আজ হয়ে উঠেছে বসন্ত ঋতুর বর্ষারম্ভের 'শিরুয়া' পরব। পুরনো দিনের ডোমনি গানের ছট্ বা বিক্ষিপ্ত পদগুলিতে আদিরসাত্মক বিষয়ের প্রাচুর্যের ব্যাখ্যাও এই সূত্রে পাওয়া যাবে।"[৭৯] সুতরাং বলা যায় ডোমনীর ঐতিহ্য ধরে লোকনাটকটিতে এই ডোমনী চরিত্রটির আবির্ভাব হয়েছে। এই চরিত্রটি গম্ভীরা লোকনাটকের শিব-এর মতোই প্রতীকি হয়ে উঠেছে।

তবে উৎস যাই হোক একসময় এই ডোমনী গানের আসর শিরুয়া উৎসব উপলক্ষে পরিবেশিত হত। এই অঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিনটিকে শিরুয়া বলা হয়। শিরুয়া শব্দটি এসেছে সং, সংক্রান্তি শব্দ থেকে। অর্থাৎ শিরুয়া হল চৈত্র সংক্রান্তি। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ডোমনী। তবে শিরুয়া উৎসব ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময় ডোমনী অভিনীত হয়। শিরুয়ার দিন ডোমনীর দল বাড়ি বাড়ি মাগন সংগ্রহ করেন। গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে খোলা আকাশের নিচে দিনের বেলায় এই আসর বসত। পালাগুলিও আকারে ছোট ছোট করা হত। কারণ যত বেশি বাড়িতে যাওয়া যাবে, উপার্জনও তত বেশি হবে। কিন্তু এখন মাগনের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে হ্রাস পাওয়াতে পালার আকার বড় হয়েছে। ডোমনী গানের মহড়া শুরু হয় দোল পূর্ণিমার পর থেকে। আবার কোন কোন জায়গায় রামনবমীর সময় ডোমনীর মহড়া হতে দেখা যায়। ১০-১৫ জন সদস্য

নিয়ে ডোমনী দল গঠিত হয়। দলটি প্রতিবছর নতুন নতুন পালা তৈরি করে এবং সাথে পুরনো জনপ্রিয় পালাগুলিও ঝালিয়ে নেয়। সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেচ্ছা-কাহিনি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা ডোমনীর পালাগুলিতে স্থান পায়। ডোমনীতে একজন মূল গায়ক ও দু'জন নারী বেশধারী ছোকরা থাকে। এছাড়া একজন রঙ্গ-তামাশা করার জন্য ভাঁড় বা বিদূষক থাকে, তাকে লাবার বা জোকার বলা হয়। দলের মধ্যে কেবল ছোকরারাই মেক-আপ নেয়। এই গানের বাদ্যযন্ত্রগুলি হল— করতাল, ঢোল, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, বাঁশি।

ডোমনী গানের দুটি অংশ রয়েছে, যেমন— আসর বন্দনা ও নাচারি বা লাচারি। আসর বন্দনার মধ্য দিয়ে ডোমনী গান শুরু করেন মূল গায়ক। বন্দনার আগে শুরু হয় যন্ত্রসঙ্গীত। এরপর আসরে উঠে মূল গায়ক ও ছোকরারা বন্দনা গান ও নাচ শুরু করেন। সঙ্গে দোহারকি ও বাজানদারেরা ধুয়া ধরেন। দিক্‌পতিদের বন্দনার পর হিন্দু দেবদেবীর সাথে মুসলিম পীর-পয়গম্বরদেরও বন্দনা করা হয় এই গানে। সবশেষে আসরে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর চরণ বন্দনা করা হয়।

নাচারি বা লাচারি অংশে থাকে ছোকরাদের গান ও নাচ। ছোকরাদের মধ্যেই একজন ডোমনী নামে পরিচিত হন। ডোমনীকে উদ্দেশ্য করে গান বাঁধা হয় এই অংশে। গম্ভীরার শিবের মতো ডোমনীর এই ভূমিকা লক্ষণীয়। নাচারির দ্বিতীয় ভাগে ডোমনীর আর কোনো ভূমিকা থাকে না। সমাজের বিশেষ কোনো কাহিনিকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয় এই পালাগান, যা ডুয়েট বা লাচারি নামে পরিচিত। অন্যান্য লোকনাটকের মতো ডোমনীর ডুয়েট পালাগানে কোন লিখিত সংলাপ থাকে না। আসরে উঠেই সংলাপ রচিত ও পরিবেশিত হয়। তবে পালা চলাকালীন মাঝে মাঝে লাবার দর্শকদের রিলিফ দেওয়ার জন্য যে গদ্য সংলাপ পরিবেশন করেন, তাকে 'ছুট ডোমনী গান' বলা হয়। লাচারি অংশে পরিবেশিত পালাগুলিতে সমাজের অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গের কশাঘাত করা হয়।

পৌরাণিক বিষয় নির্ভর লোকনাট্য ঃ

পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যের বিষয়কে অবলম্বন করে যে সমস্ত লোকনাটক রচিত হয়, তা পৌরাণিক লোকনাটক। এই লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল কুশান, বিষহরি, রাবান, নটুয়া প্রভৃতি। কিন্তু একসময় আশুতোষ ভট্টাচার্য কুশান, বিষহরা প্রভৃতি পৌরাণিক বা ধর্মীয় আখ্যানমূলক লোকনাটককে লোকনাটক হিসেবে গণ্য করেননি। তিনি বলেছিলেন, "কোনো পৌরাণিক কিংবা ধর্মীয় বা ধর্মপ্রচারমূলক বিষয়বস্তু হলেও তা লোকনাট্য বলে গণ্য হতে পারে না। তার প্রধান কারণ, প্রত্যেকটি পৌরাণিক চরিত্র সম্পর্কে এবং তাদের নিয়ে যে সব কাহিনী রচিত হয় তাদের বিষয়ে আমাদের মনের মধ্যে একটি অবিচল এবং অপরিবর্তনীয় সংস্কার আছে। তা বিসর্জন দিয়ে কিংবা তাকে যুগধারার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে

কাহিনী কিংবা চরিত্রকে নতুন নতুন ভাবে রূপায়িত করা যায় না।"[৮০] অর্থাৎ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, লোকসাহিত্যের ধর্ম পরিবর্তনশীলতা, যেহেতু এই পৌরাণিক লোকনাটকগুলি তেমন পরিবর্তিত হয় না, তাই এদেরকে লোকনাটক বলা যায় না। তাছাড়া পুরাণ এবং মঙ্গলকাব্যের বাঁধাধরা রূপের জন্য চরিত্রগুলো সাধারণ মানুষের জীবন থেকে উঠে আসলেও এখানে চরিত্রগুলোর নিজস্ব কোন স্বাধীনতা নেই। তবে তাঁর এই মতটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এক্ষেত্রে সনৎ-কুমার মিত্রের মন্তব্য স্মরণীয়। তাঁর মতে, "কুশান বা বিষহরা ইত্যাদি পুরাণ বিষয়ক পালা। কিন্তু পুরাণ-কাহিনী হলেই যে সত্যমূলক হবে না, তা 'কৃত্রিম' হবে, তাতে জীবনের উত্তপ্ত আবেগের ছোঁয়াচ আদৌ থাকবে না তাই বা কেমন করে হয়। পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে থেকেই 'লোক'-সাধারণ আপন জীবন-সংসার ও সমাজের সত্যকে অন্বেষণ করে সেখান থেকে আহৃত সত্যকে নিজেদের জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চায়। অতএব এই সত্য দৈনন্দিনতার ধূলা-মালিন্যযুক্ত না হলেও তা 'সত্যমূলক'।"[৮১] তাই এগুলির মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে মানুষের সুখ-দুঃখের একান্ত নিজস্ব কথা। পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যের চরিত্রেরা লোককবির হাতে পড়ে হয়ে ওঠে সাধারণ গ্রাম্য নরনারী।

অনেক সময় দেখা যায়, এ ধরনের লোকনাটকের অভিনয় চলাকালীন চরিত্রগুলি হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে যায় অর্থাৎ অভিনয়ের মধ্য দিয়েই তাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা জেগে ওঠে। এগুলিকে বলা হয় 'ফাস' বা 'ফ্যাসা'। এই ফাসের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিগুলিকে ব্যঙ্গ করা হয়। তাই পৌরাণিক পালার গুরুগম্ভীর বিষয়ের মাঝে মাঝেই 'ফাস' অভিনীত হতে দেখা যায়। যাই হোক এ প্রসঙ্গে আমরা শিশির মজুমদারের মন্তব্য এখানে তুলে ধরতে পারি, "...ধর্মীয়-পৌরাণিক বিষয়ের পালাগানগুলিতে যুক্ত হয়ে পড়ে এমন সব বিষয় যা লোকসমাজেরই নিজস্ব অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। নদীয়ার বোলান বা দিনাজপুরের রামবনবাস পালায় রাবণের প্রহরীরা নিজেদের চুক্তিবদ্ধ কৃষি-শ্রমিক হিসাবে দেখে, আর তাদের চোখে রাবণ হয় জোতদার।"[৮২] তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা জরুরি, সেটি হল– পৌরাণিক লোকনাটকগুলি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে টিকে রয়েছে এবং তা ভবিষ্যতেও হয়ত টিকে থাকবে অন্যরূপে। কারণ, আমাদের প্রচলিত ঐতিহ্য ও সংস্কারগুলি আমাদের জীবন ও সমাজ থেকে কখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না, পরিবর্তিত হয়।

কুশান ঃ কুশান শব্দটি কোথা থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত রয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, "কুশান শব্দটি সংস্কৃত কুশীলব শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে হয়। কুশীলবই বাল্মীকির রামায়ণের প্রথম প্রচারক।"[৮৩] উল্লেখ্য রামায়ণে রামচন্দ্রের সভায় লবকুশ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ গান গেয়েছিল বীণা সহযোগে। কুশান গানও বেণা অর্থাৎ বীণা সহকারে গাওয়া হয় বলে একে বেণাকুশানও বলা হয়। তাই সমালোচকদের মতে, "কুশ থেকে কুশান শব্দটির উৎপত্তি।"[৮৪]

কুশান লোকনাটকটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, সীমান্তবর্তী অসমের গোয়ালপাড়া জেলা ও বাংলাদেশের রঙপুর জেলার রাজবংশী জনসমাজে বহুল প্রচলিত। আশ্বিন থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কুশানের অভিনয় চলে। গৃহস্থের বাড়ির উঠোনে কিংবা গ্রামের খোলা মাঠে এর আসর বসানো হয়। আসর বৃত্তাকার হয়ে থাকে এবং দর্শকেরা আসরের চারদিক ঘিরে বসেন। দর্শকদের সামনে বসে বাদ্যযন্ত্রী, তাদের সামনে থাকে গীদাল, দোহার, ছোকরা ও অন্যান্য চরিত্রেরা। অন্যান্য লোকনাটকের মতোই চট বা ত্রিপল দিয়ে আসরের উপর আচ্ছাদন দেওয়া হয়। অস্থায়ী সাজঘর বা গ্রিনরুম নির্মাণ করা হয় আসরের কাছাকাছি কোন স্থানে। ১০-১৫ জনকে নিয়ে কুশান দল গঠিত হয়। তবে কুশান গানে প্রধান ভূমিকায় থাকে মূল বা গীদাল। তিনিই সংলাপ ও গানের মাধ্যমে পালাটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর হাতে থাকে একটি ব্যাণাযন্ত্র। পালার সূত্রধরের ভূমিকায়ও তিনি অবতীর্ণ হন। কুশান গানের বিষয়বস্তু রামায়ণ ছাড়া অন্য বিষয় হয় না, তাই এই পালায় যে বন্দনা গান গাওয়া হয় তাতে বিভিন্ন দেবদেবী এবং রামায়ণের চরিত্রগুলির গুণকীর্তন করা হয়। ঐকতান বাদনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আসর। সকলে মিলে হরিধ্বনি দিয়ে বন্দনা শুরু করেন গীদাল। গীদাল ও দোয়ারী-এরা দুজনেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন। পালার একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অন্য বিষয়ের অবতারণা করে থাকে দোয়ারী। এগুলির বেশিরভাগই রঙ্গ-তামাসামূলক। এগুলি 'ফ্যাসা' ও 'খোসা' নামে পরিচিত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রধান হল বেণা বা ব্যাণা। এই বাদ্যযন্ত্রটি সম্পর্কে সমালোচকেরা মনে করেন, "বেণা বা ব্যাণা শব্দটি বীনা থেকে উদ্ভূত।"[৮৫] তবে ব্যাণা ছাড়া বেহালা, খোল, করতাল, সারিন্দা, বাঁশি, হারমোনিয়াম প্রভৃতি কুশান গানে ব্যবহৃত হয়। কুশীলবেরা সাধারণ পোশাকে অভিনয় করলেও ছোকরা চরিত্রেরা কিছুটা সাজসজ্জা করত। কিন্তু বর্তমানে কুশান লোকনাটকে প্রভূত পরিবর্তন দেখা যায়। গীদালের পরনে থাকে ধুতি-পাঞ্জাবী এবং গলায় থাকে উত্তরীয়। দোয়ারীর ঢিলেঢালা পোশাকের সাথে থাকে মাথায় টিকি, কপালে তিলক, হাতে বাঁকা লাঠি। গীদাল ও দোয়ারীর সাজসজ্জার ক্ষেত্রে এই ঐতিহ্যের আজও তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বহুকাল ধরে এই ঐতিহ্য চলে আসছে।

পূর্বে কুশান গান পয়ার ছন্দে গাওয়া হত। তবে এখন কিছু কিছু সংলাপ খাতায় লেখা হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে সঙ্গীতও রচিত হয়। আবার অনেক সময় আসরে উঠে তৎক্ষণাৎ সংলাপও রচনা করা হয়। সংলাপের ভাষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাই প্রাধান্য পায়। কুশান গানের ভাষা সম্পর্কে সুখবিলাস বর্মা বলেছেন, "উত্তরবঙ্গের ও তৎপার্শ্ববর্তী যে অঞ্চলে এই কুশান গান প্রচলিত সেই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রাজবংশী নামে অভিহিত এবং তাদের ব্যবহৃত উপভাষা রাজবংশী বা কামরূপী বা কামতাপুরী উপভাষা কালক্রমে বাঙালী, বরেন্দ্রী ও রাঢ়ীর সঙ্গে মিশে এ মিশ্র-ভাষার জন্ম দিয়েছে।"[৮৬] কখনো কখনো তাই এই পালাগানে মিশ্র উপভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এই পালা অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আগে কুশান গান চলত সারারাত ব্যাপী। কিন্তু এখন দর্শক ও শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী ৩-৪ ঘন্টা, আবার কোথাও ২ ঘন্টায়ও শেষ হতে দেখা

যায়। কুশান লোকনাটকের উল্লেখযোগ্য পালাগুলি হল— লবকুশ পালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দানবীর রাজা হরিশচন্দ্র, সীতার বনবাস, মেঘনাদবধ প্রভৃতি।

বিষহরি ঃ পৌরাণিক লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হল বিষহরা বা বিষহরি। এটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। জঙ্গলে পূর্ণ উত্তরবঙ্গের সর্পভীতি থেকেই মনসামঙ্গলের কাহিনি নিয়ে 'বিষহরা' পালা রচিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজে বিবাহ বা কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে দেবী মনসা বা বিষহরি পূজা করা হয়। পরিবার-পরিজনের মঙ্গল কামনায় রাজবংশী গৃহস্থেরা প্রথা বা মানত অনুসারে বাড়ির উঠোনে বিষহরা পালাগানের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া শ্রাবণ মাসে মনসা পূজাকে কেন্দ্র করেও আসর বসে থাকে। পালাগানটি কতদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে, তা নির্ভর করে গৃহস্থের সামর্থ্যের উপর। কখনো তিন-সাতদিন পর্যন্ত পালাগানটি অনুষ্ঠিত হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় শুধু ঘটপূজা করে একদিনেই জাগানি ও ভাসানি করা হয়।

উন্মুক্ত স্থানে গোলাকার অংশে নৃত্য-গীত-অভিনয় হয়। চারদিক ঘিরে দর্শক ও শ্রোতারা বসে থাকেন। আবার কোথাও কোথাও চৌকি বসিয়ে অভিনয়স্থলকে কিছুটা উঁচু করা হয়। বিষহরির দলে থাকে মূল বা গীদাল, দোয়ারী, দোহার, ছুকরী ও বাজানদারসহ মোট ১০-১৫ জন সদস্য। গীদাল ও দোয়ারীর দক্ষতার উপরই এই পালাগানের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। গীদাল ও দোয়ারীর সাজসজ্জা কুশান পালার অনুরূপ হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গীদালের হাতে থাকে একটি চামর। বিষহরার অপরিহার্য বাদ্যযন্ত্র হল মুখাবাঁশী। এছাড়া অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যেমন– খোল, করতাল প্রভৃতি এই লোকনাটকের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বন্দনা গান দিয়েই বিষহরি পালার শুরু হয়। এই অংশে দেবী সরস্বতী ছাড়া অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনাও করা হয়ে থাকে। এছাড়া দিক্‌পতি ও গুরুর চরণ বন্দনা করা হয়। কুশান পালার মতোই গীদাল বন্দনা শেষে পালার নাম ঘোষণা করেন। বিষহরাতে মূলত প্রাধান্য পায় সতী বেহুলার জীবন ও সতীত্ব। গীদাল নিজেই কখনো সূত্রধর, কখনো চাঁদ সদাগরের ভূমিকায় অভিনয় করে। আবার দোয়ারী কখনো কখনো নেড়া ও বেহুলা উভয় চরিত্রে অংশগ্রহণ করে। বিষহরার ছুকরীদের নাচের ক্ষেত্রে বিশেষ একধরনের রীতি লক্ষ করা যায়। এই পালার অভিনয়ে কুশীলবেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সংলাপ, গীত ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করে। এই অভিনয় রীতি প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "যতক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান চলতে থাকে, ততক্ষণের মধ্যে তাদের কেউ কখনো আসরে বসে না। ...তারা সবসময় একসঙ্গে আসরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যার যখন সময় সেই অনুযায়ী সংলাপ বলে, গান গায় ও নৃত্য করে।"[৮৭] আবার দোয়ারী রঙ্গ-তামাশামূলক গান বা কাহিনি পালার মাঝে মাঝে উপস্থাপন করে দর্শক ও শ্রোতাদের হাসায়-কাঁদায়। বর্তমানে এই পালার কিছু কিছু লিখিত রূপ থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংলাপ আসরেই সৃষ্টি হয়। তবে বিষহরি পালায় গদ্য সংলাপ খুবই কম। কারণ এক্ষেত্রে মনসামঙ্গলের পয়ার,

লাচারি ছন্দকে অনুসরণ করা হয়। এই পালায় মনসামঙ্গলের অনুসরণে চাঁদ সদাগরের মনসার ঘট ভাঙা, মনসার সপ্তডিঙা ডোবানো, লখিন্দরের প্রাণনাশ, বেহুলার স্বামীর সাথে কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়া, লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পাওয়া এবং শেষে চাঁদ সদাগরের মনসা পূজা ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়।

রাবান ঃ 'রাবান' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'রাবণ' শব্দের প্রভাবে। তবে এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক মনে করেন, "স্পষ্টই বোঝা যায় আবান বা রাবান হল রাবনবিষয়ক পালা। কিন্তু জলপাইগুড়ি-কোচবিহারেই শোনা যায়— রামায়ণ > আমায়ণ > আবায়ণ > রাবান (Rhotacism বা র-কারীভবন, 'রাবান' শব্দের সাদৃশ্য-সংযোগ ও তার প্রভাব); কিংবা, র-ব্যঞ্জন ধ্বনির লোপের ফলে রামায়ণ > আমায়ণ > একেবারেই, 'রাবণ' শব্দের প্রভাবে রাবায়ণ > রাবান।"[৮৮] তাই উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে 'র্'-এর 'অ' উচ্চারণ প্রবণতায় 'রাবান'-কে অনেকে 'আবান' উচ্চারণ করে থাকেন। রাবান লোকনাটকটি ভাদ্র ও আশ্বিনের জিতাষ্টমী উপলক্ষে অভিনীত হত। তবে এখন এটি বছরের যে কোনো সময় অভিনীত হয়। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলার সমতলের বেশ কিছু অঞ্চলে রাবান লোকনাটকটি প্রচলিত।

১০-১৫ জন সদস্য নিয়ে রাবান গানের দল গড়ে ওঠে। গীদাল, দোহারকি, ছোকরা ও বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে এই পালা পরিবেশন করেন। রাবান গানের বাদ্যযন্ত্র বাঁশের করতাল। এই পালাগানের আসর বসে গৃহস্থের বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনে কিংবা খোলা মাঠে। বৃত্তাকার আসরের চারিদিক ঘিরে দর্শকেরা বসেন। চট বা ত্রিপল দিয়ে আসরের উপর আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই পালাগানের কেন্দ্রিয় চরিত্র রাবণ। কুশান যেমন রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে রচিত হয়, তেমনি রাবান পালাগানে রাবণের উত্থান-পতনই মূল উপজীব্য। বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদনের পর বন্দনা শুরু হয়। কুশান পালার মতোই রাবানের বন্দনা গানে বিভিন্ন দেবদেবীর পাশাপাশি রামায়ণের চরিত্রগুলির মাহাত্ম্য স্তুতি করা হয়। বন্দনা শেষে গীদাল পালার নাম ঘোষণা করেন । এরপর গীদাল পালাগান গেয়ে যান এবং দোয়ারী তার 'ভাঙ্‌তি' দেয় অর্থাৎ গীদালের কথার ব্যাখ্যা দেন। এভাবে ক্রমপরম্পরায় গীদাল ও দোয়ারী পরস্পরের কথা ভাঙ্‌তির মাধ্যমে পালা এগিয়ে নিয়ে চলে। মাঝে মাঝে দোয়ারী ও অন্যান্য চরিত্রগুলি গানের ধুয়া তোলেন। এই ধুয়া অংশ এবং গানের অনুসরণে ছোকরারা নৃত্য করে। গীদাল, দোয়ারী ও ছোকরা— এরা প্রত্যেকেই একসাথে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন। তবে কুশান ও বিষহরার মতই রাবানেও খোসা ও ফ্যাসা গানের ব্যবহার রয়েছে।

রাবণ চরিত্রের বীরত্ব, দম্ভ, শোক প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রাবান পালা গড়ে উঠলেও কোন কোন অঞ্চলে আর এক শ্রেণীর রাবান লক্ষ করা যায়। সেটি হল 'কেউটিয়া রাবান' বা 'কেউটিয়া আবন'। এ প্রসঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক আরেক জায়গায় বলেছেন, " 'কৈবর্ত' হইতে 'কেওট'+ ইয়া, এইভাবে 'কেউটিয়া' হইতে পারে। ....জিতুয়া ছাড়াও, অন্যান্য সময়েও 'কেউটিয়া আবন' গাওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে মনে হয় 'কেউটিয়া আবন'

একান্তভাবেই জিতুয়ার আনুষ্ঠানিক গান নয়।"[৮৯] অর্থাৎ এ কথা আমরা ধরে নিতে পারি যে, রাবান থেকেই কেউটিয়া রাবানের উৎপত্তি। তাই দার্জিলিং জেলার সমতলের কিছু কিছু অঞ্চলে রাবান গানকে 'কেউটিয়া রাবান' বলা হয়ে থাকে। তবে রাবান রাবণকেন্দ্রিক গান হলেও 'কেউটিয়া আবনে'র ক্ষেত্রে দেখা যায়, সেখানে লোকায়ত জীবন মুখ্য হয়ে উঠেছে।

নটুয়া ঃ 'নটুয়া' শব্দটির অর্থ দিতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন, " 'নট' শব্দের সঙ্গে 'উয়া' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় এর অর্থ দাঁড়ায় রঙ্গকারী।"[৯০] অর্থাৎ 'নট' বলতে সেসময় বহুরূপী, অঙ্গভঙ্গকারী, বাজিকর প্রমুখকে বোঝাত। আবার নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, " 'নটুয়া' শব্দটি চলিত বাঙলাতে চলিত না থাকিলেও, 'নটুয়া' কথাটি প্রচলিত আছে, যাহার অর্থ 'নট, নর্তক' ইত্যাদি। এই সব বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়,— রঙ্গ করিবার নাচকেই 'নটুয়া' বলে। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন, 'নটুয়া' শব্দটির সহিত রঙ্গের ইঙ্গিত থাকিলেও, 'নটুয়া' গানে রঙ্গের ভাব খুব বেশি নাই।"[৯১] তবে শেষোক্ত কথাটির সাথে একমত হওয়া যায় না। কারণ নটুয়া রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান হলেও এর মধ্যে রঙ্গরস রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শিশির মজুমদারের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি মনে করেছেন, "উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরের দেশী-পলি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত 'নটুয়া'র প্রয়োগে নৃত্য, গীত ও অভিনয় আছে। এবং তা পুরোপুরি রঙ্গাত্মক।"[৯২] তবে নটুয়া কেবলমাত্র উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেই নয়, জলপাইগুড়ি ও সমতল দার্জিলিং জেলার সমতলের কিছু কিছু অঞ্চলে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া বিহারের সীমান্ত অঞ্চলেও নটুয়া প্রচলিত রয়েছে।

দশমীর পর থেকে কালীপূজা পর্যন্ত 'নটুয়া'-র আসর বসে। খোলা মাঠে কিংবা গৃহস্থের বাড়ির বাইরের উঠোনে নটুয়া অভিনীত হয়। এর আসর বৃত্তাকার। কমবয়সী মেয়েলী মুখাবয়বের ছেলেদের অর্থাৎ ছুকরীদের মধ্যে একজন রাধা সেজে থাকে। এক্ষেত্রে রাধা চরিত্রটিকে নাচে পারদর্শী হতে হয়। সংস্কৃত নাটকের বিদুষক চরিত্রের মত দু'জন 'বতেয়া' থাকে যারা উধব ও মাধব চরিত্রে অভিনয় করেন। উধব ও মাধব চরিত্রদুটি দর্শকদের কাছে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য অদ্ভুত সাজে সজ্জিত হন। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলির সাজসজ্জা অতি সাধারণ। গীদালের পরনে থাকে ধুতি পাঞ্জাবী এবং গলায় থাকে এক টুকরো কাপড়। রাধা ঘাগরা এবং উধব-মাধব লম্বা টুপি, ছেঁড়া শার্ট বা খাটো ধুতি পরেন।

অন্যান্য লোকনাটকের মতই বন্দনা দিয়ে নটুয়া পালাগান শুরু হয়। এই বন্দনাংশে কালী বন্দনা ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা করা হয়ে থাকে। নটুয়া মূলত দুটি অংশের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। (i) রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাহিনি, (ii) ফাকরি বা শ্লোক। এটি অনেকটা চোরচুন্নির মতই কথোপকথনমূলক। গীদাল পালাগানটিকে সংলাপ ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। এর মাঝে মাঝে উধব-মাধব চরিত্রদুটি গীদালের সাথে ফাকরি বা শ্লোকের মাধ্যমে রাধার দুঃখ বেদনার প্রসঙ্গ পাল্টে দেয়। রাধার হৃদয় বেদনার একঘেয়েমি থেকে দর্শক ও শ্রোতাদের মুক্তি দেওয়ার জন্য এই শ্লোক বা ফাকরি ব্যবহার করে থাকেন পালাকারেরা।

লোকসমাজে এই ফাকরি বা ধাঁধাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। লোকশিক্ষার একটি অন্যতম প্রাচীন পদ্ধতি হল ফাকরি বা ধাঁধা। এতে শিক্ষনীয় বিষয়ের পাশাপাশি বুদ্ধি চর্চার বিষয়ও রয়েছে। এছাড়া এই ফাকরিগুলির মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের নানা দিক ফুটে ওঠে। তাই এই ফাকরিগুলি নটুয়ার একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। তবে নটুয়া পালা কেবল মাত্র রাধা বিরহ ও ফাকরিতেই শেষ হয়ে যায় না ভাবের জগতে রাধা কৃষ্ণের মিলন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এখানে রাধার নিজস্ব কোন সংলাপ নেই। কেবল নৃত্যের মাধ্যমে তার বিরহ-যাতনা প্রকাশ করে।

রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'নটুয়া' লোকনাটক। তবে পালাকারেরা এখানে কৃষ্ণের চাইতে রাধার অন্তর্বেদনাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে নটুয়ার দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে– যথা, (ক) বিরোক বা বিরোথ পালা, (খ) কুঞ্জপালা। উভয় ধারাতেই রাধার প্রেম-বিরহ-মনোবেদনা বিষয়বস্তুরূপে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে বিরোক বা বিরহ পালায় রাধার অন্তর্বেদনা ও কৃষ্ণের জন্য হাহাকার প্রকাশ পায়। অন্যদিকে কুঞ্জপালায় রয়েছে রাধার প্রিয়তম কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা।

রাজধারী ঃ উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় লোকনাটক হল রাজধারী। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লক ও উত্তর দিনাজপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে এর প্রচলন ছিল। বর্তমানে এই লোকনাটক কোনক্রমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। তবে বিহার সীমান্তের কিছু এলাকায় এবং নেপালের ভদ্রপুর ও চন্দ্রগুড়ির রাজবংশী সমাজে এই লোকনাটকের প্রচলন রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজধারী লোকনাটক অনুষ্ঠিতহয় না। দুর্গাপূজার পর থেকে শীতকাল পর্যন্ত এটি পরিবেশিত হতে দেখা যায়। সাধারণত গ্রামে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বাড়লে কিংবা কোন মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে রাজধারীর আয়োজন করা হয়। কোন কোন সময় গৃহকর্তার আমন্ত্রণে গৃহস্থের বাড়ির বাইরের উঠোনে কিংবা উন্মুক্ত মাঠে রাজধারীর আসর বসে। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, ঢুলকি, কাড়া-নাকাড়া, বাঁশী, করতাল প্রভৃতি। বাদ্যযন্ত্রীসহ মোট ৬০-৭০ জন শিল্পী নিয়ে রাজধারীর দল গঠিত হয়। তবে এত লোক একসাথে পাওয়া সম্ভব নয় বলে ২৫-৩০ জন সদস্য নিয়ে কাজ চালাতে হয়। ফলে এক-একজনকে প্রায় ৮ টি চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। এছাড়া অন্যান্য লোকনাটকের মতো প্রয়োজনানুসারে বাদ্যযন্ত্রীরাও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া এখানে স্ত্রী চরিত্রেও পুরুষদেরই অভিনয় করতে দেখা যায়।

রাজধারী লোকনাটকের বিশেষ আকর্ষণ এর অভিনব মঞ্চসজ্জা ও মুখোশ। যেখানে রাজধারী অনুষ্ঠিত হবে সেখানকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুযায়ী আসর নির্দিষ্ট করা হয়। এই আসর বর্গাকার কিংবা আয়তাকার দুই-ই হতে পারে। তবে আয়তাকার বা বর্গাকার যাই হোক না কেন, আসরের তিন দিক জুড়ে দর্শকেরা বসেন। আর যেদিকে দর্শক বসে না সেখানে এক কিনারে কিছু জায়গা নিয়ে বাঁশ দিয়ে মাঁচার মতো তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে

মাঁচাটি বেশি উঁচু হবে না। সেই মাঁচা থেকে ওঠা-নামা করার জন্য বাঁশের সিঁড়িও তৈরি করা হয়। এই মাঁচাটিকে রাবণের সিংহাসনের প্রতীক বলে ধরা হয়। একে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'লঙ্কা বান্ধা'। আর এক কোণে বাঁশ দিয়ে ঘরের মতো আচ্ছাদন দিয়ে 'অশোক বন' নির্মাণ করা হয়। তাই কোন কোন অঞ্চলে রাজধারীর অপর নাম 'লঙ্কার গান'। অন্যদিকে শিল্পীদের বড় বড় কাঠের মুখোশের ব্যবহার রাজধারী লোকনাটকটিতে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। রাবণ ও তার বংশের প্রতিটি চরিত্রের জন্য সুনির্দিষ্ট মুখোশ রয়েছে। এদের মধ্যে রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মুখোশ আয়তনে সবচেয়ে বড়। এছাড়া হনুমান, জাম্বুবান, বানর, বাঘ, দেবী দুর্গা প্রভৃতি চরিত্রের ক্ষেত্রেও মুখোশ ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে রাম ও লক্ষ্মণ চরিত্র দুটি আসরে মুখোশ ব্যবহার করে না। পোশাকের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই লোকনাটকের রাজবৃত্তাধিকারী চরিত্রেরা রাজপোশাকে আসরে নামে। আর এই পোশাকগুলি জোগাড় করা যথেষ্ট ব্যায়সাধ্য। এই পোশাকগুলি তৈরি করা হয় মোটা কাপড়ের ওপর রঙিন কাপড় দিয়ে। তার ওপর থাকে জরি ও ঝিল্লির কাজ। কিন্তু রাম-লক্ষণ আসরে নামে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে অতি সাধারণ মেক-আপ নিয়ে। এছাড়া প্রতিটি চরিত্রই কমবেশি মেক-আপ নিয়ে থাকেন।

পালার মূল গায়ক রাম লক্ষণের বন্দনা দিয়ে বন্দনা গান শুরু করেন। এর সাথে রামের অনুগামীদেরও বন্দনা করা হয়। এছাড়া কালী এবং চৈতন্য মহাপ্রভুরও স্তুতি গাওয়া হয়ে থাকে এই অংশে। বন্দনা পর্বের শেষে শুরু হয় 'ডাক'। ঘটনা পারম্পর্য অনুসরণ করে এই ডাকগুলি দেওয়া হয়। এরপর হয় পালাগানের সূচনা। তবে অরণ্যকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডের কাহিনিই বেশি প্রাধান্য পায় রাজধারীতে। এর মধ্যে যেসব ঘটনা অতি নাটকীয়, যেমন– সুর্পনখার নাসিকা ছেদন, সীতাহরণ, বালিবধ, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসা, সেতুবন্ধন, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি অংশগুলি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাকি অংশ মূল গায়ক সূত্রধরের মতো বর্ণনা করে যান। কারণ সময়াভাবে পুরো কাহিনি প্রদর্শন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তবে রাম-সীতার প্রসঙ্গ এখানে তেমন গুরুত্ব পায় না। রাবণ ও তার রাক্ষস বংশের জাত্যাভিমান এখানে প্রধান। মাঝে মধ্যে দু'জন বতেয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করে দর্শকদের হাস্যরসের জোগান দেন। রাজধারীর অভিনয়ের অভিনবত্ব লক্ষ করার মতো। বিশেষ করে রাম-রাবণের যুদ্ধের ভয়াবহতা প্রদর্শনের জন্য দোহারেরা মশাল জ্বালে, আবার কেউ কেউ মুখে কেরোসিন দিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয় আগুনের বৃত্ত। সঙ্গে সঙ্গে বাজতে থাকে ঢোল, খোল, কাড়া-নাকাড়া প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। সেই মুহূর্তে আসরেও যেন যুদ্ধের বিভীষিকা ফুটিয়ে তোলা হয়। দোহারদের চিৎকার, উদ্দাম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতির মাধ্যমে সূচিত হয় রাবণের পরাজয়। শেষে লঙ্কার প্রতীকি মঞ্চে আগুন ধরিয়ে অশুভ শক্তির বিনাশে জয়সূচক মঙ্গলধ্বনি দেওয়া হয় শঙ্খের মাধ্যমে।

কাল্পনিক বা রূপকথা আশ্রিত বিষয় নির্ভর ঃ

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি অন্তর্লীন যোগ রয়েছে। তাই লোকসাহিত্যের অনেক উপাদানই লোকনাটকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কিছু লোকনাটক আছে, যার মধ্যে লোককথা বা

রূপকথা কাহিনির বিষয় হয়ে ওঠে। বিষয় যেহেতু লোককথা ও রূপকথাধর্মী, স্বভাবতই সেখানে অলৌকিকতা প্রাধান্য পায়। পালাকারেরা রূপকথা বা লোককথাকে কেন্দ্র করে কাল্পনিক চরিত্র প্রতিস্থাপন করে পালার রূপ দান করে। এই ধরনের লোকনাটকগুলিতে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজা-বাদশার কাহিনিই স্থান পায়। লোককথা ও রূপকথা ছাড়াও বিভিন্ন গাথা-গীতিকা যেমন-পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকার বিভিন্ন পালা এতে অভিনীত হয়। তবে বিষয়ের ক্ষেত্রে কাল্পনিক বা ঐতিহাসিক রোমান্স যাই হোক না কেন, এতে শেষপর্যন্ত প্রেমের জয় ঘোষিত হয় এবং এই পালাগুলির মধ্য দিয়ে নীতিকথা উঠে আসে, যা সাধারণ লোকসমাজকে জীবনে চলার পথে রসদ জোগাতে সাহায্য করে। আবার কখনও কখনও দর্শক ও শ্রোতা পালার চরিত্রগুলির সাথে একাত্ম হয়ে কল্পনার সমুদ্রে পাড়ি দেয়।

দোতরা ঃ বঙ্গদেশ দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম শাসনের অধীনে থাকার ফলে সঙ্গত কারণেই শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতি অন্যান্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কারণ মুসলিম শাসকেরা রাজ্য শাসনের পাশাপাশি ধর্মীয় ধ্বজার নিচে আনতে চেয়েছিলেন অন্যান্য সম্প্রদায়কে। তুর্কী আক্রমণ, ঔরঙ্গজেবের প্রবল হিন্দু বিদ্বেষ, কালাপাহাড়ের দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস প্রভৃতি ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, “মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর ভারত হইতে মুসলমান ফকিরগণ বাঙলাদেশে আসিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন এবং রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যপুষ্ট এই সকল মুসলমান সাধু ফকিরদিগের প্রতি হিন্দু জনসাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি তাহাদের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভাবের উদয় হয়, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। শ্রদ্ধাভাবটি এখানে গৌণ, যে ভাবটি মুখ্যত উদয় হইয়াছিল, তাহা ভয়, ...।”[১৩] তবে শ্রদ্ধা কিংবা ভয় যাই হোক না কেন এর ফলে বাদশা, আমির, ফকির, পীর-পয়গম্বর প্রমুখের গুণকীর্তন করে গ্রামীণ কবিরা পদ রচনা করতেন। আর এই ধরনের পদগুলি গ্রামীণ কবিরা পালাকারে পরিবেশন করতেন দোতরা নামক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে। কালক্রমে এগুলিই দোতরা পালা নামে পরিচিত হয়।

দোতরা গানের উদ্ভব ও প্রচলন সম্পর্কে পরবর্তীকালে আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, “ফার্সী ভাষার ‘দোতার’ শব্দটি যে উত্তর বাংলায় ‘দোতারা’ রূপে ব্যবহার করা হয়, তা অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের দোতারা ও পারস্যদেশের দোতারার গঠনভঙ্গিতে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ...দোতার এবং দোতারা শব্দদুটিও অভিন্ন।

....গৌড়ে মুসলিম রাজধানী স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য দেশীয় বহু শিল্পী, শ্রমিক কর্মী তারাও এদেশে এসে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের সংস্কৃতি দিয়ে প্রতিবেশীদের প্রভাবিত করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তখনই উত্তরবাংলার দোতারার গানের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়।”[১৪] অর্থাৎ তিনি মনে করেন

উত্তরবঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতির ফলশ্রুতি হল দোতরা। দোতরা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করে যে লোকনাট্যের বিকাশ তা দোতরা পালা নামে পরিচিত। এটি উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সমাজের অন্যতম একটি জনপ্রিয় লোকনাটক। বর্ষাকাল ছাড়া যে কোন সময় দোতরা পালার আসর বসে। দেব-দেবীর থানে, গৃহস্থের উঠোনে বা উন্মুক্ত মাঠে এই লোকনাটক অভিনয় হয়। কোথাও কোথাও মাটি দিয়ে অভিনয় স্থলটিকে কিছুটা উঁচু করে নেওয়া হয়। আসরের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রী এবং অন্যান্য শিল্পীরা বৃত্তাকারে বসেন। তাদেরকে চারদিকে ঘিরে থাকেন দর্শক ও শ্রোতারা। দোতারা ছাড়া বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে খোল, করতাল, বাঁশি, জুড়ি, সারিন্দা। কুশান গানের সঙ্গে দোতরা পালাগানের শিল্পী, আসর, উপস্থাপনরীতি, ভাষা, সাজসজ্জা প্রভৃতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

কুশান, বিষহরা প্রভৃতি লোকনাটকের মতই বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানের মাধ্যমে আসর শুরু হয়। এরপর পরিবেশিত হয় বন্দনা গান। বন্দনা গানে দেবী সরস্বতীর পাশাপাশি অন্যান্য দেবী-দেবতারাও স্থান পায়। বন্দনা শেষে গীদাল ও দোয়ারী সংলাপ ও গানের মধ্য দিয়ে পালার কাহিনি ব্যাখ্যা করে যান। চরিত্রানুযায়ী শিল্পীরা আসর থেকে উঠে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। মাঝে মাঝে চলে ছুকরীদের নৃত্য। পালা চলাকালীন দর্শকদের মানসিক বিরতি দানের জন্য দোয়ারী ফাস বা খোসা গান উপস্থাপন করে থাকেন। লোককথা, ঐতিহাসিক - রোমান্টিক উপাখ্যান, রূপকথা, কাল্পনিক কাহিনি প্রভৃতি দোতরা লোকনাটকের বিষয়বস্তু। দোতরা পালা পূর্বে মুখে মুখে রচিত ও পরিবেশিত হত। সারারাত ধরে চলা এই দোতরা পালা এখন সময়ের অভাবে ও দর্শকের রুচি অনুযায়ী দুই-তিন ঘন্টায় শেষ হয়ে যায়। দোতরা পালার মধ্যে বিখ্যাত পালাগুলি হল– বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, মরুচমতি, দুবুলাবালী, মধুমালা-মদনকুমার, গুঞ্জরাবিবি ও সাত সতীন, করিম বাদশা প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র

১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, পৃ. ১৮২।

২. ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ব বিচার, পৃ. ২৬১।

৩. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ১৮২।

৪. নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, নবম ভাগ, পৃ. ৭১৩।

৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১২৯।

৬. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১।

৭. লোকশ্রুতি - সংকলন সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫০।

৮. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা, পৃ. ১।

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পৃ. ৫৪১।

১০. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৫০১।

১১. ধ্রুব দাস, ভারতের লোকনাট্য, পৃ. ১৪ - ১৫।

১২. The New Encyclopaedia Britanica, Vol - 7, Page- 457.

১৩. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ২৫।

১৪. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৫০১।

১৫. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ৪৬৫।

১৬. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ৫।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১১।

১৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ৪৮৪।

১৯. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ১৭।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

২১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৩৭১।

২২. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

২৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৭৫।

২৪. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ২০।

২৫. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, পৃ. ২১১।

২৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ২৯।

২৭. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৬৭।

২৮. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 137.

২৯. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজাপার্বণ, পৃ. ১৫১।

৩০. নির্মলেন্দু ভৌমিক, মেছেনি লোকনাট্যের সম্ভাবনা, লোকশ্রুতি, সপ্তম সংখ্যা, পৃ. ৯৬-৯৭।

৩১. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ১৭৫।

৩২. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, পৃ. ২৮৫।

৩৩. প্রফেসর বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান, পৃ. ১৭৫।

৩৪. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৮৮।

৩৫. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 144.

৩৬. W.W. Hunter, Statistical Account of Bengal, Vol-X, Page - 378.

৩৭. Sir James Jarj Frazer, The Golden Bough, Vol-I, Page - 248.

৩৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৯১।

৩৯. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 144.

৪০. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০।

৪১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৩৪৬।

৪২. Charuchandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page - 138.

৪৩. সুখবিলাস বর্মা, জাগ গান, পৃ. ২৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৪৫. মিহির ভট্টাচার্য সম্পাদিত, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ২৬৪।

৪৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ২৭৮।

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৪৮. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৫।

৪৯. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ২৮১।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

৫১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩১।

৫২. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ২৭৯।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৫৫. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ১৬৯।

৫৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী, লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে, পৃ. ২৪৪।

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩।

৫৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক, জলপাইগুড়ির লোকসংগীতের রূপরেখা, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩১৭-৩১৮।

৫৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।

৬০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১২৯।

৬১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, জনযোগাযোগ ঃ উত্তরবঙ্গের লোকনাটক, নকশিকাঁথা, পৃ. ৩৩।

৬২. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৯৫।

৬৩. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৭৮।

৬৪. শ্রী সুকুমার সেন সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-বিরচিত, চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ, পৃ. ১১১।

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৯।

৬৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩১।

৬৭. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ৩-৪।

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

৬৯. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার, পৃ. ৭।

৭০. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৬৪-৬৫।

৭১. শ্রীফণীগোপাল পাল, উত্তর বাঙ্লার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, পৃ.১৫৭।

৭২. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩২।

৭৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, পৃ. ৩৭।

৭৪. হরিপদ চক্রবর্তী, মালদহের গম্ভীরা ও আলকাপ, মধুপর্ণী, মালদহ জেলা সংখ্যা, পৃ. ৭৭।

৭৫. সুবোধ চৌধুরী, ডোমনি, পৃ. ৭০।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৮০. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ২।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৮২. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৪।

৮৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩৬।

৮৪. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৯১।

৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৮৬. সুখবিলাস বর্মা, কুশান গান, স্মারক পুস্তিকা, আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি, পৃ. অনুল্লিখিত।

৮৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, পৃ. ১৩৮।

৮৮. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, Vol-6 No. 1, পৃ. ১৮ - ১৯।

৮৯. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ১০৩।

৯০. সুকুমার সেন, নট-নাট্য-নাটক, পৃ. ১২।

৯১. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ৩৭৯।

৯২. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৬৬।

৯৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩১।

৯৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, দোতারার জন্মরহস্য, স্মরণিকা, লোকসংস্কৃতি উৎসব, পৃ. ১-২।

তৃতীয় অধ্যায়
উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে কাহিনিগত রূপান্তর

নাটকের মতো লোকনাটকেও কাহিনির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নৃত্য-গীত-বাদ্য-সংলাপ প্রভৃতি উপাদানগুলি এই কাহিনি বা বিষয়ের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে। এক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে যে, কোন কাহিনি বা ঘটনা গল্প বা উপন্যাস পড়ে পাঠক যতটা অনুভব করতে পারে, তার চাইতে মঞ্চে বা আসরে অভিনয়-গীত ও সংলাপের মাধ্যমে সেটি রসাস্বাদন করতে পারলেই সেই ঘটনার অভিঘাত দর্শক মনকে বেশি নাড়া দেয়। সেদিক থেকে লোকনাটকের কাহিনির প্রাধান্য এখানেই। কিন্তু কিছু কিছু লোকনাটকে খণ্ড খণ্ড কোন কাহিনি বা ঘটনা তুলে ধরা হয়। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ঘটনাযুক্ত লোকনাটকগুলিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকনাটকের পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করতে চাননি। তাঁর মতে, "গম্ভীরার গান সাময়িক ঘটনার পর্যালোচনা মাত্র, কিন্তু কোন আনুপূর্বিক ঘটনা (Theme) নিয়ে তা রচিত নয়। একমাত্র এই কারণেই তাকে লোকনাটকে অঙ্গীভূত করা যায় না।

আলকাপের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে তাই।... সুতরাং উপস্থাপনার মধ্যে লোকনাট্যের গুণ থাকা সত্ত্বেও তা-ও লোকনাট্য নয়।"[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি কেবল খন, পালাটিয়া এবং রঙ্ পাঁচালকেই একসময় গ্রামীণ লোকনাট্য হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তবে 'আনুপূর্বিক' কোনো কাহিনি থাকলেই তা লোকনাট্যের পর্যায়ে পড়বে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ উত্তরবঙ্গের এমন অনেক লোকনাটক আছে, যাতে আনুপূর্বিক কোন ঘটনা নেই। তা কেবল বিচ্ছিন্ন কাহিনি বা ঘটনার সমাহার। এ প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মিত্র যথার্থই বলেছেন, "...আদ্যান্ত কাহিনী না থাকলে নাটক (Drama) না হতে পারে, কিন্তু গ্রামীণ লোকনাটক হতে বাধা 'লোক' সমাজে হয় না। ঐসব পালার কোনো কোনোটায় খণ্ড-জীবনচিত্র বা সাময়িক ঘটনার খণ্ড-কাহিনী বর্ণিত হলেও সর্বস্তরের 'লোক'সাধারণ তার মধ্য দিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে থাকে।"[২] অর্থাৎ লোকনাটকের কাহিনির সার্থকতা জনমনোরঞ্জনের উপরেই অনেকাংশে নির্ভরশীল।

লোকনাট্যের উদ্ভব সূত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, গুহাবাসী গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাদের আনন্দ-বেদনা, আবেগ-উত্তেজনা প্রভৃতি ইশারা বা অস্ফুট ধ্বনির মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল। এরপর বেঁচে থাকার তাগিদে শিকারে সাফল্য লাভের আশায় এক অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নত করার মধ্যে এবং তাকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে শুরু হল রিচ্যুয়াল। বাস্তবে যা রয়েছে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা থেকে জন্ম হল অনুকরণমূলক নানা অভিনয়। তাই প্রথমদিকে রিচ্যুয়াল-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই প্রকাশ পায় নৃত্য-গীত-অভিনয়। এ ধরণের যাদু অনুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্মের যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লোকনাট্য সৃষ্টির প্রাক্‌মুহূর্ত থেকেই ধর্মীয় প্রভাবে বিকশিত

হয়ে আসছে। লোকনাটকের প্রাথমিক পর্যায়ের দিকে যদি আমরা ফিরে যাই তবে দেখব, বিভিন্ন যাদু ধর্মীয় আচার-আচরণ যেমন— ব্রত, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতীতির অস্তিত্ব। তাই আদিতে লোকনাটকের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছিল পুরাণ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদের ভাষায়, "মূলত পৌরাণিক কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই যেহেতু পাঁচালি গাওয়া হতো এবং 'মঙ্গল' গান গাওয়ার আসরেও উপজীব্য গল্পগুলি দেবমহিমাজ্ঞাপক হবার ফলে, তারাও আধা-পৌরাণিক অথবা, 'লোক পৌরাণিক' চরিত্রেরই ছিল, ফলে প্রথম আমলে লোকনাট্যধারাগুলিও প্রায় ব্যতিক্রমবিহীন ভাবেই ছিল পুরাণবৃত্তান্ত-নির্ভর।"[৩] আর এক্ষেত্রে সেইসব কাহিনিকেই বেছে নেওয়া হত, যেগুলির মধ্যে ভাব গভীরতা থাকে এবং যার মাধ্যমে দর্শক ও শ্রোতার মনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষা হয়। তবে এসব পুরাণ-মঙ্গলকাব্য নির্ভর লোকনাটকগুলি কোনদিনই ধর্মীয় আবেগসর্বস্ব হয়ে ওঠেনি। বলা যায় এতে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব কখনও স্থান পায়নি। উল্টে দেখা যায় জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এ সমস্ত বিনোদনে যোগ দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে। তেমনি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও দেখা যায় হিন্দুর পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও বহুকাল ধরে অভিনয়ে নিযুক্ত রয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে পৌরাণিক লোকনাটকগুলিতে পরিবর্তনের ছাপ তেমন পড়ে না। এই ধরণের মন্তব্য করেছেন লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, "বিষয়বস্তু তার মধ্যে অবিচল থাকে, চরিত্রগুলোর আচার-আচরণ তার মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে, এবং কাহিনীও তার অগ্রগতির ধারায় নতুন কোন পথ সন্ধান করে নিতে পারে না, একই পথে চলতে থাকে, তার ফলে তার মধ্যে ক্রমে প্রাণশক্তি লুপ্ত হয়ে যেতে থাকে।"[৪] এখানে উল্লেখ্য বিষয়বস্তু এর মধ্যে অপরিবর্তিত রইলেও কালের নিয়মে মানুষের চিন্তা-চেতনার সাথে সাথে এসব পৌরাণিক কাহিনির মধ্যেও বর্তমান নানা সামাজিক প্রসঙ্গ প্রবেশ করছে। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েই সাধারণের সুখ-দুঃখ ফুটে ওঠে। আবার অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় অভিনয় চলাকালীন চরিত্রগুলির মধ্যে সামাজিক চেতনা জেগে ওঠে অর্থাৎ সমসাময়িক বিভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যায়। আর তখনই পৌরাণিক বিষয়কে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন দিকগুলি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত মন্তব্য, "হরগৌরী সম্বন্ধীয় গ্রাম্য ছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রী-পুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সন্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।"[৫] তবে যে কথা তিনি ছড়ায় পৌরাণিক বিষয় বা চরিত্রের উপস্থিতি ও রূপান্তরের সম্পর্কে বলেছিলেন, তা লোকনাটকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এরপর ধীরে ধীরে পৌরাণিক কাহিনির পাশাপাশি সামাজিক কাহিনি স্থান পায় লোকনাটকে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচির বদল অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাই পুরাণ বা মঙ্গলকাব্যের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য লোকনাটকের বিষয় হিসেবে উঠে আসে সমাজ। তবে পৌরাণিক লোকনাটকগুলি এক্ষেত্রে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। এখনও স্বমহিমায় গ্রামাঞ্চলে এগুলি টিকে রয়েছে। পৌরাণিক পালাগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে যে বিষয়গুলি অর্থাৎ সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়া, সামাজিক জীবন প্রভৃতি তুলে ধরা সম্ভব হত না, তা নতুন করে রূপ পেল সমাজবিষয় নির্ভর লোকনাটকগুলিতে। কারণ "পৌরাণিক পালার মাধ্যমে নীতিবোধ, ন্যায়বিচার, ধর্মবুদ্ধি ইত্যাদি শেখানোর একটা ব্যাপার থাকে যদিও, তবু তার মধ্যেও সামাজিক অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধেও সূক্ষ্মভাবে প্রতিবাদ সূচিত হয়। আর যখন সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে পালা রচিত হয়, তখন প্রতিবাদটা অনেক স্পষ্ট এবং সরাসরিভাবেই ব্যক্ত হয়।"[৬] অর্থাৎ এসব বিষয় বা কাহিনির মধ্যে জনসাধারণ নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। কাহিনি ও চরিত্রের সাথে তারা একাত্মতা অনুভব করে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক বিষয় হিসেবে স্থান পায় অবৈধ প্রণয়, অসামাজিক কুৎসা প্রভৃতি। এ ধরণের লোকনাটকের কাহিনি বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "নাটকের বিষয়বস্তু গ্রামজীবনভিত্তিক; সেই বৎসর [পুরানো কোনো দিনের কথা নয়] সেই গ্রামে যেসব প্রণয়মূলক ঘটনা সংঘটিত হয়, নাট্যকাহিনীতে সঙ্গীতে সংলাপে নৃত্যে তারই রূপায়ণ দেখা যায়।...কাহিনীগুলো গ্রাম্য নরনারীর একান্ত প্রেমের অভিজ্ঞতাভিত্তিক, বিশেষত সে প্রেমের কাহিনী সত্য হয়েও যদি অবৈধ কিংবা অস্বাভাবিক হয় তবে তা আর বেশি উত্তেজনা এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করে।"[৭] তাই পালাটিয়া, চোর-চুন্নি, গম্ভীরা, খন, আলকাপ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজকে কেন্দ্র করে সামাজিক বিষয়, যেমন- দাম্পত্য কলহ, কুৎসা প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল।

বর্তমানে এসব ধারাতে বেশ কিছুটা রূপান্তর এসেছে। শুধু সামাজিক বিষয় নয়, রাজনৈতিক ঘটনাও স্থান পেয়েছে লোকনাটকের বিষয় হিসেবে। কখনও কখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হয়ে প্রচার কাজে আসরে নেমেছে লোকনাটকের দলগুলি। একসময় এই লোকনাটকগুলি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে সমাজের বিভিন্ন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হত। কিন্তু এখন তা কেবল ইতিহাস মাত্র। পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে পড়ে এগুলি ক্রমশ প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে। সংবাদ পরিবেশনে লোকনাটকের ভূমিকা অনন্য, তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রভৃতি এক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। উৎস থেকে আজ পর্যন্ত লোকনাটকগুলি অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে বহু পথ অতিক্রম করে এসেছে। তাই অনিবার্যভাবে এগুলির মধ্যে এসেছে নানা রূপান্তর। এই রূপান্তর মূলত দু'ভাবে হয়ে চলেছে— ক) কালিক, খ) স্থানিক। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকনাটকগুলিতে যে রূপান্তর দেখা যাচ্ছে, তা কালিক বা কালগত রূপান্তর। সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা যেমন— সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন এর মূল উপজীব্য। আবার লোকনাটকগুলিতে স্থানগত যে রূপান্তর লক্ষ করা যায় তা স্থানিক বা স্থানগত রূপান্তর।

এক্ষেত্রে স্থানভেদে একই সময়ে একই ধরণের লোকনাটকের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকনাটকগুলিতে যে ধরণের রূপান্তর ঘটে চলেছে তার মধ্যে অন্যতম কাহিনিগত রূপান্তর। স্থান-কাল ভেদে লোকনাটকগুলির কাহিনি বিবর্তনের ধারায় যেভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে, তা সত্যিই লক্ষণীয়। আলোচনার সুবিধার্থে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি যেমন— মালদহের 'গম্ভীরা', উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'খন', দার্জিলিং-এর 'নটুয়া', জলপাইগুড়ির 'পালাটিয়া' এবং কোচবিহারের 'কুশান' লোকনাটকে কাহিনিগত যে রূপান্তর ঘটে চলেছে নিম্নে তা আলোচনা করা হল—

গম্ভীরা ঃ

চৈত্র সংক্রান্তির শিবের গাজন বা লৌকিক সূর্যোৎসবকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এখন বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পূর্বে গম্ভীরা উৎসবে মূলতঃ দুটি অঙ্গ লক্ষ করা যেত— ক) পূজা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, খ) বোলবাই বা গীতাভিনয়। পূজা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পড়ে ঘটভরা, ছোট তামাসা, বড় তামাসা, ফুলভাঙা, মশান নাচ, সামশোল ছাড়া, ঢেঁকিমঙ্গল এবং আহারা পূজার ব্রত পালন, মন্ত্র প্রভৃতি। অন্যদিকে বোলবাই বা গীতাভিনয় অনুষ্ঠিত হত আহারা পূজার দিন। তবে 'ঘটভরা' অনুষ্ঠানের দিনটি ছাড়া বাকি দিনগুলিতে পূজা, ব্রত পালনের পাশাপাশি নাচগান প্রভৃতি পরিবেশিত হত।

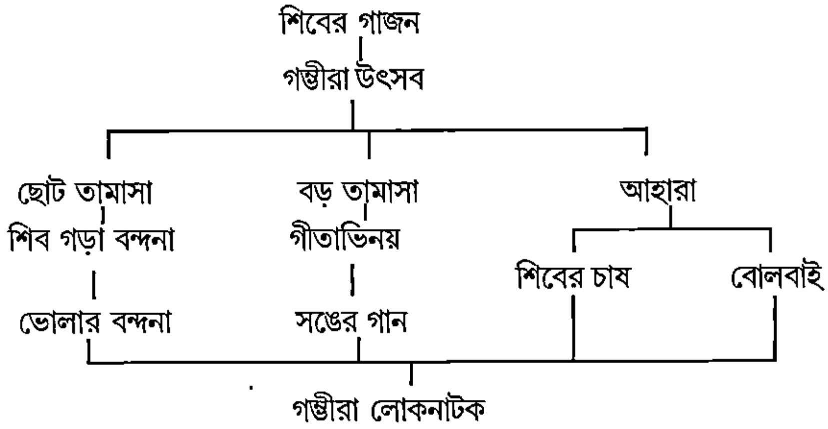

ছোট তামসার দিন শিব গড়া বন্দনা পাঠ করা হত বলে জানা যায়। এই সময় ভক্তদের কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হত। এই প্রসঙ্গে হরিদাস পালিত বলেছেন, "আরতির পূর্ব্বে বন্দনা পাঠকালে ভক্তগণকে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিতে হয় এবং প্রত্যেক বন্দনার এক এক অংশ উচ্চারিত হইলে, এক পদে দুই পদ অগ্রসর হইয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিতে হয়।"[৮] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এর মধ্যে নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত গম্ভীরার বীজ নিহিত ছিল। শিব গড়া বন্দনায় মূলত স্থান পেত সৃষ্টিতত্ত্ব। যেমন—

নমঃ শিবায়

(১)

"সৃষ্টি জলময় সংসার চিন্তিত ভগবান।
কি মতে ছিলে হে প্রভু হইয়া শূন্যাকার।।
কাঁকড়া সূতযোনি হেমের আকার।
কাঁকড়াকে করিল আজ্ঞা মৃত্তিকা আনিবার।।
কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা হেম পরিমাণ।
সেই ডিম্ব হইল দুইখান।।
কি মতে পৃথিবী সৃজন করিল ভগবান।
শিবনাথ কি মহেশ।"[৯]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে সৃষ্টি পুরাণের মিথকথা 'পৃথিবী সিজ্জন'- এর মতো টেল (Tale) উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে প্রচলিত আছে।

কিন্তু পরবর্তীতে শিব বন্দনায় ক্রমশ শিব-নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি স্থান দখল করে। যেমন—

"এই বুড়াটা দেবের হাটে, ভৃগুমুনির যজ্ঞপাটে
করিয়া যক্ষ রক্ষ সব স্বাপেক্ষ,
(সেখানে) দক্ষ রাজার মানটি কাটে।।
দাসে অভয় দিতে, শিবগাদিতে
বুড়া কখনো পাহাড়ে উঠে (ভাই রে)
সেখানে জুটিয্যা মাতাল,
পাহাড়্যা সাঁতাল
বেতাল গানের ঠাটেরে
কখনো শ্মশান ঘাটে লিচ্ছে হুদ্‌রা,
বিছানা, মরার গুদরি গুদরা,
এমনি খ্যাদরা ছি ছি রে।
বসে ফাঁকায় ভাঙ্গের বিচিরে।
এই বুড়া চাকলা ঠাকুর গোবর্দ্ধনে,
(ভাই) লোকের নাশিতে পাপটা,
কাশীতে বসে হাসির ছটায় দামিনী ছুটে।।"[১০]

আবার যে শিবকে কেন্দ্র করে গম্ভীরা উৎসব হয়, তাঁকে আসরে উপস্থাপিত করে এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করেই এক সময় শিব বন্দনা গাওয়া হল। ভক্তগণ শিবকে 'নানা', 'ভোলা' প্রভৃতি নামে ডেকে প্রতীকী সেই মহাশক্তির কাছে তাদের সমস্ত অভাব, অভিযোগ, সমাজের অন্যায় অবিচার ইত্যাদি তুলে ধরেন প্রতিকারের জন্য। শিব গড়া বন্দনা থেকে এই যে ভোলার বন্দনায় রূপান্তরের পথ চলা, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. ফণী পাল বলেছেন, "জনরুচি ও চাহিদার চাপে শিববন্দনা রূপান্তরিত হয়ে তা ভোলার বন্দনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। গম্ভীরায় শিববন্দনা ও ভোলার বন্দনা বস্তুত একই বৈশিষ্ট্যের সংগীত। তবে সময়ের পরিবর্তনে তাদের বিষয়, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে কিছু কিছু ভিন্নতা এসেছে। প্রাচীনকালের ভোলার বন্দনা ভাবের যে গাম্ভীর্য, চিন্তার গভীরতা, ভাষার পারিপাট্য ও দেবাদিদেব শিব-চরিত্রের যে গাম্ভীর্য বজায় থাকত ভোলার বন্দনায় সে গাম্ভীর্য থাকেনি। মহাদেব স্বয়ং ভোলানানা হয়ে তাঁর শাস্ত্রীয় আঁটোসাঁটো খোলস খুলে ফেলেছেন। দেবত্বের দূরত্বকে দূরে সরিয়ে নিত্য দিনের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন। গম্ভীরার লোকশিল্পীরা ভোলামহেশ্বরকে ভোলানানায় (দাদু) নামিয়ে এনে তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছেন।"[১১]

বড় তামাসার দিন অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান ছাড়াও যে সমস্ত নৃত্য-গীত-হত, তার মধ্যে রঙ্গ-তামাসা ছিল অন্যতম অঙ্গ। এই দিন অনুষ্ঠিত গীতাভিনয় সম্পর্কে হরিদাস পালিত বলেছেন, " বৎসর মধ্যে দেশে বা গ্রামে গুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ন্যায়বিগর্হিত হইলে তাহার গীত রচিত ও গীত হয়। একাধিক গায়কগণ একত্র অথবা পৃথক পৃথক, স্ত্রী-পুরুষে সজ্জিত হইয়া গীত গাইয়া থাকে। শিবের বন্দনা, ঠুংরি, চারিয়াড়ি, ইত্যাদি গান হইয়া থাকে।"[১২] দুপুরবেলা গম্ভীরা-মণ্ডপ থেকে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ঢাক সহ নৃত্য করতে করতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করত ভক্তগণ। আবার কোথাও কোথাও বড় তামাসার দিন সঙের গান বের করার রীতিও প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "সারা বছরের কোনো বিশেষ খবর, কোনো অন্যায় বা দুর্নীতির প্রতিবাদ এই সঙের গানের মাধ্যমে প্রচার করা হত। সঙের গানে পালাবদ্ধ কাহিনি থাকে না। ছোট ছোট স্তবকে রচিত সংবাদগুলো মূল গায়েন গেয়ে শোনাতেন। সহায়তা করতেন দোহারের দল। দলে দু'একজন 'ছোকরা' ও 'বিদূষক'ও থাকতেন। বাজনা থাকত অল্প। গম্ভীরায় গম্ভীরায় যেমন নির্দিষ্ট দিনে মুখা নাচ হত তেমনি বড়ো রাস্তার প্রধান প্রধান মোড়ে বা এলাকার বড়ো বড়ো বাড়িতে সঙের গান হত।"[১৩] তবে সঙের গান এখন অনুষ্ঠিত না হলেও এর পরিবর্তিত রূপ গম্ভীরার চার-ইয়ারী ও ডুয়েট সঙ্গীতে লক্ষ করা যায়।

আবার আহারার দিন সকালে কোনো কোনো অঞ্চলে 'শিবের চাষ' বলে একটি রিচ্যুয়াল প্রচলিত ছিল। এতে কৃষিকাজ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্মগুলি মোড়লসহ ভক্তেরা নৃত্য-গীত-বাদ্য-সংলাপ সহ সমবেতভাবে অভিনয় করত। এছাড়া বোলবাই নামে পালাধর্মী যে অনুষ্ঠান আহারার দিন অনুষ্ঠিত হত, তাতে সারা বছরে সংগঠিত কোন বিশেষ ঘটনা অথবা গান-ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে এ ধরনের কাজকর্মের নিরপেক্ষ

প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করত বোলবাই গান। বোলবাই গানের পরিচয় দিতে গিয়ে হরিদাস পালিত বলেছেন, "এই দিবস দুই তিন ব্যক্তির সম্মিলনে যে গীতাদি হয়, তাহাকে বোলাই বা বোলবাহি বলে, ইহার সুরও স্বতন্ত্র। ...যে বিষয় লইয়া গান আরম্ভ বা রচিত হয়, তাহাকে উক্ত গীতের 'মুদ্দা' বলে। প্রত্যেক গানের 'মুদ্দা' থাকা চাই, যাহার মুদ্দা ভাল তাহার গীতও ভাল। এ বৎসর ভূমিকম্প হইল, এই ভূমিকম্প অবলম্বনে একটি গীত রচিত হইল। অতএব এই গানের 'মুদ্দা' ভূমিকম্প। কোন 'খলিফা' অর্থাৎ গানাদি রচকের নিকট 'মুদ্দা' বলিয়া দিলে তবে খলিফা গীত রচনা করিয়া দেন। যে গীতের মুদ্দা স্ত্রী- পুরুষের বিবাদ বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার লইয়া, তাহার গীত রচনা হইলে লোকেরা স্ত্রী-পুরুষাদির বেশে সজ্জিত হইয়া আপন আপন অংশের অভিনয় করে।"[১৪] এই বোলবাহি গান তৎকালীন সময়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বোলবাই গানের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত ঘটনা জনসমক্ষে তুলে ধরা হত সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল নর-নারীর অবৈধ প্রণয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দোষীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করত বোলবাই গান। কিন্তু কেচ্ছামূলক এই পালাগুলির রচয়িতা ও অভিযুক্ত ব্যক্তিটির মধ্যে ক্রমশ বিরোধ দেখা যায়। এমনকি কোন কোন সময় তা আদালতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই এই ধরণের কেচ্ছামূলক ঘটনাগুলি গান থেকে বাদ দিয়ে বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতায় পরিবর্তন আনা হল। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ শহরের পাশাপাশি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে গ্রামীণ শিল্পীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এই সময় "শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক অ-নৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কভিত্তিক আদিরসাত্মক পালাগান পরিবেশনার মধ্যেই বোলবাহি পালার বিষয়বস্তুর পরিধি সীমিত রইল না। বোলবাহির পুরোনো বিষয়বস্তুর ওপর নতুন চিন্তা ভাবনার অভিঘাত দেখা গেল। সচেতন দর্শক পৃষ্ঠপোষক পালাকার গীতিকার গায়ক অভিনেতার সম্মিলিত প্রয়াসে নতুন নতুন বিষয় ও আঙ্গিকের অনুশীলন শুরু হল।"[১৫] স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও দেখা যায় স্থানীয় ঘটনার পাশাপাশি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা গম্ভীরা গানে স্থান করে নিয়েছে।

ড. প্রদ্যোত ঘোষকে অনুসরণ করে গম্ভীরা পালার বিষয়বস্তুর বিবর্তনকে কিছুটা সংযোজন করে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে—

সাল	← ১৯০০	১৯০১-১৯২০	১৯২১-১৯৪৭	১৯৪৮-১৯৬০	১৯৬১-১৯৮০	১৯৮১-২০০০	২০০১→
বিষয়	স্থানীয় খবর বা রিপোর্ট (কৃষি জন-জীবন বিষয়ক)	আধ্যাত্মিক বিষয়ক	আধ্যাত্মিক পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয়ক	সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রচারধর্মী বিষয়ক

সমসাময়িক বিষয়কে নিয়ে গম্ভীরা পালা রচিত হয় বলে প্রতিবছরই গম্ভীরার কাহিনি বিবর্তিত হয়। গম্ভীরার বিষয়বস্তুর এই বিবর্তন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক আর্য্য চৌধুরী বলেছেন, "আদিকাল থেকেই গম্ভীরা গান বা বোলাই প্রতিবছর নতুন করে রচনা করা হয়। গম্ভীরা গান পালা কোনো একটানা একই বিষয়বস্তুকে ধরে হয় না। ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো নানান ধরনের ঘটনাকে নিয়ে গান বাঁধা হয় আর তার সঙ্গে থাকে সংলাপ, অভিনয় , নাচ ও হাস্যরস ইত্যাদি।"[১৬] গম্ভীরা গানের প্রাচীনতম কিছু নিদর্শনে আধ্যাত্মিক বিষয় লক্ষ করা গেলেও মূলত সমাজজীবনই বারবার উঠে এসেছে। প্রথমদিকে স্থানীয় খবর, পারিবারিক কুৎসা প্রভৃতি পালাগানে প্রাধান্য পেত। গম্ভীরা গানকে এই ব্যক্তিগত কুৎসা, দলাদলির ক্ষেত্র থেকে বৃহত্তর সমাজ ও রাজনীতির জগতে ছড়িয়ে দেওয়ার পথিকৃৎ ছিলেন দু'জন গম্ভীরা শিল্পী মোহম্মদ সূফী ও সেখ সোলেমান। বলা যেতে পারে তাঁরাই প্রথম গম্ভীরার কাহিনিতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, "আদিতে সমাজের বা গ্রামের কোনো ব্যক্তিবিশেষের [প্রভাবশালী ব্যক্তিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য] ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হত। কারণ, সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেত। দূরবর্তী কোনো ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তু গানে জায়গা করে নেয়। এ- ধারার প্রবর্তক উক্ত মুসলিম রচয়িতাগণ। কারণ, হিন্দুর ধর্মীয় চৌহদ্দীর বাইরে তাঁদের যেতে অসুবিধে হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এর প্রবর্তনে তাঁদের সুবিধে হয়েছিল।"[১৭] উল্লেখ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে পট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মনেও দেশের পরিস্থিতি, সমাজ ও রাজনীতি ভিন্ন মাত্রা নিয়ে সামনে আসে। ফলে পরাধীন ভারতে ইংরেজদের অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন সমস্ত কিছুই গম্ভীরায় স্থান পায়। ইংরেজদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল গম্ভীরার কবি-শিল্পীরা। যেমন— ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গম্ভীরা শিল্পী মোহম্মদ সূফী কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।[১৮] তেমনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় সেইসময় গম্ভীরার বহু পালার অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বহু শিল্পীকে গ্রেপ্তার করাও হয়েছিল। যদিও "স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোথাও এঁদের নাম লেখা হয়নি, কিন্তু এঁদের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে, দেশের শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের গান ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখে নি। ১৯৪৪-৪৫ সালে মালদহের তাৎকালিক ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেট এইচ. এ. বার্ণওয়েল কবি গোবিন্দলাল শেঠ, মটরবাবুকে গ্রেপ্তারও করেন। মোহম্মদ সোলেমানও তাঁর এজলাসে কৈফিয়ৎ দিয়ে আসতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে পাঞ্জাবী জেলাশাসক সি. এস. কাল্হন সে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন।

শুধু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে নয়, স্বাধীনোত্তর যুগেও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গান করায় মটর, নিরু ও গোপীনাথের দল আক্রান্ত হয়েছে।"[১৯] অর্থাৎ এসবের মধ্য দিয়েই গম্ভীরা শিল্পীদের গণকবি

ও শিল্পী পরিচয় পাওয়া যায়। আবার অনেকক্ষেত্রে স্বাধীনোত্তর যুগে শিল্পীরা নিরপেক্ষভাবে পালা রচনা করতে পারে নি। সেক্ষেত্রে তাঁরা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছে। যাই হোক, বর্তমানে গম্ভীরা পালায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রশাসনের ভুল-ত্রুটিগুলিকে ধরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ সচেতনামূলক কাজকর্মের প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে। দেশ-বিদেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, পরিবার কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি গম্ভীরার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরছে গম্ভীরার কবি শিল্পীরা। ফলে স্থান-কালের প্রেক্ষাপটে গম্ভীরার কাহিনি হয়ে চলেছে রূপান্তরিত। কয়েকটি গম্ভীরার পালাগুলি আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। যেমন—

"তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর,
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।
লয়ে মদন রতির লাঙ্গল ঈশ, চাষ জুড়েছো জগদীশ
(তুমি) বিষম বেগে বিপুল বিশ্ব ঘুরাও নিরন্তর।
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণু কুমার বীজ-বুনানি মজুর তোমার
কতই না বীজ হয় না সুমার ওহে গঙ্গাধর।
তুমি বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভুগাও বিষ্ণু দ্বারা ফসল ফলাও
নিজে বসে ঠুম্‌রু তালে ডুম্‌রু বাজাও ঝম্‌রুতে গান ধরো।
মন আত্মা দুই বলদ বেঁধে, কর্ম জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়া রুজ্জু নাশায় ছেদে কতই না আর তাড়।"

এই গানটি মূলত আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ। ভারতীয় সভ্যতায় শিবকে কৃষিদেবতা রূপে অনুমান করা হয়। তিনি চাষীরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চাষ করে চলছেন অর্থাৎ চালাচ্ছেন। দুই বলদরূপ মন ও আত্মাকে বেঁধে সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করেছেন। সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলিকে এই মায়ার সংসারে প্রতিনিয়ত উস্কে দেন। সৃষ্টি থেকে ধ্বংস সবকিছুকেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তবু এ সংসার দিন দিন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কবির প্রার্থনা এই জগৎ সংসারকে রক্ষার দায়িত্বও যেন তিনিই নেন।

মোহম্মদ সূফী রহমান রচিত এই গানটিতে বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—

"চাচা জান বাঁচা দায় হলো বানে শহর যায় ভায়স্যা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগ্‌ছে দুয়ারে বইস্যা।।
ক্ষীরোদ সাহা, মহেন্দ্র শেঠে বাঁধলো বান বালুরঘাটে।
বাঁধ ভ্যাঙ্গ্যা ঢুকল বান, একজিবিশানের মাঠে।
মাঠে হুক্কা ভাসে; দেখে পোস্টমাষ্টার হাসে।।"

বন্যার কবল থেকে বড় বড় উকিল, মোক্তার, হাকিম, ডাক্তার কেউই বাদ যায়নি। সেই সময় বন্যা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ক্ষীরোদ সাহা ও মহেন্দ্র শেঠ নামে দুজন ব্যক্তি নিজেদের খরচায় বালুচরে বাঁধ বেঁধেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বাঁধ ভেঙে 'একজিবিশানের' মাঠে বন্যা ঢুকে পড়ে। এই ঘটনাই পালাকারেরা গম্ভীরা গানের রিপোর্টে পরিবেশন করেন।

পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চারদিক থেকে বহিঃশত্রুর আক্রমণে যখন বিপর্যস্ত প্রায়, সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের দুর্দিনের কথা তুলে ধরা হয়েছে গম্ভীরা গানে। যেমন—

"ভারতবাসী মোরা প্রজা তোরা রক্ষাকর্তা
যেমন পুত্রে রক্ষা করাই তাহার মাতা পিতা
(তোদের) গেল কোথায় পরাক্রম রক্ষা করতে অক্ষম
(সাহেব) আমরা হলে মুখ দেখাতে পারতাম না।
চিরকাল দুঃখে কষ্টে দেহ জর্জরিত
পরাধীন ভারতবাসী মোরা হায় কেঁদেছি নিয়ত
অবিচারের যূপকাষ্ঠের প্রাণ দিয়েছি কত কষ্টে
(সাহেব) তার ফল কি তোরা ভোগ করবি না।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই বিপর্যয়ের জন্য তাদের নিজেদের সীমাহীন লোভ, অহংকার, অনাচার-অবিচারকেই দায়ি করা হয়েছে। এই গানটিতে ইংরেজদের বিদ্রুপ করে পরাধীন ভারতবাসীর আনুগত্যের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে।

"খাদ্যের অভাব পড়েছে বাংলায় শুন পশুপতি
সেন্ট্রাল থেকে আনছে খাদ্য ঘুঁচাতে দুর্গতি। (শিব হে)
বাঁচাতে লোকের জীবন, সরকার করেছে রেশন
অনশনে মরবে না কেউ বাংলার।।
... ...
পাশ হচ্ছে হিন্দু কোড বিল আইন মজাদারী
ভাই বোনে সমান অংশ পাবে তাড়াতাড়ি। (শিব হে)
বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বলে স্বামী যাবে রসাতলে,
নারীরাই সুখ পাবে স্বাধীনতার।। (দেশে)
জমিদারী গেল আইনে জোতদারীও যাবে,
পাঁছাত্তরে কেমন বল তারা দিন কাটাবে। (শিব হে)"

এই সালতামামিটিতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে। বাংলায় চরম খাদ্যসংকট। খাদ্যাভাব দূর করার জন্য কেন্দ্র থেকে খাদ্য সরবরাহ এবং রেশন প্রক্রিয়া চালু অন্যতম পদক্ষেপ। স্বাধীনোত্তর ভারতে ব্রিটিশ আইন পরিবর্তনের জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে কংগ্রেস সরকার। সেইসময় হিন্দু কোড বিল আইন প্রণয়ন হয়। এই আইনানুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাই-বোন সমান অংশীদারী লাভ করে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন চালু হওয়ার সাথে সাথে নারীরা স্বাধীনতার সুখ ভোগ করে। জমিদারী প্রথা উঠে যায়, জোতদারী প্রথাও যাওয়ার পথে।

"হায়রে সখের সিনেমা, তোর অপার মহিমা,
এমন মনের খোরাক দেখে লাগে তাক
কি দিব তার তুলনা।।
(পায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিতুই ভজে যে জনা)
বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতা ছবিতে কহিছে কথা
অবাক চোখে সবাই দেখে উত্তম সুচিত্রা।
... ...
হায়রে সিনেমার নেশা সবাইকে করলে বে-দিশা
যুবক যুবতী কাঁচা পোয়াতি সবার ঐ দশা
বুড়া বুড়ি পুরুষ নারী কচি বাচ্চার দল ছাড়ে না।।
... ...
জ্ঞানী জন ভরেন জ্ঞান ভাণ্ডার অবুঝে শিখে ব্যাভিচার
হাঁসের মতন জুটে ক'জন বেছে নিতে দুধের সাত
দাস উপেন বলে করম ফলে বুক চাপড়ায় অন্ধ কানা।।"

এই গানটিতে সমাজজীবনে সিনেমার প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য ক্ষমতায় ছবি কথা বলে, তা দেখে সকলের চোখে লাগে ধাঁধা। সিনেমার নেশা যুবক-যুবতী, পোয়াতি, বুড়া-বুড়ি, নারী-পুরুষ, কচি-বাচ্চা কাউকেই ছাড়ে না। সিনেমা সভ্যতা আমাদের রুচি সংস্কৃতি সমস্তই ব্যাপকভাবে গ্রাস করছে। তবে সিনেমা দেখার মধ্যে সুফল-কুফল দুটোই আছে। প্রকৃত জ্ঞানীরা তা থেকে জ্ঞান আহরণ করেন, আবার অবুঝ লোকেরা তা থেকে শেখে ব্যাভিচার। কিন্তু এ ধরনের জ্ঞানী ব্যক্তি আর ক'জনাই বা থাকে। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিনেমার কুফলই মাথা চারা দিয়ে ওঠে।

"১. রাশিয়ার অস্ত্র পাঞ্জাবে চালান সরকারী পাহারাতে
খালিস্থানীরা করছে ধ্বংস সেই অস্ত্রাঘাতে

শিশু নারী যুবা অগণন শিখে হাতে হচ্ছে নিধন
সরকার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে দিনে দিনে হত্যা বাড়ছে
পুলিশ পাহারায় ভাষণ বিলায় অপদার্থ সিদ্ধার্থশঙ্কর।

২. মোদের পুলিশের মত পুলিশ আছে কি কোন দেশে
হত্যা লুণ্ঠন দমন পীড়ন পরিণত অভ্যাসে
বিহার, আসাম, উড়িষ্যা জুড়ে লক আপেতে পিঠিয়ে মারে
মানুষের চক্ষু উৎপাটন, দলবদ্ধ হয়ে নারী ধর্ষণ
মোদের মন্ত্রীগণ চালায় শাসন এই পুলিশেই করে নির্ভর।

৩. গণতন্ত্র নয় দলতন্ত্র চলছে এই ভারতে
খুনী গুণ্ডা লম্পট চিটার ঢুকছে সব দলেতে
দাদাদের মদতের জোরে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ঘুরে
দলের নির্বাচনের তরী বাহিতে এরাই যে কাণ্ডারী
ব্যস্ত বিলাস ব্যসনে প্রমোদ ভ্রমণে ভারতের মন্ত্রীপ্রবর।"

গানটিতে দেখি সমসাময়িক পরিস্থিতিতে রাশিয়ার মদতে পাঞ্জাবে অস্ত্র পাচার মুসলিম ও শিখের দাঙ্গাকে আরও উস্কে দিয়েছিল। পাশাপাশি দেশের অন্যান্য প্রান্তেও খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ বাড়তে থাকে। সেই সময় আমাদের দেশের মন্ত্রী ও পুলিশের অকমর্ণতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। ভারত গণতন্ত্রের নামে দলতন্ত্র সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। খুনি, গুণ্ডা, লম্পট, চিটাররাই দলের নির্বাচনের কাণ্ডারী। অন্যদিকে মন্ত্রীরা কেবল বিলাসব্যাসনে প্রমোদ ভ্রমণে ব্যস্ত।

"শুন হে মিনিষ্টার
দ্যাশে বাড়াইস না আর,
ঘিনাহা সংস্কৃতির আবর্জনা
(কইরছে) বিদেশী কোম্পানী
করছে কাপরা টানাটানি।
খুইল্যা লেওয়ার আগে ফুর্তি করহে মানা।
... ...
সেন্সার বোর্ডের বুদ্ধির গুণে
তোর দপ্তরের আইন-কানুনে,
সুস্থ মানুষের মাথায়

কইরছে ছ্যানা

চলে দূরদর্শনে রোজ নামচা

বসে দেখি চোখে ব্যাইন্যা গামছা।"

এই গানটিতে দেশে যে অপসংস্কৃতির চর্চা চলছে তার বিরুদ্ধে ক্রমশ জমে থাকা ক্ষোভ উগরে দেওয়া হয়েছে। বিদেশী কোম্পানীর অর্থ সাহায্যে চলছে আমাদের দেশের তথ্যসংস্কৃতি। তাই সবকিছু জেনেশুনেও নীরব ভূমিকা পালন করতে হয় দেশের মানুষকে। সেন্সার বোর্ডের ছাড়পত্রে বিকৃত রুচিগুলিকেই চোখ বুজে মেনে নিতে হচ্ছে। এছাড়া বিজ্ঞাপনও নারীদেহ প্রদর্শনে রমরমা কারবার করছে। এর ফলে যুবক থেকে বৃদ্ধ এই বিকৃত রুচির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। সুস্থ সংস্কৃতি চিন্তার অবসর পায় না মানুষ।

গানটিতে দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাবার আশায় নানা শিবের শরণাপন্ন হয়েছেন। যেমন—

"আরে ঘুষখোর সমিতি সংগঠন আজ ভারতে জোরদার

ঐ পুলিশ ডাক্তার অফিসার মাস্টার (শিব হে)

এই সমিতির মেম্বার হে

মোটা টাকা ডোনেশন দিলে বিদ্যালয়ে সিট মেলে

ও ঘুষ ছাড়া হাসপাতালে রক্ত মিলবে নাকো ভাই হে।

আরে বাহাতের মন্ত্র রে আর ব্যাঙ্ক থেকে ব্লাডও রে

এই জনসেবার নামে করে গরীব শোষণ

(শয়তানরা) এই জনসেবার নামে করে গরীব শোষণ।"

৫৭ বছরের স্বাধীন ভারতে ঘুষখোর সমিতি-সংগঠনগুলি ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল প্রায় সব জায়গায় ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। শিক্ষায়তনগুলিতে ডোনেশনের নামে মোটা টাকা ঘুষ নেওয়া হয়। হাসপাতালগুলিতে চলে ঘুষের রমরমা কারবার। সেখানে জনসেবার নাম করে চলে গরীব শোষণ।

খন ঃ

খন লোকনাটক অগ্রহায়ণ-চৈত্র মাসে অথবা যে কোন অবসর সময়ে অভিনীত হলেও পূর্বে কিছু কিছু অঞ্চলে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন খন পালা অভিনয় হত। লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের দেশি-পলি-রাজবংশী সমাজে দুর্গাবলী গান তথা নৃত্যগীত প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "... 'খনগান' হচ্ছে উৎসবের গান, উৎসবকালের গান, অবসর-অবকাশ বা বিরামকালের গান; মালদহের গাজোল থানায় এই গানকে 'খোজাগরি', 'খজাগরি', 'কোজাগরি', খন গান বলা হয়। কোজাগরী-পূর্ণিমায়

লক্ষ্মী পূজার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মেলার আয়োজন থাকে বা 'মেলা বসে'; বেশ কিছুকাল আগে, এই উৎসবের সময় 'খন' গান অনুষ্ঠিত হত।"[২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে দেবী লক্ষ্মী প্রতিটি বাড়িতে ঘুরে ঘুরে জাগ্রত লোককে আশীর্বাদ করে যায়। তাই এই রাতে সকলের জেগে থাকার রীতি রয়েছে। কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রি জাগরণের সময় মানুষ উৎসব আনন্দে মেতে উঠে নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। সেই অনুষ্ঠানই হয়তো ধীরে ধীরে পালাধর্মী অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল। খন গানের আদিরূপ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অখণ্ড দিনাজপুর জেলায় বোলোভাই, লবকুশ, গোষ্ঠ, খোশোমামি-ডেবরা, লগ্নি প্রভৃতি লোকগান একসময় বহুল প্রচলিত ছিল। যদিও এখন তা বিলুপ্তপ্রায়। এগুলির মধ্য দিয়েই খনগান পরিপুষ্টি লাভ করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ এই গানগুলিতে বিষয়রূপে নির্বাচন করা হত পারিবারিক-সামাজিক সমস্যা সংঘাত, অভাব-অনটন, নরনারীর প্রেম প্রভৃতি বিষয়। একটি বোলোভাই গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হল—

"পাথ্‌রাজ নদীর আইচ্চে বে
কান্তাই বেচা নাও
বোগ্‌-বগিয়া দাড়িয়া ফেলাইচে
লাম্বা লাম্বা পাও
তাক্ দেখিয়া চমকিচে তাজিমের মাও
আলুয়া তাংকু
তুষের আগুন মজা লাগাইচে
তাজিমের মাও পাটংগাত পাইচে।"[২১]

গানটি হাস্যরসপ্রধান হলেও এর মধ্যে স্বর্ণকার ও কর্মকারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চালচিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া দিনাজপুরের অন্যতম প্রাচীন লগ্নি গানেও দেখা যায় নর-নারীর প্রাকৃত প্রেমের ছবি।

"চালের টুহিত্ ঘুঘুর গে বাসা
মোর পিরতি জ্বালাভাসা গে নাগরি
নাগরি হাসিয়া মন্ মোর পাগলা লো
ওরে আটার বন্ধু পাটা গে বাড়ি
দুরের বন্ধু আশা ধারী গে নাগরী
নাগরী হাসিয়া মন মোর পগ্‌লালো
ওরে হাওদা দেখে হাতি কান্দে-রে মাহুত
সাজে কান্দেরে ঘোড়া

এমন সাধের হাতি কিনম রে

আসাম দেশে রে যাইয়া"[২২]

তবে এই গানগুলি থেকে সরাসরি খন গানের উৎপত্তি হয়নি। দিনাজপুর জেলায় হুলির গান, নটুয়া, চোকচুন্দি প্রভৃতি গানও প্রচলিত ছিল। যেমন, নটুয়া গানে—

"একদিন মালু দুদিন মালু
মারিয়া মারিয়া নতুর পালু
হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া না ফেলালু
আণ্ডির দশা মোকে কলু
এ হে রে হে শ্রীমতি হাসি হাসি লুঠ করেছে বারে
ঘুরাই ফিরাই লাগত বারে
একদিন দুদিন মালু
এ হে রে হে গমর গমর চাল মাইট
গমর গমর চাল
মাঝ হাটত যাই
হাত খপ ফের কেটাই
ধমশ করি বসে
আধখান ঢুকিলে মাইট কেকের মেকের করে
গটায় ঢুকিলে মাইট ফেকেত করি হাসে।
এ হে রে হে মোক মালু ভালয় কলু
ভাঙিলু হাতের শাঁখা
ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেক গোলামের বেটা
কাহাক নাগিল টাকা।"

সংগ্রহসূত্র ঃ খুশী সরকার, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর।

আবার 'চোকচুন্দি' গানেও দেখা যায়—

"হায় হায়—
চিংরিট মারে জাংগুয়া কাখর
আসিয়াট করে লটর গে পটর
চিংরিট মারিল কইনার হুরারে

আসিয়ার ভাঙ্গিলু কুশিয়ার খুয়া দাত

হায় হায় - আসিয়ানী -

মোর ভাঙ্গিলু তুই.কুশিয়ার খুয়া দাত

তোর পিছা করিম মুই কালীর বাজারটাত।”

সংগ্রহসূত্র ঃ খুশী সরকার, কুশমন্ডি, দঃ দিনাজপুর।

আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে এই গানগুলি বিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে নবরূপ লাভ করেছে। খন গান এই গানগুলিরই বিবর্তিত প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। খন গানের বিবর্তনকে এভাবে দেখাতে পারি—

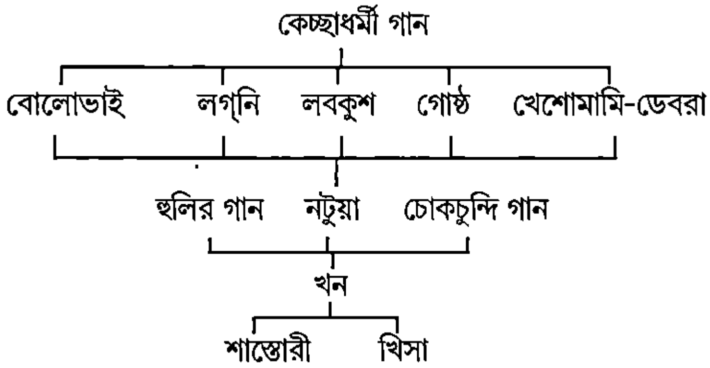

খন পালার বিষয়বস্তু সমাজে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনা থেকে নেওয়া হয়। তবে এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রেমই মূল উপজীব্য। যেহেতু আঞ্চলিক অর্থে ‘খন’ হল কেচ্ছা বা কাহিনি। এক সময় গ্রামাঞ্চলে আনন্দ বিনোদনের জন্য নতুন নতুন খন গান তৈরি হত। খন গানের বিষয়বস্তু চিরন্তন পরিবর্তনশীল, তা সত্ত্বেও দেখা গেছে পুরনো খনের পালাগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মাহাত্ম্য। আনুমানিক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে উত্তরবঙ্গে ভাগবত চর্চার প্রসারের সাথে সাথে সমাজে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী গুরু অর্থাৎ গোঁসাই-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। সমসাময়িক পালাগুলিতে শাস্ত্রবিষয়ক তর্ক আলোচনা লক্ষ করা যেত। আবার কোনো কোনো পালায় গ্রামীণ জীবনে গুরুদের ভণ্ডামি ও নষ্টামি প্রতিফলিত হয়। যেমন— বর্মোশরী। কিন্তু কেবলমাত্র ধর্মীয় বিষয়ের প্রাধান্য থাকায় শাস্ত্রীয় খন পরের দিকে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। অন্যদিকে খিসা খনে অসামাজিক কাজকর্ম, অবৈধ প্রণয় প্রভৃতি বিষয় স্থান পেত। ফলে এক সময় শাস্ত্রীয় খনের জায়গা দখল করে খিসা খন। এর পেছনে কারণ অবশ্যই রয়েছে। এ যুগের মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, অলৌকিক ভাবের জগৎ থেকে বাস্তবতায় প্রত্যাবর্তন। পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রের কাহিনির অসারতা বারবার তা প্রমাণ করেছে। সেই সময় পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্রের চেয়ে সমাজে প্রতিফলিত বাস্তবতা তাদের কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছিল। এদিকে সমাজের গোঁসাই অর্থাৎ বৈষ্ণব গুরুর পদমর্যাদাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে বসেছে। তাই শাস্তোরী

খনের গান আজকের দিনে আর তেমন শোনা যায় না। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয় রয়েছে। কিছু কিছু খন পালা এখনও জনমানসে সমাদৃত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. শিশির মজুমদার বলেছেন, "প্রতি বছরই গ্রামে গ্রামান্তরে নানান খণ্ড হয়। তা থেকে নির্বাচিত খণ্ড নিয়ে 'খন' তৈয়ারি হয় বছর বছর... এক বা একাধিক। নতুন 'খন্' পুরোনো 'খন' এর স্থান দখল করে।... পুরানো খন যে সবসময়ই একেবারে বাতিল হয়ে যায়, তা নয়, নতুন খনের পাশাপাশি বহু পুরানো খনও এই সময় শোনা যায়। পুরানো খন-এর অস্তিত্ব নির্ভর করে তার জোরালো কাহিনী, নাটকীয়তা ও গঠনপদ্ধতির ওপর। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ঢাকোশোরী' পালা উল্লেখযোগ্য।"[২৩] কিন্তু খিসা খন অর্থাৎ সমাজের যে কোন সমস্যা নিয়ে রচিত পালাগুলি এখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। শুধু তাই নয় খন গান এখানেই থেমে থাকেনি। খন গানের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পেছনে মূল কারণ ছিল সমাজজীবন নির্ভর সত্যমূলক স্থানীয় ঘটনা, যা নিয়েই খন পালা লেখা হত। এইসব সত্যমূলক ঘটনার মধ্যে কলঙ্কজনক ঘটনার প্রাধান্যই বেশি। ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিকে শাস্তি ও লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় সেই খনটি অনুষ্ঠিত হত। তাতে করে সেই ব্যক্তি লোকসমাজে নিদারুণ অপমানের মুখোমুখি হতেন। আবার যখন সমাজের কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি এর শিকার হতেন, স্বভাবতই তিনি সেই পালা বন্ধ করার জন্য তৎপর হতেন। এভাবে আইন ও পুলিশ বলে বেশ কিছু খন পালা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[২৪] মামলা মোকদ্দমাও চলেছিল বহুদিন। অনন্যোপায় হয়ে লোকশিল্পীরা খনে আনলেন পরিবর্তনের ধারা। এক্ষেত্রে ঘটনা অপরিবর্তিত রইল কিন্তু চরিত্রগুলির নাম বদলে দেওয়া হল। এ ধরণের খনগুলি হল, সাইকেলসরী, হেজাকসরী, কারেন্টসরী প্রভৃতি। এর ফলে লোকশিল্পীরা দুটো দিক সমানভাবে বজায় রাখতে পারলেন। এক. কাউকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করাও হল না। দুই. সমাজের অসামাজিক ও অনৈতিক কাজকর্মগুলি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হল। খন লোকনাটক শুধু প্রেম-প্রীতিতে আবদ্ধ থাকেনি, সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা তুলে আনার পাশাপাশি অন্যায়-অধর্মের বিরুদ্ধে নৈতিক বোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, কুসংস্কার রোধ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি গণচেতনামূলক খনও লিখিত হচ্ছে। তবে গত শতকের ৯০-এর দশকের পর থেকে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খন গানের বিষয়বস্তুতে বিবর্তন লক্ষণীয়। সামাজিক, রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপের মুখে পড়ে লোকশিল্পীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদী রূপটি দিন দিন স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে খন পালা লিখিত হয়।

'মায়্যাবন্ধকী' পালাটি বহু প্রাচীন পালা। তৎকালীন সমাজে বৈষ্ণবধর্মের হরিনাম মন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার, গুরু সেবা প্রভৃতি ছিল লোকজীবনের অন্যতম অঙ্গ। গুরু সেবা দেওয়ার জন্য রঙ্গিয়া কর্তৃক স্ত্রী কিরণকে বন্ধক দেওয়া সমাজের প্রাচীন দাস প্রথাকে মনে করিয়ে দেয়।

"রঙ্গিয়া ঃ কি আর শুনিবো রে কন্যা

মোর দুঃখের কথা

কথা কহিতে ওরে কন্যা

হিয়া যায় ফাটিয়া

পায় ধরিয়া কহিনু কথা

তবু ত বুঝে না

বড় দাদা হইয়ারে কন্যা

চাউল্লা নিলে কাড়িয়া

কিরণ, শুন মোরে কথা

তরে লইয়া যাম মুই বন্ধকী থুবা

অতয় করে বুঝানু তোক

তবু ত আর বুঝিলো না

গুরুর সেবা দিমরে কন্যা বন্ধকী থুইয়া।

কীরণ ঃ বাফো যুগে নাই শুনরে মুই

নয়া নয়া কথা

গুরুর সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া

কী শুনালেন স্বামী ওগে নয়া কথা

মায়াটাক বন্ধকী থুইয়া স্বামী

দেছেন গুরুর সেবা।" (মায়্যাবন্ধকী পালা)

মেয়েকে 'বন্ধক' বা বিক্রয় করার প্রথা একসময় বঙ্গীয় কৌম সমাজে প্রচলিত ছিল। অবিভক্ত দিনাজপুর জেলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই দাস প্রথা এখনও কিছু কিছু নিম্নবর্গীয় কৌম স্তরে রয়েছে। সেটা দারিদ্র কিংবা সামাজিক ব্যাভিচার যে কারণই হোক না কেন। জমিদার-জোতদারদের শঠতা লাম্পট্য, ছলনা, প্রতারণা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে এই পালায়। পাশাপাশি আদিম কৌম সমাজগুলিতে মাতৃতান্ত্রিকতার অবক্ষয়ের রূপটি স্পষ্টত চোখে পড়ে। গুরুসেবার নাম করে ধর্মীয় প্রভাব মানুষকে কিভাবে দুর্বল করে দেয় তার পরিচয় এই পালাতে পাওয়া যায়। সামাজিক অপরাধের বিচার হয় দশজনের সামনে অর্থাৎ গণ আদালতে। অর্থবানদের প্রভুত্ব সমাজের উপর থাকলেও সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের কাছে তারা নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গভীর প্রভাব এই গণ আদালতের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়েছে।

'তেভাগা' খনটি ১৯৪৫-৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। পরাধীন ভারতের জোতদার, জমিদার এবং সুদখোর মহাজনেরা কিভাবে দরিদ্র-ভূমিহীন কৃষকদের উপর অন্যায় অত্যাচার করত

তার পরিচয় পাওয়া যায় এই খনে।

"গাউন ঃ উচল-খাল কাটি মাহাজুন

জমিখান কনু বারা-বোট

ইখান জমি ও মাহাজুন

আধি ছাড়াইস না মোর

তোর মুই পা ধরুং মাহাজুন পা ধরং

পা ধরিয়া কহচুং মাহাজুন

না করিম এনং কাম

তোর জমি ছাড়া ও মাহাজুন

মুই কেনং করি খাম।" (তে-ভাগা খন)

তারা চিরকাল এই অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে যায় নি। ভূমিহীন কৃষক, বর্গা, মজুররা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠেছে। শুরু হয়েছিল মালিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে সংঘাত। কৃষকদের মধ্যে এই আন্দোলনের বীজ পুঁতে দিয়েছিল কিছু শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তি।

"বসন্ত ঃ উদাসু তোমাদের ঐ কর্জা ধান খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জমি আধি করবে জমির উপর তোমার সত্ব থাকবে। আধি করলে তুমি হবে অর্ধেক জমির মালিক। আধি জমির সত্ব তোমাদের আদায় করতে হবে।" (তে-ভাগা খন)

সমস্ত বিপদকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে কৃষকেরা সেই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার পাশাপাশি জমিদারী-জোতদারী প্রথা লোপ, ফসলের তিন ভাগ আদায় প্রভৃতি দাবি নিয়ে তারা আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যে অনেকে 'জেল ভরো' দাবিতে পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করে আন্দোলনকে বৃহৎ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হয়েছে।

'হাগড়ু-ভাদ্‌রী' পালাটি প্রেম-প্রীতি বিষয়ক সামাজিক পালা। ভাদ্‌রী ও হাগড়ুর বাবা-মা পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য চিন্তিত। সন্তান বড় হলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক পিতা-মাতার কর্তব্য। কিন্তু গ্রামের অর্থনীতি নির্ভর করে ফসল উৎপাদনের উপর। তাই ঐ বছর ফসল ভালো না হওয়ায় ভাদ্‌রীর বাবার পক্ষে বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে ভাদ্‌রী ও হাগড়ু পরস্পরের প্রতি আসক্ত।

"হাগড়ু ঃ (স্বগত) দেখু, কেবা ত সিনান কইরবা আলি। অয়ত এই পোখর খানতে সিনান করে। যাউ, দেখেই আসু।

(গান)

ঐ না কি করেছি ভাদরী বহিন

ঘাটে বসিয়া,

তোর রূপে মুই পাগল হয়্যা

বেড়াসু ভাসিয়া।।

তোকে না দেখা পাইনু মুই

ঘাটত আসিয়া।।'

ভাদ্‌রী ঃ (গোপনে) আচ্ছা ক্যামন পাগল হইচে। এর মনটা একনা পরীক্ষা করুতো।

(প্রকাশ্যে) হাগে দাদা, তোর কি লজ্জা শরম আছে কি নাইতে?

(গান)

ঐ না কুন কথা কহিনু দাদা

লজ্জায় কইলু না,

আমার বাবা জানতে পাইলে

জীবনে রাখিবে না।।" (হাগড়ু-ভাদ্‌রী পালা)

তারা সামাজিক বাধা, অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে উপেক্ষা করে বিয়ের জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পথে ঘুষড়ু ও দারোগা বাধার সৃষ্টি করে। শেষে লোকভয় ও আইনের তোয়াক্কা না করে তারা কালীমন্দিরে গিয়ে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

'সুখ ও শান্তির কথা' পালাটিতে দেখানো হয়েছে গ্রামের সাধারণ লোকেরা অসুখ-বিসুখে ঝাড়ফুক-মাহাতালিতে কতটা নির্ভরশীল। উপযুক্ত চিকিৎসা না করিয়ে এই সমস্ত জলপরা, তেলপরা, ঝাড়ফুক প্রভৃতির উপর নির্ভরতার ফল অনেক সময় মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

"শশধর ঃ হইলে নিতে কি। ঐ কলার ছুয়াটার অসুখ। খালি কান্দে আর কিছু খাবা চাহেনি, ঐ তাংনে মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা যাহুং। পাড়ার মানুষলা কহচে ভুত ধরিয়া-বাতাস ঠেকিয়া জলপরা, তেলপরা দিলেই ভাল হই যাবে।

শান্তি ঃ তমাক আর কত বুঝাব শশধর দা। তোক আর জলপরা আনিবা যাবা হবা নহা। মোর ঠিনা ঔষধ ছে- চল ছুয়াটাক ডাক্তারের ঠিনা নিগাই। ডাক্তারের ওষুধ খাইলে ভাল হই যাবে। এত দিন হইল ছুয়াটাক সাব সেন্টারত পাঠালু নি ইনজেকশান দিবা।

শশধর ঃ বহিন ঐলা কামা সর্বনাশ। ছুয়ার ইনজেকশান মোক খুবেই ভয় নাগে। বহিন তোর দোহাই নাগে- ছুয়াটাক ইনজেকশান দি ওযুধ দিস না। মুই গেনু মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা।" (সুখ ও শান্তির কথা)

এই পালায় শান্তিদিদি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। গ্রামের মানুষগুলিকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করতে পোলিও, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে সচেতনামূলক প্রচার করার উদ্যোগ নিয়েছে সে। সে জানে এসবের পেছনে মূলত অশিক্ষাই দায়ী। কেবলমাত্র একজন স্বাস্থ্যকর্মীই নয়, অভিভাবক হিসেবেও পুতুলকে সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। জন্ম ক্ষণ নথিভুক্তকরণ, বাল্যবিবাহ রোধ, জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলিও উঠে এসেছে এই খনে। 'কামেই মোর অধিকার' পালায় প্রচারধর্মীতা প্রাধান্য পেয়েছে। গ্রামে গ্রামে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত না থাকায় কাজের অভাবে বহু মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দেয়। অর্থাভাব, অন্নাভাব মানুষকে বাধ্য করে দালালচক্রের ফাঁদে পড়তে। সুযোগ সন্ধানী কিছু মানুষ তাদের ভিন রাজ্যে নিয়ে গিয়ে কমিশনে অর্থ লাভ করে—

"পাইকারু ঃ মানুষের কারবারি করি মুই ভালয় টাকা কামানু। ৫০ ঝন কামাইল নিগাই দিবা পারিলেই পাঁচ হাজার টাকা কামাই। পেলকা দিল্লী খাটিবা যাবার কাথা ছিল। পেলকা- পেলকা বাড়ি ঘরে ছিস।

পেলকা ঃ হে ছুং তো পাইকারু দা।

পাইকারু ঃ বিদেশ খাটিবা না যাবা চায়হালু।

পেলকা ঃ যাবা চায়হালু দাদা। আর যাবা হবা নাহা। হামার এত্তিনায় মেলায় কাম। সরকার হামার তাংনি ১০০ দিনের কাম দিয়া। বাড়ির কিছু জমি-জমা আর সরকারের ১০০ দিনের কাম, দিন চলি যাবে। দিল্লি খাটিবা যাবা হবা নাহা। আর একট খবর পানু, দিল্লি খাটা নোকলা বঁচেনি। মুরগির রোগের মতন টুপতে টুপতে মরি যাহা। দিল্লি খাটি হামার রতন মারা গেল। জানি শুনি নাই যাম দাদা মরিবা।"

(কামেই মোর অধিকার)

কিন্তু ভিন রাজ্যে গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের দিন কাটাতে হয়। সেখান থেকে ফিরে আসে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে। এদের মধ্যে অনেকের মৃত্যুও হয়। অমানবিকতার চরম নিদর্শন এই মানুষ কেনাবেচার দালাল। তাই অর্থাভাবে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেওয়া রুখতে সরকার থেকে ১০০ দিনের বরাদ্দ কাজের জন্য জবকার্ড বিতড়ন করা হয়। এই ১০০ দিনের বরাদ্দ কাজের প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের অনেক দারিদ্র পরিবারের আর্থিক সুরাহার পাশাপাশি গ্রামগুলোও উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে। লোকসাংবাদিকতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই পালাটি।

নটুয়া ঃ

তরাই অঞ্চলে জিতুয়া অষ্টমীর দিন বিভিন্ন ধরনের রঙ্গ-তামাশার গান প্রচলিত। এর মধ্যে অন্যতম ছিল কলসী বা টেমকীর গান। একে কেলাচাও বলা হত। সমাজে ঘটিত নানা ঘটনা তুলে ধরা হত এই গানে।

৫-৭ জন মিলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুখে মুখে এই ধরনের গান গাইত। যেমন—

"বাঘ ভাই বাঘ ভাই ডাকি তুমাকে হে
ওরে এই নিদানে নাই আসিলি
লইজ্জা হোবে তোরে
ওরে মিছাতে গেনু মুই রাজাডার বাড়ি
মুই তো মারি রে গেছু দুরি।"

সংগ্রহসূত্র ঃ খাদা সিংহ (৬৭), ডোহাগুড়ি
মোড়, অধিকারী, খড়িবাড়ি।

কলসীর গান ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে শাস্তোরী ও অশাস্তোরী রূপ ধারণ করে। পুরাণ ও বিভিন্ন শাস্ত্রাদি থেকে বিষয় নিয়ে রচিত হয় শাস্তোরী পালা। আর সমাজের নানা কুৎসা কাহিনি প্রভৃতি সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত হয় অশাস্তোরী। এই কেচ্ছাধর্মী গান থারো হুলি নামেও পরিচিত। যেমন—

"তোর সইডা মরিয়া গোছোই মুই হইচু বেনিয়া
এলা নাগে ওগে সই মুই যেই ঢেনার ঢেনা
মাওরিয়া ছুয়াডার কাহাইতে
দিন মোর যাছে গে নিছুহো
হাতের কামলা সই মোর হাতে না আসে
প্রাণ মোর রাখি দিছু কনেক আলিঙ্গন দিয়া
জন্মের মতন সই গে হয়া
ওকি ওহো মরি হে
ওকি হায়রে মরি হায় হায় রে।"

সংগ্রহসূত্র ঃ তারন সিংহ (৫৬), ডোহাগুড়ি
মোড়, অধিকারী, খড়িবাড়ি।

অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরবঙ্গেও ভাগবতের শাস্ত্রীয় প্রভাব পড়ার সাথে সাথে লোকাচার, ব্রতকথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ এসেছে। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত পড়ুয়া গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে এই তরাই অঞ্চলে। অনুমান করা যায়, পরবর্তীতে থারো হুলির মত গানগুলিতে ভাগবতের প্রভাব পড়েছিল। যদিও এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধা-কৃষ্ণের চাইতে লোকায়ত রাধা-কৃষ্ণের প্রাধান্যই বেশি। তাই নটুয়ার উদ্ভব প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে —

জিতুয়া অষ্টমী
|
কলসী/টেমকির গান

শাস্তোরী — অশাস্তোরী/কেচ্ছাধর্মীগান
|
থারো হুলি
|
নটুয়া

রাধা-কৃষ্ণ এখানে একেবারে লৌকিক। বিরোথ ও কুঞ্জ — এই দুটি পর্যায়ে নটুয়ার অন্তর্ভুক্ত হলেও স্থান ও কালভেদে এর বিষয়ে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তবে এই দুটি পর্যায়ে বিরহের সুরই প্রধান।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে উপজীব্য করে 'নটুয়া' পালা রচিত হলেও এর মধ্যে কাহিনিগত বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণবিচ্ছেদে রাধার বিরহ বেদনা বিরোথ পর্যায়ে অধিক প্রতিভাসিত হওয়ায় এই পর্যায়ের জনপ্রিয়তা অসীম। তুলনামূলকভাবে কুঞ্জপর্যায়ে রাধার কুঞ্জ সাজিয়ে কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ভোগবাসনার প্রাধান্য। কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রাপ্তিই হল চরম সাধনা। এই সংস্কারের বশবর্তী হয়েই প্রথমদিকে কুঞ্জপালা অভিনীত হলেও বর্তমানে এই পর্যায়ের গান তেমন পাওয়া যায় না। কুঞ্জ পর্যায়ে পরস্ত্রী রাধা কুঞ্জ সাজিয়ে প্রতীক্ষারত। পরবর্তীকালে কিছু কিছু অঞ্চলে যে নটুয়া প্রচলিত ছিল তাতে যুবতী রাধার বালক স্বামী কৃষ্ণ। আবার কখনও রাধার দই-দুধের ভার বহন করে কৃষ্ণ রাধাকে প্রেম নিবেদন করছে। এখানেও রাধা কৃষ্ণের মামী। বিবাহিত স্ত্রী নন, তিনি কৃষ্ণের প্রেমিকা। যুবতী পরস্ত্রী রাধাই আবার কালের বিবর্তনে নটুয়া শিল্পীদের হাতে কৃষ্ণের মামী থেকে পরিবর্তিত হয়েছেন উধব-মাধবের মামীরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণের স্ত্রী হিসেবে। ফলে কাহিনিতে কিছুটা হলেও এসেছে রূপান্তর। যেমন, কৃষ্ণকে যেখানে বলতে শুনি—

"ভাল্ ভাল্ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহা নাই কাইন করিম তোরে।"

এখানে কৃষ্ণের সাথে রাধার প্রেম অবৈধ আবার পরবর্তীকালের নটুয়া গানে রাধার মুখে শুনি—

"খাটো খুটো বৃন্দাবনে,
ফুল তুলিবা গেনু তিনঝনে
ফুল তুলিতে হারানু স্বামীরে,
সায়া গেল মোর বৃন্দাবনে।"

উদ্ধৃতিটি থেকে বোঝা যায় যে, রাধা কৃষ্ণকে মনে প্রাণে স্বামী বলে গ্রহণ করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পৌরাণিক লোকনাটকের কাহিনির ক্ষেত্রে তেমন বিবর্তন লক্ষ করা যায় না। নটুয়া লোকনাটকও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। তবে নটুয়ায় ব্যবহৃত ফাকরি বা ধাঁধাগুলি প্রায় প্রতিবারই বদলে যায়। সমসাময়িক সমাজজীবনের বিভিন্ন ব্যবহারিক উপাদানগুলি এতে সজীব হয়ে ওঠে। রাধার বিরহের

সাথে একাত্ম হয়ে চরিত্রগুলি অনুরূপ কোন বেদনাদায়ক বিষয়েও চলে যায় অভিনয় চলাকালীন। এখানে উল্লেখ্য আদিতে নটুয়ায় হয়তো ফাকরির ব্যবহার ছিল না। এটি সম্ভবত পরবর্তীকালের সংযোজন।

এই 'নটুয়া' পালাটিতে কুঞ্জবান পর্যায়ের একটি গান তুলে ধরা হয়েছে।

"সরিষার ত্যালত্ দিয়া রাম

জুড়ি' গেইল্ বাতি।

সইন্ঝা করিতে আইলে এহো সইন্ঝা

... ...

কুঞ্জ না বান্দিয়া কুঞ্জের দেখে উপ।

কুঞ্জতে নিখিয়া দিলে চান্দ আর সুরজ।।

... ...

সোনারে আরুণী আধে গে, উপারে ঝাড়ুনী

উঠো আধে, বান্ধো কেশ;

বাহুড়ো আঙিনাখান গে।।"

শ্রীরাধা কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষায় সন্ধ্যাবেলায় কুঞ্জ তৈরি করে তাতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এরপর উঠোন ঝাড় দিয়ে সযত্নে চুল বেঁধেছেন। সখি ললিতাকে দিয়ে ফুল-পাতা এনে কুঞ্জ সাজিয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও কৃষ্ণ আর আসে না। রাধার এই কুঞ্জসজ্জা ব্যর্থ হল। এভাবেই এই গানটিতে শ্রীরাধার অন্তরের বিরহ প্রকাশ পেয়েছে।

"চোখ খাইলে বাপো মাও রে আরো টোলার লোক

ছোটো দেখে বিহা দিলে হে কোলের বালক।

স্বামীকে কোলে লয়ে গো চলিলাম বাজার

বাজারের লোক শোধাই গো, কে লাগে তোমার।

... ...

বাবাজীকে বলো গিয়ে গো কিনবে ধেনু গাই

সেও দুধায়া খিলায়ে আমি গো স্বামীকে বাঁচাই।।"

নটুয়ার এই পালাটিতে যুবতী নারী তার বালক স্বামীকে নিয়ে মহা বিড়ম্বনায় পড়েছে। স্বামী কোলে বাজার গেলে লোকে উপহাস করে। এহেন ভাগ্যের জন্যে সে পিতা-মাতা-প্রতিবেশীদের দোষারোপ করেছে। পিতার কাছে বালক স্বামীর ভরণপোষণের জন্য ধেনু গাই-এর আব্দার করে। সেই গাইয়ের দুধ দুইয়ে যুবতী জীবিকা নির্বাহ করবে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর শ্রীরাধার মতো 'নটুয়া'র রাধা দই-দুধের ভাণ্ড নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নৌকায় নদী পার হয়েছেন। নদী পার হবার সময় রাধা কৃষ্ণের মনোবাসনা জানতে পারে।

"কৃষ্ণ ঃ ভাঙ্গা নাহি টুটা নাহি বজরিয়া ভারি
হাতি ঘড়া পার করু তুই কতয় ভারি
কেশবা ছাড়িয়া রাধে গড়ায় চাপে বস
মুটে মুটে পানি ছেক লজ্জায় কেন মর
কাচলি চিড়িয়া রাধে গারিনু সকল
প্রাণ শান্তি হইয়া রাধে টুটে গেল জল্।

রাধা ঃ বহেরে দক্ষিণা বায় টলমল করে লাও
ডুবাইলো মোক আগম দরিয়ার জলে

কৃষ্ণ ঃ কোথা হইতে আইলো রাধে কোথায় তুমার ঘর
কিসের প্রসাদ আছে মস্তকের ওপর।

রাধা ঃ দহি আছে দুধ আছে খাওরে কানাই
সেই তুমার মনে আছে তাই তো হবার নাই।
পরের রমণী দেখিয়ে কানু জলে কেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায় কানু বেহা কেনেনি কর।

কৃষ্ণ ঃ ভাল্ ভাল্ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহা নাই কাইন করিম তোরে।"

বিনিময়ে রাধা তাঁর দুধ-দই সমস্তই কৃষ্ণকে প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু নিলাজ কৃষ্ণ তাতে রাজি না হলে ক্রুদ্ধ রাধা জানায় পরস্ত্রী দেখে কানু কেন জ্বলছে, সে নিজেই তো কন্যাপণ জোগাড় করে বিয়ে করতে পারে। 'নিজের জান ভাঙ্গায়' অর্থাৎ টাকা উপার্জন করে কন্যাপণ জোগাড় করা। বহু প্রাচীনকাল থেকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বা আদিম কৌম সমাজে কন্যাপণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু অলস কৃষ্ণ জানিয়ে দেয় যে তাঁর ভাগ্যে বিবাহ নেই, তাই সে রাধাকেই তাঁর উপপত্নী করবে। সেই রাধাই পরে কৃষ্ণ প্রেমে পাগল। কৃষ্ণের বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গমন রাধাকে বিরহিনী করে তোলে।

কৃষ্ণের বাঁশি রাধার মনকে উত্তাল করে তোলে। দূরদেশে গেলে কৃষ্ণকে সর্বদা মনে পড়বে বলেই রাধা কৃষ্ণের মোহনবাঁশি নিজের কাছে রাখতে চান—

"রাধা ঃ তোমা যাবেন দূর দ্যাশে প্রভু হামার পড়িবে ধান্দাওয়া
তোমার হাতে মোহন বাঁশী রাখি দেহ বান্দাওয়া

গীত ঃ মাওরে হনু আমনার মন্দিরের ঘর

রুমুনী রে রুমুনী গেল হারায়।

রাধা ঃ আয়রে আয়রে হাঙেশা পুছ তোরে জ্ঞান

দুঃখতে পড়িয়া হারানু বুদ্ধি আর জ্ঞান।

শিবকো দুয়ারো মে ইরঙ্গ বেরঙ্গ ফুলও

হে শিবো মুই হারানু কলার হায়রে স্বামীধন।"

কৃষ্ণকে হারিয়ে রাধার জ্ঞানবুদ্ধি সমস্তই লোপ পেয়েছে।

আবার কখনও দেখি শ্রীরাধার আক্ষেপ ছোট বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছে, কি করে সে শ্বশুর বাড়ি যাবে—

"গীদাল ঃ বাপো মায়ে নাহি বুঝে ছোটতে বেচিয়া খাচে

কেমনে যাইমু শ্বশুরালী গো

বয়স হল মোর লবীন।'

বৃন্দাবনে ফুল তুলতে যাওয়াই তাঁর কাল হল।

"গীদাল ঃ খাটো খুটো বৃন্দাবনে, ফুল তুলিবা গেনু তিনঝনে

ফুল তুলিতে হারানু স্বামীরে, সায়া গেল মোর বৃন্দাবনে।"

তিনি কৃষ্ণকে চিরকালের জন্য হারিয়ে ফেললেন। তখন উধব-মাধব মামী রাধার দুঃখ দেখে মামা কৃষ্ণকে খুঁজতে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়—

"উধব-মাধব ঃ মামি তোমা কান্দেন নি। হামা দোনোঝন যাছি মামাক অনষেবার।"

এখানে উধব-মাধব চরিত্র দুটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'বড়াই'- এর ভূমিকা পালন করেছে। যৌবন জ্বালায় অস্থির রাধা কৃষ্ণ বিহনে একা থাকতে পারছেন না—

"গীদাল ঃ এখেতো আন্ধার রাতি

একাশরে রহালনি যায়, ওহে পরভুজি

হায় দেখি মোর কপাল লেখারে

জার গেল মোর কাপড়া বিনে

একাশরে রহালনি যায়

গোকুলা নগরে, ওহে পরভুজি।"

কৃষ্ণবিরহে শীত চলে যায় বিনা কাপড়ে। স্বামী ছাড়াই যৌবন চলে যাচ্ছে।

পালাটিয়া ঃ

পালাটিয়া লোকনাটককে আমরা এখন যে রূপে দেখতে পাই পূর্বে তা ছিল না। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অন্যতম প্রাচীন ঢাকের গানকে লোকনাট্যের পূর্বতন রূপ বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ময়নাগুড়ি অঞ্চলের অন্যতম গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক দীনেশ রায়ের কাছে সংরক্ষিত ড. চারুচন্দ্র সান্যালের একটি অপ্রকাশিত গানের তালিকা থেকে জানা যায় উত্তরবঙ্গের প্রাচীন গান ঢাকের গান। ফাল্গুন পূর্ণিমার দোল বা হুলি উৎসবে ঢাক বাজিয়ে ছোট ছোট পালা অভিনীত হত। এই হোলি গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল 'বড় লম্বা আকারের একধরনের ঢাক'। ঢাকটি এতটাই বড় যে দুজনকে সেটি বয়ে নিয়ে বেড়াতে হত। তাই একে সাঙি ঢাক বলা হত। সাঙি ঢাক বাজিয়ে খোলা মঞ্চে পরিবেশন করা হত ঢাকের গান।[২৫] হোলি উৎসবে এই ঢাকের গান পরিবেশিত হত বলে এর অপর নাম ছিল হোলির গান। হুলি গান 'হোলিকা' উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কালক্রমে হুলির গান স্থানীয় ধামগুলিতে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। হুলির গান উপলক্ষে রাজবংশী সমাজে বিচার ব্যবস্থার প্রত্নরূপ আজও লোকনাট্যের রূপে পরিবেশিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিচার করলে হোলি গানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — সরু ও মোটা হুলি। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকও হোলির গানকে দু'ভাগে বিভক্ত দেখেছিলেন—"তিস্তার পূর্ব পাড়ে বিশেষত ধূপগুড়ি থানায় হোলির গানকে সরু ও মোটা দুইভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। বিশেষণ দুইটি লক্ষ্য করিলে বোঝা যায় ইহার দ্বারা গানের কোনো নির্দিষ্ট সুর বা কোনো রচনারীতি নির্দিষ্ট হইতেছে না। ইহা বিষয়কে নির্দেশ করিতেছে।"[২৬] মোটা হুলির গানের বিষয়বস্তু প্রেম এবং তা আদি রসাত্মক। তবে এখানে কেবল অবিবাহিত যুবক-যুবতীর প্রেমই নয়, অবৈধ প্রণয়ও স্থান পেয়েছে। আবার স্থানবিশেষে মোটা হুলির গানগুলিকে 'ভেড়া ছুবার গান' বলা হয়ে থাকে। তবে সেক্ষেত্রে গানগুলি খুবই অশ্লীল। মোটা হুলির উদাহরণ—

"বাপ-মড়াটার মুখত্ লইজ্জা নাই ,
ভাই-মড়াটার মুখত্ পড়ুক ছাই।
বিহোর ব'স মোর চলিয়া যা'ছে
ব্যাচেয়া খালেক্ নাই।।
বাপমড়া, তোক ভাত আন্দিয়া দিম্
দনো হাতে খাইস;
এক নোটা জলের বাদে
মোক যদি ডাকাইস—
ও মুই শুনিয়া শুনিবা' না হওঁ
বাপমড়া, অধিক ডাকালে
টেঁটোয়ারা ধরিম্ টিপিয়া।।

ওকি ও মরি রে,

মাটির দেহা মাটিয়ে খাবে

'—' ভাতারটা নগদ্ যাবে;

বাড়ির চেঙ্গেড়ার মন আখিলে

কত নাম করিবে।।"[২৭]

অপরদিকে সরু হুলি গানে স্থান পায় বৎসরের বিভিন্ন স্থানীয় ঘটনা ও কলঙ্কজনক কাহিনি। যেমন—

"ও হে কলিকালের চেংড়িলা

উমাক কিছু ভাই না যায় কহ্য

সাজনি সাজেছে কেমুন রে

গাউনের ছকরা।

হাতত্ নিছে একটা রবাটের ঝলা

ও কিরে দারুণ বিধাতা

উমাক কিছু ভাই না যায় কহ্য।"

(সংগ্রহসূত্র ঃ ভবেশ রায় (৬২), কুকুরজান, জলপাইগুড়ি।)

এই পর্যায়ের হুলি গানে ছোট ছোট পালা ও কিছু গান পরিবেশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সামাজিক প্রণয় কাহিনি। সরু হুলির গানগুলি মনে রাখার জন্য অনেক সময় লিখে রাখা হত এবং সংলাপ অংশ আসরে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করা হত। খাতায় লিখে রাখার কারণে এর নাম হয়েছিল খাতা হুলি। খাতা হুলির পালা স্থানবিশেষে বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঙ্গুয়ার পালা, ঘরজেয়ার পালা, দুই সোতোনী, সাদা বাউরা প্রভৃতি। হুলি গানে গীদাল ও দোয়ারী গান এবং সংলাপের মাধ্যমে পালাটিকে উপস্থাপিত করে। এই পর্যায়ের হুলি গানগুলি কাহিনি ও সংলাপ যুক্ত হয়ে ক্রমপর্যায়ে পাটপালা এবং পালাটিয়া পালায় রূপান্তরিত হয়েছে তা নিম্নে দেখানো হল—

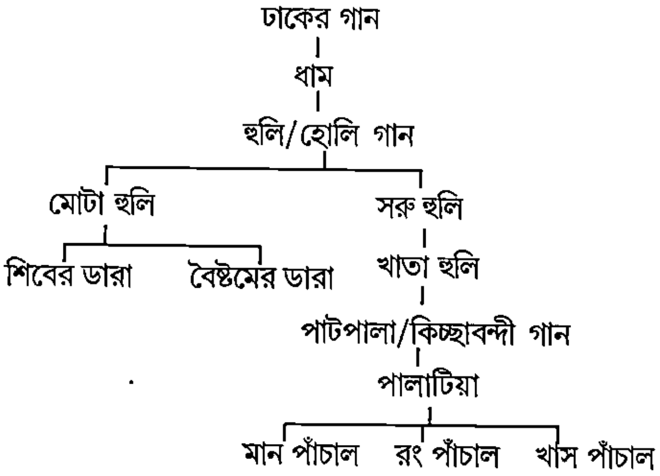

সরু হুলি থেকে খাতা হুলি এবং খাতা হুলি থেকে পাটপালা বা কিচ্ছাবন্দী গানের উদ্ভব হয়েছে। কিচ্ছাবন্দী গানে পালাগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এক একটি পালা প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যেত। এই গানগুলিতে সমাজের অর্থাৎ স্থানীয় অঞ্চলের 'কিচ্ছা' অর্থাৎ প্রচলিত লোকগল্পগুলি পালার আকারে পরিবেশিত হত। পরবর্তীকালে এই কিচ্ছাগানে বিভিন্ন বিষয় অর্ন্তভুক্ত হয়ে পালাটিয়ায় পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। পালাটিয়া গান সম্পর্কে এই অঞ্চলে একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, সেটি হল—

'পালাটিয়া হুলির গান
চেংরালার হোলেক মান।'

এ থেকে পালাটিয়া সঙ্গে হুলি গানের একটি সম্পর্কসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

পালাটিয়া গানের আদিপর্বে সমাজে ঘটিত কলঙ্কজনক কাহিনি, অসামাজিক প্রেম ইত্যাদির পাশাপাশি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনি সমন্বিত মানপাঁচালীর পালাগুলি গ্রাম্য সমাজে বহুল পরিমাণে সমাদৃত হত। কিন্তু যত দিন গেছে আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে ইতিহাস, পুরাণ বা শাস্ত্রের আলোচনা ক্রমশ তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তার জায়গা নিয়েছে রং পাঁচাল ও খাস পাঁচাল। এই পালাগুলিতে ব্যক্তিগত কুৎসা, অবৈধ প্রেম, অসামাজিক কর্ম প্রভৃতি অভিনয়ের মাধ্যমে আসরে সমবেত গ্রাম্য সমাজের সামনে ফাঁস করে দেওয়া হত। এতে করে সমাজের সেই ব্যক্তিকে চরম হেনস্থার মুখোমুখি হতে হত। খন লোকনাটকের মতই পালাটিয়াতেও মামলা মোকদ্দমা চলার ফলে বহু পালার অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাই পালাটিয়াকে টিকিয়ে রাখতে লোকশিল্পীরা ঘটালেন রূপান্তর। কাহিনি একই রেখে অথবা কিছুটা পরিবর্তন করে পালা পরিবেশন করলেন। গিল্টিমিঞা ভেজালশ্বরী, হ্যাজাকবাবু মেন্টালশ্বরী প্রভৃতি পালাগুলি এর উদাহরণ। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে দীর্ঘদিন ধরে যে ডাঙ্গুয়া প্রথা, ঘরজেয়া প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় পালাটিয়ার প্রথম পর্বে। এছাড়া এখানকার সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জোতদারী ব্যবস্থা, জমিদারী ও মহাজনী ব্যবস্থাও উঠে এসেছে পালাটিয়ার পালায়। পরবর্তীকালে অবশ্য পালাটিয়া কেবল সামাজিক বিষয়েই আবদ্ধ থাকেনি, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও এতে স্থান পেয়েছে। যেমন, ভেস্টেশ্বরী পালা। শুধু তাই নয় পালাটিয়ার মাধ্যমে পরিবার কল্যাণ, জনশিক্ষা প্রসার, সমাজ সচেতনামূলক বিষয়গুলির প্রচার কার্যও চালানো হয়েছে।

'কাঙ্ভাঙ্গা-ঢেঙপাড়ীর পালা'য় কাঙ্ভাঙ্গা নামে এক যুবক দেউনিয়াগিরি শেখার জন্য জালু দেউনিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হয়। 'দেউনিয়া' শব্দের অর্থ গ্রামের বা পরিবারের কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি। জালু দেউনিয়া একজন বড় দেউনিয়া ও ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। গুরুর বাড়িতে থেকে কাঙ্ভাঙ্গা দেউনিয়াগিরির পাঠ নেওয়া শুরু করে। কিন্তু জালু দেউনিয়ার স্ত্রী ঢেঙপাড়ী অর্থাৎ গুরুপত্নী শিষ্য কাঙ্ভাঙ্গার কাছে প্রেম নিবেদন করে—

"ঢেঙপাড়ী : (গান) ও মোর বাপোই রে,

নাজের কাথা কভা' না মনায়।

ধানটার পেট্‌ত চাউলটা বাপোই

জানে না আর কাঁয়।।

কি ভাগ্যের কপালের ফলে

নিধি মোক ছলিল্ কুন্ ছলে হে;

অন্তরে মোর অঘনি জ্বলে,

শাগে-ভাতে না মিলিলে—

পেট ভরে কি চুয়ার জলে?

শুনিয়া তোর গুরুজীর রাও

জ্বলিয়া উঠে মোর গাও;

তোর লাখা স্বয়ামী যদি পাওঁ —

এলাও মুই হবা' পারুঁ

সাত ছাওয়ালের মাও।।"

(কাঙ্গভাঙ্গা-ঢেঙ্‌পাড়ীর কথা— পালাটিয়া)

'চিন্তাশোরী' পালায় সদ্যবিধবা চিন্তাশোরীর রূপে মুগ্ধ ফাঁকতাল যে কোনো প্রকারে তাকে পেতে আগ্রহী। এই উদ্দেশ্যে সে নানারকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়। ফাঁকতালকে 'ডাঙ্গুয়া' করে নেওয়ার কথাও বলে—

"চিন্তাসরি ঃ গান

চিতুন বয়সে মোক আড়ি কন্নোরে

ও কি হায়রে নারায়ণ।

চিং ঃ দারুন বিধিরে ওরে কি দোসে

মারিলো মোর স্বামীধন

ওরে ধিক ধিক নারী এ ছাড় জীবন।

চিং ঃ দারুণ বিধিরে ওরে কি দোসে মারিলো স্বামীধন

ওরে স্বামীর শোগে মোর যাবে জীবন

ফাকতাল ঃ ডাকেছিৎ কান্দেছিৎ কেনে খালি দেহটাক ফুরালো একেলায় যদি অভা না পারিস তে ফাকতালটাক আনিয়া তুই ডাঙ্গুয়া

চিন্তাসরি ঃ হুই স্বামীটা ত মোর ঠিকে ভুত হইছে। অক যদি মুই না খেদাও তাহলে ত অত্তাচার

করিবে।" (চিন্তাশোরি পালা— পালাটিয়া)

রাজবংশী সমাজে এই 'ডাঙ্গুয়া' প্রথা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। 'ডাঙ্গুয়া' অর্থাৎ যুবতী বিধবার শক্তসামর্থ অথচ দরিদ্র যুবককে স্বামীরূপে গ্রহণ করার রীতি। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে ফাকতাল চিন্তাসরিকে স্ত্রীরূপে পায়না।

'দশ নম্বর আড়ি ঢেনা অধিকারী' পালায় গ্রামের এক সম্পন্ন জোতদার ও তার অধঃস্তন কর্মী মোড়লের চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। লোভী জোতদার ও তার মোড়ল বিধবা যুবতী ময়নার প্রতি আকৃষ্ট। ময়না এমন একজন বিধবা নারী যার নয় জন স্বামী গত হয়েছে। জোতদার ও মোড়লের মনোভাব বুঝতে পেরে সে দুজনকে জব্দ করার ফন্দি করে—

"জোতদার ঃ মোড়ল, তুই যদি ঐ চেংরিটাক নিয়া যাবার পারিস মোরঠে, তোর মাইনা বাড়ে দিম।

মোড়ল ঃ মাই, একটা কাথা।

ময়না ঃ কি কাথা।

মোড়ল ঃ তোক নিবার খিব পাগলা জোতদারটা। তুই কি নিবু।

ময়না ঃ তালে ওহো পাগলা, তোহও পাগলা। তো দ্যাখেক ভাই মোর একখান কাথা। পরীখ আছে যায় তোমরা ওই বাঁশানীতলার দিঘিটাত যায় ভেল্লা সমায় ডুবিয়া অভা পাবেন তাকে নিম।"

(দশ নম্বর আড়ি ঢেনা অধিকারী— পালাটিয়া)

জনৈক নেতা নামক ব্যক্তির বাঁশানীতলার দিঘিতে ডুবে থাকার প্রতিযোগীতা করতে গিয়ে যারপরনাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয় জোতদার এবং মোড়ল। সে সময়ের অবস্থাপন্ন জোতদারদের নৈতিক অধঃপতন এবং পরনারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি সাধারণ মানুষকে কিরকম বিড়ম্বনায় ফেলত তাই পালায় তুলে ধরা হয়েছে।

'পৈলসাঞ্জুর সংসার' পালায় গ্রামের বৃদ্ধ অধ্যক্ষ নাঠুয়া বিধবা আঙ্গাতির একমাত্র কন্যা মেনকাশ্বরীকে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে বুড়ির প্রাপ্য জি. আর ডবল করে দেয়—

"নাঠুয়া ঃ আঙ্গাতি বুড়িকতো এইবার ডবল জি.আর দিনু। দিনুতো ঠিকেই, দেখা যাওক। সঙ্গরাক আগত কও একটা বুদ্ধি করিবারে নাগিবে।

[চাক্কাউর প্রবেশ]

চাক্কাউ ঃ সঙ্গরা!— সঙ্গরা! বাড়িত আছেন না নাই।

নাঠুয়া ঃ কায় সঙ্গরা, আইস। মুই তোমারে কথা চিন্তা করেছো। আচ্ছা ভাই আগত বইস; একটা আরো ঘটনা; আঙ্গাতি বুড়ির যে বেটিটা আছে দারুণ ঢকরে ভাই।

চাক্কাউ ঃ কিতে নিবার চাছেন নাকি?

নাঠুয়া ঃ নিবার আরো কি, বিয়াওয়ে করিম। উয়ায় যেহেতু আকয়ারী মান্‌সি। উয়ারও মাথার জাবুরা ঘুচুক। সুখে খাবে, সুখে রবে। মোর কি কুনর অভাব আছে।

চাক্কাউ ঃ সঙ্গরা, তেমরা মারি ফেলালেন। পাটির যে যুগ, আরো হইসে যুব সংগঠন। এইটা কি কুনদিন হয়। তোমার বয়সে আর কইনার বয়সে এইটা কি আর বনে। আজিকালি যে যুব চ্যাংড়ালা খাড়ায় ধরি ফেলাবে।" (পৈলসাঞ্জুর সংসার)

কিন্তু পার্টির যুব সংগঠনের কথা মনে করিয়ে চাক্কাউ নাঠুয়াকে অন্যত্র মেনকাশ্বরীর বিয়ের ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়—

"চাক্কাউ ঃ অনেকখান ভোল বুদ্ধি খাটেবার নাগে। আগত ইয়াক ঘজ্জেয়া থুইয়া বিয়াও দেই। আগত একটা সাদাসিদা চ্যাংড়া দেখ ওইটাক ঘজ্জেয়া থুইয়া বিয়াও দিম। হুটাতো কাম কাজ করিবার না হয়। তারপর হামরায় না হুটাক নিকিলি দিম।

নাঠুয়া ঃ তারপর সেলা কি করিয়া সঙ্গরা? পারা যাবে তো? তোমরা যেইটাই করিবেন ওইটাই মুই রাজি। যাতে নেওয়া যায়।

চাক্কাউ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ মোর নাম চাক্কাউ, মুই কতজনকাক আঠারো চাকার রথ দেখাইছু, হিটাতো ক্ষুদ্র, সেলা মোরটা হবে তো।" (পৈলসাঞ্জুর সংসার)

চক্রান্ত করে পৈলসাঞ্জুকে 'ঘজ্জেয়া' অর্থাৎ ঘর জামাই করে রাখা হয়। বিয়ের পর পৈলসাঞ্জুর অসঙ্গত আচরণে রেগে গিয়ে আঙ্গাতি নাঠুয়ার কাছে নালিশ করে। নাঠুয়া ও চাক্কাউ এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। বলা মাত্র তারা এসে পৈলসাঞ্জুকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

"প্রধান ঃ মধুভাষি বাড়িত আছেন বাহে।

(মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ কায় ডেকাছেন? ও প্রধানদা তোমা, আইস, আইস, বইস।

প্রধান ঃ না না মুই এইঠে বসিবার আইসো নাই।

মধুভাষি ঃ খানিক তায় গুয়াপান খাও।

প্রধান ঃ দ্যাখেক মুই তোর ফাউকসালি কাথা না শুনো। বাকী খাজনার টাকালা কুনবেলা দিবু।

মধুভাষি ঃ প্রধানদা, মুই কোনঠে থাকি পাইসা দিম। মোরঠে তো এতলা পাইসা নাই। তোমরা মোক কনেক দয়া কর। মোক এইবেলা মাফ করি দেও।

প্রধান ঃ ঠিক আছে এমুন করি যেনং কবার ধচ্চিস, নে, এইবার তোর খাজনা মাফ। কিন্তুক মোর একখান শর্ত আছে।

মধুভাষি ঃ কেমুন শর্ত?

প্রধান ঃ ভালেদিন থাকি তোক দ্যাখেচু, তুই বড়ো দুখি মানষি। মুই-ও ভাই একেলা মানষি। তো মুই তোক নিবার চাছু। তুই মোরঠে আসিলে সুখত নবু। এলা তুই যদি রাজী থাকিস তাইলে তোর খাজনা মাফ করি দিম।"

(অতি চালাকের গালাত দড়ি)

'অতি চালাকের গালাত দড়ি' পালায় গ্রামের প্রধানের পরনারী লোলুপতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জমিজমা আত্মসাৎ করার প্রবণতা ফুটে উঠেছে—

"প্রধান ঃ চোকিদার মোর তো মনটা কছে সাদাসিদা এইঢক করি মানিবে না। উয়াক খানিক টাইট দিবার নাইগবে।

চোকিদার ঃ হুজুর, তায় কি করিবেন?

প্রধান ঃ মোর কতলা পাইসা নাই ফাকতে নিয়া নিলেক। একখান বুদ্ধি বার করির নাইগবে।

চোকিদার ঃ কি বুদ্ধি হুজুর?

প্রধান ঃ (কতখন ভাবিয়া) যা হাট-বাজারত ঢোল পিটি দেক—যায় বত্তা ঘোড়া এক কেজি পাল্লা দিয়া ওজন করিবার পারিবে তাক মুই অদ্ধেক সম্পত্তি আর মোর বেটিক দিয়া বিয়াও দিম। আর না পাইলে উয়ার যা সম্পত্তি থাইকবে তামান মোর নামে লেখি দেওয়া খাবে। (প্রস্থান)

(চোকিদার সেই নাখান ঢোল পিটি দিল)

চোকিদার ঃ শোনেন, শোনেন, শোনেন—হামার এই অঞ্চলত যায় একখান বত্তা ঘোড়া এক কেজি পাল্লা দিয়াওজন করিবার পারিবে তাক প্রধানের অদ্ধেক সম্পত্তি আর বেটিক দিয়া বিয়াও দেওয়া হবে। আর না পারিলে উয়ার যা সম্পদ থাকিবে তামান প্রধানের নামে লেখি দিবার নাইগবে।" (প্রস্থান)

(অতি চালাকের গালাত দড়ি— পালাটিয়া)

কুশান ঃ

কুশান লোকনাটকের কাহিনি মূলত রামায়ণনির্ভর তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এই রামায়ণ আমাদের দেশে বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত। আর্য সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ৫০০-৪০০ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের আর্য

জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অনার্যগোষ্ঠীর মধ্যেও রামায়ণ-মহাভারত জনপ্রিয়তা লাভ করে। যদিও মনে করা হয় রামায়ণ রচিত হওয়ার অনেক আগে জনজীবন ও সমাজে রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি লোককথারূপে প্রচলিত ছিল। রামায়ণে বিবৃত গার্হস্থ্য জীবনের চিরাচরিত সম্পর্কের মধ্যে লোভ-কুটিলতার দ্বন্দ্ব, রাজ্য ও রাজত্বের জটিলতা, বিয়োগান্ত পরিণাম প্রভৃতি সহজেই জনমানসের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল। তাই তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারের সাথে একীভূত হয়ে রামায়ণ বিভিন্ন রূপ লাভ করল। আদি কবির এই কাব্য যুগ যুগ ধরে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে নিঃসন্দেহে। আর তার প্রভাব পড়েছে পরবর্তীকালের শিল্প, সাহিত্য ও জীবনচর্চায়। পঞ্চদশ শতকে সেই সংস্কৃত রামায়ণকে বাঙালি জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃত্তিবাস রচনা করেন 'শ্রীরামপাঁচালী', তখন তার মধ্যে ফুটে উঠল বাংলার লোকায়ত জীবন। তবে কৃত্তিবাসের পূর্বে কামতা - কামরূপে রামায়ণ লেখেন মাধবকন্দলী। তাই কোচবিহারের লোকসাহিত্যে তাঁর প্রভাবই বেশি পড়েছিল বলে মনে করা হয়। মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনের ধাক্কায় রামায়ণ আর শিক্ষিত সমাজে স্থায়ী থাকেনি, তা ধনী-দরিদ্র, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে লোকায়ত জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আসলে বাঙালি জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এই রামায়ণ। এতেই বাংলার তৎকালীন লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল। কারণ রামায়ণ গেয়কাব্য বলেই পাঁচালি আকারে পূর্বে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আসরে পরিবেশিত হত। তাই রামায়ণ গান পরিবেশনের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের যোগ এখনও রয়ে গেছে।[২৮] এমনকি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেও "মনসার কাহিনী, ধর্মের কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী, ইত্যাদি দেশীয় বস্তু এবং রামায়ণ কাহিনী ও কৃষ্ণলীলা-কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক বস্তু ছোটবড় গানে অথবা পাঁচালীতে বাদ্য ও নৃত্যের যোগে পরিবেশিত হইত গ্রামোৎসবে অথবা দেবপূজা উপলক্ষ্যে দেবমন্দিরে।"[২৯] সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রামায়ণ পাঁচালি আকারে কতকটা কথকতার মতো লোকসমাজে স্থান করে নিয়েছিল। পরবর্তীতে রামায়ণ থেকে খণ্ড খণ্ড কাহিনি নিয়ে নৃত্য-গীত সহকারে অভিনীত হত। ধীরে ধীরে তার মধ্যে সংলাপ যুক্ত হয়ে লোকনাট্যে পরিণত হয়। তবে এই অঞ্চলের শুরুতে কুশান গানে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রভাব ছিল না। কোচবিহারের রাজসভায় অনুদিত রামায়ণ এবং লোকায়ত জীবনে প্রচলিত রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনি নিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছিল কুশান লোকনাট্য। নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, "...আখ্যানরসের দিক থেকে মধ্যযুগ থেকেই, বাঙালী রামায়ণকেই বেশী পছন্দ করে এসেছে। সে মধ্যযুগীয় কারণ তো আছেই, উপরন্তু আলোচ্য অঞ্চলের নিজস্ব সাংস্কৃতিক কারণও এর পেছনে কাজ করছে বলে অনুমান হয়। রামায়ণ সম্পর্কে শঙ্করদেবের ভূমিকার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু এও লক্ষ্যণীয়, আসামে 'অঙ্কীয়া নাটে'র মাধ্যমে রাম-রামায়ণের যে প্রভাব ও ব্যাপকতার সৃষ্টি তিনি করতে পেরেছিলেন, কোচরাজদরবার ছাপিয়ে সাধারণ লোকজীবনে তিনি কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।"[৩০] তবে পরের দিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা কুশান লোকনাট্য

স্থান করে নেয়। সুতরাং কুশান পালার উদ্ভব আমরা এভাবে দেখাতে পারি—

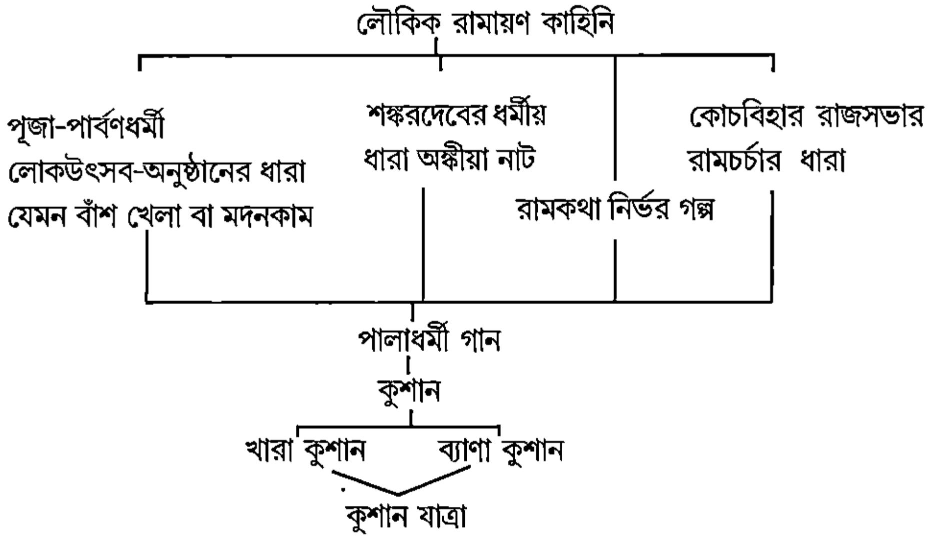

কুশান লোকনাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পয়ার ও সংলাপের মাঝে ফ্যাসা ও খোসার ব্যবহার। ফ্যাসা হল একধরণের খণ্ড কাহিনি। আর খোসা হল খণ্ড কথা বা গান। পৌরাণিক লোকনাটকগুলির মতো কুশানেও Dramatic relief দেবার জন্যই এই ধরণের ফ্যাসা বা খোসা গান ব্যবহার করা হয়। এগুলির মধ্যে যে খণ্ড খণ্ড কাহিনি পাওয়া যায় তা সমসাময়িক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করে। এগুলির উপর ভিত্তি করেই পালাগুলির প্রাচীনত্ব বিচার করা যায়। তাই কুশান গানের ক্ষেত্রে এই খোসা বা ফ্যাসাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কুশান লোকনাটক কাহিনির দিক থেকে তেমন পরিবর্তন না হলেও এই ধরণের খোসা বা ফ্যাসা গানগুলি সর্বত্রই পরিবর্তিত হয়। সংকলিত পালাগুলি আলোচনার মাধ্যমে রূপান্তরের বিষয়টি তুলে ধরা হবে।

কুশান লোকনাটকের 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' পালাটিতে কাহিনির দিক থেকে রামায়ণকে অনুসরণ করা হয়েছে। গঠনগত দিক থেকে দেখা যায় পয়ার রীতির ব্যবহার। মূল ও দোয়ারী মিলেই এই পালা পরিবেশন করেন। পিতার ব্রহ্মহত্যা পাপ স্খালনের জন্য রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন, লব-কুশ কর্তৃক অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বন্দী, লব-কুশের সঙ্গে যুদ্ধ, যুদ্ধে রামসহ চার ভাই-এর মৃত্যুবরণ, হনুমানের বন্দীদশা, রাম সহ সকলের পুনর্জীবন, সীতা ও লব-কুশকে ফিরে পাওয়া— এই নিয়ে এই পালার কাহিনি। যেমন—

"দেখ দেখিহে খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে।।
খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে রে।
বাজিয়া গেল রণ ঃ আরে।
ওকি দেখহে প্রথমেতে করে যুদ্ধ মুখে গালাগালি।

ওকি দেখহে দ্বিতীয়তে করে যুদ্ধ বাহু ঠেলাঠেলি।

ওকি দেখ হে তৃতীয়াতে করে যুদ্ধ বাণ বরিলন।

ওকি দেখহে পৃথিবীতে মহাশব্দ বানের গর্জন।।

ওকি দেখহে কুশের প্রধান বান বেড়াপাক নাম।

ওকি দেখহে সেই বান ধনুকেতে করিল সন্ধান।।

ওকি দেখহে মুহাপাশ বাণ তখন লবের মনে পড়ে।

সন্ধান করিয়া বাণ ধনুকেতে জুড়ে।।

ওকি দেখহে মুহাপাশ বান যেন যায় নানা ছন্দে।

ওকি দেখহে হস্তে গলে শত্রুঘ্নের অবশেষে বান্দে।।"

(কুশান — অশ্বমেধ যজ্ঞ)

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালায় পয়ার রীতি ব্যবহার করার পাশাপাশি এতে সংলাপের প্রবেশ ঘটেছে। বিভিন্ন চরিত্রের আগমন হয়েছে। মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদে রাবণের হাহাকার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাবণের যুদ্ধযাত্রা, শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীর খোঁজ, বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরোগন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসা, লক্ষ্মণের জীবন লাভ পর্যন্ত এর কাহিনির বিস্তার। যেমন—

"রাম ঃ ওহে মিত্র বিভীষণ!

এই ধনুর্বাণ তোমার করে করিনু অর্পণ।

ওরে তোরা সবাই মিলে জয়ধ্বনি দাও।

[রাম শেল উপড়িয়া লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলো]

ওরে অনুজ লক্ষ্মণ! একবার তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

গীত/৪

ও-ও-মোর গুণের ভাইরে, ভাই লক্ষ্মণরে!

কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।

মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।।

এনেছি সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের নিধি।

আসিয়া সাগর পারে বাম হইল বিধি।।

কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস।

সীতা উদ্ধারিতে আজি হইল সর্বনাশ।।

এনেছি সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের ধন।

কি বলিয়া নিবারিব মায়ের ক্রন্দন।।

পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।

বিধি বাদী হইল এই তাহে সর্বনাশ।।" (কুশান— লক্ষ্মণের শক্তিশেল)

'দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র' পালায় রামায়ণের হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি অনুসরণ করলেও মাঝে মাঝে খোসা গান ও ফ্যাসা ব্যবহার করা হয়েছে। পালাটিতে ইন্দ্রের রাজসভায় তালভঙ্গের অপরাধে নর্তকীদের ইন্দ্রের অভিশাপ, নর্তকীদের বিশ্বামিত্রের তপোবনে প্রবেশ ও লতাপাশে বন্দী, বন্দিনী নর্তকীদের মুক্ত করে হরিশ্চন্দ্রের উপর বিশ্বামিত্রের ক্রোধ, অযোধ্যাসহ সসাগরা পৃথিবী দান, দানের দক্ষিণা মেটাতে ভার্যাসহ নিজেকে বিক্রয়, পুত্র রুহিদাসকে সর্পদংশন, হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে শৈব্যার শ্মশানে মিলন-এই কাহিনির বিষয়বস্তুকেই নেওয়া হয়েছে।

এই পালাটির মধ্যে একটি ফ্যাসা বা উপকাহিনিও গড়ে উঠেছে। দুই ভাই ব্যাঘারু ও শ্যাকারু ঝগড়াঝাটি করে জোতদারের মধ্যস্থতায় আলাদা হয়। দুই ভাই-এর সম্পত্তি বলতে ছিল একটি সুপারি গাছ, একটি গাই আর এটি কাঁথা। এগুলিকে দুই ভাগ করে নিতে গেলে মহাসমস্যা বাধে। শ্যাকারু ব্যাঘারুর তুলনায় চালাক হওয়াতে সে আগেভাগে সুপারি গাছের উপরের অংশ, গরুর পেছন ভাগ ও কাঁথাটি রাতে নেওয়ার কথা জানায়।

"মূল : হ্যা ঐ গছটার দুইভাগ, গাইটার দুইভাগ, আর ঐ পুরান দাগিলাখান তো ভাগ করা না যায়, ছিড়িলে তোমরা কায়োয় পিন্দিবার পাবেন না। তায় দাগিলাখানক এবেলা ওবেলা করি তোমরা দোনোজনে পিন্দিবার পান।

ছুকরী : মুই তায় গছটার আগিলাখান, গাইটার পাছিলাখান আর দাগিলাখান রাতিত নিম।

মূল : কি ব্যাঘারু, তুই কি রাজি আছিস।

দোয়ারী : হ্যা দেউনিয়া, ও হোবে ভালা।

মূল : ঠিক আছে তায় ঐটায় কাথা রইল।" (সকলের প্রস্থান)"

(কুশান— দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র)

বোকা ব্যাঘারু এই তিনটি জিনিসের কোনটিও ভোগ করতে পারে না। শেষে প্রতিবেশীদের বুদ্ধিতে সে শ্যাকারুকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়। বেগতিক দেখে শ্যাকারু আবার জোতদারের শরণাপন্ন হয়।

"ছুকরী : দেউনিয়া মোর দাদা আজি আমার গুয়ার গছটা কাটির ধরিচে।গাইটাক কালি থাকি কোনোয় খোয়ায় নাই। আজি আরো মোর ভাগের দাগিলাখান ভিজি থুইছে। আরো কইলে কয় মোর ভাগেরখান মুই কি করিম না করিম তোক কি পুছিয়া করিম। তোমরায় এলা বিচার করেন।

মূল : হয় নাকি ব্যাঘারু। কাথাটা সচায়।

দোয়ারী : হু দেউনিয়া, কাথাটা সচায়।

মূল ঃ দ্যাখেক শ্যাকারু মোর তো এইটে কিছু কওয়ার নাই। তোমরায় এইঢক করি জিনিসলা ভাগ করি নিছেন। এলা এইলা তোমরাই বোঝেন। মুই গেনু। (প্রস্থান)

ছুকরী ঃ দা, মোর ভুল হয়া গেইচে। মোক মাপ করি দে।

দোয়ারী ঃ শ্যাকারুরে মোর ভাই, তোক মুই মাপ না করে রবার পাম।"

কিন্তু জোতদার আর সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি না হওয়ায় শ্যাকারু তার ভুল বুঝতে পারে এবং দাদার কাছে ক্ষমা চায়। এই উপকাহিনির মধ্য থেকে তৎকালীন সামাজের বিচার ব্যবস্থা জোতদারের মত সম্পন্ন লোকেদের হাতে ন্যাস্ত ছিল তা জানা যায়।

'হরিশ্চন্দ্রের দান' পালাটির বিষয়বস্তু একই হলেও এর মধ্যে রয়েছে খোসা গানের ব্যবহার।

"মূল ঃ স্ত্রী লইয়া যায় রাজা হাটের ভিতরে।
দাসী কে কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে।।
এক বিপ্র ছিল হাটে পণ্ডিত সুজন।
তার একটি দাসীর ছিল প্রয়োজন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মাইয়াক বেচি চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা পালুং।
মুনিবর তোমরা এইলা গ্রহণ করেন।

বিশ্বামিত্র ঃ রাজা, চাইর কোটি তো দিলু। আরো তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা যে বাকি আছে।

খোসা ঃ ও মোর কালারে কালা
ও পারে কালা বান্দিলুং বাড়ি
কলা গাড়িলুং কালা সারি সারি
কলা বাগিচায় ঘিরিয়া নিল মোর বাড়ি।
আগদুয়ারী কালা কুকুর ভোকে
মন কয় মোর যেন বন্ধু আইসে
দেখং বন্ধু মোর কার বা বাড়িত বইসে।
ও মোর কালারে কালা
সেদিন যাইম মুই বাপের বাড়ি
মইষা গাড়ি কিংবা গরুর গাড়ি
ভাই বোন মোর কান্দি রবে মোর সারি সারি
কুনদিন ফিরিয়া আসিম বা মুই বাপের বাড়ি
ও মোর কালারে কালা।" (কুশান— হরিশ্চন্দ্রের দান)

এই খোসা গানটিতে রয়েছে প্রিয়তমের আগমনের প্রতীক্ষা। নদীর ওপারে বাড়ি তৈরি করে আশায় আশায় দিন কাটাচ্ছে। বাড়ির চারিদিকে সারি সারি কলাগাছ গাড়ার ফলে কলার বাগানে ঘিরে নিয়েছে তার বাড়ি। বাড়ির সামনে কুকুরের অচেনা কাউকে দেখলে ডেকে ওঠা বারবারই তার প্রিয়তমের আগমনের উৎকণ্ঠা জাগিয়ে তোলে। এর মধ্য থেকে যেন গ্রাম-বাংলারই ছবি ফুটে উঠেছে। গরু বা মোষের গাড়িতে যেদিন সে বাপের বাড়িতে যাবে আনন্দে মন ভরে উঠবে। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় ভাই-বোনেরা তাকে চোখের জলে বিদায় দেবে। আবার কখনও দেখা যায়—

"খোসা ঃ বাপ কি এবার মঙ্গা গেল রে
আশ্বিন কার্তিক মাস
চোতুর্দিকে হাহাকার ঘরে ঘরে উপাস।
আইলের কচু খুড়িয়া খাইলেক কলার মুড়ার উষা
ভাইরে এইবার মরণ দোশা।
প্যাটের ভোকে বুড়ি সরি রে, হইলো সর্বনাশ ভাইরে
বাপ কি এইবার মঙ্গা গেল রে।" (কুশান — হরিশ্চন্দ্রের দান)

এই খোসা গানটিতে সেই বছরের মন্দার রূপটি উঠে এসেছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল ভালো না হওয়ায় চারিদিকে অন্নের হাহাকার। ঘরে ঘরে সবাই উপোস দিয়ে রয়েছে। পেটের খিদে মেটাতে গ্রামের প্রায় সবাই ক্ষেতের আলের ধারের কচু ও কলাগাছের মুড়ো খুড়ে এনে সিদ্ধ করে খেয়েছে।

'হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার শ্মশানমিলন' পালায় কাহিনির পাশাপাশি ব্যবহৃত খোসা গানটিতে নববিবাহিত দম্পতির একে অপরকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয়। সেই অবস্থায় দাদা এসেছে তার বোনকে দু'চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে। মন না চাইলেও তাকে যেতে হয়। সেজেগুজে দাদার সঙ্গে যাবার সময় বারবার পিছু ফিরে চায়। পান-সুপারির পোটলা বিছানায় ফেলে এসেছে বলে দাদাকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে বাড়িতে এসে স্বামীকে প্রবোধ দেয়।

" শৈব্যা ঃ কিন্তু এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াব প্রভু।
হরিশ্চন্দ্র ঃ তুমি, আমি, পুত্র রুহিদাস।
তিনজন করিতে হইবে কাশিবাস।।
চল, শৈব্যা আর দেরি নয় এই মুহূর্তে আমরা রওনা দেই। (রওনা দিল)
খোসা ঃ দিন চারিক প্রাণপতিধন ভাত রান্ধিয়া খান
দাদা আসছে নাইয়োর নিবার নাইয়োর যাবার চাং

বহুদিনে আসছে দাদা যদি বা না যাং গোসা হয়য়া
যাবে দাদা কাথাটা কেমন করিয়া কং। (দুইবার)
গ্যাল্লেস করি আধ বোতল তেল মাথাত দিলুং ঢালি
আয়না দেখি সিতা পারিলুং খোপা বান্ধিলুং তুলি।
স্নো পাউডার দিলুং কত মুখোত লাগাইয়া
কাম সিন্দুরের ফোটা দিলুং কপালোত ন্যালভ্যাল করিয়া।
গোড়া ঐ দিন চারিক ....কেমন করিয়া কং
হাটিও যাং ফিরিও চাং পাচ ফিরি দ্যাখোং
মাথার ঘোমটা ফেলেয়া দাদাক ইশারা করি কং
বাড়ি হইতে আইসোং দাদা হাটেক ধীরে ধীরে
গুয়াপানের টোপলাখুনা ছাড়িচুং বিছানার উপরে।
গোড়া ঐ দিন চারিক ....যাবার চাং
আধ ঘাটাত খুইয়া দাদাক দৌড়ি গেলুং বাড়ি
বাড়ি যায়া দ্যাখোং স্বামীধন বিছানাত আছে পড়ি।
বগোলত বসিয়া এলা কং ধীরে ধীরে
দুই-চারদিন ও স্বামীধন থাকেন বোল কোনরকমে
গোড়া ঐ দিন চারিক ....কেমন করিয়া কং।”

(কুশান— হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার শ্মশান মিলন)

সুতরাং বলা যেতে পারে, লোকনাটকগুলির কাহিনির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু বিবর্তন ঘটে চলেছে। এর পেছনে কারণ মূলত সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন। উৎস থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে লোকনাটকগুলির কাহিনির রূপান্তর ঘটে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা ও সংগ্রহ, পৃ.৭-৮।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. তিন।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

৪. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা ও সংগ্রহ, পৃ. ২।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকসাহিত্য, পৃ. ১০০।

৬. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পৃ. ২২৫।

৭. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা ও সংগ্রহ, পৃ. ৯।

৮. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ১৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

১০. ড. ফণী পাল, গম্ভীরার কবি-শিল্পীদের জীবন-কথা ও সংগীত সংগ্রহ, পৃ. ১৯৭-১৯৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

১২. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ২৯।

১৩. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ১২।

১৪. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা, পৃ. ৩০।

১৫. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২০।

১৬. আর্য্য চৌধুরী, প্রসঙ্গ ঃ 'প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গম্ভীরা গান'।। একটি সংযোজন, লোকশ্রুতি, Vol.5, Issue 2, পৃ. ১২৩।

১৭. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, পৃ. ৬৮।

১৮. আর্য্য চৌধুরী, প্রসঙ্গ ঃ 'প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে গম্ভীরা গান'।। একটি সংযোজন, লোকশ্রুতি, Vol.5, Issue 2, পৃ. ১২৪।

১৯. প্রদ্যোত ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা ঃ পুনর্বিচার, পৃ. ৯৮।

২০. শ্রীসনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক, পৃ.১৭৮।

২১. ধনঞ্জয় রায়, খন, পৃ.১৩।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৩. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৯৬।

২৪. সাক্ষাৎকার ঃ খুশী সরকার (৫২), ঊষাহরণ রোড, কুশমণ্ডী, দক্ষিণ দিনাজপুর, তাং ০৩.০৪.২০১০।

২৫. সাক্ষাৎকার ঃ দীনেশ রায় (৬২), রাউতপল্লী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, তাং- ১২.০৯.২০০৯।

২৬. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

২৭. প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সংগ্রহ, পৃ. ১৩১-১৩২।

২৮. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৮।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

৩০. জগন্নাথ ঘোষ, সম্পাদক, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ. ২৪।

চতুর্থ অধ্যায়
উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে চরিত্রগত রূপান্তর

নাটকে চরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ড. অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন, "নাট্যকার নাটক রচনা করবার সময় জীবন-সত্যের একটি বিশেষ দিক রূপায়িত করবার সংকল্প নিয়েই বসেন। নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডির মধ্যে কয়েকটি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই জীবন-সত্যকে নাট্যরসোত্তীর্ণ করে তোলাই হল তাঁর উদ্দেশ্য। এজন্য ঘটনা-সংস্থাপনার কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগুলির নাটকীয় উপযোগীতার দিকেও তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। সক্রিয়তা, আবেগধর্মীতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি গুণগুলি নাট্যচরিত্রের মধ্যে দেখাতে পারলে সেই চরিত্রও সংবেদনশীল হতে পারে।"[১] অর্থাৎ নাটক কিংবা লোকনাটক যাই হোক না কেন, কাহিনির মতো চরিত্রের সমৃদ্ধ কলা-কৌশল, অভিনয়, সাজসজ্জা ও বাচনভঙ্গিতে কাহিনির বিভিন্ন খণ্ডিত অংশগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কাহিনির মতো চরিত্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ নাটক বা লোকনাটকের জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে চরিত্রের উপর। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে কাহিনির পাশাপাশি চরিত্রগত রূপান্তর ঘটে চলেছে। চরিত্রের এই রূপান্তর সাধারণত তিন দিক থেকে হয়ে থাকে। যথা— i) নতুন নতুন চরিত্রের আগমন, ii) স্ত্রী চরিত্রে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তি এবং iii) পুরনো চরিত্রগুলির নব রূপায়ণ।

লোকনাটকগুলির পরিবেশনগত দিক থেকে নতুন নতুন চরিত্রের আগমন সব দিক থেকে বিশেষত্বের দাবী রাখে। পূর্বে মূল যিনি গায়ক বা গীদাল ও তার সহকারী অভিনেতা দোহার বা দোয়ারী চরিত্র দুটি এবং কিছু বাদ্যযন্ত্রী মিলেই লোকনাটক উপস্থাপন করত। গীদাল নিজে কখনও প্রধান চরিত্রে, কখনও বা সূত্রধরের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। অভিনয়কালে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন দোয়ারী। সে তাঁর পরনের ধুতিটাকে গলায় পেচিয়ে সেজে উঠত নারী। কিন্তু এখন দেখা যায় সময়ের সাথে সাথে লোকনাটকে চরিত্রের আনাগোনা বেড়েছে, ফলে অনেকগুলি চরিত্র একসঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, " 'মাস্টার', 'ছোকরা', 'ছড়াদার', 'গীদাল', 'দোয়ারি', 'জোকার' বিভিন্ন চরিত্রের অভিনেতা, এবং বাদ্য শিল্পীদের নিয়েই লোকনাট্যের শিল্পী-পরিবার। 'মাস্টার' সাধারণতঃ দলের চালক হয়ে থাকেন। 'ছোকরারা' নৃত্য গীত পরিবেশন করেন, 'ছড়াদার-রা' টিপ্পনি ও ছড়া কাটেন, কথার হুল ফোটান, কখন কখন চরিত্র ভূমিকায় আসেন, 'গীদাল' মূল কাহিনীটিকে ধরে রাখেন, 'দোয়ারি' বা 'জোকার' হাসিঠাট্টার ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভূমিকা পালন করেন, বিভিন্ন চরিত্র, চরিত্র অনুসারে অবতীর্ণ হন।"[২] অন্যভাবে বলা যায় গীদাল ও দোয়ারীর উপর পালার অনেকাংশই নির্ভর করত, কিন্তু এখন তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা চলে এসেছে। বর্তমানে দোয়ারীর কাজ কেবল মূলের কথার ভাংতি দেওয়া এবং হাস্যরসের অবতারনা করা। যেমন -'কুশান' লোকনাটকে গীদাল নিজেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতেন। পরের দিকে বিভিন্ন চরিত্রের বাদ্যযন্ত্রী, ছুকরী প্রমুখেরা অংশগ্রহণ করে।

আবার গম্ভীরার ক্ষেত্রে দেখি গম্ভীরা অনুষ্ঠিত হত শিবের থানের সামনে। যেহেতু শিবের অপন নাম গম্ভীর, তাই যেখানে শিব ঠাকুর পূজা করা হয়, সেই স্থানটিকে গম্ভীরা বলা হয়। অর্থাৎ শিব মন্দিরটিকেও গম্ভীরা বলা হয়। সেই মন্দির বা থানে শিব-মূর্তির সামনে মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য প্রার্থনা জানাত। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা কালে ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পালাকারেরা যখন সোচ্চার হলেন, তখন থেকেই পালাধর্মী ফর্ম তৈরি হয়েছিল গম্ভীরায়। সেই সময় থেকে এগিয়ে দেখা যায় এই শিব একসময় প্রতীকে পরিণত হল। রক্ষাকর্তা শিব পরিবর্তিত হল শাসকদলের প্রতিভূ হিসেবে। পালাকারেরা তাদের অর্থাৎ জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে সমস্ত অভাব-অভিযোগ তুলে ধরল এবং এসবের জন্য শিবকেই দায়ী করতে লাগল। এখানেই এই শিব চরিত্রের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। পরবর্তীকালে আমরা দেখি একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে শিবের আসরে আগমণ। সমস্ত অভাব-অভিযোগ শুনে তিনি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অন্তর্হিত হন। পুষ্পজিৎ রায়ের মতে, "পালারূপে 'বন্দনা' পর্যায়ে শিব হচ্ছেন প্রধান চরিত্র। গম্ভীরায় আপন 'থানে' আসীন থাকতেন শিব (মূর্তি)। তাঁকে লক্ষ করেই সব গান সব কথা নিবেদন করা হত—

শিবো হে
বুঝি বাঁচে না জান,
অনাবৃষ্টি কর‍্যা সৃষ্টি
নষ্ট করল্যা মাটি হে .... ইত্যাদি।

কিন্তু আধুনিক কালের শিব একটি চরিত্র হিসেবেই আসরে প্রবেশ করেন। চরিত্র হিসেবে শিবের এই ভূমিকাটি ঠিক কতদিন থেকে প্রচলিত তা সঠিক ভাবে বলা যায় না।"[৩] অনুমান করা হয় ১৯৩৫ - ১৯৩৮ খ্রীঃ মধ্যে গম্ভীরায় শিব চরিত্রের উপস্থাপন করেছেন মোহম্মদ সুফী। প্রচলিত কাহিনিটিকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, এই শিব চরিত্রের অন্তর্ভূক্তি বেশিদিনের নয়। এছাড়া গম্ভীরার চারইয়ারী পর্যায়ে চারজনের মধ্যে একজন উচিত বক্তা থাকেন। এই 'উচিত বক্তা' চরিত্রটিও বেশি পুরনো নয়।[৪]

'নটুয়া' লোকনাটকে গীদাল নিজেই রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কখনও রাধা, আবার কখনও সূত্রধরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। দোয়ারী বা বতেয়া উধব-মাধবের চরিত্রে অভিনয় করতেন। কিন্তু এখন দলের মধ্যে থেকেই একজন ছুকরীকে রাধা সজানো হয়। আর বাকী ছুকরীরা রাধার সখী হিসেবে অবতীর্ণ হন। যদিও রাধার নিজের মুখে কোন সংলাপ থাকে না।

'খন' ও 'পালাটিয়া'র ক্ষেত্রেও দেখি ওসিয়া বা বতেয়া এবং মূল মিলে পালাটি পরিবেশন করতেন। তবে নারীবেশী 'ছুকরী'রা নৃত্য-গীতে অংশগ্রহণ করার পাশাপাশি এখন বিভিন্ন চরিত্রেও অভিনয় করে থাকেন। জনৈক সমালোচকের মতে, এই ছুকরী বা ছোকরার সংখ্যা এক একটি পালাগানে ৩-৪ জন। খন গানের পালায় এঁরা কখনও নায়িকার ভূমিকায়, আবার কখনও বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে থাকেন।[৫] আবার জোতদার বা

মহাজন চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য দল থেকে নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত লোকনাটকগুলিতে পুরুষেরাই নারীর ভূমিকায় অভিনয় করে এসেছে। সবক্ষেত্রেই তারা নারী চরিত্রের অভিনয় করে পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছে। গ্রামীণ দর্শকদের চমকৃত করেছে। লোকনাটকগুলিতে নারীবেশে ছেলেদের ছুকরীতে রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে শিশির মজুমদার বলেছেন, "বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় নামে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকনাট্যে এদের সন্ধান মিলবে। এরা আসলে পুরুষ। প্রধানত তরুণ বয়সী। ছোকরা বা ছুকরী নাচার জন্য তারা মাথায় স্বাভাবিক লম্বা লম্বা চুল রাখে। তবে পরচুলাও তাদের পরতে হয়। ...এরা যেভাবে শাড়ি পরে তা আধুনিক নারীর মতো।"[৬] এক্ষেত্রে দর্শকমনে একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগতে পারে, এ ধরণের নাটকে যখন কোন পুরুষ নারী চরিত্রে অভিনয় করে, তখন সেখানে উপবিষ্ট দর্শক ও শ্রোতা সকলেই জানে যে সে প্রকৃতপক্ষে মেয়েই নয়; তবে সেক্ষেত্রে নর-নারীর আবেগঘন ও স্পর্শকাতর অভিনয় কি করে দর্শকদের হৃদয়াঙ্গম হয়! অথচ আশ্চর্যের বিষয় দর্শকসাধারণের মনে এ ধরণের কোন প্রশ্ন জাগে না, উল্টে এটাতেই তারা বেশি আনন্দ পায়। তবে নারী চরিত্রে পুরুষের এই অভিনয়ের পেছনে কতগুলি কারণ বর্তমান। কারণ হিসেবে বলা যায়, কিছুকাল আগে পর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ঘরের মেয়েদের প্রকাশ্যে অভিনয় ছিল নিষিদ্ধ। তখনকার সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী নারীদের এই সুযোগ দেওয়া হত না। তাই মেয়েদের অভাবে ছেলেরাই মেয়ে সাজত। এদিকে গ্রামীণ দর্শক সমাজ পালাগানের মধ্যে এতটাই একাত্ম হয়ে যেতেন, কে পুরুষ বা কে মহিলা— সে বিষয়ে তারা মাথা ঘামাতেন না। আর তাই ছুকরী ও নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এমন ছেলেকেই নির্বাচন করা হত, যার বয়স অল্প, মেয়েলি মুখাবয়ব, মেয়েলি কণ্ঠ এবং নাচ-গানে কিছুটা পারঙ্গম। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে কয়েক বছর ধরে গীদাল বা দলের পরিচালকরা নিজেদের ঘরের মেয়েদের দলে নামানোর পর থেকে দরিদ্র ঘরের মেয়েরা অর্থ উপার্জনের আশায় নিজেরাই এগিয়ে এসেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য, ততদিনে সামাজিক অনুশাসন অনেক শিথিল হয়েছে। কেবল ছুকরীই নয়, বিভিন্ন চরিত্রে তাদের অভিনয় করতে দেখা যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা মূলের ভূমিকায়ও অভিনয় করে— এমন নজির অনেক পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বলা যায়, সমাজজীবনে পরিবর্তনের পাশাপাশি দর্শক ও শ্রোতার রুচির পরিবর্তন হয়েছে। থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির প্রভাবে তারা এখন আর নারী চরিত্রে পুরুষের অভিনয় দেখতে চায় না। ফলে লোকনাটকের চাহিদা হ্রাসের ভয়ে শিল্পীরা সম্প্রতি স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মেয়েদের নিয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, এখনকার দিনের সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতি বিনোদনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার জন্য শিল্পীরা লোকনাটকে এই পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়, "আগে ছেলেরা মেয়েদের অংশে অভিনয় করত, কিন্তু সাম্প্রতিককালে ব্যবসায়ী আলকাপের দলে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য মেয়েদেরও নিযুক্ত করা হয়।"[৭] তবে শুধু আলকাপ নয়,

বর্তমানে প্রায় সব লোকনাটকেই মেয়েদের নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই 'ব্যবসায়ী' শব্দটি। সত্যি কথা বলতে কি, এখন সমস্ত বিনোদনের মাধ্যম ব্যবসার উপাদনে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে আগের মতো স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। কেবল প্রয়োজনের তাগিদে এগুলিকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে। ব্যবসার তাগিদে এর মধ্যে কৃত্রিমতার বেনোজল ঢুকে পড়েছে।

আর একটি পদ্ধতিতে লোকনাটকে চরিত্রের রূপান্তর ঘটে থাকে, তা হল পুরনো চরিত্রগুলির নব রূপায়ণ। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও সমাজের শোষক-শোষিতের চরিত্র ঠিক একই রকমের রয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে শোষিতরা শোষকের দ্বারা নিপীড়িত হয়ে চলেছে। শোষক-শোষিতের সম্পর্ক না বদলালেও প্রতিনিয়ত শোষকের রূপ বদলাতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জমিদার, জোতদারেরা ছিল শাসনতন্ত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। খন ও পালাটিয়া লোকনাটকে সেই সময় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ হিসেবে জমিদার, জোতদার প্রমুখেরা স্থান পেয়েছিল। জমিদারী প্রথা বিলোপের সাথে সাথে আর এক শ্রেণীর শাসকের উদ্ভব হয়, যার নাম মহাজন। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি যেহেতু কৃষিনির্ভর, কৃষকদের উপর চলতে থাকে অবাধ শোষণ। মহাজনের শোষণের পাশাপাশি রয়েছে বড় বড় আড়তদার, ফড়ে প্রভৃতির দৌরাত্ম্য। এই চরিত্রগুলিই সমসাময়িক লোকনাট্যগুলিতে উঠে এসেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনও লক্ষ করা যায় উত্তরবঙ্গের লোকনাট্যগুলিতে। যেমন, গম্ভীরা পালায় শিবের সামনে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভাব-অভিযোগ পেশ করার রীতি বহুকালের। স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সমস্ত ক্ষোভ উগরে দিয়েছিল গম্ভীরার সাহায্যে। স্বাধীনতার পর সেই শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তিত রূপ নেতা-মন্ত্রীরা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গম্ভীরা পালার কথা। তৎকালীন সময়ে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন ইংরেজ। এখানে ইংরেজদের দ্বারা শোষিত পরাধীন ভারতবাসীর প্রতি অন্যায়-অবিচারের ছবি তুলে ধরা হয়েছে —

"চিরকাল দুঃখে কষ্টে দেহ জর্জরিত
পরাধীন ভারতবাসী মোরা হায় কেঁদেছি নিয়ত
অবিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছি কত কষ্টে
(সাহেব) তার ফল কি তোরা ভোগ করবি না!"

সহস্র রক্তক্ষয়ে যে স্বাধীনতা এসেছিল সেই স্বাধীনতা কি মানুষ চেয়েছিল? ইংরেজরা ভারত ছাড়ার পর শাসনযন্ত্রের নিয়ামক হয়ে ওঠেন নেতা-মন্ত্রীরা। বর্তমানে নেতা-মন্ত্রীরাই দেশের সর্বেসর্বা। নেতা-মন্ত্রীদের অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ, প্রশাসন, আমলা সমস্ত কিছুই চলছে। তাই তো—

"গণতন্ত্র নয় দলতন্ত্র চলছে এই ভারতে
খুনী গুণ্ডা লম্পট চিটার ঢুকছে সব দলেতে

দাদাদের মদতের জোরে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ঘুরে
দলের নির্বাচনের তরী বাহিতে এরাই যে কাণ্ডারী
ব্যস্ত বিলাস ব্যসনে প্রমোদ ভ্রমণে ভারতের মন্ত্রী প্রবর।"

শুধু তাই নয় বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, নারীরক্ষা সমিতি; আমলাতন্ত্র, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা প্রমুখ চরিত্রগুলির মধ্যেকার স্বার্থবাদী রূপটি গম্ভীরায় প্রকাশ পেয়েছে।

আবার নটুয়া ও কুশানের মত লোকনাটকগুলিতে পৌরাণিক চরিত্রগুলি কখন যেন আমাদের ঘরের মানুষের পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে মানস মজুমদারকে অনুসরন করে বলা যায়, "লোকনাট্যের চরিত্রগুলি দেশের মাটি জল থেকে উদ্ভূত। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, 'কুশান' পালার লব-কুশ-সীতা-শত্রুঘ্ন-বাল্মীকি, 'শিবযাত্রা'র শিব-শিবানী, 'বিষহরি' পালার বেহুলা-চাঁদ-মনসা প্রভৃতি লোকবাংলার মাটি-জল সম্ভূত। পুরাণ বা দৈবী সংস্কার এদের আচ্ছন্ন করে নি। আচার-আচরণ, কথা-বার্তায় এ সমস্ত চরিত্র লোকসমাজেরই প্রতিভূ।"[৮] তাই নটুয়ায় রাধাকে বলতে শুনি—

"রাধা ঃ পরের রমণী দেখিয়ে কানু জলে কেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায় কানু বেহা কেনেনি কর।"

রাধা কৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের মতই পরিশ্রম করে পণের টাকা জোগাড় করার উপদেশ দিয়েছেন। আবার কখনও উধব-মাধব প্রাকৃতজনের মত বলে উঠে—

"উধব-মাধব ঃ মামি গরমিত বিচন দিয়া হাওয়া নি করে। তাতে মামাডা রাগ করি পলাইচে।"

অর্থাৎ গরমে রাধা কৃষ্ণকে পাখা দিয়ে বাতাস করেনি বলে কৃষ্ণ রাগ করে পালিয়ে গেছে।

এছাড়া কুশান পালায় বিশ্বামিত্র ও কপিঞ্জনের কথোপকথনে চরিত্রগুলির মানবীকরণ ঘটেছে। যেমন—

"বিশ্বামিত্র ঃ চল্ কপিঞ্জন তপোবনোত দেখিয়া আসি কায় কায় বন্দী হয়া আছে। (পদচারণা) এলা কপিঞ্জন কাংয়োয় তো নাই। কোটে গেইলেক মোর বন্দিনী পঞ্চকইনা। কার এমুন সাহস হৈচে, মোর বন্দিনীলাক মুক্ত করি দিচে।

কপিঞ্জন ঃ সচায় তো গুরু, এমুন কাম কায় করির সাহস পাইল।

বিশ্বামিত্র ঃ কপিঞ্জন, মুই ধ্যান করিয়া দেখং কায় এই বন্দিনী পঞ্চ কইনাক মুক্ত করি দিছে। (ধ্যান) হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র!

কপিঞ্জন ঃ কোন হরিশ্চন্দ্র গুরু?

বিশ্বামিত্র ঃ অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র মোর বন্দিনীলাক মুক্ত করি দিছে। মুই এলায় অযোধ্যা যাইম। রাজা হরিশ্চন্দ্রক পুছিম, কেনে উয়ায় মোর বন্দিনী পঞ্চকইনাক মুক্ত করিছে?

আর শোন মুই যদ্দিন ফিরিয়া না আইসোং তদ্দিন তুই এই তপোবন দেখাশুনা করিস। (প্রস্থান)

কপিঞ্জন ঃ আইসো গুরু। হুঁ হুঁ আজি আমার গুরুর চণ্ডালীদেও খরাইচে। অযোধ্যা যায়া আজি কিবা করে! আর কি করে করুক, ঐ যে কাথায় কয় না- যায় যেমন ঝাল খায় তায় তেমন মজা বোঝে। মুই এলা যাং খায়া দায়া নিন পারং যায়া।"

(কুশান— দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র)

সর্বোপরি চরিত্রগুলির এই রূপান্তর একদিনে সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মনন ও মানসিকতার পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে সময়ের সাথে মানুষ নিজেকে বদলে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তারই অনিবার্য প্রভাব পড়ে চলেছে সমাজজীবনে। সমাজজীবনের এই পরিবর্তিত রূপই লোকনাটকে প্রতিফলিত হয়। তাই চরিত্রগুলি কখনও কখনও পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে, আবার কখনও নবরূপ গ্রহণ করছে।

তথ্যসূত্র

১. ড. অজিতকুমার ঘোষ, নাটকের কথা, পৃ. ৪০।

২. সম্পাদক সন্তোষ চক্রবর্তী, লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৭০।

৩. সম্পাদনা মিহির ভট্টাচার্য, লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

৫. ধনঞ্জয় রায়, খন, পৃ. ২৫।

৬. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৪০।

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসংস্কৃতি, পৃ. 132।

৮. সম্পাদক সন্তোষ চক্রবর্তী, লোকশ্রুতি, ডিসেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৩৫।

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর

সময়ের সাথে সাথে মানবজীবনের পরিবর্তন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই মানবজীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত সমাজের উপরও পরিবর্তনের ছাপ অজান্তেই পড়ে যায়। আর এই পরিবর্তন সমাজের উপর এতটাই দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে, তার প্রভাব সংস্কৃতিতেও পড়ে। ফলে অনিবার্যভাবে তথাকথিত শিষ্ট সংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির আঙিনাতেও এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত লোকনাটকের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বিভিন্ন গণ আন্দোলন প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রুচি ও চাহিদার রূপান্তর লক্ষণীয়। আধুনিক নাটক, যাত্রা, সিনেমা ইত্যাদির ব্যাপক প্রভাব পড়ছে জনসাধারণের মনে। তাই রুচির দিক থেকে দর্শক ও শ্রোতা উভয়েই আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছে। তবে লোকনাটকের দর্শক ও শ্রোতার রুচি ও চাহিদা উত্তরোত্তর বদলে যাওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আধুনিক সমাজ। এই সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়েই উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে আঙ্গিক ও প্রদর্শনশৈলীগত রূপান্তর ঘটে চলেছে। দর্শক ও শ্রোতার রুচি এবং চাহিদামত নতুন নতুন উপাদান সংযুক্ত হতে থাকে। একথা অবশ্য স্বীকার্য আধুনিক সিনেমা, নাটক, যাত্রা প্রভৃতি সমাজে এতটাই স্থান করে নিয়েছে যে এর চাপে পড়ে লোকনাটক প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে। লোকনাটকের বহু দল যেগুলি পূর্বে জনপ্রিয়তায় শীর্ষে ছিল, সেই দলগুলির বেশিরভাগ সঠিক পরিচালনা, আর্থিক অসঙ্গতি, কুশীলব ও জনপ্রিয়তার অভাবে হারিয়ে গেছে। এখন গুটিকয়েক যে সমস্ত দল রয়েছে তারা কোনক্রমে এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য লড়াই করে চলেছে। বলা যায় আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকরা লোকনাটকের উপস্থাপন ও অভিনয়ের দিক থেকে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয় লোকনাটকের প্রদর্শনশৈলীগত বিভিন্ন উপাদানগুলিরও নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তবে একথা কেবল উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত লোকনাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের আলোচ্য উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির উপস্থাপন ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেসব উপাদানের রূপান্তর হচ্ছে সেগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা— (ক) মঞ্চরীতি, (খ) সাজসজ্জা, (গ) পোশাক-পরিচ্ছদ, (ঘ) বাদ্যযন্ত্র, (ঙ) আলোকসজ্জা।

মঞ্চরীতি ঃ

লোকনাটকের আসর কী ধরণের হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "তাতে সাজঘর বলে কিছু নেই। সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারদিক ঘিরে বসে, যখন যার অভিনয় করবার প্রয়োজন তখন সেই সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে, আবার গিয়ে সেখানেই বসে থাকে।"[১] আবার সনৎ কুমার মিত্র মনে করেন, "লোকনাটক মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়। এর চারদিকই খোলা। বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে দর্শকেরা আসরের চারদিকে গোল হয়ে বসে-কোন প্রসেনিয়ামের (Proseenium) বাধা থাকে না।"[২] অর্থাৎ মুক্ত মঞ্চ হওয়ায় এবং প্রসেনিয়ামের কোনো বাধা না থাকায় দর্শক ও শ্রোতা মাঝে মধ্যে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে শিশির মজুমদার বলেছেন, "লোকনাট্যের ক্ষেত্রে সবসময় মঞ্চ পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট কোন স্থান নয়। নাট্যের পৃষ্ঠপোষক বা প্রযোজক-গৃহস্থের অঙ্গন (উঃ ও দঃ দিনাজপুর), খাস বা 'ধাম' (জলপাইগুড়ি) বা অকর্ষিত জমির সমতলভূমি এর মঞ্চ। শুধু অনুষ্ঠানের আগে খড় বা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হয় আসর এলাকা। বিশেষভাবে মঞ্চের উপর টানানো হয় চাঁদোয়া, অভাবে বর্গায়িত চাদর। বাদ্যযন্ত্রী-কুশীলব যেখানে বসেন সেখানে হাতে তৈয়ারি পাটের ধোকড়া (শতরঞ্জী) পেতে দেওয়া হয়। অভিনয়ের স্থান সাধারণতঃ উন্মুক্ত-শক্ত মাটি কিংবা তৃণাচ্ছাদিত।"[৩] তবে কেবল উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির লোকনাটকের মঞ্চরীতির ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের ক্ষেত্রে মঞ্চরীতির এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যেতে পারে। পল্লব সেনগুপ্ত লোকনাটকের মঞ্চরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, "সাধারণভাবে লোকনাট্য, মুক্ত অঙ্গনে-খোলা মাঠে কিংবা চাষের জমিতে অথবা গ্রামদেবতার থানের সামনে অভিনীত হয়।"[৪] আবার মানস মজুমদার মনে করেন, "লোকনাট্যের অভিনয়-আসরে উপস্থিত হ'লে দেখতে পাই, অভিনয় মঞ্চ ব'লে কিছু নেই। চারদিক খোলা আসরে দর্শকদের মাঝখানে চলে অভিনয়। অভিনেতা আর দর্শক-শ্রোতাদের কাছাকাছি অবস্থান।"[৫] সুতরাং বলা যায় লোকনাটক অভিনীত হত গৃহস্থের উন্মুক্ত উঠোনে, গ্রাম দেবতার থানে কিংবা খোলা মাঠে। অতিপ্রাচীন কাল থেকে লোকনাট্যের স্থানটি ছিল বৃত্তাকার। এ প্রসঙ্গে মনে করা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজে প্রাকৃতিক শক্তির আধার রূপে সূর্য পুজনীয় ছিল। সূর্যের সেই গোলাকার চিহ্নই যুগ যুগ ধরে শুভ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই আসরের চারদিক ঘিরে দর্শকেরা বসত। ফলে সহজেই চরিত্রগুলি দর্শক ও শ্রোতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারত। আসরের উপর চাঁদোয়ার মত কাপড় কিংবা পাটকাঠির আচ্ছাদন দেওয়া হত এবং নীচে বসার জন্য চাদর বা বস্তা পেতে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে আলাদা কোন সাজঘরের ব্যবস্থা ছিল না। অভিনেতারা সাজসজ্জা করে আসরেই বাদ্যযন্ত্রীদের পাশে বসে থাকত। অভিনয়ের সময় তাঁরা উঠে এসে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করত।

কিন্তু ইদানীং লোকনাটকের আসরের ক্ষেত্রে বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। জনপ্রিয়তার ঘাটতির দরুণ লোকনাটকের দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা দিন দিন কমে চলেছে। ফলে আগের মতো জনসমাগম এখন আর হয়

না। তাই জনসমাগম বৃদ্ধি করতে প্রযোজকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির আদলে মঞ্চ তৈরি করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসংস্কৃতির জন্মভূমি গ্রামে-গঞ্জে এখন সিনেমার নায়ক-নায়িকা ভাড়া করা যাত্রার রমরমা বাজার। তাই এই ধরণের গ্রাম্য পরিবেশে সাধারণ মানুষের দ্বারা অভিনীত লোকনাটকের চেয়ে যাত্রা গ্রামের মানুষের কাছে অতি উপভোগ্য। অবশ্য এর পেছনে যে কেবল আধুনিক বিনোদন ব্যাবস্থাই দায়ী, তা নয়। আসলে মানুষের মনন ও চিন্তনের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে মানুষের রুচির দিকে লক্ষ রেখে লোকনাটককেও পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। তাই "...নাটকে যে উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈয়ারি করে মঞ্চ সৃষ্টি তা পরবর্তীকালের ব্যাপার। উঁচু মঞ্চ তৈয়ারির সঙ্গে সঙ্গে নাটক ও কুশীলব দর্শকদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। নাট্যমঞ্চে সূচিত হয় এক নূতন যুগ।"[৬] অর্থাৎ যখনই যাত্রার আঙ্গিকে লোকনাটকেও মাটি কেটে উঁচু প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ তৈরি শুরু হল সেই সময় থেকে লোকনাটকের আসর বৃত্তাকার থেকে হয়ে গেল বর্গাকৃতি। যেমন— আদিতে কুশানের মঞ্চ ছিল গোলাকার, কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে বর্গাকৃতি রূপ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে খন গানের আসরের কথা তুলে ধরে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "অন্যান্য লোকনাট্যের মতো বাড়ির খলানে, উঠোনে বা গ্রামের কোনো খোলা জায়গায় এই পালাগানের আসর বসে। চারদিকে দর্শকসাধারণের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় আসর বসে। ইদানীং কোথাও কোথাও তিন দিক খোলা মঞ্চেও আসর অনুষ্ঠিত হয়।"[৭] অর্থাৎ খন গান মুক্ত উঠোনে কিংবা মাঠে অভিনীত হলেও, বর্তমানে তিন দিক খোলা স্টেজ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। খন গানের মঞ্চরীতি সম্পর্কে শিশির মজুমদারও বলেছেন, "কুশীলবরা সাজ পোশাক করে মঞ্চের মধ্যস্থলে বাইনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। অভিনয় কালে উঠে এসে অভিনয়ে অংশ নেয়। তবে ইদানীং ভিন্ন সাজঘর হয়েছে। সাজঘর থেকে তারা দর্শকের মধ্য দিয়ে একফালি সরুপথে মঞ্চে যাতায়াত করে।"[৮]

শুধু তাই নয় গম্ভীরার মঞ্চসজ্জায় রূপগত যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সেই সম্পর্কে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "প্রাচীনকালে এই আসর সাজানো হত পদ্মফুল দিয়ে। পরবর্তীকালে নানা কারণে যথেষ্ট সংখ্যক পদ্মফুলের অভাব দেখা দিলে কাগজের পদ্মফুলে আসর সাজাবার প্রথা শুরু হয়। ...বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি, কালীঘাটের পট ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হত। রঙিন, নকশাদার বিশেষ ধরণের পট ও রামকেলীর বস্ত্রে অঙ্কিত ছবি দিয়ে আসর সাজানো হত। এছাড়া চাঁদোয়াও টাঙানো হত। আসরে বসার জন্য কোনো কিছুর ব্যবস্থা আগেকার দিনে ছিল না। কেউ কেউ বাড়ি থেকে চট, আসন ইত্যাদি আনত। মণ্ডপের যে অংশে নাচ গান হত সে অংশেও বসার কোনো ব্যবস্থা করা হত না। ধূলোয় বসা হত এবং ধূলোতেই নাচ গান হত।

ইদানীংকালে গম্ভীরা মণ্ডপে সাজাবার ব্যবস্থা তেমনভাবে করা হয় না। কোনো কোনো গ্রামে সামান্য কিছু ব্যবস্থা করা হয়। ... আগে গ্রিনরুম থাকত না। এখন চালু হয়েছে।"[৯] আবার প্রদ্যোত ঘোষ মনে করেন, "প্রায় বার থেকে ষোল ফুট ব্যাসযুক্ত গোলাকার অংশকে আসর করে চারদিকে বৃত্তাকারে শ্রোতা বা দর্শকেরা ভূমি আসন গ্রহণ করে। ওপরে থাকে সামিয়ানা বা অন্য কোন আচ্ছাদন। একটু দূরে থাকে গ্রীনরুম বা সাজঘর।

আসরের একপাশে বসে বাজিয়ে এবং গায়কেরা।"[১০] এ থেকে বোঝা যায় গম্ভীরার মঞ্চসজ্জার এই যে ব্যাপক পরিবর্তন তা একদিনে ঘটেনি। প্রথমদিকে মঞ্চসজ্জায় যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হত, পরবর্তীতে সেগুলি অপর্যাপ্ত কিংবা দূর্লভ হওয়ায় আর ব্যবহার করা হয় না। তবে এদিক দিয়ে নতুনত্ব হল গ্রিনরুমের ব্যবহার। এখন প্রায় প্রতিটি লোকনাটকেই গ্রিনরুমের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অভিনয়ের আসর থেকে কিছুটা দূরে অস্থায়ী গ্রিনরুম তৈরি করা হয়। সেই গ্রিনরুম থেকে আসরে যাওয়া আসার জন্য একটি সরু রাস্তা থাকে। গ্রিনরুম ব্যবহারের একটা বিশেষত্ব রয়েছে সেটি হল দর্শকদের মনে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখা, যা পূর্বের লোকনাটকগুলিতে সেভাবে প্রকাশ পেত না। কারণ সেক্ষেত্রে চরিত্রেরা আগে থেকেই সেজে এসে আসরে বসে থাকত।

এছাড়া আসরে এখন মাইকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। পূর্বে দর্শক ও শ্রোতার কাছে অভিনয়ের সংলাপ পৌঁছানোর জন্য জোরে জোরে বা প্রায় চিৎকার করতে হত। যাতে তাদের আবেগদীপ্ত সংলাপ শ্রোতার বোধগম্য হয়। এর জন্য শিল্পীরা কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। উপরন্তু সেই সময় "আসরে মাইকের ব্যবহার শিল্পীদের অক্ষমতার পরিচায়ক ছিল।"[১১] তবে এখন মাইকের ব্যবহার লোকনাটকের একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে অভিনেতারাও এই ধরণের শারীরিক ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

সাজসজ্জা ঃ

লোকনাটকের চরিত্রগুলি সাজসজ্জার দিক থেকে তেমন পরিপাট্য ছিল না। একেবারেই সাদামাটা সাজে অভিনেতারা আসরে উপস্থিত হতেন। তবে এদের মধ্যে কেবল ছুকরী চরিত্রটি সুসজ্জিত হয়ে আসরে নামতেন। শিল্পীদের ব্যবহৃত সাজসজ্জার উপকরণগুলি গ্রামজীবনে খুব সহজেই পাওয়া যেত। অর্থাৎ গ্রামজীবনে যা সহজলভ্য, যেমন— ভুষাকালি, সিঁদুর, আলতা, হলুদবাটা, খড়িমাটি প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে শিল্পীরা তাদের সাজসজ্জায় ব্যবহার করত। তাই প্রসাধন সামগ্রীর ক্ষেত্রে তেমন ব্যয় ছিল না।

কিন্তু এখন বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জার উপকরণ অর্থাৎ প্রসাধন সামগ্রী বাজারে ছড়িয়ে পড়ায় তা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করছে সহজেই। বর্তমান প্রজন্মকে তো বটেই। আবার যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতির দৌলতে প্রতিটি মানুষের সাজসজ্জায় এসেছে পরিবর্তন। তাই লোকনাটকেও সাদামাটা গ্রাম্য ভাব কাটানোর জন্য নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে চরিত্রগুলি নিজেদের সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই নানা ধরণের সাজসজ্জার উপকরণের ব্যবহার। এই পরিবর্তিত সাজসজ্জার উপকরণের উল্লেখ করে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "শিল্পীরা মেক আপের জন্য ব্যবহার করেন— পাউডার, ক্রিম, পিউরি, মিনা, ক্রেপ, জিঙ্ক অক্সাইড, স্পিরিটগাম, পরচুলা প্রভৃতি।"[১২] আবার শিশির মজুমদার খন গানের অভিনেতাদের সাজসজ্জা সম্পর্কে বলেছেন, ছোকরা চরিত্রটির "হাতে কাচের চুড়ি গলায় মালা। চুল

খোঁপা করে বাঁধা, গায়ে রঙীন ব্লাউজ। ... 'নাহিড়ী' বা নায়িকা, 'মুড়ি' বা নায়ক এবং যে চরিত্রটি 'ওসিয়া' বা 'ফাত্রা'র মুখে জিঙ্ক অক্সাইড পাউডার দিয়ে সাদা করে দেওয়া হয়।"[১৩] বলা বাহুল্য এ সমস্ত উপকরণ গ্রামের মানুষের কাছে যেমন দুর্লভ, তেমনি যথেষ্ট ব্যায়সাধ্য। যা লোকনাটকের শিল্পীদের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না। তবে এখন এ ধরণের প্রসাধন সামগ্রী প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। ফলে মঞ্চসজ্জার পাশাপাশি সাজসজ্জায়ও এসেছে নানা পরিবর্তন। তাই এখন লোকনাটকগুলির প্রায় প্রতিটি চরিত্রই কিছু না কিছু মেক-আপ নিয়ে থাকে। তাঁরা সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে মেক-আপ পাউডার, ফাউন্ডেশন, লিপস্টিক, কাজল, স্টোন বসানো মালা, চুড়ি প্রভৃতি।

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ

পোশাক পরিচ্ছদ শুধুমাত্র মানবদেহকে আবৃত করে তাই নয়, মানবদেহকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে এক অন্য মাত্রা দেয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে নিতান্ত অনাড়ম্বর ও সাধারণ পোশাকে কুশীলবেরা অভিনয় করতেন আসরে। পুরুষেরা ধুতি পাঞ্জাবী, এবং গীদালের গায়ে থাকে নামাবলী (বিশেষ বিশেষ লোকনাটকের ক্ষেত্রে)। ছুকরী চরিত্রটি শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ ও পরচুলা ব্যবহার করে। এছাড়া দোয়ারী বা বতেয়া চরিত্রটি নিজেকে হাস্য উদ্রেককারী করে তুলতে হাস্যকর পোশাক পরিধান করে, যেমন— ছেঁড়া গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, কখনো বা পায়জামার একটা পা অর্ধেক করে কাটা ইত্যাদি। অবশ্য প্রায় প্রতিটি লোকনাটকের বতুয়া বা দোয়ারীর পোশাকে এ ধরণের বৈচিত্র্যের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। যা পালাগুলিতে হাস্যরসের ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। খন পালার চরিত্রগুলির পোশাক সম্পর্কে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। নারী-চরিত্র ও জোকার বা বিদূষক চরিত্রের সাজপোশাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত পুরুষ চরিত্রের হাতে বা কাঁধে গামছা এবং নারী চরিত্রের হাতে রুমাল থাকে।"[১৪] আবার গম্ভীরার ক্ষেত্রে দেখা যায় বতেয়া চরিত্রটির ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর অনেকগুলি মেডেল ঝোলানো থাকে। এ ধরনের পোশাক আর কোনো লোকনাটকে দেখা যায় না। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি সাধারণত পাঞ্জাবী-পায়জামা অথবা শার্ট-প্যান্ট পড়ে থাকে। তাই "গম্ভীরা গানের শিল্পীদের রূপসজ্জার বিষয়টি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এঁদের সাজসজ্জার মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটি হয় একেবারেই অন্যরকম। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা, ধুতিও থাকে ময়লা-ছেঁড়া। মুখে চোখে সামান্য মেক-আপ। শিবের চরিত্রে যিনি অভিনয় করেন তাঁর পরণে থাকে বাঘছাল, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল এবং বা হাঁতে থাকে ডম্বরু।"[১৫] গম্ভীরা লোকনাটকের পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ পরিবর্তন না হলেও চরিত্রগুলির পোশাকের মধ্যে এখন মার্জিত রূপ লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য লোকনাটকগুলিতে বিশেষ করে পালাটিয়া, খন প্রভৃতি লোকনাটকে চরিত্র অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন— পুলিশ, ডাক্তার, উকিল, রাজা-বাদশা প্রভৃতি চরিত্রের অনুরূপ পোশাক পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। 'পালাটিয়া'য় ছুকরী চরিত্রগুলি পূর্বে ঘাগড়া পড়ত। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন অঞ্চলে তাদের শাড়ি পড়তে দেখা যায়।[১৬]

এই রূপান্তরের পেছনে কারণ হিসেবে মানস মজুমদার সিনেমা, পেশাদারী যাত্রা ও মঞ্চাভিনয়ের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৭] আবার অনেক ক্ষেত্রে জরির পোশাক, ঢাল তলোয়ার, পিস্তল প্রভৃতিও ব্যবহার হয়। চরিত্র অনুযায়ী এই ধরণের পোশাক যদি কেনার সামর্থ্য না থাকে কোন দলের, তবে সেক্ষেত্রে এগুলি ভাড়া করা হয়। এ প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মিত্র বলেছেন, "... তবে আজকাল কোন কোন পালায় কোন কোন দল ঝকমকে যাত্রার পোশাক ভাড়া করে নিয়ে আসে।"[১৮] সুতরাং বলা যায় আধুনিক সমাজব্যবস্থায় জনমনোরঞ্জনের জন্য লোকনাটকের দলগুলি পোশাক পরিচ্ছদের নানাতর পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন, যা পূর্বে ছিল অভাবনীয়।

বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ লোকনাটকে মুখোশের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 'নটুয়া'র 'বতেয়া' চরিত্রের কালিমাখা মুখ দেখে মনে হয় নটুয়া পালায় একসময় হয়ত মুখোসের ব্যবহার ছিল।[১৯] কুশান গানেও মুখোসের ব্যবহার থাকলেও আজ আর তা দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে মুখোশ শিল্প তেমন লাভজনক না হওয়ায় এর সাথে যুক্ত শিল্পীরা জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে কিংবা অন্য পেশায় প্রবেশ করেছে। ফলে মুখোশের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া বিদেশের বাজারে এ ধরণের মুখোশের মূল্য অনেক বেশি। তাই ভারতের বিশেষত উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকাগুলি থেকে চোরাকারবারীদের হাতে মুখোশগুলি বিদেশে চালান হয়ে চলেছে। তবে কিছু কিছু লোকনাটকের ক্ষেত্রে যেখানে মুখোশের ব্যবহার অপরিহার্য, সেখানেই কেবল মুখোশের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ঃ

বাদ্যযন্ত্র লোকনাটকের একটি অন্যতম উপাদান। এর মাধ্যমেই কখনো আবেগের সুর ভেসে ওঠে, আবার কখনো বা কান্না-হাসির সুর দোলা দেয়। লোকনাটকের ক্ষেত্রে এই বাদ্যযন্ত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্বে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ব্যবহৃত হত দোতরা, ব্যানা, মুখা বাঁশি, করতাল, ঢাক, ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি। তবে হারমোনিয়াম, ফ্লুট, সানাই, ক্যাসিও প্রভৃতি ইদানীংকালে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মিত্র বলেছেন, "আঞ্চলিক এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রই সুরসৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন উত্তরে ব্যানা, দোতরা, মুখাবাঁশি, মৃদঙ্গ, সঙ্গে ঢোল-কাঁসি, ঢাক, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, করতাল ইত্যাদিরও ব্যবহার লক্ষ করা যায়।"[২০] লোকনাটকের বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে শিশির মজুমদার মনে করেন, "খোল, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, দোতরা, খমক, ঢোল, বাঁশী, মেহনা (সানাই), ঢাক, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, এসব হলো প্রত্যেক লোকনাট্যের বাদ্যযন্ত্র। হারমোনিয়াম ডুগিতবলা ছাড়া এখন খন বা পালাটিয়া শুধু নয়, কোনো লোকনাট্যের আসর জমে না। প্রবীণ শিল্পীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি পূর্বে হারমোনিয়াম ডুগিতবলার কথা জানা ছিল না। ঢোল, তাল (করতাল), দোতরা, খমক একটা বাঁশী এই নিয়ে বাদ্যযন্ত্রীরা আসর জমাতেন।"[২১] আবার মানস মজুমদারের মতে, "ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, ধামশা, শিঙ্গা, সানাই, কাঁশি, বাঁশি, ফুলুট, দোতরা,

সারিন্দা, বেহালা, তবলা, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চোখে পড়ে। ইদানীং হারমোনিয়ামও কোনো কোনো আসরে স্থান পাচ্ছে।"[২২]

অর্থাৎ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকেরা সুরের ক্ষেত্রে নতুনত্ব নিয়ে আসার জন্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানাতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে অনেক নতুন বাদ্যযন্ত্র লোকনাটকের আসরে স্থান পেয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও পাবে। তাই প্রায় প্রতিটি লোকনাটকের বাদ্যযন্ত্রে এসেছে পরিবর্তন, আমদানী হয়েছে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের। খন গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "খোল, ঢোলক, হারমোনিয়াম, বাঁশি, জুড়ি বা করতাল, তবলা, ছোটো আকারের সানাই, ব্যাণা [বীণাযন্ত্রের মতো] প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।"[২৩] এখানে উল্লেখ্য, ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত খন গানে সানাই-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। আবার শিশির মজুমদারের মতে, " 'খন'-এ বাদ্যযন্ত্র হলো— হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, করতাল, বাঁশি । তবে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি, হারমোনিয়াম অন্ততঃ ৫০ বছর আগে চালু ছিল না। ডুগি-তবলাও নয়। খোল বা ঢোল, বাঁশি ও করতালই ছিল এর বাদ্যযন্ত্র।"[২৪]

অপরদিকে গম্ভীরা লোকনাটকে প্রথমে কেবল ব্যবহৃত হত ঢোলক ও করতাল। কিন্তু পরবর্তীকালে এর মধ্যে নতুন নতুন অনেক বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে প্রদ্যোত ঘোষ বলেছেন, "বর্তমানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, বাঁশি ও জুড়ি। আদিতে ছিল কেবল ঢোল ও কাঁসি। তার পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে ঢোলের সঙ্গে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা ও মন্দিরা। আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে গোপাল দাস [দাস গোপাল নামে পরিচিত], হরিমোহন কুন্ডু, শরৎ দাস ও মোহম্মদ সূফীর আমলে ঐ সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। বাঁশির ব্যবহার হাল আমলের।"[২৫] এই একই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন পুষ্পজিৎ রায়, তিনি বলেছেন, "গম্ভীরা পালায় সাধারণত যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বা বাজনা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ঢোলক, জুড়ি, তবলা, বাঁশি, করতাল, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, কর্নেট। ...এখানে উল্লেখ্য এই যে ঢোলক ও জুড়ি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বাজনাই পরবর্তীকালের সংযোজন।"[২৬] অনুরূপভাবে কুশান লোকনাটকে আদিতে ব্যানা, ঢোল ও করতাল ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। পরবর্তী পর্যায়ে এতে দোতরা, সারিন্দা, হারমোনিয়াম, সানাই ও ক্যাসিও স্থান পেয়েছে। বর্তমানে দু'ধরণের কুশান পালা পাওয়া যায়— ব্যাণা কুশান ও দোতরা কুশান। যে পালা ব্যাণার সাহায্যে পরিবেশিত হয় তা ব্যাণা কুশান, আর ব্যাণার বদলে দোতরা দিয়ে যে পালা পরিবেশন করা হয় তা দোতরা কুশান। কোন কোন অঞ্চলে এখন দোতরা কুশান প্রচলিত হয়েছে। তবে ব্যাণা কুশানের পরিবর্তিত রূপ যে দোতরা কুশান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পালাটিয়া লোকনাটকে নতুন বাদ্যযন্ত্রের সংযোজনের প্রসঙ্গে শিশির মজুমদার বলেছেন, "রঙপাঁচালীতে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, ক্ল্যারিওনেট ব্যবহারও করতে দেখেছি। এগুলি যে কলকাতার যাত্রার প্রভাব, একথা না বলে দিলেও চলে।"[২৭] অর্থাৎ সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির সর্বাত্মক প্রভাব জনমানসে যে কতটা কার্যকারী তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি

লোকনাটকের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে লোকনাটকের বিষয়কে মনোজ্ঞ করে তোলার জন্য এই রূপান্তর আনা হচ্ছে। বিশেষ করে আধুনিক যুবসমাজ; যারা সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতির চটকদার সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রে অভ্যস্ত, তাদের লোকনাটকের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

আলোকসজ্জা ঃ

গ্রামসমাজের লোকসাধারণকে কেন্দ্র করে রচিত লোকনাটক মূলত উপস্থাপিত হয় গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে। তাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকনাটক ছিল গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই সময় গ্রামগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল না। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম লণ্ঠনের মাধ্যমেই সারতে হত। তেমনি লোকনাটকগুলিতেও পৃষ্ঠপোষকেরা হ্যাজাক ও লণ্ঠনের ব্যবস্থা করতেন। এই আলোকসজ্জা সম্পর্কে মানস মজুমদার বলেছেন, ''ডে লাইট, হ্যাজাক বা পেট্রোম্যাক্সের আলোয় অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।''[২৮] কিন্তু দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। আর যেখানে বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছাতে পারে নি, সেক্ষেত্রে জেনারেটরের মাধ্যমে আলো জ্বালানো হচ্ছে। ফলে লোকনাটকের আলোকসজ্জায় এসেছে রূপান্তর। হ্যাজাক ও লণ্ঠনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলো ও জেনারেটর।

সবশেষে বলা যায় লোকনাটকগুলি পূর্বে গ্রামের সম্পন্ন জমিদার বা জোতদার শ্রেণীর লোকেদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হত। এমনকি লোকনাটকের কুশীলবদের যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্বও বহন করতেন এই ধরনের আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পাশাপাশি জোতদার ও জমিদারদের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যায় এবং আর্থিক দিক থেকে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে লোকনাটকের দলগুলির গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাঁরা আর বহন করতে পারে না। এই সহায়সম্বলহীন অবস্থায় অনেক দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। অনেক শিল্পী রোজগারের আশায় নতুন করে চাষ-আবাদ শুরু করে। এভাবে অনেক দল কালের সীমায় হারিয়ে যায়। কিন্তু জাতশিল্পী যাঁরা, যাঁদের রক্তের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে রয়েছে শিল্প, তাঁরা আবার বহু কষ্টে নিজেদের উদ্যোগে নতুন দল সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সময়ে গ্রামগুলিতে পুরোদমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল যাত্রা-থিয়েটার। তাই তখন লোকনাটকের দলগুলি যাত্রার অভিনয়ের পাশে নিজেদের অস্তিত্বের সংকট বুঝতে পেরেছিল। টিকে থাকার অদম্য ইচ্ছে থেকেই দলগুলি নিজেদের চেষ্টায় লোকনাটকের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। তাঁরা সমকালীন থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দলকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো অনুকরণ করে, কিংবা কোথাও কোথাও বর্জন করে লোকনাটককে তাঁরা নতুন রূপ দেয়। অবশ্যই এক্ষেত্রে লোকনাটকের মূল ফর্মকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। বলা যায়, তাঁদেরই সচেষ্ট কর্মের ফলশ্রুতি প্রচলিত বর্তমান লোকনাটকগুলি।

তথ্যসূত্র

১. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৮-৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. চার।

৩. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৫।

৪. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পৃ. ২২৪।

৫. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৩৭।

৬. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৮-৩৯।

৭. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৮১।

৮. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৭।

৯. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৬৩।

১০. শিশির মজুমদার, দিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ খন, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৭।

১১. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ২৬।

১২. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৭।

১৩. শিশির মজুমদার, দিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ খন, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৬-৩৭।

১৪. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৮১।

১৫. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৬-২৭।

১৬. সাক্ষাৎকার ঃ দীনেশ চন্দ্র রায় (৬৩), রাউতপল্লী, ময়নাগুড়ি, তাং- ০৫.০২.২০১০।

১৭. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৪৭।

১৮. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. চার।

১৯. সাক্ষাৎকার ঃ নগেন্দ্রনাথ রায় (৬০), চৈতন্যপুর, শিবমন্দির, দার্জিলিং, তাং-১০.০৯.২০১০।

২০. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. চার।

২১. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৪৩।

২২. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৩৭।

২৩. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৮১।

২৪. শিশির মজুমদার, দিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ খন, একটি সমুদ্রপাখি বিহান, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ. ৩৭।

২৫. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৬৩।

২৬. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৬।

২৭. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য ঃ পালাটিয়া, মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩৬৯।

২৮. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৩৭।

ষষ্ঠ অধ্যায়
উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে ভাষাগত রূপান্তর

সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের অপরিহার্য মাধ্যম হল ভাষা। প্রকারান্তরে বলা যায় "ভাষা হচ্ছে কতগুলি অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপ যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে।"[১] ভাষার মধ্য দিয়েই মানুষ তার চিন্তা-চেতনাকে অন্যের কাছে প্রকাশ করে। তেমনি লোকনাটককে দর্শক ও শ্রোতার মাঝে পৌঁছে দেওয়ারও কাজ করে ভাষা। শুধু লোকনাটকেই নয়, সমগ্র লোকসাহিত্যের ভিত্তিভূমি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষা। লোকসাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে লোকসমাজ। এই লোকসমাজের গোষ্ঠীভাবনা ও ঐতিহ্যমুখীনতার ফলে লোকসাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই শিষ্ট ভাষার তুলনায় লোকসাহিত্যের ভাষায় আঞ্চলিক বিভেদ পুরোমাত্রায় লক্ষ করা যায়।

লোকসাহিত্যের ভাষা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। আবার তা যদি কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাষা হয়, সেক্ষেত্রেও চলমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষার বহমান রূপ প্রকাশ পায়। লোকসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষাকে লোকভাষা বলা যেতে পারে। লোকসমাজের মধ্যেই লোকভাষার অস্তিত্ব নির্ভর করে। কথ্যভাষাকে আশ্রয় করে বলেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে অনেকটা মিল থাকে লোকভাষার। কিন্তু উপভাষা ও লোকভাষা কখনই এক নয়। উপভাষা হল একই ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ। উপভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রামেশ্বর শ' 'A Dictionary of Linguistics'-কে অনুসরণ করে বলেছেন, "উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (Standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (Literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগ্‌ধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলিকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশী না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলিই এক-একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাষা হয়ে উঠে।"[২] অর্থাৎ উপভাষার সঙ্গে আদর্শ ভাষার পার্থক্য থাকলেও তা হবে একে অপরের পরিপূরক। উপভাষাগুলির সাধারণত দুটি রূপ লক্ষ করা যায়। যথা— লেখ্য উপভাষা ও কথ্য উপভাষা। কোন উপভাষিক অঞ্চলে অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্নতা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে উপভাষার যে কোন একটি আদর্শকে লেখ্য উপভাষা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। যাতে তা অঞ্চল নিরপেক্ষভাবে পাশাপাশি অঞ্চলের একই বাচকগোষ্ঠীর বোধগম্য হয়। আর কথ্য উপভাষা যেহেতু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তাই কথ্য উপভাষা অঞ্চলভেদে বিভিন্ন। লোকভাষার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে ড. নির্মল দাশ এই কথ্য উপভাষাকে দুটি সূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে, "কথ্য উপভাষার প্রধান অংশটা সমাজের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাতে সমসাময়িকতার প্রসঙ্গই

প্রধান। কিন্তু কথ্য উপভাষার আর একটি অংশ আছে যেখানে দৈনন্দিন সমসাময়িকতার বদলে অতীতের ঐতিহ্যবোধই বাগ্‌ব্যবহারের মধ্যে স্থান পায়। এই অতীতচারিতা ব্যক্তিগত স্মৃতি রোমন্থন নয়, এর মধ্যে থাকে ফেলে আসা সামন্তজীবনের গোষ্ঠীভাবুক পিছুটান। তাতে দৈনন্দিন ও সমসাময়িক শব্দভাণ্ডার ও বাক্যবন্ধের বদলে কিছু বাঁধাধরা শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বিন্যাসক্রম প্রাধান্য পায়। কথ্য উপভাষার এই অংশের অতীতচারী ঐতিহ্যানুসারিতার মধ্যে কাজ করে নানা ধরণের লোকায়ত প্রবণতা। তাই কথ্য উপভাষার এই অংশের নাম দেওয়া যেতে পারে লোকভাষা।"[৩] অর্থাৎ লোকভাষার অতীত ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে লোকায়ত প্রবণতা। কিন্তু লোকভাষায় কেবলমাত্র 'কিছু বাঁধাধরা শব্দ, শব্দগুচ্ছ ও বিন্যাসক্রম প্রাধান্য পায়'— একথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ লোকভাষায় 'নিষেধ'(Taboo), সংস্কার (Superstition), লোকনিরুক্তি (Folk-etymolog) প্রভৃতির উপরও জোর দেওয়া হয়।[৪] এক একটি উপভাষায় অনেকগুলি লোকভাষা থাকতে পারে। আবার একই এলাকায় লিঙ্গ, পেশা ও বয়সগত তারতম্যে লোকভাষায়ও রকমভেদ লক্ষ করা যায়। উপভাষার মত লোকভাষার কোন আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা নেই। লোকভাষা গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দ্বারা পরিপুষ্ট। লোকভাষায় লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা উপভাষায় পাওয়া যায় না। আবার উপভাষার যে সমস্ত চলমানতার ধর্ম রয়েছে যেমন মান্যায়ন, স্বয়ংভরতা, ঐতিহাসিকতা ও সজীবতা, তা লোকভাষার ক্ষেত্রে তেমন খাটে না।[৫]

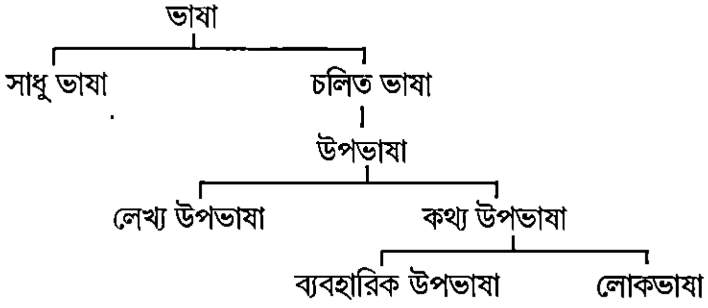

লোকসাহিত্যে ভাষার সাধারণ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে গিয়ে অনেকেই বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পরেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য, "বাঙলা লোকসাহিত্যের ভাষার চতুঃস্তরীয় বিভাগের [ধ্বনিতত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডার] মধ্যে বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের আলোচনাই মুখ্য হওয়া উচিত; কেননা লোকসাহিত্যের ভিত্তি আঞ্চলিক বলে তাতে যেমন ধ্বনিতত্ত্বগত বিভেদ-বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, তেমনি তাতে রূপতত্ত্বগত সরলতা অর্জনের প্রবণতা স্বাভাবিক। ... লোকসাহিত্যের ভাষায় ব্যাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের পরিবর্তন কিন্তু দ্বিমাত্রিক— আঞ্চলিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক। 'সমাজ' অবশ্য এখানে লোকসমাজ।"[৬] অর্থাৎ অঞ্চলভেদে এবং লোকসমাজের রুচি অনুসারে ভাষার বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারে পরিবর্তন হয়ে থাকে। লোকসাহিত্যের আখ্যানমূলক রচনার ভাষারীতি লোকভাষার পর্যায়ে পড়ে কিনা—এ

বিষয়েও যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। ড. নির্মল দাশ লোকনাট্যের ভাষাকে লোকভাষা বলে স্বীকার করেন নি। তিনি মনে করেন, "লোকভাষা লোকসাহিত্যের অঙ্গীভূত, কিন্তু লোকসাহিত্যের সমস্ত ভাষারূপই লোকভাষা নয়। বিশেষত লোকসাহিত্যের আখ্যানমূলক রচনার [গীতিকা, পালাগান, লোকনাট্য ইত্যাদি] বর্ণনা ও বিবরণ অংশে সাধারণভাবে বাগ্‌ভঙ্গির ঐতিহ্যগত ছাঁচের বদলে ভাষার সাধারণ রীতিই অনুসৃত হয়। তাই লোকসাহিত্যের এই অংশগুলিতে লোকভাষার লক্ষণ অনুপস্থিত, শুধু যে অংশে লোকায়ত বাগ্‌ভঙ্গির ঐতিহ্যগত ছাঁচ আছে সেইটুকুই মাত্র লোকভাষা।"[৭] কিন্তু ভাষার ধর্ম চলমানতা, তা যে কোন ধরণের ভাষাই হোক না কেন। ভাষাকে কোন নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা যায় না। তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। লোকসমাজে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে, মান্য ভাষার চাপে লোকভাষাতেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। অতীত ঐতিহ্যবোধের সংকীর্ণ সীমারেখাকে অতিক্রম করে লোকভাষা তার সার্বিক আবেদন সকলের কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট। ফলে লোকভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে বহু নতুন নতুন শব্দ, নতুন নতুন ভাষা।

লোকনাটক যেহেতু লোকসমাজের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সেক্ষেত্রে লোকসমাজের ব্যবহৃত লোকভাষাই লোকনাটকের ভাষা। যে লোকভাষা বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহ্য পরম্পরায় চলে আসছে তার প্রভাব সেই গোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতিতে পড়াটাই স্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের ক্ষেত্রেও লোকভাষা অনিবার্যভাবেই উঠে এসেছে। অবশ্য কখনও কখনও তা প্রাচীন রূপ নিয়ে, আবার কখনও সংযোজন, বিয়োজনের মাধ্যমে নিত্য নতুন রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

গম্ভীরা ঃ

মালদহ জেলার অন্যতম লোকনাটক গম্ভীরা। গম্ভীরা লোকনাটকে মালদহ জেলার কথ্য উপভাষা স্থান পেয়েছে। এই কথ্য উপভাষা বরেন্দ্রী উপভাষার অন্তর্গত। গম্ভীরায় ব্যবহৃত এই কথ্য উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্য উপভাষায় পুরুষবাচক সর্বনামগুলি হল—

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	হামি, হামাকে, হামার	হামরা, হামাদের
মধ্যম	তুই, তুমার, তোখে	তুমাদের, তোরা
প্রথম	অঁই, অয়, অর	অরা

২. বচনের ক্ষেত্রে একবচনে 'টা', 'ডা', 'অ্যাট্টা' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন— মানুষটা। 'গুলা', 'গিলা', 'গুলান' বিভক্তি দিয়ে বহুবচন নির্দেশ করা হয়।

৩. পুংলিঙ্গে কখনও কখনও পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। আবার স্ত্রীলিঙ্গে 'ই', 'নি', 'ইন', 'আন' প্রত্যয় যুক্ত করা হয়।

৪. এই কথ্য উপভাষায় অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় ফের, এখনি, খুভই, কত্তো প্রভৃতি।

৫. ল্যাগ্যা, ছ্যাড়্যা, সাঁথে, কাছে, প্রভৃতি অনুসর্গ যোগে বাক্য গঠিত হত।

৬. মালদহ জেলার প্রচলিত কথ্য উপভাষায় ক্রিয়ার কাল ছিল নিম্নরূপ—

পুরুষ	সাধারণ বর্তমান	সাধারণ অতীত	সাধারণ ভবিষ্যত
উত্তম	হামি যাছি	হামি গেছুনু	হামি যাব
মধ্যম	তুই যাছিস	তুই গেছলি	তুই যাবি
প্রথম	অঁই য্যাছে	অঁই গেছলো	অঁই য্যাবে

বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

বাক্য গঠনের দিক থেকে মালদহ জেলার কথ্য উপভাষা বা লোকভাষা চলিত বাংলার রীতি পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছে। পরবর্তীকালে গম্ভীরায় এই ভাষার বাক্যগঠন রীতির ক্ষেত্রেও তেমন পরিবর্তন দেখা যায় না। যেমন— ক) না-বাচক বাক্য = হামার বংশে কেউ চুরি-চামারি করে না বে।

খ) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্য = একটা-দুটা-তিনটা বলতে বলতে সরকারের আইন ব্রেক ক'ইর‍্যে সাত-সাতটা বেটি হয়্যা গেল।

খন ঃ

স্বাধীনতার পর থেকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা একত্রে পশ্চিম দিনাজপুর নামে পরিচিত ছিল। সেই সময় পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত প্রধান ব্যবহৃত ভাষা ছিল বাংলা ভাষা।[৮] যদিও পশ্চিম দিনাজপুর দুটি পৃথক জেলায় ভাগ হওয়ার পর উপভাষাগত দিক থেকে দুটি আলাদা আলাদা উপভাষা অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হয়। উত্তর দিনাজপুরের ভাষা কামরূপী উপভাষার এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ভাষা বরেন্দ্রী উপভাষার পর্যায়ে পড়ে। আবার অঞ্চলগত ও গোষ্ঠীগত পার্থক্যে এই অঞ্চলের ব্যবহৃত কথ্যভাষার বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। দিনাজপুরের অন্যতম লোকনাটক খনে স্বাভাবিকভাবেই কথ্য উপভাষা ব্যবহৃত হয়। এই কথ্য উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষায় পুরুষবাচক সর্বনামগুলি হল—

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মুই, মোক, মোর	হামা, হামরা, হামার
মধ্যম	তুই, তোক, তোর, তোম্হা, তমার	তহমরা, তমরা
প্রথম	অয়, অক, ওমহা	ওমা, অরা, অমরা, অরহা, ওয়ারা

২. এই কথ্য উপভাষায় একবচনে নির্দেশক বিভক্তি হল— 'ট', 'টা', 'ড', 'ডা', 'খান'। যেমন— মানুষট। বহুবচনে 'লা', 'বহুৎলা', 'ভেল্লা', 'গিলা' বিভক্তি যুক্ত হতে দেখা যায়।

৩. পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে পুরুষবাচক প্রত্যয় হল 'আ' এবং পূর্বপদ হল 'মরদ'। স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের সঙ্গে 'ই', 'ঈ', 'নী', 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে স্ত্রীলিঙ্গ গঠিত হয়। পূর্বপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় 'বেটি'।

৪. অব্যয় হিসেবে আর, ফের, যুদি, হয়তে, তাহো, তানে, কিন্তুক প্রভৃতি যুক্ত হয়।

৫. অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হত আগত, পাছত, সাথ, পাকা/পাকে, লোগি/লি, কহে, তানে প্রভৃতি শব্দগুলি। করণ কারকের 'দি', 'লি' অনুসর্গ এখন অনেকক্ষেত্রে 'দিয়া', 'লিয়া' রূপে উচ্চারিত হয়। এছাড়া 'তানে', 'কহে' শব্দ দুটির পরিবর্তে 'জন্য' শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।[৯]

৬. দিনাজপুর জেলার ক্রিয়ার কালের রূপগুলি হল—

কাল	সাধারণ বর্তমান	সাধারণ অতীত	সাধারণ ভবিষ্যত
উত্তম	মুই যাউ	মুই গেনু	মুই যাইম
মধ্যম	তুই যাইস, তোম্হা যাবেন	তুই গেলো, তোম্হা গেলেন	তুই যাবু, তোম্হা যাবন
প্রথম	অয় যাবে	অয় গেইল	অয় যাবে

বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কথ্য উপভাষা বাক্য গঠনের দিক থেকে বাংলা চলিত ভাষাকে প্রায় সবসময় অনুসরণ করে না বলা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য নঞর্থক বাক্যে না-বাচক শব্দ 'নি'-এর ব্যবহার। যেমন— মুই তমার কোন কিছু খামনি মা। কিন্তু এই কথ্য উপভাষা না-বাচক বাক্যে 'নি' শব্দটি ক্রিয়ার পূর্বপদরূপে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে ক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে দু'জায়গাতেই বসে। যেমন— নি খাম > খামনি। এছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের গঠনরীতি বাংলা চলিত ভাষার মতই। যেমন— কাঁচা বয়সে বেহা দিলে অনেক অসুক হবা পারে।

নটুয়া ঃ

ভাষাগত দিক থেকে দার্জিলিং জেলাকে মূলত তিনটি এলাকায় ভাগ করা যায়। (i) মূল পাহাড়ী অঞ্চলের চলিত নেপালি বা গোর্খালি ভাষা, (ii) পাহাড়তলীর হিন্দির প্রভাবে আংশিক বিকৃত বা মিশ্রিত নেপালি ভাষা এবং (iii) সমতলভূমি বা তরাই অঞ্চলের রাজবংশী ভাষা।[১০] দার্জিলিং জেলার সমভূমি অঞ্চলে রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষার প্রাধান্য হলেও স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের অভিবাসন ঘটেছে। জর্জ গ্রীয়রসন তাঁর 'Linguestics Survey of India' গ্রন্থে দার্জিলিং জেলার সমতলভূমির কথ্যভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে তরাই অঞ্চলে ব্যবহৃত রাজবংশী বা কামরূপী কথ্যভাষাকে 'dialect' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দার্জিলিং জেলার এই অঞ্চলের পশ্চিমে নেপাল, দক্ষিণ-পশ্চিমে বিহার ও দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ অবস্থিত

হওয়ায় যথাক্রমে নেপালি, বিহারি এবং বাংলা ভাষার প্রভাব এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় পড়েছে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি, ও উত্তর দিনাজপুর জেলা কামরূপী ঔপভাষিক অঞ্চল। তাই এই অঞ্চল অর্থাৎ তরাই অঞ্চলের কামরূপী কথ্যভাষায় একধরণের মিশ্রিত রূপ লক্ষ করা যায়। 'নটুয়া' লোকনাটকে দার্জিলিং জেলার ব্যবহৃত কথ্য উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল—

১. দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের রাজবংশী বা কামরূপী কথ্যভাষায় সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়—

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মহ/মুই, মোক, মোর	হামা, হামরা, হামার
মধ্যম	তহ/তুই, তহ্মা, তোক তোর	তম্রা, তম্রালা
প্রথম	অয়, অক, অম্হা, অম্হাক, অহ	অমার, অম্হার

২. একবচনের ক্ষেত্রে 'ডা', 'টা', খান' বিভক্তি যুক্ত হয়ে যথাক্রমে প্রাণীবাচক এবং বস্তুবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন— মানষিডা। আবার 'লা', 'গিলা', 'ভেল্লা', 'মেলা' প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যুক্ত হয়ে বহুবচন হয়।

৩. পুংলিঙ্গ শব্দে সাধারণত 'আ' প্রত্যয় এবং পূর্বপদ হিসেবে 'ব্যাটা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন— ব্যাটা ছোওয়া। তেমনি স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দের সঙ্গে 'ই', 'ঈ', 'নী', 'আনী', প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন— বেরছানী (মহিলা)।

৪. এই কথ্য উপভাষায় আর, ফের, এলা নি, সেলায় না, নাইতে, তাহোঁ, গে, নাতেন, না হয়, বোধায় প্রভৃতি অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. আগত্, পাছত্, সাথত/লগত, নীচত, বাদে, তানে, আগিলা, কাইঠা, তকা (থাকে), তকরা (পর্যন্ত), দিয়া প্রভৃতি এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষায় অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়।

৬. এই অঞ্চলের কামরূপী কথ্য উপভাষায় প্রচলিত ক্রিয়ার কালগুলি হল—

কাল	সাধারণ বর্তমান	সাধারণ অতীত	সাধারণ ভবিষ্যত
উত্তম	মুই/মহ যাছু	মুই গেছিনু	মহ যাম
মধ্যম	তহ যাইস তম্হা যান	তুই গেছিস তম্হা গেছিলেন	তহ যাইস/যাবো তম্হা যাবেন
প্রথম	অয়/অহ যাছে	অয়/অম্হা গেছিলো	অহ/অয় যাবে

বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

তরাই অঞ্চলের এই কথ্য উপভাষার বাক্য গঠনরীতি চলিত বাংলাকে অনুসরণ করেই গঠিত হয়েছে। 'না' বাচক বাক্যে নঞর্থক শব্দরূপে 'নি' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই না-বাচক শব্দ 'নি' আবার কখনও ক্রিয়ার পূর্বে বা ক্রিয়ার পরে বসে। যেমন— .

মামি তোমা কান্দেন নি।

অথবা, মামি গরমিত বিচন দিয়া হাওয়া নি করে।

এছাড়া বাংলা অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের গঠনরীতিও অনুসৃত হয়েছে এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষায়। যেমন— তম্‌হার মামা গেইচে ষোলশ গোপিনী নিয়া লীলা করিবা।

পালাটিয়া ঃ

উপভাষিক অঞ্চলের দিক থেকে বিচার করলে জলপাইগুড়ি জেলা কামরূপী উপভাষা অঞ্চলের অন্তর্গত। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার কথ্যভাষায় কামরূপী উপভাষার প্রাচীন রূপটি বজায় রয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, এই অঞ্চলটি উত্তরবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং চতুর্দিক একই উপভাষার বাচকগোষ্ঠীর দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে অন্য কোন উপভাষা তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না।[১১] তাই কামরূপী উপভাষিক অন্যান্য অঞ্চলের কথ্য উপভাষার তুলনায় এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য। জলপাইগুড়ি জেলার পালাটিয়া লোকনাটকে ব্যবহৃত এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য উপভাষার পুরুষবাচক সর্বনামগুলি নিম্নরূপ—

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মুই, মোক, মোর	হামা, হামাক, হামরা
মধ্যম	তুই, তোর, তোক, তমা	তম্‌রা, তম্‌রালা
প্রথম	অয়, উয়ায়, উয়াক	উমুরা, অম্‌হা

২. একবচনের ক্ষেত্রে প্রাণীবাচক শব্দে 'টা' এবং বস্তুবাচক শব্দে 'খান' যুক্ত হয়, যেমন— মানষিটা, জমিখান। আবার শব্দের শেষে 'গুলা', 'গিলা', 'লা' এবং বহুত্ববোধক শব্দ 'বহুৎলা', 'ভেললা', 'তামান', 'ঘর', 'গটায়লা' যুক্ত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়।

৩. এই কথ্য উপভাষায় 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুংলিঙ্গ হয় এবং পূর্বপদ হল 'ব্যাটা'। স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের শেষে 'ই', 'ঈ', 'আনী' ও 'নী' প্রত্যয় যুক্ত হয়।

৪. না, বা, আরো, তে, নাতেন, গে, তাহোঁ, নাইতে, কিন্তুক, যুদি, এলা সেনি, বাদে, সেলা না প্রভৃতি শব্দ এই কথ্য উপভাষায় অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্য উপভাষায় এমন কিছু অনুসর্গের ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা সাধু কিংবা চলিত বাংলায় এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এই ধরণের অনুসর্গগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত হত।[১২] এই

কথ্য উপভাষায় ব্যবহৃত অনুসর্গগুলি হল— আগ্‌ত, আবানে, উপর, আগিলা, আগাল, কাইন্টা, গোড়, চৈ, ঠে, ঠেনা, তকা, থাকি, দি, তানে, তি, ত্তি, নগত, পাক/পাখ, নাগিয়া, হাতে, প্রভৃতি।

৬. ক্রিয়ার কালের রূপ হল—

কাল	সাধারণ বর্তমান	সাধারণ অতীত	সাধারণ ভবিষ্যৎ
উত্তম	মুই জাও	মুই গেনু/গেইনু	মুই জাইম্
মধ্যম	তুই জাইস, তমা জান্	তুই গেলো, তমা গেইলেন	তুই জাবো, তমা জাবেন
প্রথম	উয়ায়/অয় জায়	উয়ার/অয় গেইল	উয়ায়/অয় জাবে

বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

পালাটিয়া পালায় দেখা যায় কোন কোন জায়গায় না-বাচক শব্দ 'নি' শব্দটি ক্রিয়াপদের পূর্বে বসেছে। যেমন— মুই তমার নি পারিম ভাত আন্ধিবার। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলা চলিত রীতির নিয়মানুসারে না-বাচক শব্দ 'নি', 'না'-তে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ক্রিয়াপদের পরেই তা বসেছে। যেমন— বাবারে মোক তো কাহ চেনেন না।

সরল বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হলেও বাক্যটি বাংলা চলিত ভাষায় রীতিই অনুসরণ করে। যেমন— ঐ বাঁশানীতলার দীঘিটাত ডুবিয়া ভেল্লা সমায় অভা খাবে।

কুশান ঃ

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী অধ্যুষিত জেলাগুলির মধ্যে কোচবিহার জেলার প্রচলিত কামরূপী উপভাষায় বৈচিত্র্যময়তা লক্ষ করা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় প্রাচীন কালের কামরূপ রাজ্যের অধীনস্ত হলেও কোচবিহার জেলা একসময় স্বশাসিত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রাহ্মণ এনে কোচবিহারের রাজারা এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সূত্রপাত করেছিল। তাদের ভাষা-সংস্কৃতি এই অঞ্চলের লোকভাষাতে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে কোচবিহারের রাজদরবারে একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরসূরী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের রাজসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন হয়েছিল।[১৩] তাই এখানকার কথ্যভাষায় বাংলা চলিত ভাষার সংমিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এছাড়া অন্যান্য জেলাগুলির তুলনায় রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা কোচবিহারে দীর্ঘদিন ধরে ছিল। "এই রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার জন্য কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীদের মুখের ভাষার বিকাশ এবং পুষ্টি যেভাবে ঘটেছে, উত্তরবঙ্গের বাকী এলাকাগুলিতে সেভাবে ঘটেনি। একারণেই কোচবিহারের রাজবংশীদের ভাষা ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষা একই উৎস থেকে জন্ম লাভ করলেও সাম্প্রতিককালে ঈষৎ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে।"[১৪] আবার এই জেলার পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ অবস্থিত হওয়ায় প্রান্ত অঞ্চলগুলি

মান্য বাংলার অন্যান্য উপভাষা দ্বারা প্রভাবিত। ফলে এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষায় বাংলা মিশ্রিত যে রূপ পরিলক্ষিত হয়, তা অন্যান্য কামরূপী উপভাষা অঞ্চল থেকে পৃথক। কুশান পালায় বাংলা ভাষার প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেছেন, "এই খানেই মনে হয়, এই অঞ্চলের জনসাধারণ, যারা কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা নিম্ন বা ভাটি অন্ত্য-মধ্যযুগীয়, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকীয় বাঙলা সাহিত্যের দ্বারা কম-বেশী প্রভাবিত হয়েছে। এই জন্যেই সেখানে প্রচলিত কুশানীপালার ভাষাভঙ্গি ও উপস্থাপন রীতি অনেক বেশি পরিমার্জিত বা পরিশীলিত।"[১৫] কোচবিহার জেলার অন্যতম লোকনাটক কুশানে ব্যবহৃত এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১. এই অঞ্চলের কথ্য উপভাষায় সর্বনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়—

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	মুই, মোক, মোর	হামরা, আমরা, হামা, আমাক, হামাক
মধ্যম	তুই, তোর, তোক, তোমরা, তোমাক	তোমাক, তোমা, তোমরালা
প্রথম	উয়ায়, উনায়, উনাক	উমরা, উমাক

২. জলপাইগুড়ি জেলার কথ্যভাষার মতই এখানে প্রাণীবাচক শব্দে 'টা' এবং বস্তুবাচক শব্দে 'খান' যুক্ত হয়ে একবচন গঠিত হয়। অন্যদিকে বহুবচনে শব্দের শেষে 'গিলা', 'লা' এবং বহুত্ববোধক শব্দ 'ম্যালা', 'ঘর', 'গটায়লা' যুক্ত হয়।

৩. পুরুষবাচক শব্দের সঙ্গে 'আ' ও 'উ' প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ এবং 'ই','ঈ', 'নি', 'আনি' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গে গঠিত হয়।

৪. আর, নাহয়, নাতেন, না হইলে, বা, তবু, তাও, কিন্তুক, তাঙ, কি বোলে, নাকি, বুলি, বাদে, বুঝি, পাছে, বোধায়, হায়, বারে ইত্যাদি এই কথ্য উপভাষায় অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. এই কথ্য উপভাষায় অনুসর্গ রূপে পাওয়া যায় করি, করিয়া, কাইনটাত, চাইতে, চায়া, ছারা, টে, জইননে, তানে, থাকি, দিয়া, নাগি, নাগোত, প্রভৃতি।

৬. কোচবিহার জেলার কথ্যভাষায় ব্যবহৃত ক্রিয়ার কাল নিম্নরূপ—

কাল	সাধারণ বর্তমান	সাধারণ অতীত	সাধারণ ভবিষ্যৎ
উত্তম	মুই জাঙ্	মুই গেলুঙ্	মুই জাইম্
মধ্যম	তুই জাইশ, তোমরা জান্	তুই গেলু, তোমরা গেইলেন	তুই জাবু, তোমরা জাবেন
প্রথম	উয়ায়/উনায় জায়	উয়ার/উনায় গেইল	উয়ায়/উনায় জাবে

বাক্য গঠনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

বাক্য গঠনগত দিক থেকে এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় না-বাচক বাক্যে না-বাচক শব্দ 'না' কোন কোন সময় ক্রিয়াপদের পূর্বে আবার কখনও ক্রিয়াপদের পরে বসে। যেমন— তোর এই রাজসিংহাসনের অমর্যাদা যেন কোনদিনও মুই না করঙ্।

অথবা, এলা এইটা ছারা তো মুই আর কুনো রাস্তা দেখির ধরচুঙ্ না।

এছাড়া অসমাপিকাযুক্ত বাক্যের গঠনরীতিতে চলিত বাংলার অনুসরণ করা হয়। যেমন— রাইজ্যখান বিশ্বামিত্র মুনিক দিয়া মুই খিব শান্তি পালুঙ্।

উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলার মধ্যে (দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার কিছু অংশ বাদ দিলে) কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা প্রচলিত। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কামরূপী উপভাষার অস্তিত্ব আজ সংকটময়। বাংলা, হিন্দি, নেপালি প্রভৃতি ভাষার সর্বব্যাপী প্রভাব বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষায়। ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে উত্তরবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চল। তাই সুদূর অতীত থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাজ্যগুলি থেকে ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। অনিবার্যভাবে এর প্রভাব পড়েছে ভাষা ও সংস্কৃতিতে। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা থেকে দিনাজপুরের বেশ কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করা হলে ওপার বাংলা থেকে বেশিরভাগ বাংলা ভাষাভাষি মানুষ উত্তরবঙ্গে চলে আসে। এর পর ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে সেখান থেকে বহু অ-মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। আবার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে বৃহৎ মাত্রায় অনুপ্রবেশ ঘটে। বলাবাহুল্য এরা বঙ্গালী উপভাষিক অঞ্চলের মানুষ। তাই এদের বেশির ভাগেরই কথ্যভাষা বঙ্গালী। সেই সময় কামরূপী ও বঙ্গালী উপভাষার সংমিশ্রণে প্রচলিত হল এক নতুন ধরনের ভাষা।[১৬] উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্বে যে সমস্ত লোকনাটকগুলি প্রচলিত ছিল, সেগুলি পরবর্তীতে আর পাওয়া যায়না। সেই পালাগুলির জায়গা দখল করে নতুন নতুন পালা। যদিও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কুশান, নটুয়ার মত পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর লোকনাটকগুলি। কিন্তু কালের নিয়মে আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের ফলে লোকনাটকগুলি ফর্ম অক্ষুন্ন থাকলেও বহিরঙ্গে চলে আসে পরিবর্তন। লোকনাটকের ভিত্তিভূমি গ্রাম্যসমাজ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি গ্রাম্যসমাজের জীবিকা ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রাত্যহিক জীবনের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। সংস্কৃতায়নের ফলে শহর ও গ্রামের জীবনচর্যায় ভাবগত আদান প্রদানের মাধ্যম রূপে ভাষা ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে ভাষাটি গ্রাম ও শহর উভয় পক্ষের বোধগম্যতার উপর নির্ভরশীল। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের ফলে আবালবৃদ্ধ-বনিতার মান্য বাংলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পাশাপাশি জীবিকার তাগিদে শহরমুখী হওয়ায় ভাষা ব্যবহারে চলিত বাংলার প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। তাই অনিবার্যভাবেই উত্তরবঙ্গের জেলাভিত্তিক কথ্য উপভাষাগুলিতেও

চলিত বাংলার প্রভাব পড়েছে। আর সেই কারণেই লোকনাটকগুলির ব্যবহৃত ভাষায় সর্বনাম, বচন, অনুসর্গ প্রভৃতি রূপতাত্ত্বিক দিকগুলি পরিবর্তিত হয়। যেমন— গম্ভীরায় ব্যবহৃত মালদহের কথ্য উপভাষার বিবর্তিত রূপ। বর্তমানে গম্ভীরার ভাষায় যে রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলি পরিলক্ষিত হচ্ছ সেগুলি হল—

i) মালদহের কথ্যভাষায় পূর্বে ব্যবহৃত সর্বনামগুলি ছাড়াও এখন গম্ভীরায় চলিত বাংলার সর্বনামগুলিও যথা— আমি, আমার, আমরা, তোকে, আপনি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

ii) ইদানীং গম্ভীরায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একবচনে 'টা' এবং বহুবচনে 'গুলা' বিভক্তির ব্যবহার হতে দেখা যায়।

iii) গম্ভীরায় এখন স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে 'আন' প্রত্যয়ের ব্যবহার তেমন লক্ষ করা যায় না।

iv) পূর্বে ব্যবহৃত অব্যয়গুলি ছাড়াও এখন গম্ভীরায় আর, আবার, বা, ও, খালি, বরং, নাইলে, নাহলি প্রভৃতি চলিত বাংলার অব্যয়গুলির ব্যবহার করা হয়।

v) অনুসর্গের মধ্যে দিয়া, দিয়্যে, থাকি, থাইকা, লাগে, নাইগা প্রভৃতি গম্ভীরায় বর্তমানে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে।

vi) বর্তমানে গম্ভীরায় ব্যবহৃত লোকভাষার ক্রিয়ার কালের রূপটি হল—

কাল	সাধারণ বর্তমান	সাধারণ অতীত	সাধারণ ভবিষ্যৎ
উত্তম	হামি/আমি যাই	হামি/আমি গেছিনু	হামি/আমি যাবো
মধ্যম	তুই যাইশ/যাশ, আপনি/আপনে যান	তুই গেছলি, আপনি/আপনে গেছিল্যান	তুই যাইবি/যাবি আপনি/আপনে যাইব্যান
প্রথম	অঁয় যায়	অঁয় গেছলো	অঁয় যাইবে

শুধুমাত্র গম্ভীরা লোকনাটকের ক্ষেত্রেই নয়; খন, নটুয়া, পালাটিয়া ও কুশান লোকনাটকেও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে ভাষাগত রূপান্তর লক্ষ করা যায়। এই লোকনাটকগুলির লোকভাষাতে সর্বনাম, বচন, অনুসর্গ প্রভৃতি রূপতাত্ত্বিক দিক থেকে নানা পরিবর্তন ঘটে চলেছে। রূপতত্ত্বগত এই পরিবর্তনের পেছনে মান্য চলিত বাংলার প্রভাব অনেকখানি কার্যকারী হয়েছে বলে মনে করা হয়।

এছাড়া পালাগুলিতে ভিন্ন শব্দভাণ্ডার থেকে গৃহীত নতুন নতুন আগন্তুক শব্দের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহার, অসম সন্নিকটে থাকায় উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতিতে মিশ্র প্রভাব পড়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রান্ত অঞ্চলগুলিতে নেপালি, হিন্দি, অসমিয়া প্রভৃতি ভাষাভাষি বাচকগোষ্ঠীর অবস্থানের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষাগুলিতে বৈচিত্র্যময়তা লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে একসাথে বসবাসের ফলে লোকভাষাগুলিতে বিভিন্ন শব্দ ঢুকে পড়েছে। যেমন— হিন্দি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ মূলত উত্তরবঙ্গের বিহার সীমান্তের অঞ্চলগুলির কথ্যভাষায় বা লোকভাষায় ব্যবহৃত হয়। এই হিন্দি শব্দগুলিই লোকনাটকে কখনও অপরিবর্তিত অবস্থায়, আবার কখনও বিকৃত অবস্থায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমেও হিন্দি ভাষা

সরাসরি জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকনাটক গম্ভীরা, খন ও নটুয়ার কথা বলা যেতে পারে। দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলা বিহার সন্নিহিত হওয়ায় এই অঞ্চলে কথ্য লোকভাষা ও সংস্কৃতিতে হিন্দি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন—

i) **হিন্দি শব্দের ব্যবহার ঃ**

নটুয়া— দহি, টুটা, শিরা মে, লাটকাঞঁ, তোহার, কামরুখমে, আইসান, গাউরী, কৈসে, ধরতি, লাখরি, মেরা, কদমোকো ইত্যাদি।

ii) **হিন্দি বাক্যের ব্যবহার ঃ**

গম্ভীরা— 'জিয়ামে জান আগেয়া হামারে।'

'কমলী মুঝকো ছোড়তা হায় লেকিন ম্যায়নে কমলীকো নেহি ছোড়ঙ্গা।'

নটুয়া ছাড়াও খন ও পালাটিয়া লোকনাটকেও এই ধরণের হিন্দি ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইদানীং প্রতিবেশী আগন্তুক শব্দ ছাড়াও উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে বিদেশি শব্দের আগমন ঘটছে। বিদেশি ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজি থেকে প্রচুর শব্দ যেমন মান্য চলিত বাংলায় গৃহীত হয়ে চলেছে, তেমনি তার রেশ এসে পড়ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উপভাষিক বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে। সরাসরি কিংবা চলিত বাংলার মাধ্যমে অনেক ইংরেজি শব্দ উপভাষাগুলির মধ্যে প্রবেশ করছে। স্বাভাবিক ভাবেই লোকনাটকগুলিকেও এই ইংরেজি শব্দ যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। তবে তা প্রায় অনেক্ষেত্রেই ইষৎ পরিবর্তিত রূপে। আবার কখনও কখনও তা কেবল ইংরেজি শব্দ ব্যবহারেই সীমিত থাকেনি, বাক্যেও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। যেমন—

i) **ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ঃ**

খন ঃ গ্যারান্টি , রেকর্ড, জবকার্ড, ডাইরিয়া, ইনজেকশন, সার্টিফিকেট, ইসকুল, রেশন কার্ড, সাব-সেন্টার, ডাক্তার ইত্যাদি।

গম্ভীরা ঃ সাইজ, ডিজাইন, ব্রেক, ভি. আই. পি পারসেন, ইমিডিয়েটলি, মার্ডার, ক্যাডার, গো ব্যাক, ডোনেশন, রেফার, সিট, রেক্টিফাইট, ইউটিলাইসড ইত্যাদি।

ii) **ইংরেজি বাক্য বা বাক্যাংশের ব্যবহার ঃ**

গম্ভীরা ঃ 'ও মাই গড।', 'কারেক্ট ইয়োর আইডিয়া।', 'অ্যাটেনশন স্টেডি ওয়ান-টু- থ্রি-গো।', 'ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, নাউ।', 'হোয়াই গিভ মি অ্যানসার?', 'নেভার আই কান্ট বিলিভ ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ।' ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র

১. ড. রামেশ্বর শ', সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, পৃ. ৬৪৫।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৬।

৩. ড. নির্মল দাশ, লোকভাষা থেকে ভাষালোক, পৃ. ১১-১২।

৪. ড. আশিস্কুমার দে, ড. সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, লোকভাষা, পৃ. ২০।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৭. ড. নির্মল দাশ, লোকভাষা থেকে ভাষালোক, পৃ. ১৭।

৮. সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরী, পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, পৃ. ৩২।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১০. অজিতেশ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, মধুপর্ণী, দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩২৫-৩২৬।

১১. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা, পৃ. ২২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১৪. সত্যেন্দ্রনাথ বর্মণ, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কথ্যভাষা ঃ ইতিবৃত্ত, সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ (গবেষণা অভিসন্দর্ভ) পৃ. ৩৯।

১৫. জগন্নাথ ঘোষ, সম্পাদক, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ বর্ষ ১সংখ্যা, পৃ.২৪।

১৬. দেবাশিস ভৌমিক, উপভাষা ঃ মিশ্রণ ও বিলুপ্তি, পৃ. ২৫।

উপসংহার

উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপ এত বিচিত্র যে কোথাও পার্বত্য অঞ্চল, তো কোথাও সমভূমি অঞ্চল। ফলে জলবায়ুর তারতম্যও লক্ষ করা যায় এখানে। এত বৈচিত্র্য বলেই হয়ত এখানে বহু ভাষাভাষি মানুষ একত্রে মিলেমিশে বসবাস করে। তাই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে মিশ্র ভাষা-সংস্কৃতি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিনিয়ত এখানে জনসমাগম ঘটে চলেছে। উত্তরবঙ্গের ভূ-খণ্ড প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও অসম দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, তদুপরি সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে। আবার সমাজ যেভাবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলিকে প্রভাবিত করছে ঠিক তেমনিভাবেই লোকসংস্কৃতিও বহুদিন ধরে সমাজের বিভিন্ন ধারাকে পরিবর্তিত করে চলেছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমাজ ও লোকসংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান করছে। কারণ সমাজকে বাদ দিয়ে লোকসংস্কৃতিকে ভাবা যায় না। দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, উন্নত যোগাযোগ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি প্রতিনিয়ত সমাজকে বদলে দিচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন লোকসংস্কৃতি তথা লোকনাটককে নানাভাবে রূপান্তরিত করে চলেছে।

পূজা-পার্বণের উপর ভিত্তি করে লোকনাটকগুলি সৃষ্টি হলেও আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক রূপেই এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ফলে লোকনাটকে ধর্মকে ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এরপর ধীরে ধীরে লোকনাটকগুলি বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হতে থাকে। কোথাও সমাজ, কোথাও পুরাণ, আবার কোথাও বা কল্পনা-রূপকথা প্রভৃতি প্রাধান্য পেতে লাগল। এ ধরনের লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম পালাটিয়া, গম্ভীরা, খন, চোরচুন্নি, আলকাপ, কুশান, নটুয়া প্রভৃতি।

যেহেতু লোকনাটক সৃষ্টি মুহূর্তে ধর্মকেন্দ্রিক ছিল তাই শুরুতে লোকনাটকের বিষয়বস্তু রূপে প্রাধান্য পেয়েছিল বিভিন্ন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই ধরনের পুরাণ বা মঙ্গলকাব্য বিষয়ক লোকনাটকগুলিতে বিষয়গত তেমন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সাথে সাথে পৌরাণিক কাহিনির মধ্যেও বর্তমান নানা সামাজিক সমস্যা উঠে আসে। পুরাণের মোড়কে সমাজের যে সমস্ত বিষয় লোকনাটকে তুলে ধরা হত তার মধ্যে ন্যায়-নীতিবোধই বেশি প্রাধান্য পেত। কিন্তু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ যখন রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল তখন কেবল ন্যায়-নীতি-আদর্শের দোহাই দিয়ে পৌরাণিক লোকনাটকগুলি আর টিকে থাকতে পারল না। মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকনাটকেও এল রূপান্তর। সাধারণ মানুষ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বদলে নিজেদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখের প্রতিবিম্ব দেখতে চাইল। এভাবে একসময় চাহিদা বাড়ল সামাজিক

লোকনাটকের। কিন্তু তাই বলে এটা কখনই নয় যে, পৌরাণিক লোকনাটক একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এখনও তা স্বমহিমায় বিরাজমান। তবে এর ফর্ম অনেকটাই বিবর্তিত হয়েছে। লোকনাটক এখানেই থেমে থাকেনি, সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি এতে স্থান পেয়েছে রাজনীতি। যেমন, আলোচ্য গম্ভীরা লোকনাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে একসময় গম্ভীরা উৎসব প্রচলিত হয়েছিল। গম্ভীরা উৎসবের প্রধান দুটি দিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং বোলবাই বা গীতাভিনয়; কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে গম্ভীরা লোকনাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। কাহিনি হিসেবে প্রথমদিকে স্থান পেয়েছিল আধ্যাত্মিক বিষয়। এর পেছনে কারণ মূলত ধর্মীয় ভাবনা থেকে জাত গম্ভীরা উৎসব। তবে শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ই নয়, পাশাপাশি সমাজজীবনও উঠে এসেছে গম্ভীরায়। লোকনাটক যেহেতু লোকসাংবাদিকতার চরম নিদর্শন তাই গম্ভীরাতেও স্থান পেয়েছিল স্থানীয় খবর, সমাজের দুর্নীতি, ব্যক্তিগত কুৎসা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে অবশ্য এতে রাজনীতি প্রাধান্য পায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে লোকনাটকগুলিতে যেখানে মূল গায়ক, তার সহকারী দোহার এবং কিছু বাদ্যযন্ত্রী মিলে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করত সেখানে চরিত্রানুযায়ী নতুন নতুন শিল্পীর আগমন ঘটেছে। যেমন— গম্ভীরায় যে শিব মূর্তির সামনে শিল্পীরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ তুলে ধরত, পরবর্তীকালে সেই শিব একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে আসরে উপস্থিত হল। দেবতার এই মানবীকরণের রূপ মঙ্গল কাব্যেও দেখা গেছে। লোকনাটকেও দর্শক ও শ্রোতা সেই দেবতাকে মানবরূপে আসরে প্রতিষ্ঠা করল। আবার নারী চরিত্রে যেখানে পুরুষেরা অভিনয় করত সেখানে নারীরা অভিনয়ের সুযোগ পেল। এছাড়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শোষক চরিত্রগুলি বিবর্তিত হয়ে নবরূপ গ্রহণ করেছে। ফলে লোকনাটকেও জোতদার, জমিদার চরিত্রের পরিবর্তে উঠে এসেছে ইংরেজ, নেতা-মন্ত্রীরা।

লোকনাটকের উপস্থাপন ও অভিনয়ের দিক থেকে যে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটে চলেছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। লোকনাটকের প্রদর্শন শৈলীগত বিভিন্ন উপাদানগুলি যেমন— মঞ্চরীতি, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র ও আলোকসজ্জার ক্ষেত্রে বিবর্তন ঘটছে। চারদিক উন্মুক্ত, সমতল গোলাকার আসর আজ তিনদিক খোলা, উঁচু প্ল্যাটফর্ম যুক্ত বর্গাকৃতি আসরের রূপ নিয়েছে। অভিনেতাদের সাজসজ্জার জন্য গ্রিন রুমের ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শিল্পীরা সাধারণ সহজলভ্য সাজসজ্জার পরিবর্তে আধুনিক প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার অনুকরণ লক্ষণীয়। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র যেমন— হারমোনিয়াম, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি লোকনাটকে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে হ্যাজাক ও লণ্ঠনের পরিবর্তে লোকনাটকের আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক আলো ও জেনারেটর।

লোকসাহিত্যের ভাষা যেহেতু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তাই একই এলাকায় লিঙ্গ, পেশা ও বয়সভেদে এই ভাষায় তারতম্য লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের বৃহৎ অংশ কামরূপী ঔপভাষিক অঞ্চলের অন্তর্গত। কিন্তু ভৌগোলিক, সামাজিক দিক থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাজ্যগুলির ভাষা

এবং সংস্কৃতির প্রভাব এখানে মিশ্র ভাষা-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। ফলে বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজির মতো বিদেশী শব্দগুলির সর্বব্যাপী প্রভাব লোকনাটকের ভাষাতেও এনেছে বিরাট রূপান্তর।

সর্বোপরি বলা যেতে পারে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীন থাকার ফলে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি বংশপরম্পরায় উত্তরবঙ্গের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এছাড়া পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী গণ আন্দোলনগুলির, যেমন— তে-ভাগা আন্দোলন, তিনবিঘা ও বেরুবাড়ি আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, কামতাপুর, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের জনমানসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লোককবিরা প্রতিবাদ জানাল সামাজিক লোকনাটকে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও রাজনীতির দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতেও তারা তৎপর হল। ব্রিটিশ রাজত্বকালে তাদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তুলে ধরেছিল লোকনাটকের মতো হাতিয়ার। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বহুক্ষেত্রে লোককবিদের এই সংগ্রামী মনোভাব অবিচল থাকেনি। আর্থ-সামাজিক চাপে শাসক ও শোষকযন্ত্রের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে লোকনাটকের দলগুলি। যে লোকনাটকগুলি একসময় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত, তা ক্রমশ শাসকদলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। জনমানসে সংবাদ পরিবেশনে লোকনাটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য তাই বর্তমানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রচারকার্যের জন্য লোকনাটককে বেছে নিয়েছে। ফলে লোকনাটকগুলি ক্রমশ প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় এর আগে পূর্বসূরী গবেষকদের সংকলিত লোকনাটকগুলিতে যে ধরনের ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা ও রীতি লক্ষ করি তা আধুনিক লোকনাটকগুলিতে প্রায় পাওয়া যায় না। পূর্বে 'নয়নশ্বরী' বা 'মাইয়াবন্ধকী'র মতো পালাগুলি সমাজে যতটা জনপ্রিয় ছিল, বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই পালাগুলি সাধারণ মানুষ আর পছন্দ করেন না। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা আধুনিক জীবনসমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত পালাগুলিই বেশি পছন্দ করেন। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে ভূমি-সংস্কার আন্দোলন, তে-ভাগা, ভেস্ট প্রভৃতি গণ আন্দোলনগুলি মানুষের চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আগেকার মতো এখানকার মানুষের হাতে অত সময় নেই। কৃষিকাজের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে চা-বাগান ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠায় মানুষ কৃষিকাজের চাইতে এগুলির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। ফলে অফুরন্ত সময় হাতে না থাকায় তারা আর তেমনভাবে লোকনাটক রচনায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। তাই ধীরে ধীরে লোকনাটকের দলগুলি বসে যেতে শুরু করেছে। তবে বর্তমানে সরকারী সাহায্য শিল্পীদের মনে এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু সবক্ষেত্রে হয়তো এই সরকারী সুযোগ মিলছে না। যেক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য মিলছে সেখানে শিল্পীরা তাদের অনলস প্রচেষ্টায় লোকনাটককে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। সময়াভাবে দীর্ঘ পালাগুলি সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে থিয়েটার, সিনেমা ও যাত্রার সর্বগ্রাসী প্রভাব লোকনাটকের সার্বিক রূপান্তরের

জন্য দায়ী। দর্শক ও শ্রোতা ধরে রাখতে সিনেমা ও যাত্রার সাথে পাল্লা দিয়ে লোককবিরা তাদের পালায় কাহিনি, চরিত্র, মঞ্চসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিতে রূপান্তর নিয়ে এসেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে লোকনাটকের এই রূপান্তর লোকনাটকের প্রাচীন ঐতিহ্যকে খর্ব করেছে। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে বিবর্তনের পথ ধরে নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে যাওয়াই যেমন সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম, তেমনি সংস্কৃতির রূপান্তরও এক অনিবার্য ঘটনা। তাই সমাজ বিবর্তন যতই আধুনিক হোক না কেন অথবা বলা যায় লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে নাগরিক বা শিষ্ট সংস্কৃতির আগ্রাসী ছায়া যতই দীর্ঘতর হোক লোকসংস্কৃতির মৌলিক পরিকাঠামো কখনই পুরোপুরি হারিয়ে যেতে পারে না। তাই লোকসংস্কৃতির স্বার্থেই লোকনাটকের এই রূপান্তর আমাদের স্বগর্বে ও স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিতে হয়।

লোকনাটকের সংগ্রহ ও সংকলন

গম্ভীরা

(১)

তুমি হয়ে চাষী কাশীবাসী কেন কাশীশ্বর,
তোমার কর্মক্ষেত্র এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষেত্র তব হর।
লয়ে মদন রতির লাঙ্গল ঈশ, চাষ জুড়েছো জগদীশ
(তুমি) বিষম বেগে বিপুল বিশ্ব ঘুরাও নিরন্তর।
ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণু কুমার বীজ-বুনানি মজুর তোমার
কতই না বীজ হয় না সুমার ওহে গঙ্গাধর।
তুমি বীজ বুনাতে ব্রহ্মায় ভুগাও বিষ্ণু দ্বারা ফসল ফলাও
নিজে বসে ঠুম্‌রু তালে ডুম্‌রু বাজাও ঝুম্‌রুতে গান ধরো।
মন আত্মা দুই বলদ বেঁধে, কর্ম জোয়াল চাপিয়ে কাঁধে
মায়া রজ্জু নাশায় ছেদে কতই না আর তাড়।
সুখ দুঃখ শক্ত যোতা সেই জোয়াল আছে যোতা
পাছায় আশা লাঠির দিচ্ছ গুঁতা ও হে বিশ্বেশ্বর।
সৃষ্টি হতে লয় পর্য্যন্ত চাষের কি হবেনা অন্ত
তুমি কিঞ্চিদপি হওনা ক্ষান্ত, ওহে বিশ্বেশ্বর।
তব ক্ষেত্র এ ত্রি-সংসার, দিনে দিনে হচ্ছে অসার
হরিমোহন বলে ও সারৎসার, সার বিতরণ কর।

সংগ্রহসূত্র ঃ শ্রী ফণীগোপাল পালের গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'উত্তর বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড (নির্বাচিত সংকলন), (১৯৮১) থেকে উক্ত পালাটি সংগৃহীত।

(২)

রিপোর্ট/শেখ সফিউর রহমান বা সূফী মাষ্টার

(এর পটভূমিকায় আছে ১৩৪৫ সালের মালদহের বন্যা)

চাচা জান বাঁচা দায় হলো বানে শহর যায় ভায়স্যা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগ্‌ছে দুয়ারে বইস্যা।।
ক্ষীরোদ সাহা, মহেন্দ্র শেঠে বাঁধলো বান বালুরঘাটে।
বাঁধ ভ্যাঙ্গ্যা ঢুকল বান, একজিবিশানের মাঠে।
মাঠে হুক্কা ভাসে, দেখে পোষ্টমাষ্টার হাসে।।
আবার কালী সাহা করে আহা, ব্যাঙ্কের পাঁচিল যায় ধ্বস্যা।
খাঁ সাহেবের রাব গুড়ের টিন, জলে ডুবেছিল তিনদিন,
দিশা প্যায়্যা উঠায় গিয়া মাছিতে ভিন ভিন।
বাবু ছগনলাগ তার নাম, গুড়ের দিচ্ছিলেন তিনি দাম।
তোমরা খ্যায়া দ্যাখো সবাই ল্যাগবে না পয়সা।
উপেনবাবু পড়ে পাঁকে, লালবিহারী বাবুকে ডাকে
গঙ্গাদেবীর পূজা কর শীঘ্রি ঢোল ঢাকে।
আবার রাখালবাবু পাম্পসু অ্যালবার্ট
বাটা কোম্পানীর মত ঠাঁট।
ও তার ঘরের মধ্যে ঝুলছিলো আলনাতে হ্যাট-সার্ট।
সে সব টকি হলে আম গাছেরই তলে।
তোমরা হেসো না কো লেগে ঢেউ হয়েছি কি দশা।।
রোহিনীবাবুর মটর ভাসে মুরারী সাউজী দেখে হাসে।
মনোমোহন সাহা তাড়াতাড়ি যায় নৌকার তল্লাসে।
নৌকা না পেয়ে শেষে টিনের বোট বানাতে বসে।।
আবার সদর গেটে বেন্ধে রাখে দড়িতে কস্যা।
আশুবাবুর কপাল মন্দ রথবাড়ীর পুকুর করলো বন্ধ।।
মাছ পালালো গোঁদরাইলে নাই তাতে সন্দেহ্।
এ সব শুনে হৈ চৈ তাড়াতাড়ি গেলাম লাঙ্গলবাবুর বাড়ী।।
ও তার ডুবেনি ঘর, কেবল পায়খানা রস্যা।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি প্রদ্যোত ঘোষের 'লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার' (১৪১০) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

(৩)

সাহেবের প্রতি ভারতবাসীগণের উক্তি

গান

সাহেব হে তোদের ভাগ্যলিপি মোদের জানা,
জানি মোরা আগে হতে এত দুঃখ তোর বরাতে
(একবার) বিপদ কালে হরিনাম কর না।

১.

ছিলি এতদিন তোরা আত্মঅহঙ্কারে
মনে করতিস তোদের মতো আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
আছে একজন উপরে তারই ন্যায্য বিচারে
(সাহেব) এত কষ্ট তোদেরই পাওনা।

২.

সীমা আছে সব কাজের অতিশয় ভালো নয়
অতি দর্পে হত লঙ্কা সারা রাজ্য হল লয়
বল তো দেখি কেন শুনি সুভাষবোসের মৃত্যুবাণী
(করিস) কেন ভারতকে প্রবঞ্চনা।

৩.

ভারতবাসী মোরা প্রজা তোরা রক্ষাকর্তা
যেমন পুত্রে রক্ষা করেন তাহার মাতা পিতা
(তোদের) গেল কোথায় পরাক্রম রক্ষা করতে অক্ষম
(সাহেব) আমরা হলে মুখ দেখাতে পারতাম না।

৪.

চিরকাল দুঃখে কষ্টে দেহ জর্জরিত
পরাধীন ভারতবাসী মোরা হায় কেঁদেছি নিয়ত
অবিচারের যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছি কত কষ্টে
(সাহেব) তার ফল কি তোরা ভোগ করবি না!

৫.

তোদের কাছে ভারতবাসী মহামূর্খ জানোয়ার

কিছুই জানে না তারা এ ধারণা তোদের সবার
তবে কেন হে বিজাতি কৃপা করে মোদের প্রতি
(মোদেরকে) বলে বেড়াস যুদ্ধে সবাই চল না।

৬.

এত কষ্ট সহেও মোরা রাজা বলতে অজ্ঞান
রাজার কল্যাণে ভারত দিতে পারে স্বীয় প্রাণ
হলেও মোরা পরাধীন সম্রাটের এ দুর্দিন
(কখনও) পরানে আমাদের সইবে না।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি পুষ্পজিৎ রায়ের
'গম্ভীরা' (২০০০), গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

(৪)

ভেষ্ট দখল

(রচনা ঃ উপেন্দ্রনাথ দাস, সময় ঃ ১৯৭০ খ্রীঃ, সূত্র ঃ ঐ খাতা)

(পথে এক যুবক জনৈক যুবতীর খোপায় লাল ঝাণ্ডা গুঁজিয়া দিলে)

(গান)

যুবতী ঃ কোন সাহসে লাফিয়ে এসে গায়ে হাত বাড়ালি
তুই কে শয়তান।
পেয়ে একলা কুলবালা করলি কেন অপমান।।

যুবক ঃ ফ্রন্ট সরকার হয় শরিকদার বামপন্থি ধরি নাম।
ভেষ্ট দখলে জিগির তুলে হাতিয়ার হাতে লাল নিশান।।

যুবতী ঃ যুক্তফ্রন্টকে করবি ঠান্ডা, তোমরা যত হুড়ের পাণ্ডা
সামাল কর তোর লাল ঝাণ্ডা নইলে ছোরার মুখে দিবি জান।।

যুবক ঃ ছোরাছুরি গুলি গোলা লিয়ে মোরা করি খেলা
ভেষ্ট দখলের বসিয়ে মেলা চালাই দেশে অভিযান।।

যুবতী ঃ ভেষ্ট দখলে তোমরা পোক্ত দুর্বলের যম শক্তের ভক্ত
দেখে টাটা বিড়লার চক্ষুরক্ত দূর হতে বাজাও সেলাম।।

যুবক ঃ নয়ত আমরা তেমন ছেলে জুজুর ভয়ে যাই আঁচল তলে
বুকের রক্ত দিব ঢেলে উড়াইতে বিজয় নিশান।।

যুবতী ঃ বাপের হোটেল পেয়ে খোলা, খেয়ে বনেছ তাগড়া জালা
দেখাইছ কত ঢং-এর খেলা, ষাঁড়ের মত দিয়ে তরপান।।

যুবক ঃ দেশের বুকে সামরাজ্য করতে খতম মোদের জেহাদ
রেখো জেনে মোদের স্বভাব করব সবকে এক সমান।।

যুবতী ঃ উঠেছে তোদের মরণপাখা, তাইত চলছ এঁকাবাঁকা
পেয়ে তোদের ভোগের পাঁঠা, দেশ সেবায় দেয় বলিদান।

যুবক ঃ শত শহিদের রক্তমাখা, মোদের দেশের স্বাধীনতা
রাখতে বজায় তার মর্য্যাদা আছে শত ক্ষুদিরাম।।

যুবতী ঃ শুনে মুখে হাসি থামে না, কাহার সাথে কার তুলনা
কদমতলায় দাওগা থানা তোমরা কচুর বনের কালাচাঁন।।

যুবক ঃ স্বাধীন যুগের তোমরা নারী চিনতে দেহের ছাড়লো নাড়ি
মাঝ দড়িয়ায় দিছে পাড়ি উড়িয়ে শাড়ি সাঁঝ বিহান।।

যুবতী ঃ সতীমায়ের সুবোধ ছেলে মরবে কেন কুকর্ম ফলে
যাও চলে যাও মায়ের কোলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম।।

যুবক ঃ তোমরা কু আর হামরা কর্ম মানি নাত গুরু ব্রহ্ম
শিকায় তুলে আপন ধর্ম সইতে নারি কামের টান।।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি ড. ফণী পালের 'গম্ভীরার কবি-শিল্পীদের জীবন-কথা ও সংগীত সংগ্রহ', (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

(৫)

বন্দনা

শিব হে! হে বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর
ধ্বংস বুঝি বিশ্ব চরাচর।
চলে ধ্বংস লীলা ওহে ভোলা
মারণ যজ্ঞ নিরন্তর।

১) রাশিয়ার অস্ত্র পাঞ্জাবে চালান সরকারী পাহারাতে
খালিস্থানীরা করছে ধ্বংস সেই অস্ত্রাঘাতে
শিশু নারী যুবা অগণন শিখের হাতে হচ্ছে নিধন
সরকার কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে দিনে দিনে হত্যা বাড়ছে
পুলিশ পাহারায় ভাষণ বিলায় অপদার্থ সিদ্ধার্থ শঙ্কর।

২) মোদের পুলিশের মত পুলিশ আছে কি কোন দেশে
হত্যা লুণ্ঠন দমন পীড়ন পরিণত অভ্যাসে
বিহার, আসাম, উড়িষ্যা জুড়ে লক আপেতে পিটিয়ে মারে
মানুষের চক্ষু উৎপাটন, দলবদ্ধ হয়ে নারী ধর্ষণ
মোদের মন্ত্রীগণ চালায় শাসন এই পুলিশেই করে নির্ভর।

৩) গণতন্ত্র নয় দলতন্ত্র চলছে এই ভারতে
খুনি গুন্ডা লম্পট চিটার ঢুকছে সব দলেতে
দাদাদের মদতের জোরে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ঘুরে
দলের নির্বাচনের তরী বাহিতে এরাই যে কান্ডারী
ব্যস্ত বিলাস ব্যসনে প্রমোদ ভ্রমণে ভারতের মন্ত্রীপ্রবর।

৪) খণ্ডিত পাকিস্থান আর ঐশলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে
মিলিটারী শাসন চলে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে
অস্ত্র বলে অতি বলীয়ান দুই শিয়ালের একই রকম তান
বন্দুকের জোরে শাসন আর ভারতের বিরুদ্ধে গর্জন
ভুট্টোর পত্নী কন্যা নসরৎ বেনজির ভারত বিরুদ্ধে সদামুখর।

৫) শিশু নারীর তরে হচ্ছে কত সভা সমিতি
হোটেল রেস্টুরেন্ট চায়ের দোকানে তাদের কি দুর্গতি

দিবারাত্রি পরিশ্রম করে পচা বাসী খেয়ে উদর পুরে
তার উপর মালীকের অত্যাচারে নীরবে কত অশ্রু ঝরে
বলে গোপীনাথ ওহে ত্রিনাথ মৃত্যুই বোধ হয় শ্রেয়স্কর।

চার-ইয়ারী

১) দিল্লীর জুমা মসজিদের ইমাম আবদুল্লা বুখারি ঃ ভারত সরকার করছে অবিচার
কাশ্মীরে গণভোট চাই মোরা।

২) সুভাষ ঘিসিং ঃ মোদের আন্দোলন থামবে না কখনো গোর্খাল্যান্ড ছাড়া।

৩) পাঞ্জাবের খালিস্তানপন্থী শিখ ঃ জান করা হ্যায় কোরবান্ চাহিয়ে খালিস্তান।

৪) জনৈক ভারতীয় ঃ মুসলিম গুর্খা পাঞ্জাবী শিখ কত দেশদ্রোহী
কেহ্ মার্কিন কেহ্ পাকিস্থান ভারতশত্রুর পদলেহী
ভারতে বসে দাঙ্গা লাগায় শিশু নারী হত্যা চালায়
এইসব মীরজাফরের দল হিন্দু বিদ্বেষ যাদের সম্বল
বুখারি আর সাহাবুদ্দিন দুই মোল্লাই এক সমান
ভারতশত্রু এই দুটি বেইমান
জেলখানাই এদের উপযুক্ত স্থান।

(২)

১) ভারতের মুসলমান দিন করছে গুজরান ভয়ে হয়ে কম্পমান।

২) গোর্খাল্যান্ডের জন্য মোরা সঁপেছি দেহ প্রাণ।

৩) হিন্দু শেষ করেঙ্গে খালিস্তান লেঙ্গে।

৪. (ক) খুনী জল্লাদ হত্যাকারীতে পাঞ্জাব পরিপূর্ণ
অপদার্থ সিদ্ধার্থ ব্যর্থ, বীরত্ব তার চূর্ণ।
ভিন্দ্রেয়ালার মদতদাতা বুঝছে সব কংগ্রেসী নেতা
পাঞ্জাবে কি বীভৎস লীলা নরমুণ্ড নিয়ে খেলা
পাকিস্থান আর কিছু মুসলমান গোপনে অস্ত্র যোগায়
কাপুরুষ শিখেরা নারী শিশু হত্যা চালায়।

৪. (খ) সুভাষ ঘিসিং তিরিং তিরিং লাফায় অতিশয়

দার্জিলিংএ চায় গোর্খাল্যান্ড এই মহাশয়
মিথ্যাবাদী ধূর্ত অতি কথা পাল্টায় দ্রুতগতি
ক'রে ধ্বংস বহিয়ে রক্ত পাবে দার্জিলিংএর তক্ত।
মিটবে না সাধ ওরে উন্মাদ ওরে ঘিসিং অর্ব্বাচীন।
বাংলা ভাগের আশা মিটবে না কোনদিন।

বেহাই-বেহান

বেহান ঃ হায় বিধি কি গুণনিধি পেয়েছি জামাই
এই ইতরের ঘরে মেয়ে পড়ে মেয়ের দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

বেহাই ঃ মুখ সামলে বল কথা, ছোটলোক কেন এলে হেথা
গলাধাক্কায় দিব বিদায় জেনো শেষ কথা
পালিয়ে মেয়ে করেছে বিয়ে এমন ছেলে পাবে কোথায়।

বেহান ঃ সুন্দরী পাশ করা মেয়ে, কত জন হতাশ হলো চেয়ে
তোমার গুণধর পুত্র পালায় মেয়েকে নিয়ে
পনের হাজার টাকার কম হবে না, গয়না আর নগদ টাকায়।

বেহাই ঃ পনের হাজার টাকা মাত্র, কোথায় পাবে এমন পাত্র
লক্ষ টাকা দেনেবালা ছিল যত্র তত্র
প'ড়ে মেয়ের খর্পরে ছোট লোকের ঘরে, ছেলে এমন করলে হায়।

বেহান ঃ তাই বুঝি করবে অত্যাচার, মেয়েকে প্রাণে করবে সাবাড়
এত টাকা-গয়না দেখেছ কি বাপের কালে তোমার
থানায় যাব এজাহার দিব, দেখি রক্ষা কে করে তোমায়।

বেহাই ঃ যদি মেয়ের ভাল চাও, টিভি মোটরবাইক পাঠাও
নইলে চিরতরে মেয়ের আশা ছেড়ে যথা ইচ্ছা যাও
মারবো কাটবো যা ইচ্ছা করবো, দেখি কে মেয়ে নিয়ে যায়?

বেহান ঃ তবে শুন শেষ কথা, মেয়ে যদি করে আত্মহত্যা
গুষ্টি শুদ্ধ জেলে খাটাবো হবে না অন্যথা
চললাম থানায় দেখি কিবা হয় পুলিশ ছাড়া।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি ২৫.১০.২০০৯ তারিখে প্রশান্ত শেঠের (কুতুবপুর গম্ভীরা পার্টির পরিচালক) কাছ থেকে সংগৃহীত।

(৬)

গম্ভীরা (২০০৪ সাল)

কন্যাসন্তানের পিতা (গান) ঃ দড়ি দিব আমি গলায়
ঐ দড়ি দিব আমি গলায়
বাড়া ভাতে পড়ল আমার ছাই
এবার দড়ি দিব।

অবিবাহিত যুবক ঃ দড়ি কেন দিবি রে?

কন্যাসন্তানের পিতা (গান) ঃ ও সাত বেটির পরে জমজ বেটি
এত দুখ কি সহ্য যায়
বাড়া ভাতে পড়ল আমার ছাই।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ এ ভাই, ভাই।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কি হইছে বে?

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমার একটা ব্যবস্থা করে দে ভাই।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আব্বে হইল কি?

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ বাড়ি-ঘাট জমি-জায়গা সবকাটা গঙ্গায় পড়ি গেল।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আব্বে বল না বে কি হইল।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কি আর বলবো মুখ দেখা ঠেলা হইচে না, বোঝেন তো।

গান ঃ আরে কি হল রে ওকি কইবো রে
কি করি উপায়
বাড়ি ঘর জমি জায়গা সবকাটা মোর গঙ্গায়।
হায় কি হল রে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ এ —

অবিবাহিত যুবক ঃ কি হল বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আজ তিন কাল চইলে গেছে এককাল আছে।

অবিবাহিত যুবক ঃ হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বাড়ি হচ্ছে কালিয়াচক পাঞ্চানন্দপুরে।

অবিবাহিত যুবক ঃ হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ এর আগে তো গঙ্গার জলে কাটতে কাটতে শ্যাষ হইচে। তাও তিন চার কাটার মধ্যে বাড়িটা ছিল।

অবিবাহিত যুবক : হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা : একটু লাইগ্যা ছিল সেটাও এবার কাইটে কুইটে চলে গেল। এখন ওর অবস্থাটা কি হইছে। আর তোর কি হইছে।

অবিবাহিত যুবক : আবে তুই তো বললি ওর তিনকাল চলে গেছে এককাল আছে।

কন্যাসন্তানের পিতা : হ্যা।

অবিবাহিত যুবক : আর হামার তো চারকাল চলে গেছে ফাওয়ে চলছি বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : মারব শালা ফাওয়ে চলছিস। ফাওয়ে কুনদিন মানুষ চলে বে।

অবিবাহিত যুবক : আব্বে ওর চাইতে দুঃখ হামার বেশি বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কি দুঃখ ?

অবিবাহিত যুবক : শুনবি।

কন্যাসন্তানের পিতা : হ্যা বল।

অবিবাহিত যুবক (গান) : বয়স আমার গেল ভাটিয়া
বাপ মায়েতে দিছে না বিয়া
আকর বাকর করছে ভিতর
তোহো শোনার কেহ নাই।

কন্যাসন্তানের পিতা : আরে চুপ না বে।

অবিবাহিত যুবক : কেমন করে চুপ হবে। চোখে হাত দিয়ে চুপ হবে না বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : চুপ চুপ চুপ চুপ।

অবিবাহিত যুবক : দেখতো শালা কানছি চোখে আর পেট টিপলে কেমন করে চুপ হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কি হয়েছে তোর।

অবিবাহিত যুবক : হামার না, হামার বাপ শালার ব্যাটা শালা।

কন্যাসন্তানের পিতা : বাপকে কেউ শালার ব্যাটা বলে। সবাই জানে— পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতাহি পরমাণু তব। পিতৈ প্রতিমাপন্নে পিয়ন্তে সর্বদেবতায় নমঃ।।
আর তুই বাবাকে শালা বলছিস।

অবিবাহিত যুবক : ওরকম বাপকে ধনঞ্জয়ের মতো ফাঁসি দিয়ে দিব রে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কেন কি হইছে।

অবিবাহিত যুবক : হামরা না দুটা ভাই, আর একটা বোন আছে বিয়া দিবার মত।

কন্যাসন্তানের পিতা : তুই ছোট না বড় ?

অবিবাহিত যুবক : আব্বে হামি ছোট থাকলে তো হামার দুঃখই ছিল না বে। আব্বে হামি বড় বে বড়।

কন্যাসন্তানের পিতা : তো দুঃখটা কি।

অবিবাহিত যুবক : হামার ছোট ভাইটা পাড়াতে একটা খিটকাল করে বসে আছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : চুরি চামারি করেছে নাকি বে।

অবিবাহিত যুবক : মারব শালা বে। হামার বংশে কেউ চুরি চামারি করে না বে।

হরিভক্ত গোসাই : পকেট মেরেছে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কি হয়েছে?

অবিবাহিত যুবক : হামার ছোট্ট ভাইটা পাড়াতে একটা মেয়ের সাথে পেরেম করছিল। পেরেমটা পাকাপাকি যখন হয়্যা গেল তখন কালির থানে লিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে সিন্দুর দিল। বিয়া কইর‍্যে বাড়ি ছাড়া হইল তো হইল পাড়া ছাড়্যে অন্য পাড়ায় চইল্যে গেল।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : যা।

অবিবাহিত যুবক : হামার বাপ শালার ব্যাটা শালা মনে কইরছে —

সর্বশ্রান্ত কৃষক : আবার গাল দিলি বে।

অবিবাহিত যুবক : হামার বাপ মনে কইরছে ছোট ব্যাটা তো বিহা করে আলাদা হয়েই গেল, আর হামি যদি এখন বড় ব্যাটাকে বিহা দেই বড় ব্যাটাও যদি ছোট ব্যাটার মত বাড়ি ছাড়্যে পাড়া ছাড়্যে অন্য জাগায় চইল্যে যায়। তা হামার বাপের একটা বেটি আছে, ওর বিহাতে তো হামি টাকা পয়সা দিব না, কত বড় চালাক শালা হামার বাবা দ্যাখ।

কন্যাসন্তানের পিতা : ব্যাপারটা তা নয়। এ শালা শাক দিয়্যা মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : কি রকম ?

কন্যাসন্তানের পিতা : আসলে শালা এক পয়সা রোজগার করে না।

অবিবাহিত যুবক : কে বলে রোজগার করি না বে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : কি করিস বে।

অবিবাহিত যুবক : ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠি বে। ভ্যান লিয়ে চলে যাই রথবাড়ি, রথবাড়ি থ্যাকা মঙ্গলবাড়ি, মঙ্গলবাড়ি থ্যাকা সাহাপুর, সাহাপুর থ্যাকা কত কত জায়গা ঘুরি বে। সাঝবেলা বাড়ি ঢুকি। বাবার হাতে সত্তর টাকা, আশি টাকা, নব্বই টাকা প্রত্যেকদিন উঠিয়ে দি। এরকম ভালো ছেলে মালদা ডিস্ট্রিকে নাই বে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	ঠিক ছে রে।
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	তাহলে ভাই আরো কোন কারণ আছে।
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	এ কি হল !
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	কোনো মেয়ে ওকে পছন্দ করছে না। কোনো মেয়ের বাপ দেখতেও আসছে না।
অবিবাহিত যুবক	ঃ	আব্বে শালা, এই তো কয়দিন আগে বে, কয়দিন আগে হামার বিহার জন্য সাত সাতটা লোক আসলো।
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	তোকে দেখতে !
অবিবাহিত যুবক	ঃ	হামাকে না তো বুড়াকে বে।
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	আমাকে টানছিস কেন বে।
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	তারপরে —
অবিবাহিত যুবক	ঃ	সাত-সাতটা লোক আসলো হামার বিহার জন্য বে। হামি দেখলাম যে লোকগুলাকে মানসম্মান করতে হবে। একটা টালির ঘর আছে, টালির ঘরে একটা মাদুর পেতে দিলাম। ওখানে বইসলো লোকগুলা। হামি চইল্যে গেলাম মুদিখানার দোকানে।
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	কি করতে বে।
অবিবাহিত যুবক	ঃ	লোকগুলাকে মানসম্মান কইরতে হবে না বে, জিনিস পত্তর আনতে হবে -
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	ও তুই মুদিখানা গেলি।
অবিবাহিত যুবক	ঃ	হ্যা গেলাম, ওখানে গিয়ে একমুঠা বিড়ি আর দেড়শ গ্রাম মুড়ি আনলাম।
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	উরি বাব্বা, তোর মুড়ি কম আছে কেন বে।
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	আব্বে কম আছে কেন বে।
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	ওই দেড়শ গ্রাম।
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	হ্যা দেড়শ গ্রাম মানে কি? কটা বাড়ি লিয়ে একটা ঘর হয়, কটা ঘর লিয়ে একটা বাড়ি হয়?
সর্বশ্রান্ত কৃষক	ঃ	ঠিকই তো।
কন্যাসন্তানের পিতা	ঃ	কটা বাড়ি লিয়ে একটা পাড়া হয়, কটা পাড়া লিয়ে একটা গ্রাম হয়। দেড়শ গ্রাম আনি দিল তো!
অবিবাহিত যুবক	ঃ	আবে শালা বিদ্যাসাগরের ভাতিজা। আবে দেড়শ গ্রাম মুড়ি ওজন করে আনলাম বে। সাত-সাতটা লোককে মানসম্মান করতে হবে বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ও বাটখাড়াতে ওজন।

অবিবাহিত যুবক ঃ আনলাম, এনে ওদেরকে দিলাম।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আচ্ছা তারপর।

অবিবাহিত যুবক ঃ লাল চা দিলাম। ওরা খাচ্ছে এমন সময় হামার বাপ ঢুকল ঘরের ভিতরে। বাপ ঢুকে বলছে, বলেন হামার ছ্যালে পছন্দ। মেয়ের বাপ বলছে, হ্যা পছন্দ। তখন মনে কি হইছে বে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কি হইছে?

অবিবাহিত যুবক ঃ মনে হইছে ঘরের ভিতর হামার বিহা হইল কি হইল বে।

হরিভক্ত গোসাই ঃ হবে, আর হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তারপরে।

অবিবাহিত যুবক ঃ তখন মেয়ের বাপ বলছে হামার বাপকে, হামার মেয়ে পছন্দ। হামার বাপ বলছে হ্যা পছন্দ।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ দুপক্ষেই রাজী।

অবিবাহিত যুবক ঃ উভয় পক্ষের যখন পছন্দ হয়েই গেছে তখন লেনদেনের কথাবার্তাটা বলেন।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হ্যা আজকাল লেনদেনটাই তো বিশাল সমস্যা।

অবিবাহিত যুবক ঃ হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ মেয়ে পছন্দ হোক, আর ছেলে পছন্দ হোক বা না হোক লেনদেনটাই হচ্ছে। আজকার যার বাড়িতে বিবাহ উপযুক্ত কন্যা রয়েছে, সে যেন জুতার দোকান খুলে রয়েছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ জুতার দোকান করে কি বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আরে শালা জুতা কিনতে যাইস কি না।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হা যাই।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ জুতা কিনতে গেলে কোনোটা সাইজ পছন্দ হল, সাইজে হল, কালার পছন্দ হল না, কোনোটার কালার পছন্দ হল তো ডিজাইন পছন্দ হল না। ওরকম মেয়ে দেখতে গেলে ওমা মেয়েটা একটু বেটে হয়ে গেল, ওমা মেয়েটা একটু লম্বা হয়ে গেল। মেয়েটা একটু কালো হয়ে গেল। সবদিক দিয়ে যদি পোষালো তো দেনাপাওনাতে বসালাম। তো মেয়ের বাপ জুতার দোকান খুলেছে তো না কি করেছে।

অবিবাহিত যুবক ঃ আবে হামার বাপ আর মেয়ের বাপ উভয়পক্ষেই মিলে পছন্দ করি নিল বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আচ্ছা তারপর।

অবিবাহিত যুবক ঃ তারপরে মেয়ের বাপ বলছে, বলেন হামি খুব গরীব মানুষ। কি লিবেন বলেন? বলছে আপনি আর কি দিবেন পনরো হাজার টাকা লগদ দিবেন।

হরিভক্ত গোসাই ঃ পনরো হাজার বে।

অবিবাহিত যুবক ঃ পনরো হাজার বে হামার গুষ্টিতে কেউ নম্বরই দেখে নি বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ শুন ভাই, পনরো হাজার টাকা লগদ তো লিবি।

অবিবাহিত যুবক ঃ হ্যা লিব।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ সঙ্গে একজন ভালো লোক লিয়ে যাস।

অবিবাহিত যুবক ঃ কেনে এতে ভালামন্দ সবাই যাবে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আরে শালা আজকাল যে হারে ৫০ টাকার নোট, ১০০ টাকার নোট, ৫০০ টাকার নোট জাল বারিয়েছে, তোকে তো সব নোট জাল দিবেই তোর বিহাও জাল হইবে।

অবিবাহিত যুবক ঃ শালা তোদের মত বোকা আছি বে।

হরিভক্ত গোসাই ঃ বোকার বিয়া কে দিবে।

অবিবাহিত যুবক ঃ নম্বরীর পালার টোপর দিয়ে যাব কেন বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ টাকা নিবা না শালা।

অবিবাহিত যুবক ঃ টাকা আজকাল কোন জামাই ছেড়ে দিছে বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তুই কি লিবি বে।

অবিবাহিত যুবক ঃ ভিখারী দেখে শ্বশুর বরকে শুধু রেজকি দিবে বে। আমার বাবা আর একটা ভালো জিনিস চাইল।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কিরে?

অবিবাহিত যুবক ঃ ইণ্ডিয়া-পাকিস্থানের খেলা পাবে হামার বাড়িতে ঠুন মিলাবে। হামার বাপ বলেছে একটা টিবি দিবেন টিবি। টিবি দেখব বে খাটে বসে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ শুন বন্ধু।

অবিবাহিত যুবক ঃ হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তুই যখন আমার ছোটকালের বন্ধু, টিবি যখন পাবি আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু বিয়ের আগে তোর হবো শশুরের কাছে তোর একজন বন্ধু পাঠিয়ে দিস।

অবিবাহতি যুবক : কি জন্যে বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কারণ টিভি যে দিবে টিভির সাথে যেন একটা ব্যাটারি দেয়।

অবিবাহিত যুবক : ব্যাটারি কি করব হামি বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : আরে শালা তোর বাড়িতে কি ইলেকট্রিক লাইন আছে বে টিভিটা চালাবি।

অবিবাহিত যুবক : কি শালা বোকা রে, হামার বাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইনের কুন দরকার আছে রে।

হরিভক্ত গোসাই : আবে ঐ, তোর টিবিটা কি কুপিতে চলবে বে।

অবিবাহিত যুবক : এতগুলা লোক আছে কাওরো টিবি কুপিতে জ্বলছে বে জিজ্ঞাসা কর তো।

হরিভক্ত গোসাই : তুই চালাবি কিসে বে।

অবিবাহিত যুবক : হামার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলাদা ব্যবস্থা করেছে।

কন্যাসন্তানের পিতা : তোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলাদা ব্যবস্থা করছে!

অবিবাহিত যুবক : হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা : কি ব্যবস্থা করছে।

অবিবাহিত যুবক : হামার বাড়ির পাশ দিয়ে লাইন গেছে হামি হুক দিয়ে টেনে লিছি, পয়সা লাগে না বে।

কন্যা সন্তানের পিতা : ওরে শালা তোর বিয়াও হুক হয়ে যায় রে।

অবিবাহিত যুবক (গান) : দেড়শ গ্রাম মুড়ি আর একমুঠি বিড়ি গেল রে।

বিয়া আর হইল না রে

বয়স আমার গেল ভাটিয়া

বাপ মায়ে দিছে না বিয়া

আকর ফাকর করছে ভিতর

উহু করার কেউ নাই।

হরিভক্ত গোসাই : হরির কৃপায় সংসার চালাই।

কন্যাসন্তানের পিতা : ওরে আমার জগাই মাধাই।

হরিভক্ত গোসাই : জগাই মাধাই কি আছে বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : শালা হরির কৃপায় সংসার চলছে। হরি কি তোর বাড়ির হাট বাজার করে দিছে। না হরি তোর বাড়িতে মানি অডার করে টাকা পাঠাছে বে।

হরিভক্ত গোসাই : আবে হরি বাজার ঘাটও করে দেয় না, আর মানি অডার করে টাকা পয়সাও

পাঠায় না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তাহলে।

হরিভক্ত গোসাই (গান) ঃ কীত্তন হবে বুড়াবুড়ি তলাতে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কীত্তন হবে বুড়াবুড়ি তলাতে।

হরিভক্ত গোসাই (গান) ঃ চইলে গেলাম কৃষ্ণপল্লী চাঁদা ওঠাতে

চইলে গেলাম রথবাড়ী চাঁদা ওঠাতে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বাড়ে এত বড় একটা অনুষ্ঠান হবে, এত দল আসবে, এত খরচ হবে প্রচুর টাকার দরকার তো।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আবে কোন অনুষ্ঠান হবে না আর কোন দলও আসবে না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কোন অনুষ্ঠান হবে না, কোন দলও আসবে না!

হরিভক্ত গোসাই ঃ না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তবে টাকাগুলা?

হরিভক্ত গোসাই ঃ টাকাগুলা আমার পেট কীত্তন।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আরে শালা হরির নামে ভণ্ডামী।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আরে হরির নামে ভণ্ডামী বলছিস। বর্তমান যুগের একশ্রেণীর নেতারা কি করছে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বর্তমান যুগের রাজনৈতিক নেতারা কি করছে?

হরিভক্ত গোসাই ঃ রামকে বেচ্যে খাইচে, তা আমি হরিকে বেচ্যে খাইলাম তো কি হইচে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ওরে শালা কী পাইকারী হাল দেখ।

হরিভক্ত গোসাই ঃ হরির কৃপায় সংসার চালাই।

কন্যাসন্তানের পিতা (গান) ঃ দড়ি দিব আমি গলায় (২)

ওরে বাড়া ভাতে পড়ল আহা ছাই

এবার দড়ি দেব।

হরিভক্ত গোসাই ঃ দড়ি কেনে দিবি?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আরো তোরা এই গৌড় বাদরলের কালীপূজা কমিটি থেকে আমাকে সবাই দশওয়ালী থেকে ফাঁসি ঝুলিয়ে দে ভাই।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আব্বে তোর হয়েছে কি?

কন্যাসন্তানের পিতা (গান) ঃ ও সাত বেটির পরে যমজ বেটি

এত দুঃখ কি সহ্য যায়

অবিবাহিত যুবক ঃ আব্বে তুই করেছিস কি বে, সাত-সাতটা বেটি তোর।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তাহলে—

অবিবাহিত যুবক ঃ তুই ঘুমাইছিস কেমন করে রে, খাইছিস কি রে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ একটা-দুটা-তিনটা বলতে বলতে সরকারের আইন ব্রেক কইর‌্যে সাত সাতটা বেটি হয়্যা গেল।

অবিবাহিত যুবক ঃ চিন্তার কথা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হুতাসে একটা ভাতও ঢুকে না।

অবিবাহিত যুবক ঃ কেমনে ঢুকবে?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ চোখে ঘুম আসে না।

অবিবাহিত যুবক ঃ কেমনে ঘুমাবি?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ দিন দিন একবারে রোগা হয়্যা লিকলিকায়ে যাছি।

অবিবাহিত যুবক ঃ হবে হবে হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ এ দিন যায় দিন যায় হঠাৎ একদিন হামার বউ ভাটিবেলায় ইশারা করে ডাকছে।

অবিবাহিত যুবক ঃ তোকে?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তো তোকে ডাকবে শালা হামার বউ?

অবিবাহিত যুবক ঃ আচ্ছা তোকে ডাকলো তোকে ডাকলো।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ এ ঢেমনা বোকা শালা। হামাকে ইশারা করে ডাকেছে। হাজার হলেও বউ ডাকেছে। মনটা শালা আকুলি হয়া উঠেছে। সাথে সাথে চলে গেনু। বউ বলছে শুন গো শুন। কি হল গো। হামার না আর একটা হোবে।

অবিহিত যুবক ঃ হ্যা শালা বুড়হার আর একটা হবে বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হামিও দেখলাম অষ্টম গর্ভ। অষ্টম গর্ভে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম হইছে। এবার বেটা সিওর সাউডাঙ্গি। সারাবিশ্বে এমন শক্তি নাই যে রুখে যায়। ৩ মাস, ৪ মাস, ৫ মাস, ৬ মাস, ৭ মাস, ৮ মাস, ৯ মাস যেই পার হইচে হঠাৎ একদিন হামার বউ, হ্যাগো গা-হাত হামার কেমন কেমন করে, ভাল লাগে না গো ভালো লাগে না। হামিও তাড়াতাড়ি রিকসাওয়ালাকে ডেকে এনে রিকসাতে উঠিয়ে লিগে হাসপাতালে ভরে দিনু।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আবে হাসপাতালে ভরে দিলি না, ভর্তি করলি।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হ্যা হ্যা ভর্তি করি দিনু।

হরিভক্ত গোসাই ঃ ওইটা বলবে কে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হামাকে তো ঢুকতে দিবে না ঐ ঘরে।

হরিভক্ত গোসাই ঃ না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হামি দুয়ারটা চিনে রাখনু, আর হাসপাতালের সামনে যে বিড়ি সিগারেটের দোকানগুলা আছে, ওখান থেকে এক মুঠা বিড়ি আর একটা দেশলাই লিলি।

হরিভক্ত গোসাই ঃ লিয়া লিলি।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ লিয়া ঐ হাসপাতালের যেই ঘরে আছে, ঐ সামনে বারান্দাতে পাইচারি দিছি। কুনোটা বিড়ি ধরিয়া ফেলছি, কোনটা না ধরিয়া ফেলছি।

অবিবাহিত যুবক ঃ এত আনন্দ সব একসঙ্গে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ এসবের মধ্যে কিছুক্ষণ পর দুয়ার খুলল।

অবিবাহিত যুবক ঃ কে রে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ একটা দিদিমণি।

অবিবাহিত যুবক ঃ দিদিমণি তোকে চিনতে পারল।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ চিনবে না বে, হামি একটা ভি. আই. পি পারসেন।

অবিবাহিত যুবক ঃ আচ্ছা কুনো খবর টবর আইল।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হ্যা বলল আপনের তো খুব ভালোভাবেই হয়েছে।

অবিবাহিত যুবক ঃ যাক ভালো।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ যাক মনটা ভালো হল, তাও কি মন মানছে বে। মনের ভিতর খাও খাও করছে। ফের একটু আগিয়ে গেলাম, বলেন না দিদিমণি, বললাম তো আপনার দুইটা হয়েছে।

অবিবাহিত যুবক ঃ দুটো হারে শালা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ জিয়া মে জান আগেয়া হামারে, বাবা আরে কামাল ডাবলিং।

অবিবাহিত যুবক ঃ একটা পায়না হামি দুইটা। তাও মন মানছে না, মনটা খাউ খাউ —

অবিবাহিত যুবক ঃ করবেই করবেই।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ফের আগিয়ে গেলাম বলেন না দিদিমণি, উঃ আপনারা বড্ড বিরক্ত করেন বললুম তো আপনার দুটো মেয়ে হয়েছে, দুটোই দেখতে সুন্দর।

অবিবাহিত যুবক ঃ যা শালা, দুটো মেয়ে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হামিও ওখানে কাইত।

হরিভক্ত গোসাই ঃ তুই তখন কোথায় বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হামি হাসপাতালে ভর্তি।

হরিভক্তি গোসাই ঃ তোর জ্ঞান কখন ফিরল?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তারপর দিন ভাটিবেলায়।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আর ছুটি কখন হল।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ছুটি হল তারপর দিন সকালে। হামাকেও ছুটি দিলে হামার বউকেও ছুটি দিলে।

হরিভক্ত গোসাই ঃ বাড়ি কিভাবে আসলি?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ হামি একটা বেটি কোলে লিলু, হামার বউ একটা বেটি কোলে লিলো। লিয়া ন-বেটির মাগ-ভাতার সাইজে নয়া কইর‍্যে গৃহ প্রবেশ করনু।

অবিবাহিত যুবক ঃ ভালো ঠেটাইছে রে।

কন্যাসন্তানের পিতা (গান) ঃ ও সাত বেটির পরে যমজ বেটি

এত দুঃখ কি সহ্য যায়

বাড়া ভাতে পড়ল আমার ছাই।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ শুন ভাই।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কি?

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমরা এখন খুব বিপদে চলছি, শুধু আমরা চারজনা না বে, আমাদের মতো হাজার হাজার লাখো লাখো বেকার ফালতু ফালতু ঘরে বসে আছে। এসব বেকারের সমস্যা সমাধান কিভাবে হবে, কাকে বলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তার মানে তুই বলতে চাস যে, আমরা চারজনায় শুধু সমস্যায় জর্জরিত মানুষ।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ নানারকম সমস্যায় জর্জরিত। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে, বাসভাড়া বাড়ছে, ট্রাক ভাড়া বাড়ছে, ঘরে ঘরে বেকার বাড়ছে। কাজ নাই অনাহার-অর্ধাহার নানারকম সমস্যায় আজ সারা ভারতবর্ষ জর্জরিত· অতএব এই সমস্যার সমাধান কাকে বললে কি হবে। কিন্তু যাকে তাকে যেখানে সেখানে বললে হবে না।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আজ কাউকে গিয়ে বলবা হয়তো তোমাকে ৫০০ টাকা দিল, তুমি ২ দিন, ৪ দিন,

অর্ধাহার অনাহারে তোমার দিনাতিপাত হল। ওর মেয়ের বিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানকে বলল তারা হয়ত দুই হাজার, পাঁচ হাজার করে দিল ওর সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু ভারতবর্ষে আপামর জনসাধারণের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অতএব আমাদের যে কাণ্ডারী, আমাদের যে মাথার ছাতা সেই দেবাদিদেব মহাদেব শিব ঠাকুরকে ডাকো। ডেকে আমাদের দুঃখের কথা বলো। তাতেই সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নচেৎ নয়।

হরিভক্ত গোসাই : আব্বে শুন, শিব ঠাকুর নানা থাকে কৈলাসে। অঁয় কি ডাকলে চলে আসবে বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : ভক্তের বল ভগবান। প্রহ্লাদ যদি থামের মধ্যে পেয়ে থাকে আমরা সমস্যায় ডাকলে আসতে বাধ্য।

হরিভক্ত গোসাই : আসবে।

সকলে : শিব গো হে।

অবিবাহিত যুবক : নানা আসছে ঐ যে নানা চলে আসছে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কই নানা।

অবিবাহিত যুবক : ঐ যে নানা আসছে। কি হল চমকাসছিস কেন বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : চমকাই নি।

অবিবাহিত যুবক : তবে।

কন্যাসন্তানের পিতা : ঘাবড়ায়ছি।

অবিবাহিত যুবক : ঘাবড়ালি কেন বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : এখানে এ কেটে পড়লো!

অবিবাহিত যুবক : এটা কে রে! ওরে বাবা রে।

কন্যাসন্তানের পিতা : শোন তুই আমার ছোট বেলার বন্ধু।

অবিবাহিত যুবক : হ্যা হ্যা আমি তোর বন্ধু।

হরিভক্ত গোসাই : আব্বে শোন প্রথম কাজ কাকে ডাকলাম? কে আইল পরিচয় নিতে হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা : হ্যা।

অবিবাহিত যুবক : শালা তখন থেকে যা বলছি হা-হা। মনে কর আমরা তোকে দলের নেতা করলাম।

কন্যাসন্তানের পিতা : ও মাই গড, আমি তোদের দলের নেতা!

অবিবাহিত যুবক : হ্যা নেতা করলাম।

কন্যাসন্তানের পিতা : তাহলে ইমিডিয়েটলি একটা ফুলের মালা এনে দে।

অবিবাহিত যুবক ঃ আগে নেতার মত কাজ কর তার পর ফুলের মালা দিব।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তাহলে আমি নেতা।

অবিবাহিত যুবক ঃ নিশ্চই।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি যা বলবো তাই তোরা শুনবি।

অবিবাহিত যুবক ঃ নিশ্চয় শুনবো।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি যা বলবো তাই তোরা করবি।

অবিবাহিত যুবক ঃ নিশ্চয় করবো।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি নেতা হয়ে আদেশ করছি এগিয়ে যাও। মালটা কে আছে দেখে এসো।

অবিবাহিত যুবক ঃ ঐ নেতা, এটা কুন যুগের নেতা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বর্তমান যুগের নেতা।

অবিবাহিত যুবক ঃ বর্তমান যুগের নেতার কাজ কি?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ দোতালায় বসে বউকে নিয়ে টিভি দেখবে নয়তো সিডি দেখবে, ক্যাডারকে পাঠিয়ে দেবে যা শালাকে মার্ডার করে আয় নাতো মার্ডার হয়ে আয়। আব্বে ক্যাডার মরলে ক্যাডার পাবি, নেতা মরলে নেতা পাবি? নেতা নেতা নেতা নেতা হেন ধন। নেতার জন্য পাগল গৌড়বাদ রোডের জনগন।।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ ঠিকই বলেছিস।

অবিবাহিত যুবক ঃ ঠিক তো বে নেতা মরলে নেতা তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে না। ক্যাডার মরলে ক্যাডার রাতারাতি হাজারটা পাওয়া যাবে। এই শালা একে পাল্টা, নেতা এর দ্বারা হবে না।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আব্বে শুন, প্রাণের ভয় সবারে আছে এমন একটা যুক্তি বার কর মরলে চারজনে মরব, বাঁচলে চারজনে বাঁচবো।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কারেক্ট ইয়োর আইডিয়া। মিলিমিশি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। দশের লাঠি একের বোঝা। কে আগে যাবে, কে মরবে, কে বাঁচবে, কে বিধবা হবে।

অবিবাহিত যুবক ঃ আবে হাট।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি রেডি ওয়ান-টু-থ্রি গো। সবাই এক সঙ্গে পারপারে যাব। অ্যাটেনশন স্টেডি ওয়ান-টু-থ্রি গো।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আবে ধর।

অবিবাহিত যুবক ঃ ঐ নেতা তুই কি বললি বে ওয়ান-টু-থ্রি গো। আমরা তিনজনা গো , আর তুই

একা গো ব্যাক।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ গো ব্যাক কেন হব। আমি কি বললাম রেডি ওয়ান-টু-থ্রি গো।

অবিবাহিত যুবক ঃ হ্যা গো।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ সামনে কি পিছনে বামে কি ডানে তা তো বলিনি, যায় যেদিকে পারো পারপারিয়া গো।

হরিভক্ত গোসাই ঃ এই কথাটা আছে কি বে, ওকে চিনতে হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ওকে চিনতে হবে বললেই পারিস, এটা তো মামুলি ব্যাপার।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ পায়ে কি দেখছিস বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি, নাউ।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ বাপরে ইংরেজিতে গাল বে।

অবিবাহিত যুবক ঃ তোকে বলল কে আছে চিনা আয়, তুই কি চিনা আসলি।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ চিনা আয় নিজে রে।

অবিবাহিত যুবক ঃ কি চিনে আসলি।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ পিসার শালার শ্বাশুড়ির ভাতার।

অবিবাহিত যুবক ঃ মারব শালা থাপ্পর।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ এই দিকে আয় চিনে আসলি। মানে বুঝায় ক।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ মানে— তোকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমাকে প্রশ্ন করবি, কর।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ প্রথম প্রশ্ন আছে তোর পিসি আছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমার পিসি, হ্যা আছে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তোর পিসির বিয়ে হয়েছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হয়েছে আমি দেখিনি।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তোর পিসির বর তোর সম্পর্কে কি?

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ পিসির বর দেখিনি কোনো দিন চোখে—পিসা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কারেক্ট, তোর পিসার শালা জীবিত আছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ এই শালা ভদ্রলোকের বাচ্চা ভদ্রভাবে কথা বল।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ উই স্যাল বি ডিসিপ্লিন নো ব্রেক।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হ্যা আছে।

কন্যাসন্তানের পিতা : তোর পিসার শালা তোর সম্পর্কে কি?

সর্বশ্রান্ত কৃষক : পিসার শালা— হামার বাবা।

কন্যাসন্তানের পিতা : বাবা, তোর বাবার শ্বাশুড়ি জীবিত আছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : হ্যা বাইচা আছে।

কন্যাসন্তানের পিতা : তোর বাবার শ্বাশুড়ি তোর সম্পর্কে কি?

সর্বশ্রান্ত কৃষক : আমার নানি।

কন্যাসন্তানের পিতা : নানির ভাতার ইনি।

অবিবাহিত যুবক : এইটা নানা! নানা এর আগে এসছে আমাদের সঙ্গে কত হেস্যে খেল্যে কথা বলছে। ভাক্কোর মত দাড়িয়ে আছে কেন বে।

কন্যাসন্তানের পিতা : কেমন করে চিনবি।

অবিবাহিত যুবক : কেনে!

কন্যাসন্তানের পিতা : লাদেন নানার গুল্লা ঢিল করে দিয়েছে।

অবিবাহিত যুবক : লাদেন! ডাকতো।

কন্যাসন্তানের পিতা : নানা—

শিব : হ্যা বল, আমাকে ডেকেছ কেন?

কন্যাসন্তানের পিতা : আমি ডাকি নাই শালাগুলা ডেকেছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : নানা শুনো তুমি আমাদের ডাক শুনতে পেয়েছ।

শিব : হ্যা শুনতে পেয়েছি বলেই তো আমি আসছি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : ডাক শুনে সুদুর কৈলাস থেকে ঘুরে এসেছ।

শিব : হ্যা আমি কৈলাস থেকে ঘুরে আসছি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : তাহলে তুমি থাকতে আমাদের বারো হাল তেরো দুর্গতি কেন হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা : হোয়াই, গিভ মি অ্যানসার?

শিব : কে বলেছে?

কন্যাসন্তানের পিতা : এই যে দেখছ না ভেন্টিলেশন লাগিয়েছে, শালা হাওয়া ঢুকছে আর বাতাস মার খাচ্ছে।

শিব : কে বলছে, আমি তো দেখছি তোমরা সুখে আছো।

কন্যাসন্তানের পিতা : সুখে একেবারে শ্মশানের মুখে, কেবল খড়ি দিয়ে পোড়াইতে দেরী।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : বা কি সুখে আছি, বা!

শিব ঃ বল তোমাদের কি সমস্যার কথা আছে।

সকালে (গান) ঃ ওহে ভারত বিধাতা এই স্বাধীনতা চায়নি জনগণ।
ওরে দমন পীড়ন অত্যাচার অনাচার অবিচার
এই কি গো তোমার স্বাধীনতা (ভারতে)।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ নানা।

শিব ঃ হ্যা বল।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ তুমি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছ ঠিকই, কত বছর হল নানা স্বাধীনতার।

শিব ঃ ৫৭ বৎসর।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ৫৭ বৎসর হল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কি পেয়েছি আমরা?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা হাসিমুখে ফাঁসিকে বরণ করেছিল। নিজের জীবন দিতে দ্বিধা বোধ করেনি। তাদের সামনে একটাই স্বপ্ন ছিল, একটাই প্রতিজ্ঞা ছিল—

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কি স্বপ্ন! কি প্রতিজ্ঞা ছিল?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ যে আমরা মরে গিয়েও রক্ত দিয়েও যদি আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, আমাদের প্রজন্মরা স্বাধীন ভারতে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকবে। কিন্তু কি দেখা গেল ব্রিটিশ পিরিয়ডে ভারতবাসীর উপর প্রকাশ্যে যে অত্যাচার চলছে বর্তমান স্বাধীন ভারতে গোপনে তার চাইতে বেশি অত্যাচার চলছে।

সকলের (গান) ঃ ওরে দমন পীড়ন অত্যাচার অনাচার অবিচার (২)
এই কি গো তোমার স্বাধীনতা (ভারতে)

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমরা কি চিরকাল কষ্টে দিন কাটাবো রে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কষ্টে কেন দিন কাটাবি আমার শরণাপন্ন হ।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ সুখের লাগাল পাবো?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বর্তমান স্বাধীন ভারতে যদি সুখে স্বাচ্ছন্দে ইস্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে থাকতে চাস, আমার সাথে যোগাযোগ কর। আমার ইউনিয়নে যোগ দে। কোন অসুবিধা থাকবে না। না থাকবে অর্থাভাব, না থাকবে অন্নাভাব, না থাকবে দুশ্চিন্তা।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আবে তোর সমিতির নাম কি?

সকলে (গান) ঃ আরে ঘুষখোর সমিতি সংগঠন আজ ভারতের জোতদার (২)

ঐ পুলিশ ডাক্তার অফিসার মাস্টার (শিব হে) (২)

এই সমিতির মেম্বার হে

মোটা টাকা ডোনেশন দিলে বিদ্যালয়ে সিট মেলে

ও ঘুষ ছাড়া হাসপাতালে রক্ত মিলবে নাকো ভাই হে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আজকের ভারতবর্ষে শহর থেকে গ্রামে পৌছে যান যে কোন সরকারী দপ্তরে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ নেই। তবে সব সরকারী কর্মচারী ঘুষ খায় না। সরকারী কর্মচারীর মধ্যে একটা শ্রেণী আছে যারা ঘুষ ছাড়া কোন কাজ করে না। চলে যা গ্রামের অঞ্চল অফিস ঘুষ ছাড়া কোন কাজ নেই। ব্লকে যা ঘুষ ছাড়া কাজ নেই। সেটালমেন্টে যা ঘুষ ছাড়া কাজ নাই। থানাতে যা ঘুষ ছাড়া কাজ নাই। কোর্টে যা, ট্রেজারিতে যা, যেখানে যাবি প্রতি পদক্ষেপে ঘুষ ছাড়া কোন কথা নাই।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ সব জায়গাতে ঘুষ কে বলল?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি বলছি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আব্বে এক জায়গাতে এমন আছে যেখানে ঘুষ কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে না জানিস।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কোথায়?

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ ইস্কুলে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ঠিক বলেছিস। ইস্কুলে ঘুষ না চলার কারণ আছে। কারণ ইস্কুলে দেবী সরস্বতীর পূজা হয় ওখানে ঘুষ চলতে পারে না। তাই ওখানে ঘুষ নামটাকে রেক্টিফাইড করে ডোনেশন ইউটিলাইসড করা হয়েছে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ ওটা আবার কি রে!

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ওটা বুঝবি না। তোর ব্যাটাকে যখন ভর্তি করবি তখন বুঝবি। আর ডাক্তাররা কায়দা করে ঘুষ খায়।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ দেশের সেবা করছে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আজকাল দেখবেন জন্মের পর থেকে আবালবৃদ্ধবণিতা— এদের শিশু থেকে বুড়োপর্যন্ত গ্যাস, অম্বল, বুকের দোষ নানা রকম অসুখে জর্জরিত। আমরা গ্রামের মানুষ গ্রামে সাধারণভাবে চিকিৎসা না পেয়ে শহরে বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। কার কাছে যাব, প্রথমে গেলাম হয়তো সার্জেনের কাছে, উনি দেখে চেখে বললেন ওহ্ বাবা একটা লিভারের ঔষধ লিখে দিলেন, একটা হজমের ঔষধ, একটা গ্যাসের

ঔষধ, রাত্রে ঘুমের ট্যাবলেট বলে দিল। বাবা পনের দিন টক-ঝাল-বাসি খাবে না। ভালোভাবে থাকবে। এইভাবে পনের দিন পরে আমার সাথে এসে দেখা করবে। ভালো করে মেনে চলেছে পনের দিন ভালো হয়ে গেছে। পনের দিন পরে এসছে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু সত্যি আপনি যদি আমাদের গ্রামে থাকতেন না আপনাকে দেবতার মত পূজা করতাম গো। সত্যি আমি ভালো হয়ে গেছি। চুপ ব্যাটা ভালো হয়ে গেছি তোর বুকের দোষ আছে। রেফার টু চেষ্ট স্পেশালিস্ট।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : বা ফাসছে রে।

কন্যাসন্তানের পিতা : নাম লিখে দিল অমুক বুকের ডাক্তারের কাছে, অন্য ডাক্তারের কাছে যাবে না। ঐ বুকের ডাক্তারের কাছে যাওয়া মাত্র বলছে, ওমা তোমার এখনো বুকের এক্স-রে হয় নি। যাও অমুক এক্স-রে ক্লিনিক। অন্য জায়গায় যদি রিপোর্ট করো রিপোর্ট ক্যানসেল করবো, আমি দেখবো না।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : ছবি ভালো হইলে হবে না।

কন্যাসন্তানের পিতা : বাড়িতে গিয়ে হয়তো বুড়া বকরি ছিল ঐটাকে বেচে-টেচে এনে বুকের ছবি তুলল। বুকের ছবি তুলে গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার করল কি লিভারের ঔষধ রেখে দিল ওটাই, কোম্পানি আলাদা করে দিল। হজমের ঔষধ ওটাই রাখল কোম্পানী আলাদা করে দিল। গ্যাসের ঔষধ বাদ দিল। একটা কাশির সিরাপ ধরিয়ে দিল। বলল যে বাবা একটা ঔষধ দিলাম দেখবে একটু ঘন সিরাপ ওটা জল মিশিয়ে খাবে না। পরের দিন আবার আমার কাছে এসো।

সর্বশ্রান্ত কৃষক : ভালো হয়ে গেছে রে।

কন্যাসন্তানের পিতা : ভালো হয়ে গেছে! ওর অসুখ থাকলে তো। পনের দিন পর আবার এসছে। বাবু আমি না একদম ভালো হয়ে গেছি, দ্যাখেন বাবু। চুপ ব্যাটা তোর গ্ল্যান্ডের দোষ আছে। রেফার টু ই.এন.টি (ইয়ার নোস থ্রেটিস্ট স্পেশালিস্ট) এখন ওর কাছে যাওয়া মাত্র বলছে ওমা তোমার স্টুল এগজামিন হয়নি, ইউরিন এগজামিন হয়নি, ব্লাড এগজামিন হয়নি। অমুক প্যাথোলজিস্টের কাছে যাও। বাড়িতে গিয়ে হয়তো বউয়ের নাকের ছিল কি কানের ছিল ওটাকে বেচে টেচে দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করিয়ে উনি করলেন কি লিভারের ঔষধ রেখে দিলেন, একটা নাসাল ড্রপ ধরিয়ে দিলেন এই হল ডাক্তারের কীর্তি। আর এই বিভিন্ন ডিগ্রিধারী ডাক্তাররা এখন হাসপাতালে যায় চিকিৎসা করতে তখন কিন্তু ওদের ঐসব ডিগ্রি থাকে না।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কে বলল?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ না থাকে চেস্ট স্পেশালিস্ট, না থাকে নিউরোলজিস্ট, না থাকে প্যাথোলজিস্ট, না থাকে সার্জেন, না থাকে ই.এন.টি, না থাকে অন্যকিছু।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ না, নতুন কথা শোনা কি হল রে। আব্বে যত রকম ব্যারাম ততরকম ডাক্তার।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ নেভার আই কান্ট বিলিভ ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ। হাসপাতালে যখন ওরা চিকিৎসা করে তখন ওদের ডিগ্রি একটাই হয়ে যায়।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কি ডিগ্রি?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ওদের ডিগ্রি হয়ে যায় হাসপাতালে চিকিৎসাকালীন ডি.এম.ডি.এস।

অবিবাহিত যুবক ঃ এটা কোথাকার ডিগ্রি বে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ওরা নিজেরা মেডিকেল বোর্ড করে ওটা ডিগ্রি করেছে ডি.এম.ডি.এস। ডি.এম.ডি.এস ধরো মারো রফা শেষ।

অবিবাহিত যুবক ঃ ধুর শালা ঐ হসপিটালে কে যাবে বে।

সকলে (গান) ঃ আরে ঘুষখোর সমিতি আর সংগঠন আজ ভারতে জোরদার (২)
ওরে পুলিশ ডাক্তার অফিসার মাস্টার (শিব হে)
এই সমিতির মেম্বার হে।
মোটা টাকা ডোনেশন দিলে বিদ্যালয়ে সিট মেলে
ও ঘুষ ছাড়া হাসপাতালে রক্ত মিলবে নাকো ভাই হে
আরে বা হাতের মন্ত্র রে আর ব্যাঙ্ক থেকে ব্লাডও রে
এই জনসেবার নাম করে গরীব শোষণ
(শয়তানরা) এই জনসেবার নামে করে গরীব শোষণ।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ অতএব আমরা গ্রামের মানুষ গ্রামে কাজকর্ম পাইনি সবাইকে নিয়ে পরিবারসহ অনাহারে কাটাতাম, ভেবেছিলাম শহরে আসবো, কাজকর্ম পাবো, দুবেলা অন্ততপক্ষে মোটা ভাত কাপড়ে থাকবো। কিন্তু শহরে যেসব বিভিন্ন ব্যাধি আরম্ভ হয়েছে তাতে বাঁচার উপায় নেই। যা সব বড় বড় ব্যাধি। অতএব আমরা গ্রামের মানুষ গ্রামে চল, সেখানে আমরা আরামে থাকবো।

সকলে (গান) ঃ আরে ছদ্মবেশি শয়তান আর ভণ্ডদের দোষাদোষে হে
আরে ডাইনি নামে নারী হত্যা চলছে আজও দেশে হে
কুসংস্কারের বলে নরবলি আজও চলে

তারাও তো ছলে বলে কৌশলে শোষণ করে চলে হে।

অবিবাহিত যুবক ঃ আজকাল গ্রামের লোকেরা কি করছে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কি করছে?

অবিবাহিত যুবক ঃ যখন কোন অসুখ হচ্ছে তখন আর কিন্তু হসপিটালে যায় না, ডাক্তারের কাছে যায় না। ওরা কোথায় যায়?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কোথায়?

অবিবাহিত যুবক ঃ চলে যায় গ্রামাঞ্চলে। কবে যায়? শনিবার আর তোর মঙ্গলবার দিন। ওখানে গিয়ে কি করে?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কি করে?

অবিবাহিত যুবক ঃ একটা কালীর মুখা রেখে দেয়, ওখানে সিঁদুর দেয়, ধূপ দেয়। দিয়ে ভর নেমে সব সত্যি কথা বলে দেয়। আরে ভর নেমেছে ধূপ নিয়ে আয় ধূপ রে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে মা।

হরিভক্ত গোসাই ঃ মা, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে মা, কালকে ধূপ দিবো মা।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ তুমি কে আছ মা?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমাকে চিনতে পারলি না রে। (ভর ওঠে)

হরিভক্ত গোসাই ঃ তোমার পরিচয় দাও।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি তোদের শ্মশানকালী।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ মা, প্রণাম নিও মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ ধূপ দে।

অবিবাহিত যুবক ঃ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তোদের দুঃখ কষ্ট না দেখতে পেরে আমি তো অসময়ে তোদের কাছে হাজির হইরে।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আমাদের কষ্ট দেখে থাকতে পার?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তোদের কষ্ট না দেখতে পেরেই তো চলে আসি।

হরিভক্ত গোসাই ঃ মা আমার দুইটা কথা আছে।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ দুটা কেন দুশোটা বল।

হরিভক্ত গোসাই ঃ মা, মন দিয়া শুন মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আরে মন দিয়ে শুনছি না তো কি।

হরিভক্ত গোসাই : আমার একটা মেয়ে দেখতে খুব ভালো। বিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে বয়স। ছেলেপিলে আসছে দেখছে-শুনছে খাইচে চল্যে যাচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে না, তালে কি উপায় মা।

কন্যাসন্তানের পিতা : আমি থাকতে তোর মেয়ের বিয়ে হবে না।

হরিভক্ত গোসাই : হবে!

কন্যাসন্তানের পিতা : হ্যা নিশ্চই হবে?

কন্যাসন্তানের পিতা : বল মা কি করতে হবে?

কন্যাসন্তানের পিতা : শোন, সামনের মঙ্গলবার গোটা দিন উপবাস থেকে এক ডুবে স্নান করে পিতলের ঘটে এক ঘট জল, একটা লাল ডোর, একটা চাবির তাবিজ, এগারোটা জবা ফুল, এগারোটা বেলপাতা, এগারোটা পান, এগারোটা সুপারি, এক প্যাকেট ভালো ধূপবাতি, হাপ কিলো গুড়া ধূপ, মোটা সিঁদুর আর ৫০ টাকার ভালো নলেন গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আমার থানে আসবি।

হরিভক্ত গোসাই : তাহলে হয়ে যাবে তো।

কন্যাসন্তানের পিতা : আমি তাবিজ ভরে দিলে চার মাসের মধ্যে তোর মেয়ের বিয়ে হবে।

হরিভক্ত গোসাই : হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা : তবে হ্যা।

হরিভক্ত গোসাই : আর কি আছে মা?

কন্যাসন্তানের পিতা : তবে আমার একটা কথা আছে।

হরিভক্ত গোসাই : কি কথা?

কন্যাসন্তানের পিতা : আমার কথা হচ্ছে যেদিন আমি তাবিজ ভরে দিব সেদিনে আমার মন ভরে দিতে হবে।

হরিভক্ত গোসাই : কি দিয়ে ভরব মা?

কন্যাসন্তানের পিতা : কি দিয়ে ভরবি, যখন আমি তাবিজ ভরে দিব তখন জোড়া ঢাক বাজিয়ে আমার থানে পূজা দিতে হবে।

হরিভক্ত গোসাই : ওরে বাপরে! আর কি লাগবে?

কন্যাসন্তানের পিতা : আর জোড়া পাঠা বলি দিতে হবে।

হরিভক্ত গোসাই : ছোট পাঠা দিলে হবে না।

কন্যাসন্তানের পিতা : না, পনের কিলো বিশ কিলো করে যেন মাংস হয়।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আর কিছু লাগবে?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আর একটা লাল রঙের বেনারসী শাড়ি।

হরিভক্ত গোসাই ঃ আর—

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আর ৫০১ টাকা নগদ দিবি। যদি না দিস বংশ শুদ্ধা মুখ দিয়া রক্ত উঠে মরবি।

হরিভক্ত গোসাই ঃ কোথা থেকে দিব মা, গরীব মানুষ মা।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ মা—

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বলনা রে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমি তোমার থানে এসেছি মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আসবি তো, আমি তো তোদের জন্যই আসছি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমি খুব গরীব মানুষ মা। ভ্যান চালিয়ে খাই মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আমি তো গরীবের জন্যেই রে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমার একটাই ছেলে মা। ভ্যান চালিয়ে কুনো রকমভাবে ছেলেটাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করেছি মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ সেটা তো আমার আশির্বাদেই হয়েছে রে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমার ছেলের চাকরীটা বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু চাকরীটা আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকছে না। এর কি কারণ আছে মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কি বললি? আমি থাকতে তোর ছেলের চাকরি হবে না।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হবে, হবে মা, হবে!

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ শোন, ঐ সামনের মঙ্গলবার গোটা দিন নির্জলা উপবাস থেকে —

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ লাল চা খাবো?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ বললাম যে নির্জলা উপবাস।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ খাবো না, খাবো না।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ নির্জলা উপবাস থেকে এক ডুবে স্নান করে মাটির ঘটে এক ঘট জল, তামার তাবিজ, কালো ডোর নিয়ে আমার থানে আসবি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ আর সঙ্গে আনবি নটা জবা ফুল, নটা বেলপাতা, নটা পান, নটা হরিতকি, নটা ভালো মণ্ডা আর নটা দুব্বা।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হ্যা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ সঙ্গে আনবি এক প্যাকেট ভালো সেন্টের ধূপবাতি, এক কিলো গুড়া ধূপ, আড়াইশো মোটা সিঁদুর, এক কিলো সরসার তেল, হাপ কিলো গাওয়া ঘি আমার থানে নিয়ে আসবি। আমি তাবিজ ভরে দিলে ছ'মাসের মধ্যে তোর ছেলের চাকরি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ হবে মা, হবে মা, জীবনে বাঁচব মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তবে হ্যা, আমি যখন তাবিজ ভরে দিব তখন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হবে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ কি মা?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তুই আর কি দিবি।

সর্বশ্রান্ত কৃসক ঃ আমি খুব গরীব মানুষ মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ তুই তো খুব গরীব মানুষ। তবে-

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ আমার শর্তটা যাতে খুব পাতলা হয় মা।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ শোন, তুই আর কি দিবি। তুই আমাকে আটানা সোনার নাকের নথ দিস।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ মাগে আটানা সোনার দাম কোথায় পাবো মা, সাড়ে তিন হাজার টাকা, ভ্যান চালিয়ে খাই মা।

অবিবাহিত যুবক ঃ ভ্যান বেচে দিবি।

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ যদি না দিবি বংশ শুদ্ধা আগুনে পুড়্যা মরবি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ মাগে মা আমি শুধু ভ্যান চালিয়ে খাই মা, কিছু নাই আমার মা। ভ্যান বেচ্যে দিলে খাবো কি বে।

অবিবাহিত যুবক ঃ চাকরি পাইলে কিনে নিবি।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ চার মাস পরে চাকরি পাবো, চার মাস খাবো কি করে? হায়রে চ্যাংড়াব্যাংরা নিয়ে ডুবে যাব রে মা।

অবিবাহিত যুবক ঃ আবে থাম, কুন মা আছে না আছে পরীক্ষা করতে দে।

সর্বশ্রান্ত কৃষক ঃ মাকে লিয়ে ইয়ারকি মাচ্ছিস, মুখে রক্ত উঠে মরে যাবি।

অবিবাহিত যুবক ঃ হাতে কি আছে মা?

কন্যাসন্তানের পিতা ঃ কি বললি।

অবিবাহিত যুবক ঃ হাতে কি আছে?

সকলে (গান) ঃ আরে ছদ্মবেশী শয়তান আর ভণ্ডদের দোষাদোষে (২)
আরে ডাইনি নামে নারী হত্যা চলছে আজো দেশে
কুসংস্কারের বলে নর বলি আজো চলে

তারাও তো ছলে বলে কৌশলে শোষণ করে চলে রে,
প্রশান্ত শেঠ কয় হে মৃত্যুঞ্জয় (২)
ওই তাইতো ভারতে সাক্ষরতার প্রয়োজন।

কন্যাসন্তানের পিতা : তাই অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে পড়বা
অতি ছোট থাকো না ছাগলে মুড়ে থুইবে।

শিব : শোনো ভক্তগণ।

কন্যাসন্তানের পিতা : হ্যা বলেন নানা।

শিব : আমার মনের অবস্থা ভালো নাই, তাই তোমাদের আমি সব কথাই শুনলাম। সব সমস্যার সমধান করে দিব। কোনো চিন্তা নাই। আমার দিকে একটু লক্ষ রেখো তাহলেই হবে।

কন্যাসন্তানের পিতা : শোনো নানা, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা রাজপ্রাসাদ চাই না, রাজভোগ চাই না। মোটা ভাত মোটা কাপড়ই আমাদের শ্রেয়। তাই তুমি অন্নহীনে অন্ন দেও, কর্মহীনে কর্ম দেও, গৃহহীনে গৃহ দেও, ভূমিহীনে ভূমি দেও। আর এ যদি না দেও, বছর বছর চিনি আর কলা-আতপচাল দিয়ে পূজা দিচ্ছি তা আর দেব না।

শিব : কি দিবি?

কন্যাসন্তানের পিতা : এবার থেকে আখিনাড়া চাল দিব আর আঠিয়া কলা দিব।

শিব : বেশ তাই দিস।

চার-ইয়ারী

লেবার কমিশনার (গান) : আ-ওহে আমি যার অফিসার তাই রক্ষা করব গরীবের অধিকার।

মহিলা সমিতির নেত্রী (গান) : মোদের সমিতি নারীদের প্রতি আর সবে না অত্যাচার।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা (গান): কর মোদের নিয়োগ শ্রমিক বন্ধুগণ।

উচিত বক্তা (গান) : ঝুট বোলে কাউয়া কাটে কালে কাউয়া সে ডরিয়ো
ম্যায় মাইকে চলি যায়েগি তু দেখতে রহিয়ো।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : এখানে আমাদের আলোচনা চলছে, তুই কার পারমিশনে ঢুকেছিস।
বেরোও, বেরো এখান থেকে।

মহিলা সমিতির নেত্রী : এদিকে এসো।

উচিত বক্তা : দ্যাখেন তো মেয়ে-ছেলেটার ব্যবহার কি লাভলি।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আচ্ছা তুমি এখানে কেন এসেছ?

উচিত বক্তা ঃ আপনারা এখানে কি করছ?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ বাঃ, ভাষা সম্বন্ধে তোমার বেশ জ্ঞান আছে দেখছি।

উচিত বক্তা ঃ লেখাপড়া কম শিখেছি, আরও শিখতুম। ইস্কুলে একটাও বেঞ্চি ছিল না। বাড়ির চট্টি লিয়ে যায়ে কতদিন পড়ব।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ শোনো, আমি তোমার কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছি তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেক।

উচিত বক্তা ঃ এখন বুঝবেন না আপনি তো একটা গিরগিটি মেয়েছেলে।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আরে এটা আবার কোন ভাষা।

উচিত বক্তা ঃ এটা ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ ও তাই, শোনো আমি এখানে কেন এসেছি জানো।

উচিত বক্তা ঃ কেন এসেছেন?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আমার কিছু বক্তব্য আছে, বক্তব্যগুলো বলার জন্য আমি এখানে এসেছি। কি দেখছ তুমি?

উচিত বক্তা ঃ আপনি কেমন মাইয়াছ্যালে গো!

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ কেমন?

উচিত বক্তা ঃ এতবড় একটা ধাড়ী মাইয়াছ্যালে, আর এই দু-দুইটা ব্যাটাছেলের মধ্যে আপনি একল্যা ঢুইক্যা গেছেন।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ বুঝতে পেরেছি। আমি তো দেখেছি তুমি ভীষণ এক বোকা ছেলে।

উচিত বক্তা ঃ আমি বোকা। আমি বোকা কেনে?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ কেন তুমি জানো না নারী পুরুষ সমান অধিকার।

উচিত বক্তা ঃ মাইয়াছ্যালে ব্যাটাছ্যালে সমান হই গিছে।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তুমি আজকে শুনছ।

উচিত বক্তা ঃ শালা এই খবর তো হামার বউ আগে পেই গিছে।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ কেন?

উচিত বক্তা ঃ হামাকে দিয়া বাড়ি ঝাড় দেই লিছে, চা করই লিছে, চায়ের কাপ ধুয়ে লিছে, তরকারী কুটিয়ে লিচে, ভাতের মাড় গালিয়ে লিচে।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তাতে কি হয়েছে তুমি তাকে সাহায্য করেছ।

উচিত বক্তা : সাহায্য করেছি না বিহার দিসি আখার ছাই দিছি। কম কষ্ট করে গিয়া বিহা করে এনেছি বর্ষার মধ্যে।

মহিলা সমিতির নেত্রী : তুমি কিছু জিজ্ঞাস করবে?

উচিত বক্তা : এগলা কে আছে?

মহিলা সমিতির নেত্রী : তুমি পরিচয় নাও তাহলেই বুঝতে পারবে।

উচিত বক্তা : বাবু—

লেবার কমিশনার : হয়াট (what)?

উচিত বক্তা : কে হটবে, হটবে কে?

মহিলা সমিতির নেত্রী : তুমি কি পাগল নাকি।

উচিত বক্তা : কেন?

মহিলা সমিতির নেত্রী : একটা বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় তোমার জানা নেই।

উচিত বক্তা : বয়স্ক আর আমি একটা স্মল বয়। আমার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় ওর নলেজে নাই। আমি বলছি যে বাবু, আপনি কে আছ, বলছে হট, বাপস যাও।

মহিলা সমিতির নেত্রী : আরে বাবা উনি তো ঠিকই বলছেন।

উচিত বক্তা : এখনই কৃষ্ণকে ডাকে ওর মাথা ফাটিয়ে দিব।

মহিলা সমিতির নেত্রী : আমি বলছি যে তুমি কেন ওনার সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছ। উনি বলছেন হোয়াট, হোয়াট মানে জানো তুমি?

উচিত বক্তা : হোয়াট!

মহিলা সমিতির নেত্রী : হোয়াট হচ্ছে ইংরেজি ওয়ার্ড। হোয়াট মানে কি।

উচিত বক্তা : হোয়াট মানে কি! যাক পাংচার হলাম। বাংলাতে এখন বাঁশ খেয়ে যেতাম। বাবু, আপনি কে আছ বাবু?

লেবার কটিশনার : এ ব্যাটা দূরে থেকে কথা বল, ভদ্রতা নাই।

উচিত বক্তা : অভদ্রতাই বা কোথায় দেখলেন?

লেবার কমিশনার : আমি কি বইলা আছি বে, তোর গলা শুনতে পাচ্ছিনা। দূর থেকে বল যা বলার।

উচিত বক্তা : আপনি কে আছো বাবু?

লেবার কমিশনার : ও তুই আমাকে চিনিস না।

উচিত বক্তা : কেমন করে চিনব আপনার সঙ্গে ঘুরেছি, না খেলেছি, না বেরিয়েছি।

লেবার কমিশনার : চোপ, বেশি বাজে বকবি না। শোন, আমি যা বলছি ভবিষ্যতে তোদের কাজে

লাগবে। মন দিয়া শোন বুঝেছিস।

উচিত বক্তা ঃ বলেন আপনি কে বাবু, বাবু আপনি কে আছেন? ভ্যাড়ার মতো চিল্লাছেন কেনে?

লেবার কমিশনার ঃ মাথাটা খারাপ করে দিবি দেখছি। আমি হচ্ছি লেবার কমিশনার।

উচিত বক্তা ঃ ও আপনি লিবার কমিশনার।

লেবার কমিশনার ঃ ওরে গাধা লেবার কমিশনার।

উচিত বক্তা ঃ হ্যা লিবার কমিশনার, দিবার বেলা নাই আপনি।

লেবার কমিশনার ঃ তোর মাথায় কিছু নাই। ভালো করে শোন লেবার। লেবার কাকে বলে? লেবার হচ্ছে ইংরেজি কথা। লেবার মানে শ্রমিক। কলে-কারখানায়-মিলে যারা কাজ করে তাদের শ্রমিক বলে।

উচিত বক্তা ঃ ও কলকারখানায় হাটে মাঠে শ্রমিককে। শালা হামাদেরকে পাইক বলে বাবু।

লেবার কমিশনার ঃ গ্রামীণ ভাষা।

উচিত বক্তা ঃ শালা এবার থেকে যদি পাইক বলেছে একহাত বাবুর মাইরে নাকসুরা ফাটিয়ে দিব। রীতিমতো শালা লিভার, ফাজলামো।

লেবার কমিশনার ঃ লিভার না লেবার।

উচিত বক্তা ঃ কি বাবু?

লেবার কমিশনার ঃ লেবার।

উচিত বক্তা ঃ হ্যা লেবার। শালা এবার পাইক বললে নাকসুরা ফাটিয়ে দিব। তালে আপনি হলেন—

লেবার কমিশনার ঃ লেবার কমিশনার।

উচিত বক্তা ঃ হ্যা, লেবার কমিশনার। বাবু—

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাঃ আজ্ঞে।

উচিত বক্তা ঃ আপনি একটু আলোতে আসেন তো, খুব চকচক করছেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ চকচক করবো না, কেন কি হয়েছে?

উচিত বক্তা ঃ আপনি কে বাবু?

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আমি হচ্ছি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা।

উচিত বক্তা ঃ ও আপনি হচ্ছেন শ্রমিক শোষণ নেতা।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ ধ্যাত, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা।

উচিত বক্তা ঃ হ্যা, শ্রমিক শোষণ নেতা। আর শ্রমিকের পয়সা মাইরা ভালোই হইচেন চকচকা।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ হেই শালা, শোষণ কথাটা মুখ দিয়ে বন্ধ কর। আমি হচ্ছি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা— এটা জেনে রাখিস।

উচিত বক্তা ঃ হ্যা, আপনি হচ্ছেন শ্রমিক শোষণ নেতা। দ্যাখেন আপনি কে আছ?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ দূরে সরে কথা বলো।

উচিত বক্তা ঃ দ্যাখেন আমি মাইয়াছ্যালের দিকে তাকাতে পারি না।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না। তুমি ওখানে দাড়াও। তুমি আমাকে চিনতে পারবে না।

উচিত বক্তা ঃ আমি তো মাইয়া ছ্যালের দিকে তাকাই না।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আমি হলাম মহিলা সমিতির একজন একজন নেত্রী।

উচিত বক্তা ঃ ও আপনি মহিলা সমিতির নেত্রী। আর মহিলাদের পাইসা মাইরে ভালোই করেছেন টিকটিকি। হ্যা আরে মা।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তুমি কি পাগল নাকি?

উচিত বক্তা ঃ কেনে?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ এখানে তুমি কি পাগলামি করতে এসেছ।

উচিত বক্তা ঃ না, না।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তুমি কার সাথে কথা বলছ জানো? কি নাম তোমার?

উচিত বক্তা ঃ হামার নাম, হামার নাম জানি।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ হ্যা, জানো তো বলো।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতাঃ এ ব্যাটা ঐ ভদ্রমহিলা তোর নামটা জানতে চাইছে। তা নামটা যখন জানিস তো তুই বল না।

উচিত বক্তা ঃ বলছি তো জানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ হ্যা, জানিস তো বল।

উচিত বক্তা ঃ মাইরি বিদ্যা, দু'চোক্ষের কিরা জানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ জানিস তো বল না।

উচিত বক্তা ঃ বলছি তো জানি, বাপরে বাপ।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ তো, বলতে কি হচ্ছে?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আরে শোনো জানির পরে কি কিছু আছে? তোমার পদবী আছে?

উচিত বক্তা ঃ পদবী নাই, টাইটেল আছে।

লেবার কমিশনার : যাকে পদবী বলে তাকেই টাইটেল বলে। বল নাম কি?

উচিত বক্তা : জানির পরে আছে মণ্ডল।

লেবার কমিশনার : ও, জানি মণ্ডল। একসঙ্গে বলবি তালে সম্পুর্ণ নামটা বলা হবে বুঝলি।

উচিত বক্তা : হামাদের গায়ে শুধু জানি বলে।

লেবার কমিশনার : এটা তো গ্রাম না রে ব্যাটা।

উচিত বক্তা : কচুর গাছ আছে তো গাঁ না।

লেবার কমিশনার : ও।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : শোন।

উচিত বক্তা : হ্যা, বলেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : ভদ্রমহিলা যখন তোর নামটা জানতে চাইছিল তখন তুই বারবার বলছিস জানি জানি জানি। আমি ভাবলাম যে তুই নামটা হয়তো জানিস, অথচ ভুলে গেছিস বা বলতে পারছিস না।

উচিত বক্তা : হেই আপনাদের সাথে ইয়ার্কি করতে পারি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : সেই তো।

উচিত বক্তা : আপনারা গণ্যমান্য মানুষ।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : দ্যাখ তোর নাম হল জানি মণ্ডল। হ্যারে তোর বাবার নাম কি রে?

উচিত বক্তা : বাবার নাম কিজানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : আরে এত বড় ছেলে বাবার নাম জানিস না।

উচিত বক্তা : মাইরি বিদ্যা কিজানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : তুই সমাজে পরিচয় দিবি কি করে রে?

উচিত বক্তা : বলছি কিজানি বাবুরা বিশ্বাস করে না।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : কি বোকা ছেলেরে, বাবার নাম জানিস না।

উচিত বক্তা : মাইরি বলছি কিজানি।

লেবার কমিশনার : এ ব্যাটা মাথাটা একটু তুই খাটা। এত বড় ধারী মরদ হই গেলি বাবার নামটা বলতে পারিস না। লোকে তোকে বোকা বলবে।

উচিত বক্তা : আমি মরদ না ব্যাটা ছ্যালা।

লেবার কমিশনার : যাকে মরদ বলে তাকেই ব্যাটাছেলে বলে। শোন বাবার নামটা বলতে পারছিস না।

উচিত বক্তা : বলছি তো।

লেবার কমিশনার : কি?

উচিত বক্তা : বললাম যে কিজানি।

লেবার কমিশনার : কিজানি, বাবার নাম কিজানি?

উচিত বক্তা : ও হ্যা, কিজানি মণ্ডল।

লেবার কমিশনার : মণ্ডল কথাটা মুখ দিয়ে বের হয় না গাধা।

উচিত বক্তা : একসাথে অতনি বলে দিব।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : এ ব্যাটা এই তোর নাম বললি জানি মণ্ডল, বাবার নাম কিজানি মণ্ডল। বাপ ব্যাটার নামের খুব মিল আছে রে।

উচিত বক্তা : বাপ ব্যাটা যেখানে স্বাস্থ্য সেখানে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : বেশ, এবার বল তোর বাড়ি কোথায়?

উচিত বক্তা : হাজানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : হা জানিস তো বল?

উচিত বক্তা : বলছি তো হাজানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : হা জানিস তো বল না।

উচিত বক্তা : বলছি হাজানি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : বলতে কি হচ্ছে।

মহিলা সমিতির নেত্রী : এদিকে এসো, তুমি কি আমাদের সাথে ইয়ারকি করছ?

উচিত বক্তা : কেন ইয়ারকি করবো?

মহিলা সমিতির নেত্রী : তাহলে একটা ঠিকানা বলতে কত সময় লাগবে।

উচিত বক্তা : বলছি তো হাজানি।

মহিলা সমিতির নেত্রী : হাজানি কি গ্রাম না চৌলা, না পুর, না পল্লী কোনটা?

উচিত বক্তা : হাজানিতলা।

মহিলা সমিতির নেত্রী : ওটা কি তোমার বাবা এসে বলবে।

উচিত বক্তা : আমার বাবা হাটতে পারে না, প্যারালাইসিস হয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : এই এদিকে আয়, হ্যারে তোর কি অন্নপ্রাশন হয়েছিল রে।

উচিত বক্তা : না ভাত খাওয়া হয়েছিল।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : ও অন্নপ্রাশন হয়নি, ভাত খাওয়া হয়েছিল। বেশ ভালো কথা। এবার বলতো

		তোর যে দিন ভাত খাওয়া হয়েছিল সেদিন তোর বাড়িতে ব্রাহ্মণ এসেছিল।
উচিত বক্তা	ঃ	না ব্রাহ্মণ একটাও আসেনি ঠাকুর মশায় এসেছিল।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	ও ব্রাহ্মণ আসেনি ঠাকুর এসেছিল। বেশ এবার বলতো ঠাকুর মশায় যখন এসছিল তখন ওর হাতে পঞ্জিকা ছিল?
উচিত বক্তা	ঃ	হাতে ছিল না ওর বগলে ছিল।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	ঠাকুরের হাতে পঞ্জিকা ছিল না, বগলে ছিল।
উচিত বক্তা	ঃ	হ্যা।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	বেশ, এবার বল দেখি তোর যেদিন ভাত খাওয়া হয়েছিল ঠাকুর মশায় গেছিল ওই পঞ্জিকা নিয়ে পঞ্জিকার কত নম্বর পাতাতে তোর নামটা পাওয়া গেছিল।
উচিত বক্তা	ঃ	পঞ্জিকার কোন নম্বর পাতাতেই হামার নাম পাওয়া যায় নি।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	তালে ঠাকুর মশায় তো পঞ্জিকা দেখেই তোর নামটা রেখেছিল।
উচিতি বক্তা	ঃ	ঠাকুর মশায় পঞ্জিকা দেইখ্যাই আমার নামটা রাইখ্যা ছিলেন।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	আরে গর্ধব কত নম্বর পাতায় তোর নামটা ছিল?
উচিত বক্তা	ঃ	কুনো নম্বর পাতাতেই ছিল না।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	নামটা কোথায় পেল ঠাকুর?
উচিত বক্তা	ঃ	পঞ্জিকার মলাটে নামটা ছিল।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	ধ্যাত পঞ্জিকার মলাটে নাম থাকে?
উচিত বক্তা	ঃ	আরে চার পাঁচটা ভাত খাওয়া ছিল তাড়াহুড়া করে মলাট দেইখ্যা নামটা রাইখ্যে চলে গেইছে।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	চলে যা, চলে যা এপাশ থেকে বেরো।
উচিত বক্তা	ঃ	বাবু
লেবার কমিশনর	ঃ	হ্যা বল।
উচিত বক্তা	ঃ	আপনি কি বলছিলা।
লেবার কমিশনার	ঃ	ও আমার কথা ভুইলে গেলি। শোন—
উচিত বক্তা	ঃ	হ্যা বলেন।
লেবার কমিশনার (গান)	ঃ	তুমি কচি ব্যবসাদার আ-ওহে অফিসার তাই রক্ষা করে মোর গরীবের অধিকার।

মহিলা সমিতির নেত্রী (গান) ঃ ঐ মোদের সমিতি নারীদের প্রতি আর সইবে না অত্যাচার।

উচিত বক্তা ঃ কি বললেন দেবী? ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যেই নমস্তেস্যেই নমঃ নমা।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এই ব্যাটা এখানে দুর্গাপূজা হচ্ছে, না মহালয়া হচ্ছে।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ এই কি ব্যাপার বলো তো? তুমি কি আমাদের সঙ্গে ইয়ারকি করছ?

উচিত বক্তা ঃ হেই, আমি আপনাদের সঙ্গে ইয়ারকি—

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তাহলে তুমি আমাদের কথার মধ্যে কেন এরকমভাবে ডিসটার্ব করছ। তোমার যদি ভালো না লাগে তুমি চলে যেতে পারো।

উচিত বক্তা ঃ কেন যাব?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ কিন্তু তুমি আমাদের কথার মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি করবে না, ঠিক আছে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো।

(গান) ঃ মোদের সমিতি নারীদের প্রতি আর সইবে না অত্যাচার।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ করো মোদের নিয়োগ শ্রমিক বন্ধুগণ

উচিত বক্তা ঃ কি বলিলে গোলাম মশায় উঠাও চটকি ফাটাও গা দিনি— দেখি দেখি কার সাহস।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এই, এই ব্যাটা। তোর জিভ ধরে টেনে ছিড়ে ফেলে দিব রে ব্যাটা।

উচিত বক্তা ঃ আমিও জিভটারে ভইর‍্যা রাইখ্যা দিমু।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা (গান) ঃ করো মোদের নিয়োগ শ্রমিক বন্ধুগণ।

উচিত বক্তা (গান) ঃ আরে জনদরদী নেতা নেত্রী হুরে নমস্কার।

আর কুদলো ভেনি জোদের সাথে ভাষণ যাত্রির কাল হে

ফের রাজনৈতিক ডুগডুগির তালে নাচে এইসব গরীব দলে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এই ব্যাটা তুই কাকে বাদর বললি? কি জন্য বাদর বললি? তুই এক্ষুনি বাদর বললি।

উচিত বক্তা ঃ না একবারও বলিনি।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আরে তুমি তো এইমাত্র বললে।

উচিত বক্তা ঃ আমি বললাম বাদর খেলা দেখেছেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ নিশ্চয়ই দেখেছি।

উচিত বক্তা ঃ একজনা ডুগডুগি বাজিয়ে বাদর খেলা দেখায়। বাদরকে বলে বাদর ইস্কুল যা,

ডুগডুগ ডুগডুগ। বাদর ইস্কুলে যায়।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ খেলা দেখিয়ে বাচ্চাদের আনন্দ দেয়।

উচিত বক্তা ঃ হ্যা বাদর বিহা করতে যা। ডুগডুগ ডুগডুগ। বাদর বিহা করতে চলে যায়।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ হ্যা যায়।

উচিত বক্তা ঃ তা ঠিক সেইরকম আপনাদের ডুগডুগিটা রাখা আছে দিল্লিতে, না হয় কলকাতাতে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ কেন?

উচিত বক্তা ঃ ওখানে ডুগডুগিটা বাজছে, আর আপনারা এখানে—

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আরে কি বলছ ইডিয়েট কোথাকার।

উচিত বক্তা (গান) ঃ আরে জনদরদী নেতা নেত্রী হুরে নমস্কার

আর কুদলো ভেনি জেদের সাথে ভাষণ যাত্রীর কাল হে

ফের রাজনৈতিক ডুগডুগির তালে নাচে এইসব গরীবের দলে।

ও যদি ভঙ্গ হয়রে কাজ

আবার শ্রমিক মাঝে দাঙ্গা লাগায় তোদের মতো নেতারা।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এই দাঙ্গা আমরা লাগাই না দাঙ্গা লাগায় যারা সমাজবিরোধী তারা।

উচিত বক্তা ঃ এই শয়তান।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ কি!

উচিত বক্তা ঃ আজ দেখবেন এখানে যদি একশ জন রিকসা প্যাডলার থাকে পাঁচটা রাজনৈতিক দলে তাদেরকে পাঁচ ভাগে পাঁচটা ইউনিয়ন করছে। যদি একশ ট্রাক ড্রাইভার থাকে তাদেরকে পাঁচ ভাগ করছে। শ্রমিকে শ্রমিকে মারামারি, খুনাখুনি। আবার শ্রমিক মাঝে দাঙ্গা লাগায় তোদের মতো নেতারা। ঐ দাঙ্গার সময় তোদের পাত্তা নাই।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এ ব্যাটা।

উচিত বক্তা ঃ বলেন বাবু।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ তোরা কি আগের জন্মে ভিখারী ছিলিস রে।

উচিত বক্তা ঃ কেন বাবু।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ ভিখারী যেমন ভিক্ষা করে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে, ঠিক সেইরকম তুই নাচছিস।

উচিত বক্তা ঃ এটা আপনাদের ফিউচার।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আমাদের ফিউচার কি?

উচিত বক্তা ঃ আপনারা যখন মারা যাবেন তার আগে আপনাদের অবস্থা কি হবে?

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ কেন কি হবে?

উচিত বক্তা ঃ বাবু দুইটা ভিক্ষা দেন না। (৪)

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এটা আমাদের হবে না, তোদের হবে। আমরা মারা গেলে আমাদের ফুলের তোড়া দেবে।

উচিত বক্তা ঃ তোমরা মারা গেলে বাথরুমের ঝাটার বারি দিবে। বাবু বলেন—

লেবার কমিশনার ঃ আরেকটা মজার কথা, তোদের প্রাণের কথা কলছি শোন—

(গান) ঃ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে আমাদের সাথে সহযোগীতা চাই দুনিয়ার নেতার।

মহিলা সমিতির নেত্রী (গান) ঃ ঐ সমাজ বিরোধী ধর্ষণকারীরা হও হুশিয়ার।

উচিত বক্তা ঃ কি বললেন?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আমরা দেখেছি বর্তমানে পুরুষশাসিত সমাজ মেয়েদেরকে বাজারে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে।

উচিত বক্তা ঃ কি প্যাথেটিক নিউজ।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ মেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। আর এইভাবে যে মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছে তার জন্য কোনো দল নেই, কোনো ব্যক্তি নেই, যে এগিয়ে এসে সেটার প্রতিকার করে। কারণ আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে বড়ো বড়ো পয়সা ওয়ালারা, বড় বড় কনট্রাক্টাররা তারা কি করে জানো—

উচিত বক্তা ঃ কি করে?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তারা অর্থের লোভ দেখিয়ে আদিবাসী মহিলাদের, গরীব মহিলাদের কুপথে চালিত করছে। এই ধরনের রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। তাই আমি জানিয়ে রাখছি আমার ইউনিয়ান কিন্তু সেই জন্য। আমার ইউনিয়ানের কোনো নারীর প্রতি যদি এই ধরনের অত্যাচার হয় তাহলে সেই জানোয়ারটিকে যেমন করে হোক খুঁজে বের করে এনে তাকে এমন শাস্তি দেব, সে চিরদিনের জন্য ভুলে যাবে যে মেয়েদের উপর অত্যাচার করার পরিণাম কি ভয়াবহ।

উচিত বক্তা ঃ আচ্ছা ধরেন আপনি যে ধরনের অত্যাচারের কথা বললেন সত্যি সত্যি সেই ধরণের অত্যাচারে অত্যাচারিতা হয়ে একজন মেয়ে হয়তো মারা গেল, সেই মেয়েটি হয়তো আপনার ইউনিয়ান করে না বা কোনো ইউনিয়ানভুক্ত নয়।

আপনি কি করবেন?

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ তাহলে আমরা যাব কেন? আমাদের ইউনিয়ানের হলে তবেই আমরা স্টেপ নেব।

উচিত বক্তা ঃ দেখছেন মাইয়াছ্যালা কত হিংসুটি! দেখছেন।

মহিলা সমিতির নেত্রী (গান) ঃ সমাজ বিরোধী ধর্ষণকারীরা হও হুশিয়ার।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা (গান) ঃ তবু গো শ্রমিক শোষণ আর পার্টির আন্দোলন।

উচিত বক্তা ঃ ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার। যাকে দ্যাখেনি সে বড় সুন্দরী, যার হাতে খাইনি সে বড় রাধুনি। যার মা বেইচ্যা বেড়ায় বুড়াবুড়ি তলাতে মুড়ি, ওর ব্যাটা দ্যাখ ওমরিশ পুরি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ এই ব্যাটা। আমার শ্রমিকের প্রতি কেউ যদি অন্যায় অত্যাচার করে, আমার শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে, আমার শ্রমিকের দেহ থেকে যদি একফোটা রক্ত মাটিতে পড়ে সেই রক্ত দিয়ে হাজার হাজার শ্রমিক তৈরি হবে এবং সেই শ্রমিক সমাজ বিরোধীদের দমন করবে একমাত্র শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য।

উচিত বক্তা ঃ বাবু শোনেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ কি?

উচিত বক্তা ঃ আপনাদের কথা শুনতে শুনতে আমার একটা গল্প মনে পড়ল।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ কিসের গল্প?

উচিত বক্তা ঃ একটা ছিল অন্ধ দুই চোখে দেখতে পাইত না, একটা ছিল খোড়া ডান পায়া তকি নাই, একটা ছিল আপনার ভিখারী, জাত ভিখারী ভিক্ষা না করলে হাড়ি চড়ে না।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ তিনজন।

উচিত বক্তা ঃ দুভার্গ্যক্রমে তিনজনা বন্ধু। তিনজনায় ভিক্ষা সিক্ষা করে সংসার চালায়।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ বেশ।

উচিত বক্তা ঃ বৈশাখ মাস, সুদূর গ্রামে গিয়েছে ভিক্ষা করতে। ভিক্ষা করে মাঠের মধ্যে চলে আসছে। দুপুর তখন প্রায় ১২টা-১ টা।

লেবার কমিশনার ঃ হ্যা।

উচিত বক্তা ঃ রৌদ্রের মধ্যে হাপসে গেছে মাঠের মধ্যে একটা গাছ দেখেছে। গাছের তলায়

বসে নিস্তেজ অবস্থায় তিনজনে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠিক বেলা দুইটা আড়াইটার সময়।

লেবার কমিশনার ঃ কি হয়েছে?

উচিত বক্তা ঃ ঐ যে অন্ধ ছিল অন্ধের কিন্তু ঘুম ভেঙে গেছে। ওয় বলছে বাপরে আকাশের চাঁদের আলো কি রে!

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ ও তো অন্ধ রে, দেখতে পায় না। চাঁদের আলোটা—

উচিত বক্তা ঃ শালা অন্ধ চোখে দেখতে পায় না। দিনের বেলা চাঁদের আলো দেখছে। আর ঐ যে খোঁড়া আছে যার ডান পায়া দুটি নাই।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ হ্যা হ্যা হ্যা।

উচিত বক্তা ঃ বলছে মারব শালাকে এক লাথ মুড়ায় ভেঙে দিব।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আরে ওর তো পায়ে ভাঙা কিভাবে—

উচিত বক্তা ঃ ওর তো পায়ই নাই।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ দ্যাখতো।

উচিত বক্তা ঃ আর যে জাত ভিখারী ভিক্ষা না করলে শালার হাড়ি চড়বে না, ওয় বলছে মার শালাকে মামলা মোকদ্দমাতে যা টাকা খরচা হয় আমি দেব।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ ও তো ভিখারী টাকা পাবে কোথায়?

উচিত বক্তা ঃ তো এই হল আপনাদের তিনজনের অবস্থা।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা (গান) ঃ তবু গো শ্রমিক শোষণ আর পার্টির আন্দোলন।

উচিত বক্তা (গান) ঃ আরে কত সরকার আইল গেল স্বাধীনতার পরে হে (২)
আজ তবু মোরা রইলাম পড়ে একই আস্তাকুড়ে হে
হত্যা কিংবা ধর্ষণ হলে ভাসাও তোমরা চোখের জলে।
ও ধন্য অভিনয়ের খেল কত কি দেখলাম ওরে হে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আরে ঐ আমরা সমাজসেবী সমাজকে সেবা করে বেড়াই। আমরা অভিনয় করে বেড়াই না।

উচিত বক্তা ঃ অভিনয়।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ নিশ্চই।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ কি বলছ তুমি? আমরা এখানে দাঁড়িয়ে অভিনয় করছি।

উচিত বক্তা ঃ তোমরা বড় বড় সুপারস্টার অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে ছাড়িয়ে গেছ।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ কি বলতে চাইছ তুমি?

উচিত বক্তা ঃ আজ তোমাদের বললাম যদি সত্যি সত্যি কোনো মহিলার উপরে ঐরকম অত্যাচার হওয়ার পর নির্যাতিত হওয়ার পর মেয়েটি যদি মারা যায় তোমরা কি করবা? একটা শোক মিছিল নিয়ে আসবা।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ হ্যা প্রয়োজন আছে।

উচিত বক্তা ঃ শোক মিছিল নিয়ে এসে জনসমাবেশ যেখানে বেশি মোড়ের উপর রাখলা, রেখে তুমি একটা তুলের উপর উঠলা ভাষণ দিতে। উঠে বলছ, দেখুন আমার সামনে যে মহিলার মৃতদেহ রাখা রয়েছে একশ্রেণীর বর্বর পুরুষ তার উপর অত্যাচার করে তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। চোখ দিয়ে জল বার হচ্ছে। তখন কি করবে। এই যে ফুটানি কা বাটুয়া আছে ওর মধ্য থেকে পেপারমেন্ট বের কইর‍্যা চোখের মধ্যে লাগিয়ে দেবে।

মহিলা সমিতির নেত্রী ঃ আরে কি বলছেন কি?

উচিত বক্তা ঃ ভাষণ দিতে দিতে দেখছে শাড়ির কোণটা ঠিক আছে কি না। আর এটা, এটা তো আরও শয়তান। ভাষণ দিতে দিতে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে। বিশাল শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন— হে আমার খেটে খাওয়া মানুষ, হে আমার শ্রমিক মানুষ, হে আমার মেহনতি মানুষ আমাদের ছন্নছাড়া হয়ে থাকলে হবে না, আমাদের এক হতে হবে বন্ধু—অনর্গল জ্বালাময়ী ভাষণ চলছে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ হাততালি হাততালি।

উচিত বক্তা ঃ এর মধ্যে উনার খৈনি খাওয়ার দরকার হয়ে গেল। খৈনি খাবেন কিভাবে? খৈনি আছেন কোথায়? খৈনি আছে উনার কাছে। কী অবস্থায়? এক পকেটে চুন, এক পকেটে খৈনি। এবার ভাষণ দিতে দিতে কায়দা করে কখন দু-হাত দুই পকেটে ভরে দিয়েছে। বন্ধুগণ এই অবস্থায় আমাদের হাত পকেটে ভরে রাখলে চলবে না আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। শুধু রুখে দাঁড়ালে চলবে না বন্ধু, আমাদের হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। আমাদের মধ্যে ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। আমাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য থাকবে না। আমরা সবাই এক বন্ধু, সবাই এক, সবাই এক। আর এই সময় যদি কোন কন্ট্রাক্টার, কোনো পুঁজিপতি যদি আমার শ্রমিকের আহার ছিনিয়ে নিতে আসে, তৎক্ষণাৎ আমরা সদলবলে ছুটে গিয়ে সেই কন্ট্রাক্টার পুঁজিপতির মাথায় থাপ্পর মেরে

তার কাছ থেকে আহার ছিনিয়ে নিয়ে আমার শ্রমিক বন্ধুর মুখে তুলে দিব।

(গান) : আরে কত সরকার আইল গেল স্বাধীনতার পরে হে
আজ তবু মোরা রইলাম পড়ে একই আস্তাকুড়ে হে।
হত্যা কিংবা ধর্ষণ হলে ভাসাও তোমরা চোখের জলে
ও ধন্য অভিনয়ের খেল কত কি দেখলাম ওরে হে।
আরে শ্রমিক দরদ বুঝবি কি আর বাস করে অট্টালিকায়।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : আমরা বুঝবো না তো তোরা বুঝবি।

উচিত বক্তা : তোমরা এই খেটে খাওয়া দিনমজুরের দরদ কি বুঝবা।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : কে বুঝবে? আমরাই বুঝবো।

উচিত বক্তা : তোমরা ঐ দালান ঘরে থেকে, অট্টালিকায় থেকে, এসি রুমে থেকে, টিভি চালিয়ে, সিডি চালিয়ে, যাদের ঘর নাই বাড়ি নাই, গোটা দিন খেটে বেড়াচ্ছে; তোমরা কি করেছ?

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : ওদের জন্যই তো আমরা।

উচিত বক্তা : তোমরা ওদের জন্য, না তোমরা ওদের শোষণ করার জন্য। মোড়ে মোড়ে দেখবেন ইউনিয়ন অফিস করে রেখেছে। আর এই শ্রমিক বন্ধুরা গোটা দিন খেটে তাদের ভবিষ্যতের জন্য ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা করে দৈনন্দিন চাঁদা রাখে কিসের জন্য? তাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য। সন্ধ্যাবেলায় নেতা আসবেন। এসে বলছেন কিরে ট্যাবলা আজকের কালেকশন কত রে? তা বলল আজকে কালেকশন খুব ভালো নেই, মাত্র ৩৭০ টাকা। এক কাজ কর তুই ৭০ টাকার অরিজিনাল চেক কাট। ডুব্লিকেট চেকটা সরিয়ে দে। আর ৩০০ টাকার মধ্যে ৫০ টাকা তুই নে, ২৫০ টাকা আমাকে দে। বলে উনি একটি রিকসাকে ডেকে ওদিক দিয়ে যাওয়ার সময় রাসুয়ার ফরেনলিগারের দোকানটা আছে। একটা ছোট লিস নিয়ে লোপাক পাইকরের
[illegible]—

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : হেই ব্যাটা।

উচিত বক্তা (গান) : ও আমার শ্রমিক দরদ বুঝবি কি আর বাস করে অট্টালিকায়।

মহিলা সমিতির নেত্রী : শোনো।

উচিত বক্তা : বলেন।

মহিলা সমিতির নেত্রী	ঃ	আমি তোমার সমস্ত বক্তব্য প্রথম থেকে শুনলাম তাতে আমার যেটা ধারণা হল তুমি হচ্ছো একটা বদ্ধ পাগল।
উচিত বক্তা	ঃ	আমি পাগল।
মহিলা সমিতির নেত্রী	ঃ	অবশ্যই। রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা তোমার বিন্দুমাত্র নেই।
উচিত বক্তা	ঃ	ওহ্ মাই গড!
মহিলা সমিতির নেত্রী	ঃ	কাজেই তোমার সঙ্গে কথা বলে এই মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে চাইনা। আমার অনেক কাজ আছে আমি চলি। (প্রস্থান)
উচিত বক্তা	ঃ	আপনারা তো আসল মহিলা সমিতি করেন না, আসল শ্রমিক ইউনিয়নও করেন না, কি বুঝবেন। বাবু—
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	বল।
উচিত বক্তা	ঃ	আপনারা যে শ্রমিক ইউনিয়ন করছেন তাতে শ্রমিকের নিজস্ব কোন মতামত আছে।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই মতামত আছে।
উচিত বক্তা	ঃ	নাই।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	তুই বললেই হবে।
উচিত বক্তা (গান)	ঃ	আরে শ্রমিক ইউনিয়নের নাইকো আশ্রয় নিজের মতামত রাজনৈতিক স্বার্থে অবরুদ্ধ শ্রমিক সখের পথ হে তোরা হলি রাজনীতির দালাল—
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা	ঃ	এই ব্যাটা দালাল বলবি না। মুখ সামলে কথা বল। মেরে যে কটা দাঁত আছে ভেঙে ফেলে দিব।
উচিত বক্তা (গান)	ঃ	আরে তোরা হলি রাজনীতির দালাল ডেকেছিস তোরা বিভেদকাল/ও তোরা ধান্দাবাজের দল, ও ভাওতাবাজি দেশের কল /তাই হও আগুয়ান শ্রমিক বন্ধুগণ নিজ হস্তে ধর হাল। যে যে শ্রেণীর শ্রমিক আছেন নিজেদের হাল নিজেরা ধরুন। নিশ্চয় শিক্ষিত লোকের দরকার আছে, নিশ্চয়ই রাজনৈতিক নেতাদের দরকার আছে, তবে যারা আপনাদের স্বার্থ দেখবে শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবে তাদের ডাকুন তাদের নিয়ে ইউনিয়ান করুন। আপনারা জানেন নীলবিদ্রোহ হয়েছিল তার নেতৃত্ব কে দিয়েছিল? নীল চাষীর দল। দাস বিদ্রোহ হয়েছিল তার নেতৃত্ব কে দিয়েছিল স্পাটাকাস। তিনি দাস ছিলেন

তাই নিজেদের হাল নিজে ধরেন।

(গান) : তাই হও আগুয়ান শ্রমিক বন্ধুগণ
নইলে আন্দোলন করি হবে দেশটা ম্লান।

লেবার কমিশনার : শোন দেখছি তোর মাথায় বুদ্ধি আছে।

উচিত বক্তা : বুদ্ধি না তো কি আপনার মত গাবেট।

লেবার কমিশনার : ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হ। আমাদের জাগতে হবে বুঝেছিস। ইউনিয়ন করতে হবে, ইউনিয়ন ছাড়া বাঁচার উপায় নাই।

উচিত বক্তা : হ্যা।

লেবার কমিশনার : যে সমস্ত শ্রমিক কলকারখানা মিলে কাজ করে মালিক শ্রেণি তাদের ঠকাচ্ছে। তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে। সরকার জানতে পেরে আমাদের পদে বহাল করছে, আমরা যেদিন থেকে পদে আছি শ্রমিকদের এক পয়সা তারা মারতে পারে না। শ্রমিকরা ভবিষ্যতে খেয়ে পড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে সেজন্য তো আমরা আছি।

উচিত বক্তা : হ্যা।

লেবার কমিশনার : আমাদের ভুল বুঝবেন না।

উচিত বক্তা : না, না আপনি আস্তে আস্তে চুইষে খান।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : এই ব্যাটা এই তুই আমাকে এখনো চিনতে পারিস নি।

উচিত বক্তা : হ্যা বলেন বাবু। কেন বাবু চিনলাম তো।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : আমি হচ্ছি একজন সমাজসেবী, তুই হচ্ছিস একজন সমাজ বিরোধী।

উচিত বক্তা : না বাবু বিদ্যার কিরা না।

শ্রমিক ইউনিয়ানের নেতা : তুই চাস না যে সমাজের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হোক।

উচিত বক্তা : না, না বাবু।

শ্রমিক ইউনিয়ানে নেতা : তুই আমাকে দালালের সঙ্গে তুলনা করেছিস।

উচিত বক্তা : এমনি একবার দালাল বলেছি, গরুর দালাল তো বলিনি।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : আমাকে বাদরের সঙ্গে তুলনা করেছিস।

উচিত বক্তা : না, আর বলব না বাবু। মাঠে কেউ নাই সবাই চল্যে গেল বাবারে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা : আমার মা নাকি বাজারে বাজারে মুড়ি বিক্রি করে বেড়ায়।

উচিত বক্তা : না আগে বেচত, এখন নেতা হওয়ার পর আর ব্যাচে না।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ তুই আমাকে অপমানজনক কথাবার্তা বলেছিস।

উচিত বক্তা ঃ না, বাবু আর বলব না বাবু গো মারে।

শ্রমিক ইউনিয়ানের নেতা ঃ আমি যদি আমার এরিয়ায় তোকে পাই।

উচিত বক্তা ঃ আমি লাদেনের কাছে পালিয়ে যাব বাবারে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাক না কেন চিরুনি তল্লাশী করে নিয়ে এসে গর্ত করে —

উচিত বক্তা ঃ মাগো তোর যদি তোর ব্যাটাকে কিছু খাওয়াবার সখ থাকে জনমের মতো খাইয়া দেরে, ওগে বা গে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ গলা পর্যন্ত পুঁতে তোর এই মাথাটাকে ফাটিয়ে —

উচিত বক্তা ঃ বাবারে কালকে চুল কেটেছি বাবু।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ ঘিলুগুলাকে বের করে আকাশের শকুনকে দিয়ে ঠোকরে ঠোকরে খাওয়াবো।

উচিত বক্তা ঃ ওরে বাবারে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আর তোর গালের মাংসটাকে —

উচিত বক্তা ঃ বাবু আজ বিকেলে দাড়ি কেটেছি বাবু।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আমার বাড়ির পোষা কুকুরকে দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়াবো।

উচিত বক্তা ঃ বাবু শোনেন —

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ আবার তোর কথা কি শুনবো রে।

উচিত বক্তা ঃ মানব জনম দুর্লভ জনম, এ জনম তো আর হবে না।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ নেতাদের সঙ্গে কি করে ব্যবহার করতে হয় আগে শেখ।

উচিত বক্তা ঃ তাই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার এই পবিত্র দেহটা গলা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে এই মাথার ঘিলুগুলো কেনই বা শকুন গিধনীকে দিয়ে খাওয়াবেন।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ তবে তোর—

উচিত বক্তা ঃ আর আমার এই গালের পবিত্র মাংসগুলো কেন, কেনই বা আপনার বাড়ির পোষা কুকুরটা খাবে।

শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ঃ তবে তোর ঐ মাংসটা কে খাবে রে ব্যাটা।

উচিত বক্তা ঃ তোমরা মাগ ভাতারে খায়া লিবা।

(গান) ঃ তাই হও আগুয়ান শ্রমিক বন্ধুগণ
নইলে আন্দোলন করি হবে দেশটা ম্লান।

ডুয়েট

স্বামী : পেটটা খাউ খাউ করছে তাতাড়ি বাড়ি না গেলে হবে না। বাপরে সূর্য ডুইবা গেল সাজ লাগাইল বাবা রে। হ্যা সন্ধ্যা লাগি গিছে বাড়িতে ঝার-ঝাটা নাই। এত বড়ো তালা ঝুলচে ব্যাপারটা কি? তালাটা তো কারো বাড়ির ধার করা মনে হইচে ভাই।

স্ত্রী : এই কি ব্যাপার! তুমি কখন এলে বলো তো?

স্বামী : আরে তুমি গিয়েছিলে কোথায় গো? হ্যা, এত সাজগোজ।

স্ত্রী : আমি মনে করলাম আমি তোমার আগেই বাড়ি ফিরব, সেটা হল না। তুমি আমার আগেই চলে এলে!

স্বামী : ও আমাকে ফাঁকি দিয়ে আউট সারভিস চালানো হচ্ছে।

স্ত্রী : কি বলছ তুমি!

স্বামী : ব্যাপার কি! কুন মালটা তোমায় হেল্প করছে। এত সাজুগুজু করে কোথায় গিয়েছিলা?

স্ত্রী : দ্যাখো উল্টোপাল্টা কথাগুলো না আমার একেবারে ভালো লাগে না।

স্বামী : অ্যাই স্টপ ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ ডোন্ট টক স্ল্যাক। কার সাথে কথা বলছ। আমি যখন বলব যে হ্যাগো চলো তো আজ একটু ঘুরে আসি। নাগো আমার বড্ড মাথাটা টনটন করছে, আমি না আজ যেতে পারব না।

স্ত্রী : এটা ঠিকই বলেছ। দেখার মত অমানুষের সঙ্গে রাস্তায় বেরোনো যায়।

স্বামী : আর সাধারণ ঘরের লোক আমি। দ্যাখেন না, ড্রেস দ্যাখেন। হাটে দ্যাখেন, তিন আঙুল শাড়ি ধরে।

স্ত্রী : আরে বাবা এগুলো তো মেয়েদের কমন ড্রেস।

স্বামী : কমন ড্রেস! গিয়েছিলে কোথায়?

স্ত্রী : এতো মেজাজ দেখিয়ে কথা বলছ কেন?

স্বামী : হবে না মানে।

স্ত্রী : কেন?

স্বামী : কাকে মেজাজ দেখাচ্ছ? গোটাদিন কাজকর্ম করে এসছি। আসব হাত-মুখ ধুবো, দুটো খাব, সেনা উনি ঢপঢপে ঢপঢপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথায় গিয়েছিলা?

স্ত্রী : শোনো মানুষ যেভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে তুমি যদি আমার সঙ্গে সেইভাবে কথা বল, তাহলেই আমি উত্তরটা দিব। নইলে আমি বাধ্য নই।

স্বামী : তুমি আমার টেম্পার বাড়িয়ে দিয়েছো।

স্ত্রী : তোমার টেম্পার বাড়লেই কি, আর না বাড়লেই কি।

স্বামী : বলো কোথায় গিয়াছিলা?

স্ত্রী : তুমি আমার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলো তাহলে উত্তরগুলো দিব।

স্বামী : হ্যা বলো।

স্ত্রী : দেরী হয়েছে তো কি হয়েছে? মেয়েদের দেরী হওয়া কি অপরাধ?

স্বামী : তুমি আমার ই, আমি তোমার উ। দেরী হবে মানে।

স্ত্রী : এগুলো ভাষণ মান্ধাতার আমলে শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান যুগ বহু উন্নত। কাজেই ঐ সমস্ত কথাবার্তা এখানে চলবে না।

স্বামী : আরে যাও।

স্ত্রী : অবশ্য অমানুষ তো, তোমাকে বলা না বলা আমার নিজের মুর্খামি করা। তবে শোনো, আমি কোথায় গিয়াছিলাম জানো।

স্বামী : কোথায়?

স্ত্রী : আমি যেখানে গিয়েছিলাম তোমাকে বললে ভীষণ খুশি হবে। কোথায় গিয়েছিলাম জানো?

স্বামী : বল বল আর্ধেক খিদা বন্দ হয়া গেলো।

স্ত্রী : আমি গিয়েছিলাম ক্লাবে মিটিং শুনতে।

স্বামী : থাপ্পর পড়বে গালেতে।

স্ত্রী : কেন?

স্বামী : শালা মাইয়াছ্যালা গো বিয়াধাড়ী এদিক ওদিক —

স্ত্রী : আরে আমার কথাগুলো কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

স্বামী : শেষ মানে তুমি, প্রাণে মেরে দিব অন্য জায়গায় যেতে পারলে না। নারী মঙ্গল সমিতিতে যেতে পারলে না।

স্ত্রী : মুর্খ, তুমি একটা মুর্খ, অকাট মুর্খ। আমি আগে বলেছি আমার কথাগুলো শেষ করতে দেবে, তারপরে উত্তর দেবে।

স্বামী : আচ্ছা বল বল, হয়ে যাক।

স্ত্রী : আমি গিয়েছিলাম একটু বাজারে, ঠিক আছে। এবার বাজার থেকে ফেরার পথে—

স্বামী : হ্যা।

স্ত্রী : তোমাদের পাড়ার ঐ যে ক্লাবটা আছে না ইউনাইটেড ইয়ুথ।

স্বামী : হ্যা ইউনাইটেড ইয়ুথ।

স্ত্রী : ঐ ক্লাবের সামনে অনেকগুলো ছেলে জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বামী : মারামারি করেছে নিশ্চই।

স্ত্রী : আমি কি করে বলব। তখন আমি ছেলেদের ঐ জটলা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

স্বামী : মাইয়াছ্যালে হয়ে তুমি—

স্ত্রী : দ্যাখো ওটা তো আমাদের পাড়ার ক্লাব।

স্বামী : বাপরে!

স্ত্রী : এখন ক্লাবের ছেলেদের মধ্যে যদি কোন ঝামেলা হয় সেটা আমাদের নিশ্চই বাজে লাগবে। অবশ্য তোমার বাজে লাগতেও পারে, আবার নাও লাগতে পারে। তুমি তো একটা অমানুষ।

স্বামী : ডেনজারেস ওমেন!

স্ত্রী : কথাগুলো আমার শোনো, বেশি বকলেই যে বুদ্ধিমান সেটা কিন্তু নয়।

স্বামী : বল না?

স্ত্রী : যখন দাঁড়িয়ে গেলাম, দাঁড়িয়ে গিয়ে যখন ওদের বিষয়বস্তুটা জানতে পারলাম তখন আমার এত ভালো লাগল।

স্বামী : তার মানে!

স্ত্রী : শুনলে তোমারও ভালো লগবে।

স্বামী : তাই নাকি।

স্ত্রী : তারা অনেকদিন পর এত সুন্দর একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে। তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি।

স্বামী : কি সিদ্ধান্ত?

স্ত্রী (গান) : রক্তদান শিবির হবে যেতে হবে রক্ত দিতে
ঐ আলোচনা হল সভাতে মিটিং সিটিং।

স্বামী : কি বললা?

স্ত্রী : এতদিন পর তারা এত সুন্দর একটা উদ্যোগ নিয়েছে।

স্বামী : ঐ ক্লাবের ছোড়াগুলা এত বাড় বেড়েছে। রক্তদান, বাপের খায়্যা বনের মোষ তাড়াচ্ছে। আর তুমি ভাতারের খায়্যা রক্ত দিয়া বেড়াবা। মুড়া ফাটিয়ে দেব।

স্ত্রী : কি বলছ তুমি!

স্বামী : খবরদার না।

স্ত্রী : কি অমানুষ রে বাবা!

স্বামী ঃ প্লিজ ডোন্ট সোলেট হেয়ার। ইন এ হারি আপ গো নাউ ইয়োর ফাদার হাউস। বাপের খাও আর রক্ত দাও।

স্ত্রী ঃ আচ্ছা রক্তদানের কথা শুনে তুমি এত চটে গেলে কেন বল তো।

স্বামী ঃ চটব না মানে।

স্ত্রী ঃ কেন বল?

স্বামী (গান) ঃ শুনেছি অন্ন বস্ত্র গরু দানে হয় পুণ্যবান।

স্ত্রী ঃ আচ্ছা।

স্বামী (গান) ঃ রক্তদানের কথা কোনো শাস্ত্রে নাই কো মান।
ভষ্মে ঘি ঢালা সমান।

স্ত্রী ঃ তাই নাকি।

স্বামী ঃ হ্যা, শুনেছি অন্ন দান করে, বস্ত্র দান করে, গাভী দান করে, কন্যা দান করে— কতরকম দান আছে, সেনা ক্যাবলাকান্ত শশীকল রক্তদান - রক্তদান।

স্ত্রী ঃ আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমার কথাবার্তায়।

স্বামী (গান) ঃ যদি অন্ন বস্ত্র গরু দানে হয় পূণ্যবান
রক্তদানের কথা কোনো শাস্ত্রে নাইকো মান।
ভষ্মে ঘি ঢালা সমান।

স্ত্রী ঃ আরে এ কথা কেন বলছ বল তো।

স্বামী ঃ কেন বলব না, আমার জানা জানিস।

স্ত্রী ঃ কি বল?

স্বামী (গান) ঃ আবার বহু ব্যারাম হত আরাম রক্তে স্নান করলে
শুইনাছি ঠাকুরমাদের মুখেতে।

স্ত্রী ঃ কি বললে ভালো করে বল তো।

স্বামী ঃ ঠাকুরমা, কর্তামাদের মুখে শুনেছি আগেকার দিনে যদি ভারী ভারী ব্যারাম হত, যদি মানুষের রক্ত পান করত সে ব্যারাম ভালো হয়ে যেত।

স্ত্রী ঃ তাই নাকি!

স্বামী ঃ কোন মেয়ে যদি দেখতে কুৎসিত হত, সেই মেয়ে যদি মানুষের রক্তে স্নান করত আপন মনে সুন্দরী হয়ে উঠত।

স্ত্রী ঃ তাই।

স্বামী : আর ইনি রক্ত দিয়ে বেড়াচ্ছেন।

স্ত্রী : আচ্ছা বল তো বল তো—

স্বামী (গান) : আরে বহু ব্যারাম হইত আরাম শুইনাছি ঠাকুরমাদের মুখে।

স্ত্রী : বাঃ সত্যি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি এই কথাগুলো বলতে পারলে।

স্বামী : কেন বলব না। যাহা বলিলাম তাহাই সত্য।

স্ত্রী : মুর্খ, তুমি একটা অকাট মুর্খ না হলে এ কথাগুলো বলতে পারতে না।

স্বামী : তুমি একটা নন-সেন্স।

স্ত্রী : কারণ তুমি বললে তুমি নাকি ঠাকুরমা ঠাকুরদাদাদের কাছে গল্প শুনেছ যে রক্ত দিয়ে স্নান করলে সুন্দরী হওয়া যায়। রক্ত পান করলে নাকি কি হয় —

স্বামী : হ্যাগো শুনেছি রক্ত পান করলে আগেকার দিনে যে ভারী ভারী ব্যারাম হত ডাক্তার ফাক্তাররা ভালো করতে পারত না। রক্ত খায়ে নিলে—

স্ত্রী : অসুখ সেরে যেত। সত্যি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

স্বামী : কেন?

স্ত্রী : তুমি এই কথাগুলোকে সত্যি বলে মনে করছ!

স্বামী : তো সত্যি না, ঠাকুরমা হোত্তাবড়া মিথ্যে কথা বলবে।

স্ত্রী : বোকা, তুমি একটা বোকা। শোনো আগেরকার ঠাকুরমা ঠাকুরদারা তাদের নাতি নাতনিদের নিয়ে বসে বসে গল্প শোনাত।

স্বামী : কেমন?

স্ত্রী : ঠাকুরমার ঝুলি পড়েছ।

স্বামী : হ্যা হ্যা।

স্ত্রী : ঠাকুরমার ঝুলিতে যে ধরণের গল্পগুলো আছে তাদেরকে বললে তারা আনন্দ পেত। তারা বলত যে রক্ত দিয়ে স্নান করলে সুন্দরী হওয়া যায়, রক্ত পান করলে অসুখ সেরে যায়। এগুলি হচ্ছে কুসংস্কার। তারা শুধু নাতি নাতনিদের কাছে গল্প শোনাতেন মাত্র। আর সেই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে তুমি বাস্তবে রূপ দিতে চলেছ। তোমাকে মুর্খ ছাড়া কি বলব।

স্বামী : মিথ্যা কথা, না।

স্ত্রী : তুমি আর একটি কথা বলেছ যে গরু দান করলে পূণ্যবান হওয়া যায়, বস্ত্র দান করলে পূণ্যবান হওয়া যায়, রক্ত দানের কোন মূল্য নেই। তাই না, তাই বলেছ ভস্মে ঘি ঢালা সমান। তুমি রক্ত দানের গুরুত্ব বোঝ? বোঝ না। তা আমার কাছে জেনে নেও রক্তদানের

গুরুত্ব। তাই কি জান— (গান) তাই রক্তের অভাবে লক্ষ লক্ষ করছে মৃত্যুবরণ।

তাই তো রক্তদান এখন অতি প্রয়োজন রক্ষা পাবে বহু জীবন।

স্বামী ঃ আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও তো। জিনিসটা বুঝতে পারলাম না।

স্ত্রী ঃ তুমি জান, যেটা সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে আমাদের দেশে বছরে সময় মতো রক্ত না পাওয়ার ফলে বছরে এক লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে।

স্বামী ঃ আমাদের দেশে সময় মতো রক্ত না পেয়ে বছরে এক লক্ষ লোক রক্তের অভাবে মারা যাচ্ছে!

স্ত্রী ঃ আচ্ছা তুমি বল তো রক্ত ছাড়া কোন চিকিৎসা মাথায় আনা যায়। কাঁটা, ছেঁড়া-ফাড়া, মা-বোনদের ডেলিভারিতে পর্যন্ত রক্তের প্রয়োজন। আর সেই রক্ত দানকে তুমি বলছ ভস্মে ঘি ঢালার সমান। তাহলে তোমার সাথে আমি কি কথা বলব। তোমাকে মুর্খ ছাড়া কি বলব। আর কি জান—

স্বামী ঃ কি?

স্ত্রী ঃ তুমি বলেছ গরু দান করলে পূণ্যবান হওয়া যায়, বস্ত্র দান করলে পূণ্য হয়, আর রক্ত দান করলে কি হয় জান—

স্বামী ঃ কি হয়?

স্ত্রী (গান) ঃ যে করে রক্ত দান মহাপূণ্যবান সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

এ তুল্য কোন দান নেই পৃথিবীতে।

স্বামী ঃ বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

স্ত্রী ঃ কোন মানুষ রক্তের অভাবে মারা যাচ্ছে তাকে যদি আমার শরীরের কিছু রক্ত দিয়ে এই পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখতে পারি, সে আমার রক্তে যদি প্রাণ ফিরে পায় তুমি বল তো তার চাইতে পৃথিবীতে কোন পূণ্যবান কাজ হতে পারে?

স্বামী ঃ তার চাইতে পাপী পৃথিবীতে কেউ নাই।

স্ত্রী ঃ কি বলছ?

স্বামী ঃ যে মরছে তাকে বাদ দিয়ে ঠেলে আরো মেরে দাও।

স্ত্রী ঃ কি বলছ তুমি, কেন?

স্বামী (গান) ঃ আরে শরীর থাকলে ব্যারাম হবে তার জন্যে ডাক্তার,

চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল খুল্যাছে সরকার সভা সমিতির কি দরকার।

স্ত্রী ঃ তাই নাকি।

স্বামী : শরীর থাকলে ব্যারাম হবে এই জন্য ডাক্তার আছে, হসপিটাল আছে। পয়সা বেশি তারা নার্সিংহোমে চলে যাও, বড় ডাক্তারের কাছে যাও, কোলকাতা যাও, ভেলুর যাও। পয়সা নাই হোমোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে যাও, হাসপাতালে লাইন দিয়ে দেখাও।

স্ত্রী : আচ্ছা তাই নাকি।

স্বামী (গান) : আরে শরীর থাকলে ব্যারাম হবে তার জন্যে ডাক্তার।
চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল খুল্যাছে সরকার।
তার জন্যে এত সভা এত ক্লাবে মিটিং এত যুবক ছেলেদের খ্যাপানোর কি দরকার।

স্ত্রী : কোন প্রয়োজন নেই, তাই না।

স্বামী (গান) : আরে প্রয়োজন হলে রক্ত দিবে হাসপাতালে।

স্ত্রী : ও প্রয়োজন হলে হাসপাতাল রক্ত দিবে।

স্বামী : হ্যা যদি রক্তের দরকার হয় হাসপাতাল থেকে রক্ত দিবে। দিবে না, মারব শালা ডাক্তারের মুড়া ফাটিয়ে দিব। টেবিল চেয়ার ভেঙে ফেলে দিব। ডেক্স উঠিয়ে ফেলে দেব, জানলা টানলা ভেঙে ফেলে দিব শালা। আর ডাক্তারকে পিটব, ডাক্তারের বউকে পিটব, গুষ্টিকে পিটব, দিবেনা ওর বাবার রক্ত।

স্ত্রী : বাবা এটাও পারো তুমি।

স্বামী : তবে।

স্ত্রী : তুমি বলেছ শরীর থাকলে অসুখ হবে।

স্বামী : হতেই পারে, মে বি।

স্ত্রী : তার জন্য ডাক্তার আছে।

স্বামী : হ্যা।

স্ত্রী : মে বি।

স্বামী : ইয়েস।

স্ত্রী : তুমি ইংরেজিগুলো বলছ না আমার ভীষণ হাসি লাগছে।

স্বামী : লাগবেই।

স্ত্রী : কেন বল তো?

স্বামী : তোমার ইংরেজি জানা অভ্যেস নেই তাই।

স্ত্রী : না, এটা যদিও বলে থাকো অন্যায় কিছু বলো নাই। তবে একটা সত্য কথা জানো আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত মুর্খ আছে। কথাটা বোঝো।

স্বামী : কি?

স্ত্রী : তার পেটে বিদ্যা আছে কিন্তু শিক্ষার যে মানটা সে নিজেই জানে না।

স্বামী : তালে আমি লেখাপড়া শিখ্যা শিক্ষার অহংকার দেখাই না বুঝলা।

স্ত্রী : কথাগুলো শোনো, অত বোকার মত কথা বলো না। আচ্ছা তুমি বললে প্রয়োজন হলে হাসপাতাল রক্ত দেবে। হাসপাতাল যদি আমাদের রক্ত না দেয় তাহলে তুমি কেন, আমরা পেপার খুঁজলেই দেখতে পাই কোনো হাসপাতালে ভাঙচুর হয়েছে, কোনো ডাক্তারকে মারা হয়েছে।

স্বামী : হতেই পারে।

স্ত্রী : তাই তুমি যে কথাগুলো বলেছ অন্যায় কিছু বলনি।

স্বামী : অন্যায় কি?

স্ত্রী : আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এই কাজকর্মগুলো হচ্ছে। আচ্ছা তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন।

স্বামী : একটা কেন একশটা করো।

স্ত্রী : তুমি যে বললে হাসপাতাল আমাদের রক্ত দেবে। আচ্ছা হাসপাতাল কোথায় রক্ত পাবে?

স্বামী : কোথায় পাবে না পাবে আমার বাপের জানার কি দরকার।

স্ত্রী : বাঃ তুমি সচেতন মানুষ তো, যার জন্য এই কথাগুলো বলতে পারলে। শোনো তোমার তো অনেক ভালোমানুষের সঙ্গে ওঠাবসা আছে।

স্বামী : হ্যা নিশ্চয় আপার লেভেল।

স্ত্রী : আছে তো। তুমি কোন একজন সচেতন মানুষের কাছে জিজ্ঞাস করো তো আমার এই প্রশ্নের উত্তরটা তুমি পাও নাকি। কি প্রশ্ন জানো তো?

স্বামী : কি প্রশ্ন ?

স্ত্রী (গান) : তাই বিজ্ঞানের উন্নতি সারা পৃথিবীতে
রক্ত তৈরি হয় না কোনো ল্যাবোটরিতে
মানুষকেই হবে রক্ত দিতে।

স্বামী : কি বললা?

স্ত্রী : তুমি কোনো সচেতন মানুষকে জিজ্ঞাস করো তো হাসপাতাল রক্ত কোথা থেকে পাবে। রক্তের কি কোনো কারখানা আছে?

স্বামী : রক্তের কারখানা নাই!

স্ত্রী : না। রক্ত কোন ল্যাবোটরিতে তৈরি হয়?

স্বামী ঃ রক্ত কোনো ল্যাবোটরিতে হয় না!

স্ত্রী ঃ আকাশ থেকে পড়লে। এই ধারণাটাই তোমার নেই। রক্তের কোনো কারখানা নেই। রক্ত কোনো ল্যাবোটরিতে তৈরি হয় না। তাহলে হাসপাতাল রক্তগুলো কোত্থেকে পায়, তাই বলবে তো তুমি।

স্বামী ঃ কোত্থেকে পায়?

স্ত্রী ঃ এই যে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো যে রক্তদান শিবিরগুলো করে, বড় বড় ক্লাবগুলো যে করে এই রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে সেই রক্তগুলো হাসপাতালে পৌঁছে যায়, বুঝতে পারলে। শুনলে আরো অবাক হয়ে যাবে, কত সচেতন মানুষ আমাদের রক্ত দিতে এগিয়ে আসে জানো।

স্বামী ঃ কত?

স্ত্রী ঃ অবাক হয়ে যাবে। যেটা সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে কত মানুষ জানো—

(গান) হাজারে দুইজন ভারতে জনগণ দিচ্ছে রক্ত।

স্বামী ঃ একহাজার মানুষের মধ্যে মাত্র দুইজন স্বেচ্ছায় রক্ত দেয়।

স্ত্রী ঃ মাত্র দুইজন এক হাজার মানুষের মধ্যে। তাহলে তুমি বলো তো যে ভারতবর্ষে এক লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে সময়মত রক্ত না পাওয়ার ফলে। তো সেই দেশের মানুষ যদি স্বেচ্ছায় দুজন রক্ত দিতে এগিয়ে আসে একহাজার মানুষের মধ্যে, তাহলে আমাদের দেশে যে এক লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে বছরে, সেই মরণ থেকে আমরা তাদেরকে কোনোদিনের জন্য আটকাতে পারব? কোনো দিন সম্ভব নয়।

স্বামী ঃ মাইয়াছ্যালা হলে কি হবে, জ্ঞান খুব।

স্ত্রী ঃ মরণটাকে সেইদিনই আটকাতে পারব, কবে বল তো?

স্বামী ঃ কবে?

স্ত্রী (গান) ঃ হাজারে দুইজন ভারতে জনগণ দিচ্ছে রক্ত
ঐ সংখ্যাটা হবে বাড়াতে।
সংখ্যাটা যদি আমরা আরও বাড়াতে পারি তাহলেই মরণটাকে আটকানো যাবে। নইলে সম্ভব নয়।

স্বামী ঃ আদার বনের শিয়াল রাজা না।

স্ত্রী ঃ আরে কি বলছ তুমি!

স্বামী ঃ গায়ে গায়ে ঘুইর‍্যা সাধারণ মানুষের রক্ত চুষে বেড়্যাছিস, ডাইনি কুইথাকার।

স্ত্রী : কি বলছ তুমি! আচ্ছা কেন?

স্বামী : চোপ। আমাকেও পাঠিয়ে দিয়েছিল এখন গো।

(গান) : আরে রক্ত দিলে দুর্বল হবে পারিবে না খাটতে
আরে রক্ত পূরণের সময় লাগবে হবে ভালো খাইতে।
গরীব মরে যাবে ভাতে।

স্ত্রী : তাই নাকি।

স্বামী : রক্ত যদি একটা মানুষ দেয় কত দুর্বল হবে। ওকে ভালো ভালো খাইতে হবে, ডিম খাইতে হবে, আপেল খাইতে হবে, কত কি খাইতে হবে। একটা সাধারণ মানুষ কোথায় পাবে? প্যাটে ভাতে শালা বৌ ছেলে নিয়ে মরে যাবে। আর তুই পাড়া বেড়াচ্ছিস ডাইনিগিরি করে। মুড়া ফাটিয়ে দিব মার দিয়ে।

স্ত্রী : ঠিক আছে বলো তুমি।

স্বামী : শোনো, কত রক্ত চাই?

স্ত্রী : রক্ত চাই!

স্বামী : ইয়েস।

স্ত্রী : কোত্থেকে দেবে তুমি!

স্বামী : হাউ মাচ ওয়ানটেড অফ ব্লাড এনিটাইম।

(গান) : আবার রক্তের অভাব নাই হামার কথায় চললে পড়ে।

স্ত্রী : কী করতে হবে?

স্বামী (গান) : ও রক্ত পাবি কসাইখানাতে।

স্ত্রী : বাঃ।

স্বামী : কালকে সানডে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবি। খাসির রক্ত, বখরির রক্ত, ভেড়ার রক্ত, দেশি মুরগী-মুরগা বয়লার কত ড্রাম।

স্ত্রী : শোনো, কোনো অভাব নেই তাই না।

স্বামী : কত গেজানো কেবল বিসুদবারটা একটু খাসির রক্ত ড্রাই যায়। এনি আদারস ডে কত চাই রক্ত।

স্ত্রী : কোনো অভাব হবে না।

স্বামী : না, না কসাইখানায় গেলে কত।

(গান) : আবার রক্তের অভাব নাই হামার কথায় চললে পড়ে

ও রক্ত পাবি কসাইখানাতে।

স্ত্রী : বাঃ তোমার কথা শুনে এত ভালো লাগলো। তুমি আমাকে এমন জায়গার সন্ধান দিয়েছ সেখানে গেলে রক্তের কোনো অভাব নেই তাই না।

স্বামী : কোনো অভাব নেই।

স্ত্রী : তুমি আমাকে কসাইখানার দিলে—

স্বামী : হ্যা চলো নেতাজি মার্কেট, চিত্তরঞ্জন মার্কেট।

স্ত্রী : তোমার এই কসাইখানার সন্ধানের কথা শুনে না সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করছে।

স্বামী : জানাতেই হবে ধন্যবাদ।

স্ত্রী : কেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি জানো তো।

স্বামী : কেন?

স্ত্রী : তোমার ঐ মাথা থেকে যে কসাইখানা কথাটি বেড়িয়ে এসেছে।

স্বামী : আজেবাজে মাথা নাকি, দেখছ না বাইধ্যা রেখেছি এদিক ওদিক যেন না হয়।

স্ত্রী : শোনো।

স্বামী : হ্যা।

স্ত্রী : এই কসাইখানা ব্যাপারটা মানে পশুর রক্ত মানুষের দেহে সঞ্চালন করা যায় কি না, এটা কিন্তু বিজ্ঞানীদের মাথায় প্রথম এসেছিল।

স্বামী : আসতে বাধ্য।

স্ত্রী : বাধ্য তাই না।

স্বামী : হ্যা।

স্ত্রী : তার ফল কি হয়েছিল জানো।

স্বামী : কি?

স্ত্রী : ইজুকাল্টু জিরো।

স্বামী : হ্যা, জিরো!

স্ত্রী : হ্যা, পশুর রক্ত মানুষের দেহে সঞ্চালন করা যায় না।

স্বামী : কি!

স্ত্রী : তাতে করে মানুষ বাঁচে না।

স্বামী : তাই।

স্ত্রী : হ্যা, তারপর অনেক গবেষণার পর ড. কার্লাল স্টাইনার ১৮০১ সালে সর্বপ্রথম মানুষের রক্ত মানুষকে দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডে।

স্বামী : ইংল্যাণ্ডে!

স্ত্রী : হ্যা, কিন্তু তাতে করে কি হয়েছিল বলো তো।

স্বামী : কি?

স্ত্রী : তাতে করেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নি।

স্বামী : তাতেও মানুষ বাঁচে নি।

স্ত্রী : না তাতে করেও প্রাণহানী ঘটেছে।

স্বামী : তারপর।

স্ত্রী : তারপর অনেক গবেষণার পর ড. জেমস ব্যাণ্ডেল সর্বপ্রথম রক্তের গ্রুপটাকে আবিস্কার করলেন।

স্বামী : রক্তের গ্রুপ মানে রক্তের ভাগ।

স্ত্রী : ধরো তোমার 'ও পজিটিভ' রক্ত। তোমার রক্তের প্রয়োজন। তোমার শরীরে যদি 'ও পজিটিভ' রক্ত কোনো শরীর থেকে এনে তোমার রক্তে দেওয়া যায় তাহলে তোমার আর কোন অসুবিধা হবে না।

স্বামী : বাঃ

স্ত্রী : ঠিক আছে। এবং সেই থেকে রক্তের গ্রুপটা এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। এখন আর কোনো রকম মানুষের অসুবিধা হয় না। বুঝতে পেলে।

স্বামী : আচ্ছা আচ্ছা।

স্ত্রী : আর তুমি যে বললে না রক্ত দিলে শরীর দুর্বল হবে, তাতে করে ভালোমন্দ খাবারের প্রয়োজন আছে। এটা আমাদের ভুল ধারণা ।

স্বামী : ভুল!

স্ত্রী : রক্ত দিলে শরীর দুর্বল হয় না এবং ভালোমন্দ খাবারের কোনো প্রয়োজন নাই।

স্বামী : কোনো প্রয়োজন নাই!

স্ত্রী : না, আমরা যে সাধারণ খাবারগুলো খাই যেমন ধরো ভাত, ডাল, শাক —

স্বামী : ভাত, ডাল, শাক, তরকারী, আলু সিদ্ধ!

স্ত্রী : এগুলোই পর্যাপ্ত পরিমাণে খেলে রক্ত অটোমেটিকলি তৈরি হয়ে যায়। তাই কি জানো—

স্বামী : তাই কি?

স্ত্রী ঃ আর তুমি যে মনে করছ, রক্তদান না করলে তোমার রক্ত শরীরে থেকে যাবে এটা কিন্তু ভুল ধারণা।

স্বামী ঃ ভুল!

স্ত্রী ঃ এটা অনেক মানুষের ধারণা আছে। ধারণা কিন্তু ভুল।

(গান) তাই অতিরিক্ত রক্ত বেড়িয়ে যায় মল-মূত্রের সাথে

রক্ত দিলে শরীর দুর্বল হয় না কোন মতে বলছে চিকিৎসা শাস্ত্রেতে।

স্বামী ঃ আমাদের দেহে যে অতিরিক্ত রক্ত আছে সেটা মল-মূত্র ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

স্ত্রী ঃ বেরিয়ে যায়।

স্বামী ঃ রক্ত দিলে আমরা দুর্বল হব না, রক্ত দিলে অন্যের উপকার করা যায়, মানুষকে বাঁচানো যায়।

স্ত্রী ঃ শোনো তাহলে আমাদের জানতে হবে একটি মানুষের শরীরে একটি পুরুষের দেহে কত পরিমাণ রক্ত থাকে। তোমার জানা আছে?

স্বামী ঃ কত পরিমাণ রক্ত থাকে?

স্ত্রী ঃ একটি পুরুষের শরীরে প্রতি কেজিতে রক্ত থাকে ৭৬ মিলিলিটার।

স্বামী ঃ ৭৬ মিলিলিটার!

স্ত্রী ঃ আর একটি মহিলার শরীরে প্রতি কেজিতে রক্ত থাকে ৬৬ মিলিলিটার।

স্বামী ঃ ৬৬ মিলিলিটার!

স্ত্রী ঃ তাহলে তোমাকে একটা কথা বলি ধরো ৪৫ কেজি ওজনের একটি পুরুষের দেহে কত রক্ত থাকে জানো? প্রায় তিন লিটার।

স্বামী ঃ তিন লিটার!

স্ত্রী ঃ মানুষের দেহে রক্ত সংবহনের ক্ষেত্রে কত রক্ত লাগে জানো তো।

স্বামী ঃ কতটি?

স্ত্রী ঃ মাত্র দুই লিটার।

স্বামী ঃ মাত্র দুই লিটার!

স্ত্রী ঃ আর এক লিটার রক্ত মানুষের দেহে সবসময় বেশি থাকে। তো এবারে সেই শরীর থেকে যদি ধীরে ধীরে ২৫০ মিলিমিটার রক্ত বের করে নেওয়া যায় তাহলে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না বুঝতে পারলে। রক্ত কিন্তু আমাদের শরীরে অটোমেটিকালি তৈরি হয়ে যায়।

স্বামী ঃ বুঝলাম। হ্যা, বুঝব না একেবারে কি বোকা ধ্যাড়ধাড়া আছি বে।

স্ত্রী ঃ এবারে কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছি।

স্বামী ঃ কি সিদ্ধান্ত?

স্ত্রী ঃ কি সিদ্ধান্ত জান—

(গান) ঃ তাই কাল সকালে দুজনে মিলে দিব রক্ত
ও তোমার লিখিয়েছি নাম খাতাতে শীঘ্র।
তাই কাল সকালে—

স্বামী ঃ হ।

স্ত্রী ঃ তুমি আর আমি সেই ক্লাবে গিয়ে কিন্তু প্রথম রক্ত দিব ঠিক আছে।

স্বামী ঃ না, না কালকে আমি দিব না।

স্ত্রী ঃ দেবে না।

স্বামী ঃ কালকে রোববার আছে।

স্ত্রী ঃ কেন?

স্বামী ঃ না, ইনজেকশন আবার কোনখানে দিতে গিয়ে মাগে—

স্ত্রী ঃ আরে আমি তোমাকে এত করে বোঝালাম তারপরে তুমি এই কথা বলছ।

স্বামী ঃ কে আগে দিবে?

স্ত্রী ঃ কেন আমি আগে দেব তুমি পরে দেবে। কি হয়েছে তাই?

স্বামী ঃ মাগে।

স্ত্রী ঃ আশ্চর্য ব্যাপার।

স্বামী ঃ না-না তুই হামার নামটা কাইটে দে। পরে দিব, সাতদিন পরে দিব।

স্ত্রী ঃ কেটে দিব!

স্বামী ঃ ভালোমন্দ খাই আর দুই-চারদিন, যদি মরে যাই। মাগে- নামটা কাইট্যা আয়।

স্ত্রী ঃ কি বলছ তুমি? তোমাকে এত করে বুঝিয়ে তুমি এই রেজাল্ট পেলে।

স্বামী (গান) ঃ আরে নাম লেখানোর কথা শুনে জিউ করছে থরথর।

স্ত্রী ঃ কেন?

স্বামী (গান) ঃ ভয়েতে শুকিয়ে আসছে আমার গলার স্বর শরীর করছে থরথর।

স্ত্রী ঃ কেন, তোমাকে তো আমি সুন্দর করে বোঝালাম।

স্বামী ঃ মাগে আর বুঝিয়ে ডাইনি বউয়ের হাতে কেনে হামার বিয়া দিলে রে। জিন্দা ভাতারকে খাইয়া ফেলে দিবে গে।

স্ত্রী : কি বলছ তুমি!

স্বামী (গান) : আরে নাম লেখানোর কথা শুনে জিউ করছে থরথর
ভয়েতে বন্ধ হয়া আসছে গলার স্বর শরীর কাঁপছে থরথর।

স্ত্রী : আচ্ছা তোমার এত ভয় লাগছে কেন বলো তো।

স্বামী : ভয় লাগবে না।

স্ত্রী : কেন?

স্বামী (গান) : ওরে সূচ ঢুকাবে রক্ত টানবে ওরে বাপরে
ঐ আমি বাঁচবো নাকো জানেতে।
মাগে কত বড় বড় সুই আছে।

স্ত্রী : খুব ভয় তোমার। তবে শোন এই যে রক্ত দেওয়ার কথা শুনে তুমি যে ভয় পাচ্ছ না—

স্বামী : ভয় পাবে না!

স্ত্রী : এই ভয়টা কিন্তু শুধু তোমার ক্ষেত্রেই নয়, যারাই স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে এগিয়ে আসে তাদের মূল কারণটাই হল ভয়। বুঝতে পারলে।

(গান) তাই রক্ত না দেওয়ার মূল ভয় প্রধান কারণ
সমীক্ষার মাধ্যমে হয়েছে উদ্‌ঘাটন সচেতনার প্রয়োজন।
সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যারা রক্ত দিতে এগিয়ে না আসে তার মূল কারণটাই হচ্ছে ভয়। আচ্ছা তোমাকে একটা কথা বলি কিছুদিন আগে তোমার হাতটা লোহাতে কেটে গিয়েছিল।

স্বামী : হ্যা, দাও দিয়ে খড়ি কাটতে কেটে গিয়েছিল।

স্ত্রী : হ্যা, তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে একটা টকসাইড ইনজেকশন করার জন্য।

স্বামী : হ্যা টকসাইড বলেছিল।

স্ত্রী : তোমার কতটা লেগেছিল?

স্বামী : হ্যাই একনাও লাগেনি।

স্ত্রী : লাগেনি তাই না।

স্বামী : মাইরি বিদ্যার কিরা বলছি।

স্ত্রী : ইনজেকশন করলে যেমন ব্যাথা লাগে তেমন রক্ত দিতে। একটা ইনজেকশন করলে যে ব্যাথাটি লাগে রক্ত দানের ক্ষেত্রে সে ব্যাথাটিও লাগে না।

স্বামী : তাই নাকি।

স্ত্রী ঃ যারা রক্ত দিয়েছে তুমি তাদের জিজ্ঞাস কর। আমি অনেকবার দিয়েছি তো আমি জানি।

স্বামী ঃ শালা দিনে আটবার দশবার করে দিবো।

স্ত্রী ঃ না, এটা ভুল ধারণা। দিনে আটবার রক্ত দেওয়া যায় না।

স্বামী ঃ ও।

স্ত্রী ঃ একটি মানুষ তিন মাসে একবারই রক্ত দিতে পারে। তিন মাস পর সে আবার সে রক্ত দিতে পারবে।

স্বামী ঃ আবার তিনমাস পর দিতে পারবে!

স্ত্রী (গান) ঃ ইনজেকশন করলে যেমন ব্যাথা লাগে তেমন রক্ত দিতে।
ও ভয়ের কোন কারণ নাই এতে।
তাহলে বোঝা গেল-তুমি দেবে তো রক্ত?

স্বামী ঃ হ্যা দিব।

স্ত্রী ঃ আবার সকালবেলা উঠে কোথাও চলে যাবে না তো।

স্বামী ঃ না-না আমি আগে দিব।

স্ত্রী ঃ ঠিক আছে তুমি কিন্তু মনে রেখ। আমি চললাম।

স্বামী (গান) ঃ আরে চল বৈষ্টমী তুমি আর আমি রক্ত দিব দুজনায়।
আবার আমাদের রক্ত দিতে দেখলে রক্ত দিবে সবজনায়।

সালতামামি/রিপোর্ট

১. (গান) ঃ বলি নানা মোরা সদর্পে গম্ভীরা গাই নানা (২)
করব না মাথা নত কাপুরুষের মত গুরু গোপীনাথ বলেছে হায় নানা।

২. ঃ শোন দেশের খবরা খবর রাখছিস তো।

৩. ঃ এভরি ডে।

৪. ঃ তাল মিলিয়ে বলিস কিন্তু।

১. ঃ মাই হ্যাবিট।

২. (গান) ঃ যুগের সঙ্গে রাইখ্যা তাল

(গান) ঃ বুড়াবুড়ি তলায় বাইড়্যা গেছে মাতাল।

(গান) ঃ শহরের আনাচে কানাচে।

১. (গান) ঃ ও ডেরা দামে মদ ব্যাচে।

২. ঃ আচ্ছা এই যে শহরের আনাচে কানাচে ডেরা দামে মদ বিক্রি হয়, বেআইনি মদ বিক্রি হয়,

তো আবগারি পুলিশ আসে না।

১. : আবগারি পুলিশ, হ্যা।

২. : পুলিশ আসলে কি করে?

১. : হেভি ডিউটি।

২. : কেমন হেভি ডিউটি?

১. (গান) : ঐ আবার পুলিশ এলে দু গিলাস টানে খুশী মনে লাইনে—

২. : ভালো ডিউটি করছে।

১. : পুলিশ আসল, এ দাড়া লাইনে। কেমন আছে দেখি একবার-থু শালা মালে জল দিচ্ছিস। হ্যা গতবারের তোর মাসোহারা বাকি আছে। গতবারের বাকী টাকা আর এ মাসের টাকা গিয়ে অফিসে দিয়ে আসবি, না হলে শালা এবার ধরে দিব ফরটি সিক্স এ বেঙ্গল এক্সাইজ অ্যাক্ট-এ চালান করে। তবে ওরা খুব বেশি নেয় না সামথিং বেশি নেয়।

২. : কি রকম সামথিং?

১. : এই বত্রিশ রুপিস পার বোতল। মানে ওদেরও তো ফ্যামিলি আছে। সংসারটা তো চালাতে হবে।

(গান) : ঐ আবার পুলিশ এলে দুগিলাস টানে খুশি মনে লাইনে

২. : শোন।

১. : হ্যা বল।

২. : আরেকটা খবর

(গান) : ব্যবসা বাণিজ্য মন্দাই।

১. (গান) : ঘুরি ফিরি কোনো স্থানে কাজ নাই।

২. (গান) : দুয়ারে পাওনাদার ডাকে ভাই।

১. (গান) : দু চোখ দেখি অন্ধকার।

২. : আব্বে তুই চারদিকে ধার করে বেড়াবি তো পাওনাদার ডাকবে না।

১. : ধার করে কি সাধে খাচ্ছি রে ভাই।

২. : সাধে মানে।

১. : কালের গতিকে।

২. : কেমন কালের গতিকে।

১. : সকালে উঠি কামে ব্যাড়াছি, গোটাদিন কাজকর্ম পাচ্ছি না। আসার সময় ঐ গল্লি দিয়া

আসছি ঐ মুদিখানার দোকানদারকে বললাম ভাইরে আজকের মত চাল-ডাল-নুন-তেল দিয়া চালিয়ে দে ভাইরে। কালকেই কাম পাবো তোর টাকা শোধ করে দিব। আইনা মাগ ভাতার ছেলে পিলে লিয়ে সব খায়ে লিনু। তারপর দিন সকালবেলা আবার কামে বার হনু। কাম আবার সেইদিনও পালুম না। এই গল্লি বাদ দিয়ে দিনু।

২. ঃ ও যে মুদিখানার দোকানে ধার খালি ঐ গল্লিই বাদ।

১. ঃ ও গল্লি বাদ।

২. ঃ আচ্ছা তারপর।

১. ঃ এ গল্লি দিয়া আসনু। এ গল্লিতে এ দোকানদারকে বললুম ভাইরে আজকে কাজে গেছিনু কাজকর্ম পাইনি বারে। চাল-ডাল-নুন-তেল দিয়া আজকের মত চালিয়ে দে বারে। কালকে তোর টাকা শোধ করে দিমু। আবার খায়ে লিনু। কাল আবার কাজে বারানু, কাজ নাই। আবার এ গল্লি বাদ দিয়ে দিনু।

২. ঃ এ গল্লি বাদ, ঐ গল্লি বাদ।

১. ঃ হা।

২. ঃ এমনি করে তোর চারদিকে গল্লির দরজা বাদ হয়া গেল।

১. ঃ হা।

২. ঃ আর পাওনাদার যদি তোর বাড়ি চলে যায়।

১. ঃ হ্যা আসে।

২. ঃ তখন কেমন করে তুই ম্যানেজ করিস।

১. ঃ বৈজ্ঞানিক প্রথায়।

২. ঃ কেমন বৈজ্ঞানিক প্রথায়?

১. ঃ ও তখন থ্যাকা বাড়িতে বলি ছেলাকে, বলে যে বাবা বাড়ি নাই-নাই।

২. ঃ ও তার মানে তুই তোর ব্যাটাকে ট্রেনিং দিয়ে রাখছিস।

১. ঃ ট্রেনিং দিয়েছি বাট আনসাকসেস।

২. ঃ কেনে রে আনসাকসেস?

১. ঃ আরে শালা আমার একটা সাত বছরের ব্যাটা আছে ডাম্ফু। নামেও ডাম্ফু কামেও ডাম্ফু।

২. ঃ কেনে রে কি করল?

১. ঃ দেখছিস দোকানদার এসে আমাকে ডাকছে, ঐ শালা বিমলা তিনদিন হল চাল খাইছিস শালা টাকা দিসনি বে। আমি তো বুইঝে গেনু শালা চালের দোকানদার চলে এসছে। তো ব্যাটাটাকে

বললাম ব্যাটা গিয়ে বল গা বাবা বাড়িতে নাই। আর ব্যাটা কত একবারে অমিতাভ বচ্চনের মত অ্যাক্টিং করে দুয়ার খুলে বলছে কি বাবা বললে বাবা বাড়িতে নাই। ও তখন থ্যাকা বাড়িতে বলি ছ্যালাকে বল যে বাবা বাড়ি নাই।

২. ঃ শোন।

১. ঃ হ্যা।

২. ঃ আরেকটা খবর।

১. ঃ কি রে?

২. (গান) ঃ ছেলেরা সব দলে দলে।

১. (গান) ঃ অশ্লীল বই দেখছে হলে।

২. (গান) ঃ অশ্লীল বই সরকার করছে পাশ।

১. (গান) ঃ সমাজকে দিয়া দিছে বাঁশ। একবারে রামকিল মারল।

২. ঃ শোন, তুই দেখবি এই শহরে বিশেষ করে লছমি আর রূপকথা হল আর গ্রামাঞ্চলের ভিডিও হলগুলিতে কি জানিস—

১. ঃ কি?

২. ঃ সব 'এ' মার্কা ছবি।

১. ঃ হ্যা।

২. ঃ আর সেখানে ভিড় কাদের জানিস।

১. ঃ কাদের?

২. ঃ তের-চোদ্দ বছরের ছেলেদের।

১. ঃ তার কারণ আছে।

২. ঃ কি কারণ?

১. ঃ ঐ যে সিনেমা হলের সামনে বা ভিডিও হলের সামনে বা বাইরের দেওয়ালে পোস্টারিংগুলো করে বড় বড়।

২. ঃ ঐ রাস্তা ঘাটে যেমন।

১. ঃ হ্যা পোস্টারিং করে কি পোস্টারের কোণাতে লেখা থাকে বড় হাতের ইংরাজিতে A, যে গোল চিহ্ন থাকে। মানে অ্যাডাল্ট পিকচার প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। আঠারো বৎসরের উর্দ্ধে যারা তারাই দেখবে। এখন ১২, ১৩, ১৪ বছরের চ্যাংড়াগুলা এই পোস্টার দেখে মনে করছে আব্বে পোস্টারে এই, না জানি বই এর-ভিতরে কি না কি আছে। বাড়িতে গিয়া

জামাকাপড় খুইলা বাপের লুঙ্গি পইড়্যা আইসে টিকিট কাইটা নিয়ে গেল।

২. ঃ এই অয় যদি সিনেমা দেখবে তো বাপের লুঙ্গি পড়ে কেনে।

১. ঃ বড় হয়া গেল।

২. ঃ ও বয়স বাইড়্যা গেল। অশ্লীল বই সরকার করছে পাশ।

১. (গান) ঃ সমাজকে দিয়া দিছে বাঁশ।

পোস্টারের জ্বালাতে বৌ ছ্যালার সাথে রাস্তা চলা হইছে দায় নানা।

২. ঃ তুই ঠিকই বলছিস, আজকাল যে রাস্তাঘাটে পোস্টার তাতে ফ্যামিলির মা বোনেদের সঙ্গে একসাথে চলা যায় না।

১. ঃ তুই তো ঠেকিসনি।

২. ঃ কেনে তোর আবার প্রাকটিকাল নলেজ আছে নাকি।

১. ঃ হামার প্রেকটিকাল নলেজ কালকে কালকে।

২. ঃ হ্যা হ্যা।

১. ঃ হামার বাড়ি তো সাহাপুর। তো হামার ৭ বছরের ব্যাটাটা।

২. ঃ ঐ যে ডাম্ফু, ডাম্ফু।

১. ঃ হ্যা হ্যা বিকালবেলা বলছে বাবা বাবা টাউন যাব কালী দেখতে। হামি চিন্তা করলাম এত্তখুনা ছ্যালা টাউনে যাবে মাগে মা। কোনখানে গাড়ির তলায় পড়ে যাবে, চাপা পড়ে যাবে কি হবে, মরে যাবে কি বাঁচবে, কি করব পাঁচটা সাতটা নয় একটায় ছ্যালা। তো ফুসলে ফাসলে বললাম,ঠিক আছে হামি তোকে লিয়া যাব। তো সন্ধের আগে বিকালবেলা হাত ধর‍্যা লিয়া গেচি। গায়ের ছেলে টাউনে ঢুকেছে মটর দেখছে, গাড়ি দেখছে, দোকান দেখছে, মটর সাইকেল দেখছে, প্যাণ্ডেল দেখছে, সন্ধ্যা লাইগে গেছে লাইট দেখছে। আর দেখতে দেখতে না একটা দেওয়ালে বড় দেইখ্যা একটা সিনেমার খারাপ পোস্টার দেইখ্যা ফেলচে।

২. ঃ সিনেমার একটা খারাপ পোস্টার দেখে লিচে।

১. ঃ হ্যা, দেইখ্যা বলছে কি বাবা বাবা মাসি কাপড় পড়ে নাই কেনে?

২. ঃ মানসম্মানের ব্যাপার রে।

১. ঃ আমি তো চিন্তা করলাম ইরি বাপরে। দিলাম একটা ট্যাকফুলি ম্যানেজ।

২. ঃ কেমন ট্যাকফুলি ম্যানেজ।

১. ঃ আবে চুপ শয়তান, চল তোর মাসি এখন স্নান করতে যাবে, হাট।

(গান) পোস্টারের জ্বালাতে বৌ ছ্যালের সাথে রাস্তা চলা হইছে দায়।

২. ঃ শোন।

১. ঃ হ্যা বল

২. ঃ আরেকটা খবর।

১. ঃ কি রে?

২. (গান) ঃ ছাত্রদের জন্যে গ্রামাঞ্চলে।

১. (গান) ঃ সরকার চাল দিছে ইস্কুলে।

২. (গান) ঃ দু'টাকার খড়ি দিলাম জ্বাল।

১. (গান) ঃ তবু সিদ্ধ হইল নাকো চাইল।

২. ঃ কি, আমি বুঝতে পারলাম না চাল সিদ্ধ হল না মানে।

১. ঃ ঐ যে হামার ব্যাটা পারাইমারী ইস্কুলে পড়ে না।

২. ঃ ও হ্যা, এমনি গ্রামে গঞ্জে তো সরকার থেকে প্রাইমারী ইস্কুলে চাল দিচ্ছে।

১. ঃ চাল দিছে, হামার ব্যাটা ন কৌটা চাল পেয়েছে।

২. ঃ ও তোর ব্যাটা তো প্রাইমারীতে পড়ে।

১. ঃ হা ন কৌটা পেয়েছে।

২. ঃ আচ্ছা।

১. ঃ তো হামার বউ বলল হ্যাগো মাস দুমাস থেকে মাছ তো দূরের কথা মাছের আশও চোখে দেখতে পাইনি। তা এখন কদিন তো আর চাইল কিনতে হবে না। তা আমার বহুদিনে সখ একনা চ্যাপট্যা চ্যাপটা পুঁটি মাছগুলা আইনো, সর্ষাবাটা দিয়ে খাওয়ার সখ। হাজার হোক বউ বললে ভিতরটা একেবারে আকারিয়া উঠল। আমিও তাড়াতাড়ি বাজার গিয়া দুশো থেকে আড়াইশো চ্যাপটা চ্যাপটা পুঁটি মাছ লিনু, আট আনার সর্ষা লিনু। লিয়া দুটাকার পাত্তি খড়িগুলা লিনু।

২. ঃ ও তুমি পাত্তি খড়ি দিয়ে রাধো।

১. ঃ হাপাত্তি খড়ি দুটাকাতে ভাত, ডাল, একটা তরকারী হয়ে যায়। গরীব মানুষ কই টাকা পাবো। লিয়া না বউকে দিনু। বৌ তো একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেইচে মাছ দেখ্যা। তাতাড়ি করে কাইটে কুইটে লিয়া খড়ি-ফড়ি রেডি করে দিয়া বসিল। আর হামার তো নিজের জাগা নাই রাস্তার পাশে ঘর আছে। তা ওখানে চাট্টির বাড়ি। হ্যা তো রাস্তা দিয়ে লোক দেখতে পায় বইলা ঐ বারান্দাটাকে ঘির‍্যা দিছি আমার বৌকে দেখা যায় বলে।

২. ঃ হ্যা কাপড় দেয়া ঘেরা।

১. ঃ হ্যা কাপড় দিয়ে ঘেরে দিয়েছি রান্নার জায়গাটা। তা হামার বউ ভাতের জল বসিয়েছে। পাত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে, দিয়ে ভাতের জল গরম হয়ে গেছে। চাল দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে ফুটছে, জ্বাল দিয়েই চলেছে। পাত্তি দিয়েই চলেছে। দিতে দিতে মাইয়া ছ্যালার খাটনির শরীর ঘুমের আলসে চোখটা বুইজে আসেছে। ঐ দিকে পাত্তি শেষ হই গেছে। ঘুমের যখন তখন চাট্টি টানতে আরম্ভ করেছে। চাট্টি টেনে দিতে লেগেছে। চাট্টি শেষ শালা তাও চাইল আর সেদ্ধ হইল না।

২. ঃ ও তোর দুই টাকার পাত্তি প্লাস চাট্টি। তবু তোর চাল সিদ্দ হল না। সত্যি তোর ভাগ্য খারাপ।

১. ঃ খুবই খারাপ রে।

২. ঃ কারণ দ্যাখ, তোর দুটাকার পাত্তি খড়ি শেষ হয়ে গেল চালটাও সিদ্দ হল না। শেষে চালটা ফেলে দিলি হ্যা।

১. ঃ হ্যা বাপরে, ফেলে দিব।

২. ঃ তুইতো বললি চাল সিদ্দ হল না, তোর চালটা কি করলি!

১. ঃ তো ফেলে দিব নাকি।

২. ঃ কি করলি তো?

১. ঃ বর্তমান যুগটা কিসের?

২. ঃ বিজ্ঞানের যুগ।

১. ঃ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ওকে টেক করলাম।

২. ঃ কেমন বৈজ্ঞানিক প্রথা?

১. (গান) ঃ আবার ঐ অবশেষে পাটাই বেটে কোনরকমে গিলা খাইলাম।
কমলী মুঝকো ছোড়তা হায় লেকিন ম্যায়নে কমলীকো নেহি ছোড়ুঙ্গা।

২. ঃ শোন।

১. ঃ বল।

২. ঃ আরেকটা খবর।

১. ঃ কিরে?

২. (গান) ঃ মালদার বিখ্যাত আম।

১. (গান) ঃ দিনে দিনে হারাচ্ছে সুনাম।

২. (গান) ঃ তাই তো গবেষণা চাই।

১. (গান) ঃ চিনি লটপট আম বেশি সংখ্যায়।

২. ঃ কি আম বললে?

১. ঃ চিনি লটপট হয়ে যায়।

২. ঃ চিনি লটপট হয়ে যায়! আব্বে জীবনে এই নামটা প্রথম শুনলাম।

১. ঃ তোরা কি বাজার ঘাট করিস। শালা গৌড় বাজার কর‍্যা খাইস।

২. ঃ আমি শুনেছি ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, মোহনভোগ, তিস্তাপাতি। কিন্তু ঐ কি বললি নাম?

১. ঃ চিনি লটপটা।

২. ঃ এটা জীবনে প্রথম শুনলাম।

১. ঃ আরে কিছুদিন আগে মানে ষষ্ঠীপুজার আগে হামার শালা এসেছিল হামাকে লিতে।

২. ঃ হা তুই তো ফের কলকাতায় বিয়া করলি।

১. ঃ হামার বাড়ি গায়ে হলে কি হবে বিহা করেছি শালা কলকাতাতে।

২. ঃ আচ্ছা তারপরে।

১. ঃ তা হামরা মালদার লোক কি করি আম-কাঁঠালের সময় যদি আত্মীয়-স্বজন আসে, আমরা প্রথমে আম কাঁঠাল দিই পড়ে মিষ্টি সিঙাড়া দিই।

২. ঃ আত্মীয় আপ্যায়ন করতে।

১. ঃ আম কাঁঠাল দিয়ে আপ্যায়ন করি। তো শালা এসেছে বৌকে বললাম হ্যাগো শালা এসছে। আমি আবার ওদিক দিয়ে খুব ভালো ছেলে বউ আমার খুব গুণগান করে। আমি নিজের কাছে টাকা পয়সা রাখিনা বৌ-এর কাছে রাখি। বৌ-এর কাছে টাকাপয়সা লিয়ে দুটা ব্যাগ লিয়ে বাজারে গেনু বাজারে গিয়ে দেখছি আসেন দাদা লক্ষণভোগ, আসেন দাদা তিস্তাপাতি, আসেন দাদা গোপালভোগ, আসেন দাদা সীতাভোগ। আর কোনাতে একটা লোক বলছে আসেন দাদা চিনি লটপটা, আসেন দাদা চিনি লটপটা। আর আমগুলা কিরে একদম সোনার মতো ঝকঝক করছে। দেখার মতো আম ভাইর‍্যে নিলাম। লিয়া আইস্যা বাড়িতে বউকে দিয়ে দিনু। দিয়ে বটিটা আগিয়ে দিনু, এক বালতি জল দিনু, বাড়িতে একটা ফাট্রা প্লেট ছিল, একটা চামচ ছিল এটা বউকে দিনু। বাড়ির পাশে থেকে একটা প্লেট আর চামুচ লিয়া আইনু। আর হামার শালারা আবার ঐ ডিনিং টেবিলে খায়।

২. ঃ ও ডাইনিং-এ, হ্যা।

১. ঃ তো হামার বাড়িতে ডিনিং টেবিল নাই। তা একটা কাঠের বাক্স ছিল ওটাকে একদিকে উল্টা

করনু, এক দিকে তুল দিনু আর হামার বৌ-এর কাপড় খাচার পিড়হাটা ছিল ওইটাকে উপরে দিয়ে দিনু।

২. ঃ ওটাকে ডাইনিং বানিয়ে দিলে।

১. ঃ ডাইনিং বানাইচি।

২. ঃ ব্রেন আছে।

১. ঃ ব্রেন নাই আজেবাজে, বাপরে বুদ্ধদেব ভটচাজ কতবার আমাকে ডেকা পাঠাইচে। তবে এক দিকে শালা বসেছে ইট কালারের থান পইড়্যা, আমি বসেছি একদিকে। তারপরে হামার বউ দুপ্লেটত দুজনাকে আম দিয়েছে। খুব মন খুশী ডিনিং টেবিলে খাচি। তা হামার শালা এমনি করে কাইটে চুক করে মুখে দিয়ে টাং করে লাফ দিয়ে ধাং করে বসে গেল।

২. ঃ কেনে রে এমন ভৌতিক কাণ্ড কেনে!

১. ঃ আব্বে এত টক।

২. ঃ টক!

১. ঃ হা।

২. ঃ কেনে ওয় বলল চিনি লটপট। চিনির মতো মিষ্টি।

১. ঃ তা আমি কি ছ্যাড়া দিলাম রে শালা। সাথে সাথে বাজারে গিয়েছি, গিয়ে দেখছি ফের শালা মালটা দাঁড়িয়ে আছে। বলছে আসেন দাদা চিনি লটপটা, চিনি লটপটা। আমি, কি ব্যাপার দাদা মালদার বুকে আমদানী কবে থেকে। বলছে কেন মশায় ইয়ারকি করার জন্য এসছেন নাকি। আরে মশায় আপনি বলছেন চিনি লটপটা আম, আর মশায় লিয়ে গেলাম এত টক। ধ্যার মশায় আপনি আম খেতেই জানেন না।

২. ঃ উল্টা ওয় চার্জ করছে তোকে যে আপনি আম খেতেই জানেন না।

১. ঃ আমি, ওয় মাল বেশি বিগড়াবা না। রীতিমতো শালা মালদার মাটিতে জন্ম, নাড় কাইট্যা মালদার মাটিতে পুঁতা আছে রে শালা। আমটা কিভাবে খাইতেন মশায় হ্যা। আম জলে ধুইলাম, বাটিতে কাটলাম, প্লেটে নিলাম, চামচ দিয়ে খাইলাম। বলছে এই জন্য বললাম যে আমার খাওয়ার নিয়ম আপনি জানেন না।

২. ঃ বলছে নিয়ম জানেন না।

১. ঃ ওয় আমাকে নিয়ম বইলে দিল।

২. ঃ কেমন করে কি নিয়ম বলল?

১. ঃ বলল ঐ যে প্লেট লিয়েছেন আগে প্লেটে আড়াইশো করে পাঁচশো চিনি দিবেন দুটা। আর

দিয়ে আমকে কুচি কুঁচি করে কাটবেন, দিয়া প্লেটে দিবেন চিনির উপরে। আর দিয়া চিনিতে লটর পটর কবেন আর খাবেন। জানেন না মশায় চিনি লটপটে বলে দিয়েছি।

২. (গান) ঃ তাই তো গবেষণা চাই।

১. ঃ চিনি লটপট আম বেশি সংখ্যায়। এটা কিন্তু খুব দুঃখের কথা যে আজকে মালদার আমের সাইজ ছোট হয়ে যাচ্ছে। মালদার আমের বিদেশে যে সুনাম ছিল সেই সুনাম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

২. ঃ শোন, সেই গবেষণা শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে। এখানে এবং কিছু আম আমাদের বাইরেও গেছে। আর তুই যেটা বলছিস আম সংরক্ষণের কথা, আম সংরক্ষণ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে গৌড় রোডে।

১. ঃ আরে সেটা তো আমি করলাম।

২. ঃ মানে তোর গানেই সেটা হল বুঝি।

১. ঃ হ্যা আমার গানেই হয়েছে। শৈলেন আছে না শৈলেন সরকার, ও ব্যাটা হামার গান শুনে এই সব ব্যাপারটা করে দিল। না হলে ওকে ভৌতিক কাণ্ডটা করে দিতাম না।

(গান) ওই আবার আম সংরক্ষণে মালদায় সুজা গোষ্ঠা চাই নানা।

২. ঃ শোন।

১. ঃ হ্যা বল।

২. ঃ আরেকটা খবর।

১. ঃ কিরে?

২. (গান) ঃ বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন।

১. (গান) ঃ লাইন কইর‍্যা বস্ত্র বিতরণ।

২. (গান) ঃ বস্ত্র বিলিকারী ব্যাগে

১. (গান) ঃ সায়া ওড়না জুটল আমার ভাগ্যে।

২. ঃ কি জুটিল?

১. ঃ আরে ভাই, এর আগে যে বন্যা হল না ৯৮ সালে। মালদা জলে ডুইব্যা গেল।

২. ঃ হ্যা এর আগে যে ৯৮ সালের বন্যাটা হইল।

১. ঃ আমিও ডুবে গেছিনু, তা একটা বাবুর বারান্দাতে ছিনু।

২. ঃ শোন না সেই সময় কিন্তু বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন মানুষের পক্ষে ছিল, যেমন— ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন।

১. ঃ বহু রাজনৈতিক দল, বহু ক্লাব হা।

২. ঃ তুইও ডুবে গেছিলি।

১. ঃ আমিও ডুবে গেছিনু, তা একটা বাবুর বারান্দাতে ছিনু। কুনোদিন, কুনো কমিশনারের কাছে গেছি, কুনদিন প্রধানের কাছে গেছি, কুনো বন্ধুর কাছে গেছি, কুনো আত্মীয়ের বাড়ি গেছি চাল, ডাল, চিড়া, ছাত্তু, আটা আনে খাই। তো একদিন ফির‍্যা আসছি বিকালবেলা দেখছি হামার বাড়ির আগে একটা মোড় আছে।

২. ঃ ও এই মোড়টাতে।

১. ঃ হ্যা একটা ট্রাক দাড়িয়ে আছে। আরও ওখানে অনেক মাইয়্যা ছ্যালে-ব্যাটাছ্যালে আছে। আমি তো আগিয়ে গেনু। গিয়ে দেখছি সে ট্রাকে সব ক্যারি ব্যাগে করে কাপড় রাখা আছে।

২. ঃ বিলি করবে ঐ জন্য।

১. ঃ বিলি করবে ওই না দিতে সুবিধা হবে। তা একটা মাইয়্যাছ্যালার লাইন আর একটাব্যাটা ছ্যালার লাইন। আমিও তো কম সিয়ানা না, আমি দেখে লিলাম যে মাইয়্যাছ্যালার লাইনে হামারবউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। দেখি নাই।

২. ঃ নাই!

১. ঃ তাড়াতাড়ি বাড়ি গেনু। বাড়ি গিয়ে দেখছি বউ বসে আছে। তাড়াতাড়ি লিয়া আইনা বউকে লাইনে দাঁড় করানু যে এই বন্যার দিন যদি একটা ছিঁড়া চট পাই তাও কত কামে দিবে।

২. ঃ ও তুই তোর বউকে মেয়েদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলি। আর তুই?

১. ঃ আমি ব্যাটাছ্যালের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

২. ঃ তুই ছেলেদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলি, এবার।

১. ঃ দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে।

২. ঃ ঐ ক্যারিব্যাগে করে বস্ত্র বিলি শুরু হল।

১. ঃ হ্যা দিছে, দিতে দিতে চলছে লাইন, আস্তে আস্তে আগাইছে এবার হামার লাইন। হামি একটা ক্যারিব্যাগ পেলাম। মনটা কি আনন্দ রে।

২. ঃ সত্যি আনন্দ হওয়ার কথা।

১. ঃ ক্যারিব্যাগটা খুলেছি, খুইল্যা বাইর করছি দেখছি লাল চিকমিক ঝিকমিক করছে।মনে হচ্ছে কোনো বাবু ভাইয়ার পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবি আছে। মার শালা মাইয়াছ্যালার ওড়না রে।

২. ঃ খালি ওড়না, আচ্ছা।

১. ঃ তারপরে তো বাইর করতে গিয়ে ফিতা পায়ে গেছি, কাপড়া দেখছি আকাশি রঙের। মনে

করলাম বাবুরা তো রাইত করে এগলা পায়জামা-টায়জামা পড়ে হাটে বাজারে যায়, ওগলাই আছে। মার শালা স্যায়া।

২. ঃ সায়া।

১. ঃ হ্যা।

২. (গান) ঃ বস্ত্র বিলিকারী ব্যাগে।

১. (গান) ঃ সায়া ওড়না জুটল আমার ভাগ্যে।

২. ঃ আচ্ছা তুই তো লাইনে দাঁড়িয়ে কি পালি সায়া আর ওড়না।

১. ঃ হ্যা।

২. ঃ তোর বউও তো লাইনে দাঁড়িয়েছিল।

১. ঃ তা আমার বউ তো তোদের বউয়ের মত আনলাকি ওমেন না।

২. ঃ তাহলে নিশ্চয় ভালো জিনিস পেয়েছে।

১. ঃ ইয়েস, লাকি ওমেন ভালো জিনিস পেয়েছে।

২. ঃ কি পেল?

১. (গান) ঃ ও বউয়ের ভাগ্য ভালো হাফপ্যান্ট পাইলো চেন বোতাম কিছুই নাই।

২. ঃ ভালো জিনিস পেয়েছে। আচ্ছা শোন।

১. ঃ হ্যা।

২. ঃ আরেকটা খবর।

১. ঃ বল!

২. (গান) ঃ বোল বোমের তালে তালে

১. (গান) ঃ ইশারায় প্রেম ভালো চলে।

২. (গান) ঃ প্রেম নামের তুলনা নাই।

১. (গান) ঃ ও সিঁদুর দান হল রাস্তায়।

২. ঃ কোথায় রে?

১. ঃ এই যে শিবরাত্রির সময় মানিকচক ঘাট থেকে জল লিয়া আসে না।

২. ঃ হ্যা শিবের মাথায় জল ঢালে।

১. ঃ সব ছোড়াগুলা গেরুয়া প্যান্ট গেরুয়া জামা পইড়্যা, মাইয়াছ্যালাগুলা চুল ছাইড়্যে দেয়। লাল শাড়ি পইড়্যা সব ভাঙ্গর কইরা ইসে করে জল লিয়া আসে। আর সব বলে না ভোলে বাবা পার লাগাও ত্রিশূলধারী শক্তি জাগাও।

২. ঃ হ্যা, সুর করতে করতে যায়।

১. ঃ সেদিন আমি মিল্কিতে দাঁড়িয়ে আছি।

২. ঃ মিল্কিতে।

১. ঃ হ্যা তো, বাস ধরব বলে দাঁড়িয়ে আছি। তো বাস পাচ্ছি না। আট আনার বিড়ি কিনেখাচ্ছি। তো দেখছি দলে দলে সব চলে আসছে। মনটা শালা খুব ভালো হল যে যাক যুবক-যুবতীদের মধ্যে ধর্মে—

২. ঃ ধর্মে মন এসছে।

১. ঃ ধর্মে মন আসছে ভালো লাগছে। এই বিড়ি খাচ্ছি-বিড়ি খাচ্ছি সব চলে যাইছে। আরো আট আনার বিড়ি কিনলুম। হা লিয়া খাচি, খাইতে খাইতে একদল ব্যাটাছ্যালা একদল মাইয়াছ্যালা চলে যাইছে। বলছে ভোলে বাবা পার লাগাও ত্রিশূলধারী শক্তি জোগাও।

২. ঃ এরকম সুর করে বলতে বলতে যায়।

১. ঃ যায়, যাইতে যাইতে ওদের ঠিক পনের-বিশ হাত দূরে একটা ব্যাটাছ্যালে একদিকে আছে, আর একটা মাইয়াছ্যালে এদিকে আছে। এরা কিন্তু ওই সুরেই বলছে, তবে কথা আলাদা।

২. ঃ ওই লাস্টে যে ছেলে মেয়ে দুটো আছে ওদের সুরটা একই, কথাটা আলাদা।

১. ঃ আলাদা।

২. ঃ ওরা আবার কি বলছে?

১. ঃ ওরা বলছে— ভোলেরে বাবা পার লাগাও
তোমার নাম কি আছে
আমার নাম ললিতা আছে।
তোমার তো বিয়ে হয়নি
আমারও তো হয়নি।
চল এখানে বিয়ে করি
রাস্তায় সিঁদুর দান করি।
ভোলে বাবা পার লাগাও।

২. ঃ ও তার মানে ওদের রাস্তাতেই হয়ে গেল।

১. ঃ রানিং ম্যারেজ।

২. ঃ কি?

১. ঃ রানিং ম্যারেজ।

২.	ঃ	আব্বে আমি শুনেছি সোশাল ম্যারেজ, লাভ ম্যারেজ, রেস্ট্রি ম্যারেজ। আর এইটা রানিং ম্যারেজ ক্যানে।

১.	ঃ	রানিং অবস্থাতেই অলরেডি ম্যারেজ সেরেমনি পাস্ট।

২.	ঃ	ঐ জন্যে রানিং ম্যারেজ।

১.	ঃ	রানিং ম্যারেজ।

২. (গান)	ঃ	প্রেম নামের তুলনা নাই।

১. (গান)	ঃ	ও সিঁদুর দান হল রাস্তায়।
ও শিব ঠাকুর নানা জল পাইল না
জল ঢালল স্বামীর মাথায় নানা।

২.	ঃ	আচ্ছা জলটা তো নিয়ে যাচ্ছিল শিবের মাথায় ঢালার জন্য। আর রাস্তায় তো স্বামী পেয়ে গেল তা জলটা কি করল?

১.	ঃ	কি দরকার। যে শিব তুল্য পতি পাবার জন্য উপবাস সংযম করে সুদূর মানিকচকঘাট থেকে ডুব দিয়ে খালি পায়ে ভোলে বাবা পার লাগাও, ভোলে বাবা পার লাগাও করতে করতেজল নিয়ে চলে এসছে, ঐ জল আর পাথরের শিবের মাথায় ঢেলে লাভ কি বৎস। রাস্তা থেকে একটা জিন্দা ভাতারপায়ে গেল ওর মাথায় পারপারিয়ে দিল। ও এই পর্যন্ত করলাম ক্ষান্ত আমাদেরকে বিদায় দাও।

সংগ্রহসূত্র ঃ প্রশান্ত শেঠ (পরিচালক), কুতুবপুর গম্ভীরা পার্টী, কুতুবপুর, মালদহ, তাং ১৪.০৪.২০১০।

খন্ ঃ খিসা

মায়্যা বন্ধকী

চরিত্র লিপি ঃ

পুরুষ চরিত্রঃ

নুহা সাহা	-	একজন জোতদার
রঙ্গিয়া	-	তার ভাই
আনন্দ গোস্বামী	-	রঙ্গিয়ার গুরুদেব
ঢালা	-	নুহা সাহার চাকর
শরৎ	-	আনন্দ গোস্বামীর শিষ্য
ঘেরঘেরু	-	তার শিষ্যের ছেলে
কেরকেরু	-	গোস্বামীর ছেলে
পেটপাকু	-	নুহা সাহার শ্বশুর
ভুটি সর্দার	-	একজন ডাকাত
ঘসকু ও নসকু	-	তার চর, শিষ্য

চৌকিদার, মন্টু, ভুপাল, হাকিম আরও অনেক।

স্ত্রী চরিত্র ঃ

কিরণ	-	রঙ্গিয়ার বৌ
দেউনিয়ানি	-	নুহাসাহার বৌ
শোলো	-	ঘেরঘেরুর বৌ
ঠোঙ্গলো	-	পেট পাকুর বৌ
মাতাজী	-	আনন্দ গোস্বামীর বৌ
খকার মা	-	শরতের বৌ

।। ১ ।।

বন্ধনা (বন্দনা)

গান

হামরা করি বন্ধানা বর্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন জনা।।

পুরুবে বন্ধানা করি ধর্ম ঠাকুরের চরণ বন্ধি

তাহার চরণে হামরা পরণাম করি।।

উত্তরে বন্ধানা করি কালি মায়ের চরণ বন্ধি

তাহার চরণে হামরা পরণামও করি।।

পশ্চিমে বন্ধানা করি পীরসাহেবের চরণ বন্ধি

তাহার চরণে হামরা সালাম করি।।

দক্ষিণে বন্ধানা করি গঙ্গা মায়ের চরণ বন্ধি

তাহার চরণে হামরা পরণাম করি।।

বন্ধানা করিতে হামার হইল অনেকক্ষণ,

এ আসরে গাওয়া হবে মায়া বন্ধকী খন।।

।। ২ ।।

আনন্দ গোস্বামীর প্রবেশ

আনন্দ : আমি একজন গোসাই। আমার নাম যে কী কেউ জানে না আর জানবেই বা কি করে সবাই ডাকে আমাকে গোসাই গোসাই করে। কিন্তু আসলে নাম হচ্ছে আমার আনন্দ গোস্বামী। আমাকে এখন যেতে হয় শীষ বাড়ীতে। এখানে দেরি না করে তারাতারি শীষ বাড়ীতে যাই চৌরাশি দিতে।

।। ৩ ।।

রঙ্গিয়া ও পরে কীরনের প্রবেশ

রঙ্গিয়া : কন্যা, গোসাই আসবে নেপাকুছা করনা।

কীরণ : স্বামী, তাহলে হামরা করছি।

আনন্দ গোস্বামীর প্রবেশ

আনন্দ : বাফ রঙ্গিয়া?

রঙ্গিয়া : কি গোসাই আসলেন?

আনন্দ : হেঁ বাপু আস-ন।

রঙ্গিয়া : তাহলে বস গোসাই।

আনন্দ : বাফ রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়া : কী কহছেন গোসাই।

আনন্দ : তারাতারি নামের যোগার কর বাবা।

রঙ্গিয়া : তাহলে করছি গোসাই। কন্যা তারাতারি নামের যোগার কর না।

কীরণ ঃ তাহলে হামরা করছি। স্বামী— এই নাও স্বামী।

রঙ্গিয়া ঃ এই নাও গোসাই। (রঙ্গিয়া ও কীরণকে নাম মন্ত্র দেওয়া হল)

আনন্দ ঃ বাপ রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়া ঃ কী কহছেন গোসাই।

আনন্দ ঃ দেখ বাপু গোসাইর মন্ত্র নিলেন ঠিকেই, গোসাই পন্থে চলেন ত্রী সন্ধা, গুরু ভক্তি অতিথ ফকির আসিলে ঘুড়াই দিবেন নি বাপু আর যদি সেবা দিতে পারেন তাহলে অতি উত্তম।

রঙ্গিয়া ঃ তাহলে আমরা করত্তম গোসাই।

আনন্দ ঃ মা কীরণ?

কীরণ ঃ কী কহছেন গোসাই।

আনন্দ ঃ গোসাইর মন্ত্র নিলেন ঠিকই, কিন্তু গোসাই পন্থে চলেন বাপু।

কীরণ ঃ তাহলে চলম গোসাই।

আনন্দ ঃ ত্রীসন্ধা সামীভক্তি অতিথ ফকির আসিলে ঘুড়ায় দিবেন নী বাপু। বাপ রঙ্গিয়া তাহলে মুই গেনু বাপ।

রঙ্গিয়া ঃ গোসাই যাছেন তাহলে সেবা করবেনি গোসাই।

আনন্দ ঃ না সেবা করিমনি বাপু কারণ মোক অনেক দূর ঘুড়বা হয় শির্ষর বাড়ী চৌরাশি দিবা আর পরে আসিয়া তোর বাড়ী সেবা করিম। তাহলে মুই গেনু বাপ রঙ্গিয়া।

রঙ্গিয়া ঃ তাহলে যাও গোসাই। মনে কিছু করবেন নি গোসাই।

আনন্দ ঃ না না মনে কী আর বাপু।

রঙ্গিয়া ঃ কন্যা গোসাই যাছে প্রণাম করনা।

কীরণ ঃ তাহলে করছি স্বামী। (প্রণাম করবে) (সকলের প্রস্থান)

।। ৪ ।।

আনন্দ গোসাইর প্রবেশ

আনন্দ ঃ হরি বোল হরি বোল, এই রকম ভাবে বেড়াটা উচিত হচেনি মোর। চিন্তা করে দেখেছু মুই দেরশ দুইশ মত হয় গিসে। এখন মুই গুরু দেবের সাক্ষাৎ না করলে আর মুই কোন যায়গায় ঘুরচুনি। সুনেচু মুই মোর গুরুদেব দারজিলীংগে পাহারত মহাসাধন করছে এখন দেরি না করে তারাতারি দারজীলীং পাহারত চলিয়া যাউ গুরুদেবের সাক্ষাৎ করবা।

।। ৫ ।।

আনন্দ গোসাইর গুরুদেবের প্রবেশ ও আনন্দ

গুরুদেব ঃ হরি হর হরি হর হরি হর।

আনন্দ ঃ (জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল)

গুরুদেব ঃ এখানে কে তুমি?

আনন্দ ঃ আমি গুরুদেব।

গুরুদেব ঃ তুমি এখানে কেন? আনন্দ।

আনন্দ ঃ আমি আপনার কাছে আসিয়াছি আশির্বাদ নেওয়ার জন্য গুরুদেব।

গুরুদেব ঃ যাও তোমাকে আশির্বাদ দিলাম। আনন্দ যাও তুমি ঘড়ে ঘড়ে হরি নাম দিয়ে বেড়াও সবাই যেন হরি নাম উচ্চারণ করে আনন্দ।

আনন্দ ঃ তবে তাই করব গুরুদেব। (প্রণাম) (গুরুদেবের প্রস্থান)

আনন্দ ঃ যাক আমার ভাগ্যটা কিন্তু খুব ভাল। যে সময় গুরুদেব তপস্যায় বসিয়াছিল সে সময় আমি আসিয়া উপস্থিত। আর গুরুদেব আমাকে যে বাকী দিল। ঘড়ে ঘড়ে হরি নাম দিতে বলল।

(প্রস্থান)

।। ৬ ।।

আনন্দ গোসাই ও মাতাজীর প্রবেশ

আনন্দ ঃ এখন মোক শির্ষর বাড়ি যাবা হয়। শিষের বাড়ী যখন মুই যাম একটুক মাতাজীক ডাকিয়া দেখু। আরে-ও-মাতাজী -

মাতাজী ঃ কী কহচেন গোসাই।

আনন্দ ঃ মোর একটা কথা শুন।

মাতাজী ঃ কী এমন কথা গোসাই।

আনন্দ ঃ গান

শুনেক শুনেক ও মাতাজী শুন মরে কথা
শির্ষের বাড়ী যাছুরে মাতাজী নাই আসিম বাড়ী।
দেখিস মাতাজী ঘড় বাড়ী আর দেখিস ছাগল ছেলি।
আটদিন ধরে ও মাতাজী নাই আসিম বাড়ী।
(কথায়) শুনা পালো মাতাজী।

মাতাজী ঃ শুনা পাইসি গোসাই। তাহলে হামার একটা কথা শুন।

গান

শুন শুন ওহে গোসাই শুন হামার কথা

শির্ষের বাড়ী যাছেন হে গোসাই খাবার দিয়া যাও।

চাউল কালাই তরকারী নুন মরিচ হলদি

ঐলা দিয়া যাও হে গোসাই তোমার শিষের বাড়ী—

(কথায়) শুনা পালেন গোসাই।

আনন্দ ঃ শুন পাইসু মাতাজী—। তাহলে মোর কথা শুন।

গান

শুনেক শুনেক ও মাতাজী শুন মোরে কথা

দশটা টাকা দেছুরে মাতাজী খাইস তুই ভাঙ্গায়া।

আর দেছু বিশটা টাকা

ছুয়াটার তানে আনিস পেন জামা

মোর তানে কিনিয়া.আনিস এক জরা গামছা।

কথায়

শুনা পালো মাতাজী।

মাতাজী ঃ শুনা পান গোসাই। তাহলে কী তহমরা আজকা যাবেন গোসাই?

আনন্দ ঃ আইজ মানে - এখনই যাম তারতারি ঝলাটা আনিয়াদে।

মাতাজী ঃ তাহলে আনচি গসাই (ঝোলা আনিতে গেল ও আসিল)। এই নাও গসাই।

আনন্দ ঃ আচ্ছা মাতাজী শির্ষের বাড়ী যখন মাতাজী যাম ছুয়াটাক কাহা— তারাতারি ডাকদে।

(মাতাজী ছেলেটাক ডাকিল)

(কেরকেরুর প্রবেশ ও পরে সকলের প্রস্থান)

।। ৭ ।।

আনন্দর প্রবেশ

আনন্দ ঃ মুই যখন শির্ষের বাড়ী যাম এই গেলা জিনিসপত্র কেনং করে নিগাম একজন দোসর নিগাইলে ভাল হয়। দোসর কাক নিগাম। একজন মোর শির্ষের বেটাছে তার নাম ঘেরঘেরু দেউনিয়া। এখন মুই ঘেরঘেরুক নিগাম। (প্রস্থান)

।। ৮ ।।

ঘেরঘেরু ও পরে শোলোর প্রবেশ

ঘেরঘেরু ঃ শোলো-শোলো-শোলো

শোলো ঃ কি কহচেন পনেসতের —

ঘেরঘেরু ঃ	অতখনতে কেদছিলো
শোলো ঃ	হামরাত বাড়ীৎ ছিন।
ঘেরঘেরু ঃ	সকালে মোক কি নাগে?
শোলো ঃ	গান
	শুন ওহে স্বামী শুন মোরে কথা
	খাইবা মনাইসে দই চুরা
	দশটা টাকা দেছুহে স্বামী
	যাওনা বাজার করিবা
	ছোটতে গাভুর হয়া
	বাপ মায়ে দিশে বেহায়া
	আরনা খাইবা মনাইসে বেগনের বড়া।
আনন্দ ঃ	ঘেরঘেরু—
ঘেরঘেরু ঃ	কেদুর যাছি দাদো?
আনন্দ ঃ	তোরেঠি যাছু— যাবা হচে মোর সঙ্গে শির্ষের বাড়ী।
ঘেরঘেরু ঃ	গান
	শুনেক শুনেক ও দাদু শুন মোরে কথা
	ফাল্গুন মাসের দশ তারিখে মোর হুইসে বেহা
	নয়া নদারী ছাড়িয়া দাদু যাবায় পারিম না
	দুধ মিঠা দধি মিঠা আর মিঠা হয় চিনি
	তার চাইতে অধিক মিঠা নয়ানদারী—
শোলো ঃ	শুন শুন ওহে স্বামী শুন মরে কথা
	একলা ঘড়ে ও স্বামীধন অহিবায় পারিম না
	এখেত আন্ধার রাতি ঘড়ে রহিম যুবক নারী
	একলা ঘড়ে ও স্বামীধন সাহসে যুটেনী। (সকলের প্রস্থান)

।। ৯ ।।

রঙ্গিয়া ও কিরণ, পরে আনন্দ গোস্বামী ও ঘেরঘেরু

রঙ্গিয়া ঃ	হরিবোল-হরিবোল-হরিবোল
কীরণ ঃ	স্বামী,— তহমরা হেতলা কি করছেন।

রঙ্গিয়া ঃ কন্যা, হরির সাধনা করছু ভাই।

কীরন ঃ হরির সাধনা করে শসানে মশানে। তমরা হরির সাধনা কছেন ঘড়ের এগানায় খানতে। তাহলে হামার কথা শুন।

গান

সারাগায়ে ও স্বামীধন মারিসেন ফটা
ঐলা কীরতি ও স্বামীধন দেখিবায় মনায় না
কান্ড কিতিলা দেখিয়া জ্বলেছে মোর দেহটা
উলা কীর্তিলা ও স্বামীধন দেখিবায় মনায়না।

রঙ্গিয়া ঃ গান

কন্যা শুন মোরে কথা
সকলে কি করিতে পারে হরির সাধনা।
বনের পশু হনুমান তারায়ও চিনে ভগবান
মানুষ হয়া ওরে কন্যা চিনিতে আর পারিলো না।

কীরন ঃ গান

হরিনামের কি মাহিত্য বুঝিবায় ত পারুনা।
হরিবোল হরিবোল বলিয়া হলেন পাগেলা।
চুল দারিলা বাড়াইসেন তিলকের ফটা মারিসেন
এবার বুঝি ও স্বামীধন জগৎ মাতাইসেন।

রঙ্গিয়া ঃ গান

হরিনামের প্রল্লাদ ভক্ত জানে সর্ব্বজন
সত্য করে কহুচু কন্যা তাহার বিবরণ।
অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিলো তবু প্রল্লাদ মরিলো না।
হরিনামের কথালা কন্যা তবু মুখে ভুলে না।

আনন্দ গোসাইর প্রবেশ

আনন্দ ঃ বাপ রঙ্গিয়া ।

রঙ্গিয়া ঃ কী গসাই আসলেন?

আনন্দ ঃ হে আসনত বাপু।

রঙ্গিয়া ঃ বস গসাই ।

আনন্দ ঃ বাপ রঙ্গিয়া তারাতারি সেবার জগার কর।

রঙ্গিয়া ঃ করছি গসাই। কন্যা গসাই কোর না।

কীরন ঃ গান

ভগবান বলে ফুরালেন ঘর বাড়ী

তবুত না দয়া করে স্বামী ভগবান হরি।

ফুরালেন স্বামী ঘর বাড়ী আর ফুরালেন জাগা জমী

রঙ্গিয়া ঃ গান

বষ্টম বাবার সেবা যদি না যায় দেওয়া

এই কাল পর কাল কন্যা নরকে বাসা ।

এত করে বুঝানু তোক তবুত বুঝিলোনা

বষ্টম বাবার সেবা না দিলে নরকে বাসা।

কীরন ঃ গান

তুই থাকিতে ও স্বামীধন মুই যাম খুজিবা

ভাল করে সেবা দুয়াম তোমার গসাইটা।

রঙ্গিয়া ঃ গান

তুই গেলে যে বিশ্বাস হবে।

যারেঠি চাহিবো তাহে দিবে

মোর বড়নিলা ওরে কন্যা বিফলে যাবে

(তবুও কিরণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে)

কথা

তবে যাছু ভাই গসাইক দেখা শুনা করিস ভাই। (প্রস্থান)

।।১০।।

প্রবেশ পথে

শরৎ ঃ মোর নামত ভাই শরৎ, মুই ভাই গসাইর মন্ত্র নিসু, মোর বউটা নে নাই। কিন্তু নামের কথা শুনলেই বকাবকী করে। শুনেছু মুই রঙ্গিয়াদার বাড়ী গসাইটা আইচচে। তাহিলে যাউদি মুই গসাইটারঠি। রঙ্গিয়াদা, রঙ্গিয়াদা।

কীরণ ঃ কে দাউ শরৎ।

শরৎ ঃ (প্রবেশ) হ্যা বউদি মুই। তমার বাড়ী বলে গসাইটা আইসচে।

কীরণ ঃ তাহলে ঘরেরতি আয়।

শরৎ ঃ কে গসাই আইসচেন?

আনন্দ ঃ হ্যাঁ বাফু আইসচুত। কেদুর যাছি বাপ শরৎ।

শরৎ ঃ তমারেঠিনা গসাই।

আনন্দ ঃ কেনে বাপ শরৎ।

শরৎ ঃ হামার বাড়ী তমাক যাবা হবে। হামাক ত মন্ত্র দিসেন তমার শীষ বেটীর মন্ত্র হয় নাই। তমার শীষ বেটীক মন্ত্র দিবা যাবা হবে। বৌদি গসাইটা হামার বাড়ী যাছে।

কীরন ঃ দাউ শরৎ, গসাইটা যখন তমার বাড়ী যাবে তাইলে হামার বাড়ী আঘে সেবা করোক।

আনন্দ ঃ মা কীরণ শরতের বাড়ী মন্ত্র দিয়া আসিয়া তমার বাড়ী সেবা করিম।

কীরন ঃ গসাই যখন শরতের বাড়ী যাছেন, তাহলে হামার বাড়ী আঘে আখড়াটা চালু করে দিয়া যাও।

আনন্দ ঃ বাপ শরৎ, নে বাপু আঘড়াটা চালু করে দিই।

সকলে ঃ গান

ডুভলোরে মানুষ তরি
ভব সাগরের পাতালের মাঝে।
দেহার মধ্যে আছে রিপু ছয় জনা
ছয়জনে ছয় দিকে টানে
কারো কথা কেউ শুনে না। (প্রস্থান)

।। ১১।।

আনন্দ, ঘেরঘেরু, খকার মা ও শরৎ — শরতের বাড়ীতে প্রবেশ

শরৎ ঃ বস গসাই। খকার মা, খকার মা।

খকার মা ঃ কী কহচেন স্বামী।

শরৎ ঃ গসাই আইসচে চরণ সেবার যোগাড় কোর।

খকার মা ঃ ঐলা গসাইর মন্ত্র হামরা নাই নিম।

শরৎ ঃ মোর একটা কথা শুন—

গান

গসাই আইস্‌চে কন্যা হামার বাড়ীতে,
চরন সেবার জলরে কন্যা আন যোগাড় করে।

দুই জনে করিম হামরা গসাইবাবার চরন সেবা।

চরন সেবার জল মুছিম হামরা মাথার কেশ দিয়া।

কথা

গসাই তাড়াতাড়ি তমরা শীষ বেটীক বুঝাও।

আনন্দ ঃ মায়ো তাহিলে মন্ত্র নে।

খকার মা ঃ ঐলা মন্ত্র গসাই নাই নিম হামরা। হরি নামে দিয়া মন ভিটা বাড়ীৎ গাজে বন।

আনন্দ ঃ তাতে পাবো মা তুই শ্রীবৃন্দাবন। তাহিলে মন্ত্র নে—

গান

শুনেক শুনেক ওগে মায়ো

শুন মোরে কথা

হরি নামের কথালাগে মায়ো

কহেচু খুলিয়া।

হরি নামটা মাই বড়য় মধুর যে ভজে সে বড় চতুর

মুখের কথা নহে মাই শাস্তরে পাবো।

কথায়

শনা পালো মা, তাহিলে এখন মন্ত্র নে।

খকার মা ঃ তাহলে গসাই হামার একটা কথা শুন।

আনন্দ ঃ কি কথা মা।

খকার মা ঃ গান

শুন শুন গসাই শুন হামার কথা

হরি নামের কথালা হে গসাই কহনা খুলিয়া।

সত্য ত্রেতা, দ্বাপর কলি চার যুগতে গসাই

হরি নামে কে কে উদ্ধার গসাই

বল তাহার নাম।

আনন্দ ঃ আগে মন্ত্র নে, তারপরে বুঝায়া দিম।

খকার মা ঃ আযে হামাক বুঝায় দ, পরে মন্ত্র নিম।

আনন্দ ঃ গান

কলি যুগের জগাই মাধাই পাপী ছিল দুইজনা।

হরি নামে উদ্ধার হইল মাই তারায় দুইজনা

অহল্যা পাষাণে ছিলো

হরি নামে উদ্ধার হইলো

কাষ্ঠে তরী সোনা হইলো মাই শাস্তরে পাবো।

খকার মা ঃ বুঝা পান গসাই আর কথা শুন —

আইস গসাই বস খাটে দাড়ি চুল কুন মাসে গাজে।

আনন্দ ঃ কী শুনবো মাই। তাহিলে কহোচু মাই শুনেক -এক মাসে হইলো জলের ছঞ্চার, দুই মাসে হইলো রক্তের সঞ্চার, তিন মাসে হইলো ডিমোর সঞ্চার, চার মাসে হইলো ডিমের আকার, পাচ মাসে হইলো জীবের সঞ্চার। পাচ মাসে জীব গঠিত হইলো মাই। এই পাচ মাসেই দাড়িচুল গাজিল।

খকার মা ঃ আরেকটি কথা শন গসাই।

আনন্দ ঃ কী কথা আছে মা।

খকার মা ঃ তমার দাড়ী কয়খান গসাই।

আনন্দ ঃ দাড়ি হলো মা নয় খান।

খকার মা ঃ দেহার ভিতর লোমকুপ কয়টা গসাই?

আনন্দ ঃ দেহার ভিতর নবলক্ষ লোমকুপ মা।

খকার মা ঃ দেহার ভিতর নারী কয়টা গসাই।

আনন্দ ঃ নাড়ী তিনটি।

খকার মা ঃ তার নাম কি গসাই।

আনন্দ ঃ তার নাম হল ইঙ্গলা, পিঙ্গলা সুষমা।

খকার মা ঃ তবু হামরা নাম মন্ত্র নিমনি গসাই। এই প্রশ্নগুলা ভাল করে বুঝায় দ।

আনন্দ ঃ তাহলে আর একটা কথা শোন মা—

গান

যখন ছিলাম আমি বাপের শিয়রে

কেমনে গেলাম আমি মায়ের গর্ভে

মায়ের গর্ভে দশ মাস দশ দিন পুন হইলো

দশমাস দশ দিন পুনিত হয়ে ভূমিতে পরিলো

মায়ের চার বাপের চার গরু দুয়া দশ

আঠার মকামের কথা মাই খেলিছে মহারস। -

আর কি শুনিবো মাই। গসাই মন্ত্র নে।

খকার মা ঃ তবু হামরা মন্ত্র নিমনি গসাই।

আনন্দ ঃ তাহলে একটা কথা শোন মাই।

গান

এই দেহা তোর শশান সমান

নাম নিলে ওগে মাই তোর হবে ফুল বাগান

গসাইর নাম নিলে

চরণ সেবা করিলে

জমা পাবে আখেরে ।

খকার মা ঃ তাহিলে কি তমার নামমন্ত্র নিবায় হবে গসাই?

আনন্দ ঃ হ্যা, নিবায় হবে মায়ো। কারণ মন্ত্র যদি তুই নাই নিবো, এই হামরা তোর বাড়ী আইসচি তোর হাতে এক গিলাস জল খাম নি। কারণ তুই হলো শাক্ট।

খকার মা ঃ তাহিলে নাম নিলে কি ঠিকেই ফুল বাগান হবে গসাই?

আনন্দ ঃ তা নিশ্চয় হবে মা।

খকার মা ঃ নাম মন্ত্র নিম গসাই।

আনন্দ ঃ বাপ শরৎ।

শরৎ ঃ কী গসাই।

আনন্দ ঃ তাড়াতাড়ি নাম মন্ত্রের যোগাড় কর।

(সকলের প্রস্থান)

।। ১২ ।।

নুহাসাহার প্রবেশ

নোহা ঃ আমার নাম নোহাশাহা, আর লোকে বলে নোহাশুরা, কারণ কাউকে কিছু ধার টার দিই না। তার জন্যে লোকে নোহাশুরা বলে। আমি এখন রায়গঞ্জে যাবো কেসের তারিখ আছে। আমার বউ বাড়ীতে আছে কিনা ডেকে দেখি। দেউনিয়ানী।

দেউনিয়ানী ঃ কি কহচেন স্বামী।

নোহা ঃ দেখ দেউনিয়ানী, মুই ত রায়গঞ্জ যাছু। বাড়ীঘর দেখাশুনা করিস। ঢালা কোথায়, তাক ডাক।

দেউনিয়ানী ঃ ফ্লাস খেলবা গেইসে, তমরায় ডাক।

নোহা ঃ ঢালা-ঢালা।

ঢালা ঃ কি কহেছিগে দাদা।

নোহা ঃ কেদুর গেইলোরে। দেখ মুই রায়গঞ্জ যাছু। তুই ক্ষেত-খালা দেখাশুনা করিস।

ঢালা ঃ করিম। (নোহাশাহা ও ঢালার প্রস্থান)

রঙ্গিয়া ঃ দাদা - দাদা।

দেউনিয়ানী ঃ কেরে রঙ্গিয়া, কেত যাছি ভাই।

রঙ্গিয়া ঃ মুই তমার বাড়ী আসনু বৌদি।

দেউনিয়ানী ঃ কেনেরে?

রঙ্গিয়া ঃ গান

বৌদি শুন মোরে কথা
পেটের ভোকে ছাড়িয়া পালাছে মোর প্রাণ প্রিয়া।
তিন দিন ধরে না খাউ ভাত
কান্দেচে মোর প্রাণ প্রিয়া
পেটের ভোকে ছাড়িয়া পালাছে মোর প্রাণ প্রিয়া

কথায়

শুনা পালো বৌদি? মোক চাউল দে?

দেউ ঃ রঙ্গিয়া তোর দাদার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত মুই কিছু দিবা পারিম নি ভাই।

রঙ্গিয়া ঃ বৌদি তোক চাউল দিবায় হবে।

দেউ ঃ এই নে দাউ চাউল। তোর দাদার এখন আসার সময় হইসে সোজাসুজি বিল দিয়া যা।

রঙ্গিয়া ঃ তাহিলে মুই যাছু বৌদি। (রঙ্গিয়ার প্রস্থান)

ঢালা ঃ কি উলা দিলো গে বৌদি রঙ্গিয়া দাদাক।

দেউ ঃ চাউল দিনু ঢালা। (উভয়ে প্রস্থান)

॥ ১৩ ॥

নোহার প্রবেশ

নোহা ঃ অফিসের সময় দশটায়। কিন্তু মুই দেরী করে ফালাসু, এখন প্রায় বারটা। যাক আজিকা অফিসে যাওয়া যাবে নি। এলা সোজাসুজি কান্দর দিয়া বাড়ী যাম। (প্রস্থান)

॥ ১৪ ॥

রঙ্গিয়া ঃ তাড়াতাড়ি মুই বাড়ী যাউ।

নোহা ঃ কেরে রঙ্গিয়া? কেদুর গেইসলোরে। (রঙ্গিয়া চুপ) কোন কথাবার্তা নাই। ঝলাটাত উলা কিরে দেখু। বাঃ এলাত কঠারী ধানের চাউল, এই চাউল পালো কেদুর, শয়তান? চুরি করে আইনচি— (মারধোর)

রঙ্গিয়া ঃ গান

দাদা পায় ধরিয়া নেহরা করিছু গে দাদা

দেনা চাউল গেলা

তিন দিন হইতে না খাউ ভাত

কান্দেছে মোর প্রাণ প্রিয়া

পেটের ভোকে ছাড়িয়া পালাছে মোর প্রাণ প্রিয়া

নোহা ঃ দেখ রঙ্গিয়া যদি কোন তোর শর্ত থাকে তাহলে চাউল পাবো নিতে নাই।

রঙ্গিয়া ঃ দাদা মোর ত কোন শর্ত নাই। একমাত্র তোর ভাউষানি।

নোহা ঃ এছাড়া কি কিছু নাই! থাকবেই বা কি। আগেই ত পচাত্তর বিঘা সম্পত্তিলা বিক্রি করে শেষ। বেশ তাহলে তোর বউক ধরে কাল যাইস। আর কত গেলা চাউল লাগে নিয়া আসিস।

(প্রস্থান)

।। ১৫ ।।

দেউ ঃ ঢালা তোর দাদাক চাউলের কথা কহিস না।

ঢালা ঃ নাই কহিম বৌদি।

নোহা ঃ দেউনিয়ানী - দেউনিয়ানী (প্রবেশ) দেখ, দেউনিয়ানী হামার বাড়ী কেহ আইসছিল ফের। কথা কহছিনি দে? এই চাউল্লা কাক দিসলো।

দেউ ঃ তাহিলে এটা ভুল হইসে স্বামী। এই মাপ কর।

নোহা ঃ দেখ এবারের মত মাপ দিনু। একটা মোর কথা শুন, রঙ্গিয়াক যে চাউললা দিসলো ঐলা মুই কাড়িয়া নিয়া আইসচু। তার কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত তার বউক নিয়া না আসে ততক্ষণ মুই চাউল দেছুনি।

দেউ ঃ তাহলে তমরা ভাউষানিক বন্ধক নিবেন।

নোহা ঃ আরে এটা বন্ধক নয়, দাবীশর্ত। তুই কাহার আগত কহিবো নি। যদি কেহ পুছে তুই কহিবু মোর ছোট বহিনি। ঢালা—

ঢালা ঃ কেনেগে দাদা?

নোহা ঃ দেখ ঢালা, তোক যদি কেহ পুছে তুই কহিবি মোর দাদার শালী। আর কিছু কহিবোনি।

ঢালা ঃ নাই কহিমগে দাদা। (প্রস্থান)

॥ ১৬ ॥

কীরন ও রঙ্গিয়ার প্রবেশ

কীরন ঃ স্বামী চাউল আনলেন।

রঙ্গিয়া ঃ কন্যা চাউল আইনছু। তাহিলে একটা কথা শোন ভাই।

গান

কি আর শুনিবো রে কন্যা
মোর দুঃখের কথা
কথা কহিতে ওরে কন্যা
হিয়া যায় ফাটিয়া
পায় ধরিয়া কহিনু কথা
তবু ত বুঝে না
বড় দাদা হইয়ারে কন্যা
চাউল্লা নিলে কাড়িয়া।
কিরণ, শুন মোরে কথা
তরে লইয়া যাইম মুই বন্ধকী থুবা
অতয় করে বুঝানু তোক
তবু ত আর বুঝিলো না
গুরুর সেবা দিমরে কন্যা বন্ধকী থুইয়া।

কীরন ঃ গান

বাফো যুগে নাই শুনরে মুই
নয়া নয়া কথা
গুরুর সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া
কী শুনালেন স্বামী ওগে নয়া কথা
মায়াটাক বন্ধকী থুইয়া স্বামী
দেছেন গুরু সেবা ।

রঙ্গিয়া ঃ গান

ব্রাহ্মণরূপে ওরে কন্যা

যদি আসে ছলিতে

তখন মোরে ওরে কন্যা

কি উপায় হবে

কর্ণ দাদা দানী ছিলো

ব্রাহ্মণ রূপে ছলিতে আইলো

নিজের ছেলেকে কাটিয়ারে কন্যা ভোজন দিলো।

কীরন ঃ গান

স্বামী তমরা কেমন মানছি

মায়াটাক বনাইসেন স্বামী জিনিস বন্ধকী

বাফো যুগে নাই শুন মুই

নয়া নয়া কথা

মায়াটাক বন্ধকী থুইয়া স্বামী

কে দেছে সেবা?

রঙ্গিয়া ঃ গান

হরিশ্চন্দ্র হরির ভক্ত রাজ্য করিলোরে দান

নিজের মনকে রাখিয়া রে কন্যা প্রফুল্ল সমান

নিজের রানীকে বিক্রয় করিলো ব্রাহ্মণের ঘরে

নিজে চাকুরী খাটিলোরে কন্যা

কালু ডোমের ঘরে।

কথায়

কন্যা আর কান্নাকাটি বাদ দিয়া চল তাড়াতাড়ি।

।। ১৭ ।।

নোহাশুরা ঢালা দেউনিয়ানী পরে রঙ্গিয়া ও কীরণের প্রবেশ

কীরন ঃ গান

স্বামী নিদয়া হয়া

গুরুর সেবা দেছেন

হে স্বামী বন্ধুকী থুইয়া

এত করে বুঝানা তোক

তবু ত বুঝিলেন না

গুরু সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া।

নোহা ঃ দেখ দেউনিয়ানী, রঙ্গিয়ার আসার সময় হইসে। তমরা কোন কথা কহিবেন নি।

দেউ ও ঢালা ঃ কোন কথা কহিমনি হামরা।

রঙ্গিয়া কিরণের প্রবেশ

নোহা ঃ কতলা চাউল লাগিবে রে রঙ্গিয়া?

রঙ্গিয়া ঃ আধমন নিম দাদা।

কীরন ঃ আধমন চাউল কি করিবেন স্বামী? পাচ কাঠা চাউল নিয়া যাও।

রঙ্গিয়া ঃ দাদা আধমন চাউল নাই নিম। পাচ কাঠা নিম।

নোহা ঃ ঢালা পাচ কাঠা চাউল মাপিয়া দে (নোহার প্রস্থান)

ঢালা ঃ (চাউল মাপিয়া দিল)।

রঙ্গিয়া ঃ কীরন মুই যাছু ভাই।

কীরন ঃ স্বামী যাছেন তাহিলে আর একটা কথা শুন—

গান

স্বামী শুন মোর কথা

ছাড়িয়া যাছেন নিদয়া হয়া

অতয় করে বুঝানু তোক তবু ত বুঝিলেন না

গুরুর সেবা দেছেন স্বামী বন্ধকী থুইয়া

রঙ্গিয়া ঃ গান

কন্যা তুই আর কান্দিস না

মোরে মনটা কান্দেছেরে কন্যা তোকে দেখিয়া

একি ছিল মোর কপালের লেখা

তামানে দিনু ফুরায়া

একমাস পরে ওরে কন্যা

নিগাম ছুটায়া। (প্রস্থান)

নোহা ঃ দেউনিয়ানী কিরনক ভালবাসে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কর। তিনদিন ধরে খায়নি।

দেউ ঃ খাওয়াম স্বামী। (সকলের প্রস্থান)

॥ ১৮ ॥

গুরুর কাছে রঙ্গিয়া

রঙ্গিয়া ঃ হায় ভগবান।

আনন্দ ঃ বাপ রঙ্গিয়া, তাড়াতাড়ি সেবা যোগার কর।

রঙ্গিয়া ঃ এই নাও গসাই —

আনন্দ ঃ বাপ তাহলে মোর একটা কথা শুন।

গান

খাওয়া দাওয়া হইলরে রঙ্গিয়া ভজনত হইল
শীষবেটীটাক না দেখরে বায়ো
অন্ধকারে আলো
এলা দেখিনু কাজে কামে
আর তো চোখে দেখু না
শীষবেটীটাক ওরে রঙ্গিয়া
ফালালো কুনঠিনা।

রঙ্গিয়া ঃ হামার কথা শুন

গান

গসাই পা না ধরিয়া কহিচু গসাই
বড় ভূল করিয়াছি
হে গসাই করিবেন মারজনা
না বুঝিয়া ওরে গসাই দিনু বন্ধকী
বড় ভূল করিয়াছি।
গসাই করিবেন মারজনা।
(কথায়) শুনা পালে গসাই।

আনন্দ ঃ শুনা পানুত রঙ্গিয়া। মোর ত একটা কথা শুন।

গান

শুনেক শুনেক ওরে রঙ্গিয়া শুন মোর কথা
তোর বাড়ীকার গুরু সেবা না যায় নেওয়া।
ঘরের লক্ষ্মীটা বন্ধক দিয়া তেদিলো গুরু সেবা

তোর বাড়িকার গুরু সেবা না যায় নেওয়া

(কথায়)

বাপ রঙ্গিয়া শুনা পালো—

রঙ্গিয়া : শুনা পাইসি গসাই —

আনন্দ : বাপ রঙ্গিয়া তোর মহাজন কতলা।

রঙ্গিয়া : আমার মহাজন চারশত পচাত্তর টাকা—

আনন্দ : আর কী কী বাপ

রঙ্গিয়া : আর পাচ কাঠা চাউল গসাই।

আনন্দ : বাপ রঙ্গিয়া, তোর বাড়ী যদি খাওয়া নাই ছিল বাপ, মোক কেননি জানাইলো। এক গিলাস জল দিয়াত সেবা হলহয়া বাপ রঙ্গিয়া। তোক দুশ টাকা দেছু বাকী টাকা সাহায্য করিয়া তোর বউক্ ছুটায় আনেক বাপ। তোর জন্য মাইটা কতয় কষ্ট করছে। তাহলে গেনু বাপ।

(প্রস্থান)

।। ১৯ ।।

রঙ্গিয়া : গান

শুন দশজন বাবা
নিদান কালে ওহে বাবা
দেহ ভিক্ষা মোর মত হতভাগা
নাই এই সংসারে

(প্রস্থান)

।। ২০ ।।

নোহাসুরা, দেউনিয়ানী, কিরণ রঙ্গিয়া প্রবেশ

রঙ্গিয়া : দাদা, দাদা।

নহাসুরা : কেরে রঙ্গিয়া?

রঙ্গিয়া : হে দাদা।

নহাসুরা : কেদুর যাছিরে।

রঙ্গিয়া : মোর একটা কথা শুন।

নহাসুরা : কিরে এখন তোর কথা ছেইয়েরে?

রঙ্গিয়া : গান

নগে দাদা টাকালা

ঘুরায়া না দেগে দাদা মোরে মায়াটা

পায় ধরিয়া কহিচু কথা

সাহায্য করিয়াগে দাদা মেটানু টাকালা।

নহাসুরা : কত টাকা?

রঙ্গিয়া : দাদা চারশত?

নহাসুরা : চারশত টাকা পাবে কেদুর, মনে হয় চুরি করিয়া আনিলে। এই টাকা পালো কেদুর?

রঙ্গিয়া : সাহায্য করিয়া মেটানু দাদা।

নহাসুরা : যার ঘরে খাওয়া নাই তাকে সাহায্য দেবে কে? শয়তানটা চুরি করিয়া আনিলে।

(মারধোর টাকা লইয়া প্রস্থান)

রঙ্গিয়া : কন্যা মুই যাচু ভাই?

কীরন : যাছেন স্বামী? তাহলে হামার কথা শুন স্বামী?

রঙ্গিয়া : কী কথা ভাই?

কীরন : গান

বড়য় আশা করিয়া স্বামী আসিলেন ছুটাইবা

কান্দিয়া ভাবিয়া স্বামী মেটালেন টাকালা

এত করে বুঝানু তোক তবু তো বুঝিলেন না

এবার বুঝি ও স্বামী হারালেন মায়াটা

(কথায়) শুনা পালেন স্বামী—

রঙ্গিয়া : শুনা পানু কন্যা তাহলে একটা কথা শুন—

কীরন : কী কথা স্বামী—

রঙ্গিয়া : গান

কীরন শুন মোরে কথা

ছারিয়া না যাচু মুই নিদারুন হয়া

যেমন বিষ্ণুপ্রিয়া ছারিয়া নিমাই

গেল সন্ন্যাসী হয়া

ওই রকম ওরে কন্যা

যাছু ছাড়িয়া—

(কথায়) ঢালা, তোর বৌদিক দেখিস মুই যাছু ভাই। (প্রস্থান)

কীরন ঃ গান

স্বামী স্বামী আজি কি হইল কপালে
স্বামী হারা হনু মুই এনা সংসারে
একী ছিলো মোর কপালে লেখা
হনুরে মুই স্বামী হারা
আর কতদিন স্বামীর সঙ্গে হবেরে দেখা—

দেউ ঃ দিদি এখন চল ভিতরে যাই — (প্রস্থান)

ঢালা ঃ রঙ্গিয়া দাদা ওর বৌ যখন মোর হাতত দিয়া গেল, নহাসুরা এখন মুই বিভীষণ —

(সকলেই প্রস্থান)

।। ২১ ।।

রঙ্গিয়ার প্রবেশ

রঙ্গিয়া ঃ কীরন, কীরন—

গান

আজী কী হইল কপালে
লক্ষী হারা হনু মুই এনা সংসারে
একী ছিল মোর কপালের লেখা
হনুরে মুই লক্ষীহারা
আর কত দিন কীরনের সঙ্গে
হবেরে দেখা—
হায়রে আমার একী হলো
কথায় গেলে শান্তি পাবো
কথায় গেলে তারে পাবে।
(কথায়) কীরণ, কীরণ— (প্রস্থান)

।। ২২ ।।

দেউনিয়ানী, কীরন, ঢালা ও নহাসুরার প্রবেশ।

নহাসুরা ঃ দেউনিয়ানী রঙ্গিয়ার বউর নাম কি?

দেউ ঃ দিদি তোরে নাম কী ভাই?

কীরন ঃ মোর নাম কীরন।

দেউ ঃ স্বামী , তার নাম কীরন।

নহাসুরা ঃ দেখ দেউনিয়ানী তুই রোজেই চা তৈরী করছি আজ কিরন তৈরী করে আনোক—

দেউ ঃ দিদি কীরন, যা চা তৈরী করে আন —

কীরন ঃ যাছু দিদি (প্রস্থান ও চা তৈরী করিয়া প্রবেশ) এই নেহ বাহে —

দেউ ঃ ভাল ভাবে দে ভাই —

নহাসুরা ঃ দেউনিয়ানী দেখ মুই রায়গঞ্জ যাছু। তোক কাপড় লাগবে?

দেউ ঃ নাই লাগবে স্বামী —

নহাসুরা ঃ বাহে কীরন, তমাক লাগবে—

কীরন ঃ হে লাগবে।

ঢালা ঃ দাদা মোর তানে জামা পেন আনিস।

নহাসুরা ঃ আনিম ঢালা। তোর বৌদিক দেখিস। (সকলে প্রস্থান)

।। ২৩ ।।

মন্টুবাবুর প্রবেশ ও পরে নহাসুরা

মন্টু ঃ আমি একজন জয়বাংলার লোক। বদল করে ইণ্ডিয়ায় আসছি। এখানে আমি কাপড়ের দোকান করি। কিন্তু আমার কাপড়ের এক দর। বেশী আমি লাভ চাই না। এখনতো দোকান খুললাম। দেখি লোকজন আসছে কীনা।

নহাসুরা ঃ রায়গঞ্জ তো আসলাম। কার কাপড়ের দোকানে যাব। তবে নাম করা দোকান মন্টুবাবুরই। তার কাছে যাই, তার একদর। ও মন্টুবাবু কেমন আছেন?

মন্টু ঃ ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন নুহাশা।

নহাসুরা ঃ ভাল আছি মন্টুবাবু।

মন্টু ঃ আপনি কাপড় কিনবেন?

নহাসুরা ঃ তার জন্য ত আসছি আপনার দোকানে?

মন্টু ঃ বেশ ভাল। দয়া করে আসবেন। আপনাদের জন্য দোকান খুলে বসে আছি। আপনাকে কোন কাপড় লাগবে।

নহাসুরা ঃ আমাকে লাগবে শাড়ী আর শুট ও কোট।

মন্টু ঃ তা দিচ্ছি, বসুন। এই নেন শাড়ী।

নহাসুরা ঃ এটা ভাল নয়।

মন্টু ঃ তাহলে এটা নিন।

নহাসুরা ঃ এটা একটু ভাল, তার দাম।

মন্টু ঃ এর দাম চার শত টাকা।

নহাসুরা ঃ শুট ও কোট দেখান।

মন্টু ঃ এই যে নিন।

নহাসুরা ঃ এর দাম কত।

মন্টু ঃ তার দাম একশত টাকা।

নহাসুরা ঃ এই নিন পাঁচ শত টাকা। (উভয়ের প্রস্থান)

॥ ২৪ ॥

দেউনিয়ানী, ঢালা, কীরন ও পরে নুহাসুরার প্রবেশ

ঢালা ঃ মোর দাদা রায়গঞ্জ গিসে। এলাতনি আসে। মোর তানে কাপড় আনে কী নাই।

নহাসুরা ঃ ঢালা— বাড়ী আছিরে —

ঢালা ঃ হে দাদা আসলোগে— চ। মোর তানে জামা পেন আইনচি?

নহাসুরা ঃ ঢালা— এই নে তোর জামা পেন

ঢালা ঃ ভালতগে—

নহাসুরা ঃ ঢালা অপাবাড়ী গরু পইসে তারাতারি যা।

ঢালা ঃ কেনং কথা আপাবাড়ী গরু পইসে— তাহলে যাউ। (ঢালা প্রস্থান)

নহাসুরা ঃ দেউনিয়ানী ছাগল্লা কেনং করে বান্ধিসি। ছুটিসে, কলাইবাড়ী পইসে। যা তাড়াতাড়ি।

দেউ ঃ যাছি স্বামী। (দেউনিয়ানীর প্রস্থান)

নহাসুরা ঃ বাহে কীরন?

কীরন ঃ কেনে বাহে?

নুহা ঃ তোমার শাড়ী ন।

কীরন ঃ তাহলে দ?

নহাসুরা ঃ পছন্দ পইসে?

কীরন ঃ পছন্দ পইসে।

নহাসুরা ঃ তাহলে হামরা পছন্দ পইসি?

কীরন ঃ এলা কথা কহিতে তমাক লজ্জা লাগনি।

নহাসুরা ঃ লজ্জা ফের কিসের— কথা কহিতে।

কীরন ঃ গান

শুন শুন ওহে বাহে

শুন হামার কথা

তমাকে না দেখি বাহে

মায়া ধকলিয়া

স্বামী গিসে মোর বন্ধক থুয়া

ধর্মের পথ আর চিনিলেন না।

পা ধরিয়া কহিচি কথা

হামাক আর ছুয়েননা

নহাসুরা ঃ তাহলে হামার কথা শুন।

গান

ওনা শুন শুন ওহে বাহে

শুন মোর কথা

স্বামী গিসে তোর বন্ধক থুইয়া

আর না পারিবে ছুটাইবা।

জোর করিয়া ওহে বাহে

তোক করিম বেহা।

(কথায়) শুনা পালেন কীরন?

কীরন ঃ শুনা পান।

নহাসুরা ঃ তাহলে হামাক দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন ঃ হামরা দ্বীতিয় স্বামী নাই ভজম। তমরা হলেন ভাসুর হামরা তমার ভাউসানি। এলা কথা কহিতে লজ্জা লাগেনি।

নহাসুরা ঃ তাহলে সমন্দের কথা শুন—

গান

ওনা শুন শুন ওহে বাহে

শুন মরে কথা

রাধা কৃষ্ণ কী সমন্দ

বাহে দেখ ভাবিয়া।

ওনা তারাই হবে মামী আর ভাগিনা

প্রেম কইরাছে তারা দুই জনা

মানুষ হয়া ওহে বাহে কিছুই জানেন না।

কথায়

শুনা পালেন বাহে। দেখ, রাধাকৃষ্ণ মামি ভাগিনা তারা প্রেম করছিল হামরাত মানুষ হামারত ভুল হবেই।

কীরণ ঃ হামরা হরির নাম মন্ত্র নিসি হামরা দ্বিতীয় স্বামী নাই করম।

নহাসুরা ঃ তবে হরির কথা শুন —

গান

বৃথা মন্ত্র লয় জীব মন্ত্র কীবা করে

আপনি না জানে জীব পুনঃ পুনঃ মরে।

নিজ জাতি ধর্ম সমুদ্রে ডুবাইয়া

জগৎ ঠাকুর হইয়াছে হরি নাম লইয়া।

কথায়

তবে হরি নামের কথা ছাড়। হামার কথা শুন। তমরা দ্বিতীয় স্বামী বড়ন কর।

কীরন ঃ তবে হামার কথা শুন —

খালে আজিসু খাল পিয়াজ তাতে ভেরাইসে ঢেপ

তমার পাছাতি দেখি বাহে বড় বড় ঘেগ।

নহাসুরা ঃ কাহাবাহে— ঘেগ?

দেউনিয়ানীর প্রবেশ

দেউ ঃ স্বামী, স্বামী কীরনের সঙ্গে কী গল্প কলেন স্বামী।

নহাসুরা ঃ কিছু গল্প করুনি দেউনিয়ানী। কীরণক জীজ্ঞাসা করছি হরিনামত নিলেন হরি নাম কেমন জিনিস, হামার হরি নাম নিবা হয়। এই গল্প।

দেউ ঃ তমরা ভাল গল্প কলেন

গান

শুন শুন ও স্বামীধন শুন মরে কথা

নারীজাতি কালসাপিনি ঢংসিবে একদিনা

নারির প্রেমে ও স্বামীধন তহমরা মজেন না।

নারীর প্রেমে মজিয়া ধ্বংস হইল রাবন রাজা

নারীর প্রেমে ও স্বামীধন তহ্মরায় মজেন না।

(কথায়) শুনা পালেন স্বামী—

নহাসুরা ঃ শুনা পানতে, মোর কথা শুন

গান

শুনেক শুনেক ও দেউনিয়ানী শুন মোরে কথা

এলা কথা ও দেউনিয়ানী পাইলো কুনঠিনা।

ওনা ভগবত পুরানের কহিস কথা

সত্যযুগে আছে লেখা

কলি যুগের ঘটনা দেউনিয়ানি দেখনা চোখ দিয়া। (দেউনিয়ানীকে প্রহার)

দেউ ঃ গান

বিনা দোষে ও স্বামীধন মকে মারেন না

আপন মনে ও স্বামীধন যাছু পলায়া।

নুহা ঃ দুর হও দেউনিয়ানী। তোমাকে চাই না।

দেউ ঃ স্বামী, স্বামী বিনা দোষে হামাক বাহির করিয়া দেছেন তদে হামরা যাছি! যেন হামার কথা শরন করেন স্বামী।

নুহা ঃ দুর হও, চাইনা তোমার মতো দেউনিয়ানী— হাঃ হাঃ এবার পরিষ্কার। কীরন কোন চিন্তা নাই। তমরা এখন দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন ঃ তাহলে হামাক এক সপ্তাহ্ সময় দাও।

নুহা ঃ বেশ এক সপ্তাহ সময় দেওয়া গেল। (সকলের প্রস্থান)

।। ২৫ ।।

পেটপাক্ বুড়া ও ঠোঙ্গলো ও পরে দেউনিয়ানীর প্রবেশ

পেট ঃ দশ ঠাকুরলা প্রণাম। পেটপাক্ বুড়া মোর নাম। যাবা চাহেচু ভেড়াবা। ভেড়াবা যখন যাম তাহলে বুড়ীটাক্ ডাকায় দেখু। ঠোঙ্গলো—

ঠোঙ্গলো ঃ কী কহচেনতে—

পেট ঃ মোর একটা কথা শুন

গান

শুনেক শুনেক ওরে বুড়ী

শুন মোরে কাথা

যাইবা মেনাইসে ভেরাবা

তাড়াতাড়ি ভাজিয়া দে মারুয়া গেলা

এলায় যাম চলিয়া

গুয়ালির ফালাইস ছানগেলা

বেলা হালিয়া আসিম ঘুরিয়া

(কথায়) শুনা পালো—

ঠেঙ্গালো ঃ শুনা পানু তে হামার কথা শুন—

গান

শুনেক শুনেক ওরে বুড়া

শুন মোরে কথা

এলাহায় নাগিসে তোকে ভোখ

ঘর দুয়ারলা ওরে বুড়া মুছিবা দেনা

মোক চাইটি ছিল মারুয়ার আটা

টেকনাইলা দিসে ফালায়া

জরায় বাটলায় হবে একখান চিতুয়া

দেউনিয়ানী ঃ বাড়ীর দরজার কাছে কাঁদতে কাঁদতে—

গান

কান্দিয়া ভারিয়া ও মোর দিন গেল চলিয়া

আর কতদিন স্বামীর সঙ্গে হবেরে দেখা

স্বামী রইল নিজ ঘরে

আর কতদিন দেখা হবে স্বামীর সঙ্গে।

পেট ঃ কথায়

যারে বুড়ী বাহারাতি কান্দন শুনা পাছু। যাত দেখিয়ানে।

ঠেঙ্গলো ঃ তাহলে হামরা যাছি —(বাহিরের দরজার কাছে গিয়ে) কে বেটী?

দেউনিয়ানী ঃ হে মা, মুই। তমার জুয়াই হামাক মারিসে গরুর নাখা।

ঠেঙ্গলো ঃ বুড়া, মাইটা আইসচে।

পেট ঃ মাইটা আইসচেতে কী হুসে?

ঠোঙ্গলো ঃ তাহলে আমার কথা শুন—

গান

শুনেক শুনেক ওরে বুড়া

শুন মোরে কথা

ছুয়াটাক মারিয়া ওরে বুড়া

বুড়া কী কইসে দশা

এখতে নাবালক ছুঁয়া

মাইর মারিসে গরুর নাখা

আটকুরা জুয়াইটার শরিলে নাই দয়া

দেউনিয়ানী ঃ গান

কী শুনিবে ওগে বাও

মোর দুঃখের কথা

কথা কহিতে ওগে বায়ো

হিয়া যায় ফাটিয়া

নারীর প্রেমে মজিয়া

দেখিবায় পারেনা

ঘাড় ধরিয়া ওগে বাও

দিসে বাহির করিয়া।

পেট ঃ কুন নারীর প্রেমে মজিসে?

দেউনিয়ানী ঃ বাও অর ভাউসানিক দেখিয়া— (উভয়ের প্রস্থান)

।। ২৬ ।।

ঢালা ও পরে কীরন পরে নুহাসাহা প্রবেশ

কীরন ঃ ভাই ঢালা তোরঠি কুন বুদ্ধি কী আর নাই?

ঢালা ঃ হে মোরাঠি কোন বুদ্ধি নাই?

কীরন ঃ তোর দাদা তোর হাতত সপিয়া দিয়া গিসে।

ঢালা ঃ হেঁ ঠিকেইত। তে বুদ্ধিছে। ঘর বাড়ী জাগা জমি রেষ্টারী করে নে তারপর কহিস দ্বিতীয় স্বামী ভজিম—

কীরন ঃ ভাই ঢালা তাহলে করিম।

নুহার প্রবেশ

নুহা ঃ বাহে কিরণ এক সপ্তাহ মধ্যে কি বুঝ কলেন?

কিরণ ঃ তে বাহে হামার কথা শুন

গান

শুন শুন ওহে বাহে
শুন হামার কথা
জাগাজমি ঘর বাড়িলা
দেহ লিখিয়া জাগা জমি ঘর বাড়ী
সবে দেহ রেষ্টারী
তবে না ভজিম বাহে দ্বিতীয় সুয়ামী—।
(কথায়) শুনা পালেন বাহে

নহাসুরা ঃ শুনতে পান। একটা হামার শুন।

গান

শুন শুন ওহে বাহে শুন হামার কথা
এলা বুদ্ধি ওহে পাইলেন কুনঠিনা
জাগা জমি ঘর বাড়ী সবে চাহেন রেজেষ্টারী
তবে ভজিবেন বাহে দ্বিতীয় সুয়ামী—
(কথায়) শুনা পালেন বাহে—

ঢালা ঃ দাদাগে— কি শুনা পাছু মুই রেষ্টারী?

নুহা ঃ ভাই ঢালা আর কী শুনবো— তোর ছট বৌদি জাগা জমীলা রেষ্টারী চাহাচে। কি করা যায়।

ঢালা ঃ দিলে হইল দাদা

নুহা ঃ দুয়া ফের যায়?

ঢালা ঃ ঐ রকম চকচকি বেছুয়া পাওয়া যায়?

নুহা ঃ ভাই ঢালা, কি করা যাবে—

ঢালা ঃ দাদা, জাগা জমিলা রেষ্টারি দিয়ে দে। কারণ তোর নামে থাকলেই তোরে আর অর নামে থাকলেই তোরে—

নুহা ঃ তাহলে দিবাই হোবে—

ঢালা ঃ দিয়াদে তুই, কনু চিন্তা নাই। উন্নিশ শতক জমি মোর নামে রেষ্টারী দিস।

নুহা ঃ বাহে কীরন, চল কোনদিন রেজেস্টারীতে যাবেন—

কীরন ঃ কাইলকা যাম—

নুহা ঃ চল— (উভয়ের প্রস্থান)

।। ২৭ ।।

ভুপাল বাবু মুহরি প্রবেশ ও নুহাশুরা, কীরন হাকিম

ভুপাল ঃ আমার নাম ভুপাল বাবু মুহরি। আমি অনেক দিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। দেখা যাক কোন মকেল আসছে কীনা—

নুহা ঃ রাইগঞ্জ রেষ্টারী অফিসের মধ্যে ভুপাল বাবু ভাল লোক তার কাছেই যাই। ও ভুপাল বাবু কেমন আছেন?

ভুপাল ঃ ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?

নুহা ঃ ভাল আছি।

ভুপাল ঃ আপনি কী মনে করে আসলেন?

নুহা ঃ আসছি জমি রেষ্টারী জন্য—

ভুপাল ঃ খরিদ না বিক্রি?

নুহা ঃ দান স্বত্ব।

ভুপাল ঃ ও দান স্বত্ব। এক নামে না দুই নামে?

নুহা ঃ দুই নামে।

ভুপাল ঃ তাহলে বলুন কার কার নামে।

নুহা ঃ উন্নিশ শতক বাঁশ ঝার ঢালার নামে আর বাকী বাদ কীরন বালা রায়ের নামে।

ভুপাল ঃ পচাত্তর বিঘা এক নামে রেষ্টারী হবে না— হবে, কিছু টাকা দরকার।

নুহা ঃ তা দেওয়া যাবে

ভুপাল ঃ তাহলে হতে পারে। (পাশে বসা হাকিমের কাছে গিয়ে) এই নিন হাকীম বাবু।

হাকীম ঃ ভুপাল বাবু এক নামে পচাত্তর বিঘা রেষ্টারী হবে না।

ভুপাল ঃ নুহাসাহা একশত টাকা দিন তাহলে রেষ্টারী হবে। (নুহাসাহার কাছে এসে)

নুহা ঃ এই নিন—

(ভুপাল বাবু কিছু টাকা হাকীমকে দিল)

হাকীম ঃ ভুপাল বাবু তার কোন ওয়ারীশ কী আর নাই?

ভুপাল ঃ তাকে ডাক দিন— জিজ্ঞাসা করুন।

হাকীম ঃ নুহাসাহা আপনার কোন ওয়ারীশ কী নাই?

নুহা ঃ কোন ওয়ারীশ নাই। (রেষ্টারী হইয়া উভয় প্রস্থান)

॥ ২৮ ॥

ঢালা, কীরন ও নুহাসাহা প্রবেশ

ঢালা ঃ মোর দাদা মোর বৌদি রেষ্টারী করবা গিসে এলাতনি আসে।

নুহা ঃ ঢালা ঢালা

ঢালা ঃ কীগে দাদা

নুহা ঃ কীরে বেহার খরচ পত্তর কইসি?

ঢালা ঃ কইসু দাদা।

নুহা ঃ বাহে কীরন, এলা জাগা জমিত রেষ্টারী দিন তাহলে দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কিরণ ঃ হামার দিদিক আনো তারপর দ্বিতীয় স্বামী ভজিম।

নুহা ঃ ইড কেনং কাথা। তমার দিদিক মার ধোর করে বাহির করিয়া দিন এলা কী করে আনিবা যাই।

ঢালা ঃ কি কহেচেগে দাদা?

নুহা ঃ তোর বড় বৌদিক আনিবা কহচে।

ঢালা ঃ নি আনলে কেনং হয়। একটা বৌদি কাম করবে না মোক পনতা দিবা যাবে। নি যদি আসে তাহলে বেহাবাড়ীকার কাম কে করবে।

নুহা ঃ তাহলে কী যাবাই হবে— কী করে যাউ —

ঢালা ঃ মিষ্টি ধরে যাবো— আপনেই পাঠায় দিবে। (উভয় প্রস্থান)

॥ ২৯ ॥

পেট ঃ বুড়ী তোর কুন ভাবনা নাই। মাইটা যে পালাই আইসচে।

ঠোঙ্গলো ঃ আইসচেতে কি হইসে ফের?

নুহা ঃ শশুর বাবা।

পেট ঃ কে বাহে নহা সাহা।

নুহা ঃ হেঁ হামরা, শশুর বাবা।

পেট ঃ চল ঘরেরতি যাইলে হয় চল।

নুহা ঃ এইন মা মিষ্টি।

ঠোঙ্গলো ঃ নদি এইলা ফের কী আনবা লাগে।

পেট ঃ কূনতি যাছেন বাহে।

নুহা : তমার বেটীক নিগাবা।

পেট : নিগাবা আইসচেন, পেঠায় দিম।

ঠোঙ্গলো : (পেটপাকুর কাছে গিয়ে নীচু স্বরে) বুড়া জুয়াইটাত আইসচে।

পেট : যাবানেতে আইসচে পাঠায় দিবে না নাই?

ঠোঙ্গলো : নাই দিম পাঠায়।

পেট : কী করবো—

ঠোঙ্গলো : মোর একটা বুদ্ধি ছে।

পেট : কী বুদ্ধি?

ঠোঙ্গলো : মিষ্টিলা নিম আজরায় জল দিম ভরায়, ভাল করে বাধিয়া দিম (তাড়াতাড়ি মিষ্টিগুলো বার করে জল ভরে) এই নেহ বাহে মিষ্টিলা— বাড়ীতে নিগাও—

নুহা : মিষ্টি যখন খাবেন নাই তাহলে তমার বেটীক পাঠায় দ।

পেট : পাঠায় দিম। তাহলে হামার কথা শুন।

গান

শুন শুন ওহে বাহে
শুন হামার কথা
বিনা দোষে মাইটাক কেনে দিশেন বাহির করিয়া
বিনা দোষে দিশেন বাহির করিয়া
মাইর মারিসেন গরুর নাখা
এক্কে বারিয়ে সোজ করিম কমরের ডাংডা
(কথায়) শুনা পালেন

নুহা : শুন পালে, আর কী কথাছে কহ।

পেট : গান

তামান দোষ গেলা বাহে
তহ্মারে দেখি
শুন জুয়াই বেটা অঠাম বাহে
তমার দাড়ির মচ গেলা
লোকটা হুইসেন মট গটা
খেচিয়া বাহির করিম ভুটিটা

ঐলা পাকত্ নাম পারিসে

মোর পেট পাকু বুড়া

কথায়

এই শুন বাপু হামার কথা। বেটীক বিদায় দিম নাই।

নুহা ঃ তমার বেটীক বিদায় দিবেন নাই। দেখা যাক, ছলে বলে কলে কৌশলে তমাক বেটীক নিগাময় নিগাম।

পেট ঃ দেখা যাক কেনং করি নিগান — (উভয় প্রস্থান)

।। ৩০।।

ঢালা, কীরন ও পরে নুহাসাহা প্রবেশ

ঢালা ঃ বৌদি কত গেলা ক্ষুদি আর ছেগে।

কীরন ঃ অনেকগেলা ছে ভাই।

নুহা ঃ ঢালা—ঢালা।

ঢালা ঃ কী দাদা আসলো— ঐলা কিগে দাদা—

নুহা ঃ মিষ্টি ভাই ঢালা— বাহে কীরন এই ন মিষ্টিলা।

কীরন ঃ দ বাহে —

ঢালা ঃ দাদা খামগে মিষ্টিলা

নুহা ঃ তোর বৌদিক কহো।

কীরন ঃ খা ভাই ঢালা—

ঢালা ঃ দাদা কৈ মিষ্টি করেগে, এখানত জলগে দাদা। তোক সেতানে বিদায় দেয় নি।

নুহা ঃ কেনং কথারে মুইতো মিষ্টি নিয়া গিসনু। তাহলে আজরায় নিসে আর জল জল ভরায় দিসে। এতয় অসমান রে ঢালা।

ঢালা ঃ মোর বুদ্ধি ছে। যা, কুন ভাল মন্দ লোক হাতপাত নাই?

নুহা ঃ হে ভাই আছে একজন ডাকাত। তার নাম ভুটি সরদার। তার কাছে যাই। সেই পারবে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

ঢালা ঃ তাহলে তারাতারি যা। এই অপমান আর সহ্য যায়নি ভাই। (উভয় প্রস্থান)

।। ৩১ ।।

ভুটি সরদার ও ঘুসকু নসকু ও পরে নুহাসাহা প্রবেশ

ভুটি ঃ আমার নাম ভুটি সরদার। আমি একজন ডাকাত। আমার ডাকাতি করাই পেশা। কোথায় ঘুসকু নসকু। তোরা ছুটে আয়।

ঘুসকু ও নসকু ঃ প্রনাম সদারজি। আমায় কি জন্য আদেশ করলেন।

ভুটি ঃ তোমায় যেতে হবে ডাকাতি করতে নুহাসাহার বাড়িতে।

ঘুসকু ও নসকু ঃ চলিয়ে সদারজি —

ভুটি ঃ তোদের অস্ত্র শিখা দিতে হবে। (যুদ্ধ শিক্ষা)

তুমি কে? (প্রস্থান উদ্যত)

নুহা ঃ আমি সদারজি। আমার নাম নুহা সাহা।

ভুটি ঃ হাঁ—হাঁ তোমার নাম নুহাসাহা। কী জন্য এখানে?

নুহা ঃ আমি এসেছি আপনার কাছে। আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে।

ভুটি ঃ কী জন্য, ডাকাতি করতে?

নুহা ঃ হে ডাকাতি করতে। ডাকাতি ঠিক নয়— সরদারজি।

ভুটি ঃ তবে কী— প্রকাশ করে বল।

নুহা ঃ আমার শশুর বাড়ীতে আমার বৌকে ডাকাতি করে আনতে হবে।

ভুটি ঃ হেঁ পারবো— কত টাকা দেবে আমাকে —

নুহা ঃ এক হাজার টাকা দিবো। কিন্তু কাজ করা চাই।

ভুটি ঃ ঠিক আছে, চল দেখিয়ে দাও তোমার শশুরবাড়ী।

(বাড়ী দেখায় দিল)

।। ৩২ ।।

পেটপাকু ও ঠোঙ্গলো ও পরে চৌকিদার দেউনিয়ানী, ডাকাত প্রবেশ

পেট ঃ বুড়ী মুই যাছু দেনিয়া ধরিবা। তমরা বাড়ী থাকেন।

ঠোঙ্গলো ঃ হামরা একালাই থাকবা নাই পারম। হামাক দোসর দিয়া যায়।

পেট ঃ ঠিক আছে দোসর দিয়া যাচু — এখন চৌকিদারটার ঠিনা যাউ।

পেট ঃ ও ভাই চৌকিদার— চৌকিদার—

(চৌকিদার ছিল বাদ্যযন্ত্রীর দলের মধ্যে বসে)

চৌকিদার ঃ কেন ভাই কোনখানে কী চোর ধরা পইসে না কী।

পেট ঃ নারে ভাই। হামার বাড়ীতে যাবা হবে পাহারা দিবা।

চৌকিদার ঃ তাহলে তার মজুরী কত দিবে?

পেট ঃ তার মজুরি ১০ টাকা— (বুড়ীর কাছে চৌকিদারকে নিয়া গেল) বুড়ী এই নাও তোমার দোসোর চৌকিদার। (পেটপাকুর প্রস্থান)

(ডাকাত আসিয়া বুড়ীকে চুরি করিয়া লইয়া গেল)

।। ৩৩ ।।

নুহাসাহার প্রবেশ পরে ডাকাতের প্রবেশ

নুহা ঃ ডাকাতি করতে পাঠিয়েছি ভুটি সর্দারকে এখনও ফিরেনা কেন, দেখি অপেক্ষা করে।

ডাকাত ঃ এই নাও তোমার লোক—আমার পাওনা দাও।

নুহা ঃ এই নাও টাকা— (ডাকাতের প্রস্থান) দেউনিয়ানী তোমার মুখে লজ্জা নাই তোমার স্বামীকে তোমার বাপমা অপমান করল তুমি কীছু বল্লে না কেন?

(মারধোর করিল ও পরে ঘোমটা খুলিয়া দেখিল)

ঠোঙ্গলো ঃ বাহে হামাকত ডাকাতি করে আনলেন ভালয় কলেন।

নুহা ঃ এইটা ফের কেমন কথা। আনবা কহিনু মোর বউক আনিল বুড়ীটাক— বাহে কীরন নিয়া যায় বুড়িটাক।

কীরন ঃ মাহই, তমাকে ডাকাতি করে আইনলে চল মাহই। (প্রস্থান)

পেট ঃ বাহে নুহাসাহা।

নুহা ঃ কে শশুর বাবা— আইস বস কেদ যাছেন।

পেট ঃ তমার বাড়ী। হামার মন খারাপ।

নুহা ঃ কেনং মন খারাপ।

পেট ঃ হামার বাড়ীত ডাকাতি হইল।

নুহা ঃ কী নিগাসে।

পেট ঃ তামান ছে বুড়ীটায় নাই।

(ঠোঙ্গলোর প্রবেশ)

ঠোঙ্গলো ঃ বুড়া তমরায় আইসলেন।

পেট ঃ আইসচুত — বাহে নুহাসাহা তমার সাশুরি কেনং করি আসিলে।

নুহা ঃ হামারা গিসন বালুরঘাট। দেখচি রাস্তাত গরবরাছে। হামারা নিয়া আসন। বুড়ীটাক নিয়া যাও।

পেট ঃ বুড়ী চল বাড়ী। (সকলের প্রস্থান)

।। ৩৪ ।।

নুহাসাহা, কীরন ও ঢালার প্রবেশ

নুহা ঃ বাহে কীরন তমরা দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরন ঃ তমরা আগে বড়দিদিক আন তারপর দ্বিতীয় স্বামী ভজিম।

ঢালা ঃ দাদা বড় বৌদিক না আনিলে কেনং করে হবে। তুই হলো বড় আর কীরন বৌদি কৈন। মুই একালায় এতলা কাম করবা পারু? আনবা হবে বড় বৌদিক।

নুহা ঃ ঢালা যাবায় হবে, তাহলে যাছু।

ঢালা ঃ বৌদি এলা চল। তোর হবে জাগা জমি আর মোর হবে বাশবাড়ী। (উভয় প্রস্থান)

।।৩৫।।

পেটপাকু ও ঠোঙ্গলো, দেউনিয়ানী নুহাসাহা

পেট ঃ বুড়ী এলা কী হবে?

ঠোঙ্গলো ঃ কী হবে এবার যদি নিগাবা আসেতে পেঠায় দিম।

নুহা ঃ শশুর বাবা—

পেট ঃ কে বাহে নুহাসাহা? আইস বায়ো, ঘরেরতি আইস। বস। কেদুর যাছেন বায়ো—

নুহা ঃ তমার বেটীক নিগাবা আইসচি।

পেট ঃ নিগাবা আইসচেন যখন নিয়া যাও। বুড়ী মাইটাক নিগাবা আইসচে পাঠায় দিবো নাই?

ঠোঙ্গলো ঃ নিগাবা আইসচে যখন নিয়া যাক? বুড়া তমরা গল্প কর, হামরা মাইটাক নিয়া আসি।

দেউ ঃ মায়ো মোক যাবা কহচেন।

ঠোঙ্গলো ঃ যাবা কহচু মায়ো—

দেউ ঃ মা মোর বাফক এইতি আসবা কোহো—

ঠোঙ্গলো ঃ বুড়া এইতি আইস।

পেট ঃ কেনে বুড়ি।

ঠোঙ্গলো ঃ মাইটা ডাকছে —

পেট ঃ কী বেটি কেনে ডাকলো—

দেউ ঃ বায়ো মোক যাবা কহচেন— মোর কথা শুন—

গান

বায়ো শুন মোরে কথা
ঐটা বাড়ীত ওগে বায়ো যাবায় মনায় না।
না বুঝিয়া ওগে বায়ো দিলেন বেহায়া
সতিনির জ্বালা সহিবার পারু না।
(কথায়) বায়ো শুনা পালো—

পেট ঃ শুনাত পানু। ঐলা কথা হামরা শুনম নাই। তোক যাবায় হবে। বুড়ী তাড়াতাড়ি সাজায় দে—

দেউ ঃ বায়ো তাহলে যাচু (প্রণাম)

পেট ঃ নুহাসাহা, যায় এই রকম যাতে আর হয়নি—

নুহা ঃ নাই— নাই বাবা আর হবে নি—

।। ৩৬।।

রঙ্গিয়া ও সাধুর প্রবেশ

রঙ্গিয়া ঃ গান

হরি বোল হরি বোল—রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম।

সাধু ঃ কে তুমি বাবা তোমার নাম কী?

রঙ্গিয়া ঃ আমার নাম রঙ্গিয়া সাধু বাবা।

সাধু ঃ তোমার নাম রঙ্গিয়া। তুমি দেশের ছেলে দেশে ফিরে যাও। তোমার জন্য একজন কষ্ট করেতেছে। আর তোমার সব কিছু ফিরে পাবে। (সাধুর প্রস্থান রঙ্গিয়ার প্রবেশ)

।। ৩৭।।

কীরন প্রবেশ ও পরে রঙ্গিয়া ঢালা, নুহাসাহা এবং দেউনিয়ানী

রঙ্গিয়া ঃ বাবা বাবা।

কীরণ ঃ কে তুমি?

রঙ্গিয়া ঃ আমি একজন গসাই মা। তমার বাড়ী বাসা থাকিবার চাহাচু মা।

কীরণ ঃ হামার বাড়ীর মালিক থাকবা দিবেনি গসাই —

রঙ্গিয়া ঃ মুই তমার কোন কিছু খামনি মা। সুধু মুই থাকিম মা। সন্ধা করার সময় হয়া গিসে তারাতারি জোগার করিয়া দে —

গান

হরি বোল - রাধে শ্যাম

কথায়

মা এখন সন্ধা বাতি শেষ। বিছানার জগার করে দে মা—

কীরন ঃ গসাই বিছানা করিয়া দিন যাও সুতনে। এইটা গসাই চিনিম চিনিম নাগছে। গসাইটাক্ কেনং করে ডাকদু তানা করে একটা বুদ্ধি করু। গসাই, গসাই, চোর গসাই।

রঙ্গিয়া ঃ কোথায় চোর মা।

কীরণ ঃ চোর নাহয় গসাই। তারপর কথা শুন —

গান

শুন শুন ওহে গসাই শুন হামার কথা

তমাকেনা দেখিচি গসাই হামার গসাই নাখা—

তমাহাক দেখিয়া কান্দেছে মোর মন

ঝুরেছে বাহে দুই নয়ন

তমাক দেখি গসাই হামার গসাইর নাখা—

(কথায়) শুনা পালেন গোসাই।

রঙ্গিয়া ঃ শুনা পানু মা। তাহলে মোর কথা শুন।

গান

কী আর শুনিবো মায়ো মোর দুখের কথা

কথা কহিতে ওগে মায়ো হিদয় যায় ফাটিয়া

ফুরানু মায়ো ঘর বাড়ী আর ফুরানু জাগা জমি

মায়াটাক হারানু গে মায়ো থুয়া বন্ধকী।

(কথায়) শুনা পালো মায়ো—

কীরন ঃ শুনা পাইসি গসাই— তমার নাম কি গসাই।

রঙ্গিয়া ঃ মোর নাম রঙ্গিয়া।

কীরন ঃ তমার স্ত্রীর নাম কী গসাই—

রঙ্গিয়া ঃ মোর স্ত্রীর নাম কীরন।

কীরন ঃ তাহলে হামার কথা শুন

গান

ভয় নাই ভয় নাই স্বামী ভয়ত করেন না

মুই থাকিতে ও স্বামীধন চিন্তা করেন না

জাগাজমি ঘড়বাড়ী করে নিসি রেষ্টারী

আজি হইতে ও স্বামীধন তমার ঘড় বাড়ী।

ঢালা ঃ কীগে বৌদি? ভয় নাই ভয় নাই সুনেচু, কী হুসে।

কিরণ ঃ ভাই ঢালা তোর দাদা আইসচে।

ঢালা ঃ কীগে দাদা আইসচি।

রঙ্গিয়া ঃ ভাই ঢালা এলা মুই যাছু ভাই—

ঢালা ঃ কেনে যাবো। কোন চিন্তা নাই। তোর হাতত লাঠি দেছু। চুপ করে থাক। বৌদি, যখন মোর দাদা আসবে তখন তুই ঘাড় ধরে বাহির করে দিবে—

(নুহাসাহার প্রবেশ)

নুহা ঃ বাহে কিরণ তোমার দিদিক আনন। এলা দ্বিতীয় স্বামী ভজ।

কীরণ ঃ তাহলে হামার কথা শুন—

গান

শুন শুন ওহে বাহে শুন হামার কথা
জাগা জমি ঘর বাড়ী দেওনা ছাড়িয়া
খুলায়া দেহ জামা ধুতি ছাড়িয়া দেহ ঘর বাড়ী
এলায় না দেখিবেন বাহে তমার মায়ার কারি
(কথায়) শুনা পালেন বাহে—

নুহা ঃ শুনা পান বাহে— হামার কথা শুন।

গান

তোর মত লম্পটি মায়া দুনিয়াতে দেখু না
জাগা জমি ঘরবাড়ী নিলেন লেখিয়া
জাগা জমি ঘরবাড়ী সবে নিলেন রেষ্টারী
হামাক কলেন বাহে পথের ভিক্ষারী—
(কথায়) শুনা পালেন বাহে—

কীরণ ঃ শুনা পান। জাগা জমি ঘরবাড়ী ছাড়িয়া দ—

নুহা ঃ এত যখন অসম্মান কলেন তাহলে তমাক জোর করে বেহা করিম। (কিরণকে হাত ধরে টান দিতে গেল)

রঙ্গিয়া ঃ খবরদার দাদা। (রঙ্গিয়া ও ঢালার হাতে লাঠি)

ঢালা ঃ খবরদার দাদা। যেমন ছিলো অত্যাচারি হয়া সেই রকম যা তুই পথের ভিক্ষারী হয়া। আজ হইতে ঘর বাড়ী জাগাজমি হামার।

নুহা ঃ ভাই ঢালা। তোর সব চক্রান্ত। যার নবন খায়া মানুষ হলো তার বুকে হানা দিলো—

ঢালা ঃ এলায় কীহুসে দাদা। কীরণ বৌদির পা ধরে মাপ নে আর দশজনের কাছে মাপ নে তার পর যা—

নুহা ঃ গান

তমার মতন সতী বাহে দুনিয়াতে দেখুনা

এই অপরাধ ওহে বাহে কর মার্জনা

পা ধরিয়া কহিচি কথা

এই অপরাধ ওহে বাহে কর মার্জনা।

কীরণ ঃ হামরা মাপ দিবা নাই পারম— ঢালাক কহ।

নুহা ঃ ভাই ঢালা এখন মাপ দে—

ঢালা ঃ দশজনের কাছে মাপ নে

নুহা ঃ তাহলে দশজন ভাই কাছে মাপ নিবা হবে।

গান

শুন শুন দশঠাকুলা শুন মরে কথা

এই রকম দেউনিয়া গিরি করেন না

নারীর প্রেমে ও দশঠাকুরলা তহমরা মজেন না

নারীর প্রেমে মজিয়া ধ্বংস হইলো রাবন রাজা

ঐরপ দশা হইলো আমার।

(কথায়) ঢালা হামরা যাছি এখন তুই থাক।

(নুহাসাহা ও দেউনিয়ানী প্রস্থান ও ঢালা অর্ধেক রাস্তায় ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল)।

ঢালা ঃ দাদা তোর পা ধরিয়া কহছু। চল বাড়ীত চল। তোর বিচার মুই করিয়া দিম আর সভায় একটায় বাড়ী থাকিম।

নুহা ঃ ভাই ঢালা বিচর করিবোত— যদি বিচার করিস তাহলে যাই নিতে নাই—

ঢালা ঃ ঐ বিচার মুই নিশ্চয় করিম।

(ঢালার বিচার)

এক নম্বর রঙ্গিয়া বাড়ী মধ্যে হরির ভক্ত। আর দুই নম্বর কীরন জায়গা জমির মালিক। তিন নম্বর নুহাসাহা মেনেজার আর চার নম্বর দেউনিয়ানী মেনাজারনি। দশঠাকুরলা বিচার শেষ। মুই যেনং গোড়াতেই ছিনু এলাত এনংগেই থাকিম। পরণাম দশঠাকুরলা, পরণাম।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি ড.শিশির মজুমদারের
'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য' (১৯৮৬) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

খন (খিসা)

হাগডু - ভাদ্‌রী পালা

বন্দনা

ঐ না এস সরস্বতী
কণ্ঠে দেহ বর
বসিতে আসন দিব
মস্তকের উপর।।
ঐ না পুরুবে বন্দনা করি
ধর্মঠাকুরের চরণ বন্দি,
তাহারই চরণে আমরা
প্রণাম করি।।
ঐ না উত্তরে বন্দনা করি
কালীমায়ের চরণ বন্দি,
তাহারই চরণে আমরা
প্রণাম করি।।
ঐ না পশ্চিমে বন্দনা করি
পীড় সাহেবের সালাম বন্দি,
তাহারই উদ্দেশ্যে আমরা
প্রণাম করি।।
ঐ না দক্ষিণে বন্দনা করি
গঙ্গামায়ের চরণ বন্দি,
তাহারই চরণে আমরা
প্রণাম করি।।
ঐ না আসরে বন্দনা করি
দশভাইয়ের চরণ বন্দি,
সবারই উদ্দেশ্যে আমরা
প্রণাম করি।।

ঐ না বন্দা সমাপন হইল

শুন ওগো দশজন,

এই আসরে গাওনা করিম

হাগড়ু-ভাদরীর খন।।

ভাদ্রীর মা : এ্যা ভাদ্রির বাপ, কাঁহা কুত্তিনা গেলেন তে?

ভাদ্রীর বাপ : এইত এত্তিনা, বেড়াটার পিছদিক। কেনে তোর কি হইলি তে?

ভাদ্রীর মা : আচ্ছা, তোম্হারা যে মোর উপর রাগ করছেন, তে তোমার কপালত চোখটোক দিছে কি না তে?

ভাদ্রীর বাবা : ক্যান, কি কহিব চাহাছিস, কহেক নাতে।

ভাদ্রীর মা : মুই কহেছু, বেটিটা যে বড় হইছে, তো আর বিহা-টিহা দিবা হোবে কি নাইতে? দেখা পাচ্ছেন না দুনিয়াটা?

ভাদ্রীর বাবা : হয় ভাদ্রীর মাও, কি যে করা যায়। ধান তো ভাল হইল নাই। আর চ্যাংড়াখান যখন পড়েছে তো আরো দুকেলাস পঢ়ুক। বিহা তো এককাল নাগাইবাই হোবে।

হাগড়ুর মা : হাগড়ুর বাপ—। এত্তিনা শুন ত।

হাগড়ুর বাবা : কি কহোসি কহেক নাতে।

হাগড়ুর মা : চ্যাংড়াটার বিশ বচ্চরের মত বয়েস হইল, একবারি বিহা নাগাবার নাগে। তোমার সংসারের কাম মুই একলায় কত পারিম কহ ত?

হাগড়ুর বাবা : ধুর তোর খালি বিহা বিহা হইছে। ভাল ঘরের কইন্যা না পাইলে কেমত করে দিবু বিহা? (প্রস্থান)

ভাদ্রীর মা : কইগে বেটি। শুনা পাচ্ছি গে ভাদ্রী?

ভাদ্রী : ক্যানে, কহোছিগে মাও?

ভাদ্রীর মা : (রেগে) আচ্ছা, বাড়ির কামলা তোক কইরবা হোবে কি নাইতে? গাছের গুহাটতে যাই বসি থাইক্লে কি থালত ভাত আইস্বি?

ভাদ্রী : (স্বগত) বাড়ির কামলা কইলে ত হাগড়ু দাদাকে দেখা পামু ক্যামনে? এ্যালা মুই ওত্তিনা ছাগললা বাইন্ধব্যা যাউ।

(গান)

ঐ না হায় ভগবান বাড়ির কামলা

করিবায় মনায় না,

ছাগললা বান্ধিবা যাছু
ইস্কুলটার তিনা।।
ওকি ও হায় মরিরে
ছাগল বান্ধিয়ারে মুই
রয়্যা রয়্যা দেখিছু,
হাগড়ু দাদার মতনরে মুই
গলাটায় তাকেছু।।

কই দ্যাখা যাছে? আর কতখুন থাকু? ক্যানে যে অর এতলা দেরী করে! যাউক, বাড়ির তিনা যাউ।

হাগড়ুর বাবা ঃ কাহাঁড়ে হাগড়ু, কুন্তি ঘুরি বেড়াসিরে?

হাগড়ু ঃ এই এতিনা আছু। ক্যানে কি কহেছু?

হাগড়ুর বাবা ঃ যা যা, গরুলা বান্ধি দে, বাপু।

হাগড়ু ঃ (স্বগত) যাউক, ভাল কাম বাতাইসে মোক। এলায় যদি উত্তিনা ভাদ্‌রী বহিনটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

(গান)

ঐ না গরুলা বান্দি যাছি
ইস্কুলটার তিনা,
ভাদ্‌রী বহিন তুই আসিয়া
মোক দেখা দেনা।।
গরুলা বান্ধিয়ারে মুই
রয়্যা রয়্যা দেখেসু,
ভাদ্‌রী বহিনটার মতন রে মুই
গলাটায় তাকেসু।।

তম্‌হার ছাগললাতো দেকেছু কেবা বান্দি দিয়া চলে গিছে।
কার যে আইস্‌ল। ভাদ্‌রী বইনটায় আইস্‌ল না কি?
ভগবান, শিঘ্রে ভাদ্‌রী বহিনটাকে জীবনত মিলাই দে।

(গান)

ঐ না দোহায় নাগে বনকালী

তোরে করু ভরসা,

ভাদ্‌রী বহিনটাকে মিলাইয়া দিলে

দিম জোড় পাঠা।।

ওকি ও হায় মরিরে

ঢাকে ঢোলে পূজা দিমো

ওমা বনকালী,

ভাদ্রেশ্বরীকে মিলাই দিলে

দিম পাঠা বলি।। (প্রস্থান)

ভাদ্‌রীর মা ঃ কইগে ভাদরী, ছাগললা বান্দিতে এতলা সমে নাগে? ইস্কুলত যাবু কি নাইতে? যা সিনান করি আয়। মুই খাবারলা তিয়ারি করছু।

ভাদ্‌রী ঃ (স্বগত) আজ আর মোক ইস্কুলত যাবার মন্‌সে নাই। যাউ, সিনানটায় আগে করি আসু। কোন্‌টা পোখরতে যে যাউ।

(গান)

ঐ না হাতে নিনু সাবান-সোটা

কাঁখে কলসি,

সিনান কইরবা যাছুরে মুই

দুর্গা পোখরী।।

ওকি ও হায় মরিরে

রোদ ঝিলমিল রোদে ঝিলমিল

চিন্‌হা নাহি যায়,

দূর হত্যে দেখুরে মুই

হাগড়ুদাদা হোবা পায়।।

হাগড়ু ঃ (স্বগত) দেখু, কেবা ত সিনান কইরবা আলি। অয়ত এই পোখরখানতে সিনান করে। যাউ, দেখেই আসু।

(গান)

ঐ না কি করেছি ভাদ্‌রী বহিন

ঘাটে বসিয়া,

তোর রূপে মুই পাগল হয়্যা

বেড়াসু ভাসিয়া।।

ওকি ও হায় মরিরে,

তোর রূপে মুই পাগল হয়্যা

বেড়াসু ভাসিয়া

তোকে না দেখা পাইনু মুই

ঘাটত আসিয়া।।

ভাদ্‌রী ঃ (গোপনে) আচ্ছা, ক্যামন পাগল হইচে। এর মনটা একনা পরীক্ষা করুতো।

(প্রকাশ্যে) হাগে দাদা, তোর কি লজ্জা শরম আছে কি নাইতে?

(গান)

ঐ না কুন কথা কহিনু দাদা

নজ্জায় কইলু না,

আমার বাবা জানতে পাইলে

জীবনে রাখিবে না।।

হাগড়ু ঃ (ভীত হয়ে) রাগ ক্যানে করছিগে বহিন? মুইত কুনো খারাপ কথা কহু নাই। আর যুগটা না পাল্টাচ্ছে গে, নইজ্জা কইলে কেমুন হোবে?

(গান)

এটা সইত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি

চার যুগের অবতার,

কলিযুগে ওগে বহিন

প্রেমের প্রচার।।

শুনা পালুগে বহিন?

ভাদ্‌রী ঃ (হেসে) শুনাত পানুগে দাদা, মুইত তোর ভরসায় দিন কাটাসু।

(গান)

ঐ না মুহে না করেসু দাদা

তোরে ভরসা,

কি যুক্তিতে মিলন হোবে

করিম বসিয়া।।

ঘুষড়ু ঃ (স্বগত) শালারে! এরা ফির কদ্দিন থাকি এইরকম করছেরে ভাই। মুহে ত এক ভাদরীর লাগি মরছু। আর হাগড়ু ফির হঠাৎ কুন্তে আসিয়া এর ভিতর ঢুকি পাছে তে? আচ্ছা , দেখুত এরা কি করে। কিছুতেই এম্‌হার পিছা মুই ছাড়নু নাই।

হাগড়ু ঃ (এগিয়ে গিয়ে) একমাস যুক্তি মুই করিছু রো বহিন। তুই সাজিবারি আইসিত। চল পালায় যায়্যা কোটত বিহা করিম।

(গান)

ঐ না রিক্সাত চঢ়িয়া বহিন
চল তাড়াতাড়ি ,
গাজোল ইষ্টানে যায়্যা
ধরিমরে গাড়ী।।
ওকি ও হায় মরিরে
হামার জন্য দাঁড়ায় আছে
কলাবতী গাড়ী
তাড়াতাড়ি চলগে বহিন
মালদা এস্টেরী।।

ভাদ্রী ঃ হ্যা ঠিক কহিছি গে দাদা! এই যুক্তিটায় ভাল হইছে। চল মুই এই অবস্থায় চলিয়া যাইম। (হাগড়ু প্রস্থান করে)

ঘুষুড়ু ঃ (স্বগত) বাঃ ঠিক শালা এরা পালায় যাছে। থাম, শালা, মুই এক্ষণে থানায় যায়্যা হেনে ব্যাপাট্টা জানাই দেছু। (দৌড়ে প্রস্থান করে)

(হাগড়ু প্রবেশ করে)

ভাদ্রী ঃ (মৃদুস্বরে) একঘুড়ি ফের তুই নামিয়া কুন্হা গেছলু গে দাদা?

হাগড়ু ঃ ওই ত ওত্তিনা পেসাব করচুনু।

ভাদ্রী ঃ হায় দাদা! কেমন হই গেল দাদা।

হাগড়ু ঃ ক্যানে, কি হইছেতে গে?

ভাদ্রী ঃ ঘুষুড়ু আমাক বাসত উঠিবা দেখি ফেলাইছে দাদা। অয় থানায় তিনা দৌড়ে গেল্।

হাগড়ু ঃ তাহলে এখুন কি করা যায়?

ভাদ্রী ঃ যাউক, কোটত আর নাই যাম দাদা। চল কালীথানত যায়্যা বিহা করে নিম।

হাগড়ু ঃ হ্যাঁ, ঠিক কহিছি বহিন। তাহলে চল নুকাই নুকাই চল। (প্রস্থান)

সংগ্রহসূত্র ঃ ড. সুবোধ সেনের 'বাংলা লোকনাটকের উৎস কথা, সংজ্ঞা ও পরিচয়' (২০০৭) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

তে-ভাগা খণ

চরিত্র (পিলিয়ার) পুরুষ।

১. দয়াময় ব্যানার্জী	- জমিদারের নায়েব
২. যদুনাথ ঘোষ	- তহশিল দার।
৩. হাণ্ডিয়া দেবশর্মা	- গাএর মাহাজুন।
৪. বসন্ত চ্যাট্টার্জী	- স্বাধীনতা আন্দোলনের জেল খাটা নেতা।
৫. উপেন দেবশর্মা	- কতোয়াল।
৬. উদাসু বর্মন	- আধিয়ার।
৭. কালুয়া দেবশর্মা	- আধিয়ার।
৮. ভুজু টুডু	- আধিয়ার।
৯. নালু সিং	- দারোয়ান।
১০. ভজন লাল	- দারোয়ান।

মহিলা

১. কুমারি বুলো বর্মন	- উদাসুর বেটি।
২. ফুলন বেওয়া	- বিধবা বৌ
৩. চুমকি সরেন	- ভজুর বহু

আসর বন্দনা

পুরুবে বন্দনা করি

ধর্ম ঠাকুরের চরন বন্দি

ধর্ম ঠাকুরের ছিরি-চরনে জানাই প্রনাম।

পশ্চিমে বন্দনা করি

পির সাহেবের চরন বন্দি

পির সাহেবের ছিরি চরনে জানাই প্রনাম।

উত্তরে বন্দনা করি

দূর্গা মায়ের চরন বন্দি

দূর্গা মায়ের ছিরি-চরনে জানাই প্রনাম।

দক্ষিণে বন্দনা করি

গঙ্গা মায়ের চরন বন্দি

গঙ্গা মায়ের ছিরি চরনে জানাই প্রনাম।

আসরে বন্দনা করি

দশ ঠাকুরের চরন বন্দি

দশ ঠাকুরের ছিরি-চরনে জানাই প্রনাম।

শুন শুন তমরা দশ ঝন

এই আসরে গাউনা হবে

আধিয়ার বিদ্রোহ তে-ভাগা আন্দোলন।

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্যে-হাণ্ডিয়া, উপেন, উদাসু, ফুলন

হাণ্ডিয়া গাউন ঃ

মোর হে নামত

হাণ্ডিয়া মাহাজুন

জানে সকলে

দুনা সুদে কারবার করু

ধানের উপরে।

ও কি ও ভায়া রে

ধর্ম্ম ছাড়া

অধর্মের কামলা মোক

ভালয় লাগেনি

ও মোর ভায়া

সুদের কারবারি।

মোর হে ..... ধানের উপর।

গাউন গাইতে গাইতে হাণ্ডিয়া মাহাজুন মানডই ঘরা আসিল। মানডই ঘরা বসি হাণ্ডিয়া মাহাজুন হুকা টানেহে। কোনট আধিয়ার কতলা ধান কর্জা নিয়া সেইলা খাতা নি হিসাব করেহে। ঐ সময় একখান নাল খাতা বগলত নি কতোয়াল উপেন আসিল।

উপেন ঃ দণ্ডোপোত, দণ্ডোপোত বাহে কাকা।

হাণ্ডিয়া ঃ আসিলু বোরে উপেন। তোর কাথা ভাবিহিনু তে আসিলু ত খবর কি। কহেক দি। আদাই সাদাই কিছু করিলু।

উপেন ঃ না বোরে কাকা। আদাই সাদাই বেজাই খারাপ। সবার মুখত বাপু ঐ একট কাথা খরাত খালে, ঝরাত খালে ফসল কুন্না পান। কিনং করি মাহাজুন সুজি ইনং ত কাকা কহচে সবাই।

হাণ্ডিয়া ঃ খরাত খালে, ঝরাত খালে এইট কেনং কাথা বোরে। মুই ঐ সব কিছু জানুংনি বাপু। মোর কারা হুকুম। যেনেং করি পারোক মোর কর্জা ধান সুজিবায় হবে। মুই ঐলা পেন-পে-নানি শুনিমনি।

উপেন ঃ ছেচায় কাকা। আধিয়ারলা মিছা কহেনি। আর কি কহিবু ইবার যে, খরাট গেল নাতে চান্দিয়া বিলের মাটি ফাটি বেঙ্গ বেঙ্গ। ধানলা শুকাই খের হই গেল বাপু, না হইলে ফের দুনা সুদে তোর কর্জা কেহ বাকী থয়।

হাণ্ডিয়া ঃ না বোরে উপেন। আধিয়ারলা বর ছেচ্চর। ঐট অমার ঢং। কোন এংনা ছুতা ভাকারাবেই। মোর ভুইলা আধিকালে মোর গলার ধান কর্জা খালে চিন্তা করেক এমাক কি করা যায়? সবাই হারামজাদা। ইবার কহিলে খরাত খালে। আগত কহিবে পোকাত খালে ইলা অমার ঢং। মোক তো চিনেনি বোরে মোর নামও হাণ্ডিয়া মাহাজুন এমনি এই নামটি হয়নি। নে এলা কহেক দি কে কতলা ধান সুজিলে হিসাবট দে।

উপেন ঃ নে কাকা নেখি নে। হালাঙ্গা কর্জা ধান এক বিশ। সুজি দিলে সুদে মুলে দের বিশ। কালুয়া দিলে এক বিশ শুয়াঙ্গ আসলট সুজিলে হাদাং সুজিলে নি। বাংগুরু, ফুমাংগু, উদাসু, ভজু টুডু সব বাঁকিসব বাঁকি।

হাণ্ডিয়া ঃ কি কহোছিস বোরে। (আগানিয়া ভাব) সব বাঁকি তোর কাথা শুনি মোর অক্ত গরম হইগেল বোরে। না ইবার একট কিছু করিবায় হবে। সব হারাম জাদা, হারামি। মুই হাণ্ডিয়া মাহাজুন। আচ্ছা উপেন তুই হে কহেক মোর মতন মাহাজুন এত্তিনা আর ছে। নে খাতা খুলা।

উপেন ঃ দেউল এর পচকটু কর্জা ধান তিন-সালে সুদে-মুলে ৮ বিশ। কঠাল বাড়ীর ভোদই কর্জা সুদে মুলে ৬ বিশ। সরলার উদাসুর তিন সালে কর্জা সুদে আসলে ৮ বিশ।

হাণ্ডিয়া ঃ পাছিলা নামট কাহার কহিলু বোরে। আরেক বার ভাল করি কহেক দি।

উপেন ঃ সরলার উদাসু তিন সালে কর্জা ৮ বিশ।

হাণ্ডিয়া ঃ উদাসুর তিন সালে মাত্র ৮ বিশ। এত কম কেনে? শুনেক বোরে ঐ উদাসুর, মোর ভুইর কাছিত এক বিঘা ভাল ভুই ছে। ঐ জমিখান যদি কোন রকম করি নিবা পারু। তাহলে মোর ঐ কান্দরত মট জমি হবে ১৫ বিঘা। দেখেক ত দেখেক ত উদাসুর কিছু বারই নেখা যায় না নিহি।

উপেন ঃ না কাকা। তোর দোহায় নাগে। মোক দি ঐ কামট করাইসনা। বারাই ফের কেনং করি নিখিবু। কামট ভাল নাহায়। তুই হে বুঝি দেখেক উট অধর্ম হবে? পাপ হবে। আর তোর এত জমি থাকিতে।

হাণ্ডিয়া ঃ এহ বেজায় ধর্ম। তুই হাসালু বোরে। ধর্ম করি কি হবে। আইজ কাইল কোন নোকট ধর্ম করেহে। উপরে সাধু ভিতরে সবাই কাদু। সবাই খালি এত্তিনা উত্তিনা করেহে। যত পারিস লুট পাট করি খা। মানুষের চোখত ধূলা দি খা। মুই কি করুং না করুং তুই সব জানিস। মোর কারবার।

উপেন ঃ কি কহচিস কাকা ধর্ম এখুন ছে? আর চিরকাল ধর্ম থাকিবে। ঐ ধর্মছে কার ঠিনা জানিস গজুয়া, এলটেংগা, ভেলটেংগা, আর সজ-গজা লোকলার ঠিনা অধর্ম কাহাক কহে অমরা জানিনি।

হাণ্ডিয়া ঃ আঃ হাঃ গজুয়ালাক ত ঠকবায় হোবে বোরে। চালাক নোকলাক ঠকাবু। উলটাই তোকে ঠকাবে। নে নে মুই কহচুং তুই নিখি দে।

উপেন ঃ না কাকা। মুই তোর পাও ধরুং। অধর্ম পথত তুই মোক নিগাইস না। কটা দিনের নিলা খেলা। তুই পারিস নিজে হাতে লেখি দে। এই নে খাতা খান।

হাণ্ডিয়া ঃ তুই যে বাপু নকট কি রকম। মুই কইম তুই খালি নেখি দিবু তাতে তোর কি অধর্ম হবে। যাকে খাইস তাকে চিনিসনি। বুঝা যাহা তুই হ ডুবিবু আর মোক-অ ডুবাবু।

উপেন ঃ কাকা তোর পা ছুই কহচুং। অন্য কাম মোক করিবা কহেক মুই করি দিহুং। কিন্তু বাপু ঐট কাম বাদ দি।

হাণ্ডিয়া ঃ তোক আর কি কহিম বোরে। তুই মোক হাসালু। এই কারবার ধর্মট দুরত থো। অত সৎ পথে চলিলে ফের হয়। এখুন কার দিনে কিছু এত্তিনা উত্তিনা না করিলে হয়। এই বিটিশ আজাট জোতদার মাহাজুনলাক খুব সুবিধা দিয়া বোরে যত পারিস এলাই করি নে। না হলে পরে পাস্তাবু পাস্তাবু মুই কহি দিনু।

উপেন ঃ কি কহচিস কাকা। বিটিশ আজাট হামার দেশটাক জ্বলাই পরাই খালে। দেশটা ছিল সনা করি দিলে রূপা দেশট সর্বনাস করি দিলে। সর্বনাস করি দিলে।

"এলা বাহুকের আগাত বস্তা বান্ধি উদাসু ঢুকিল"

উদাসু ঃ পন্নাম গে মণ্ডল কাকা।

হাণ্ডিয়া ঃ এই ত উদাসু আসিল। কি ভায়া উদাসু। তোর কি খবরছে। ভাল ছিস ত ভায়া। ছুয়া পুয়া নি।

উদাসু ঃ ভাল ছুং মণ্ডল কাকা। তমার ঘরের দয়ায় ভাল ছুং ছুয়া পুয়া নি। আর জানিস ত তোর পুতু খান আগের বার মারা গেল পাসটিত। বড় কাহিচাল হচে আর কি। বেছুয়াটার তাংনি

বর মনট কান্দেহে কাকা। বেছুয়াট মোর খুব ভাল ছিল। আঃ হাঃ হাঃ অনেক মাহাত ফকির কনু বাচাবা পারিনুনি।

হাণ্ডিয়া ঃ দুঃখ করি কি করবু ভায়া উদাসু। সব কপাল, সব কপাল। কথায় ছে, মরদের মরণ জঙ্গলত আর বেছুয়ার মরণ ঘরের কনত। আর কহিস না। তোর মতন পরা কপাল মোর তোর কাকি ত পাসটিত মারা গেলে। আহা তোর কাকির তাংনি মোর মনট কি কম কান্দে।

উদাসু ঃ মণ্ডল কাকা কাথায় কাথায় মেলা কাথা মুই যে একট বর ঠেকায় আসিনু গে কাকা মোর যে কিছু কর্জা ধান নিবা হোবে।

গাউন ঃ বরই আশায় ওগে কাকা

আসিনু তোর বাড়ী

কর্জা ধান ওগে কাকা

দে মোক তারাতারি।

কাকা দুদিনতে ছুয়ালা মোর না খাইছে।

সংসারে মোর বরই অভাব।

কাকা গো তোর দোহাই নাগে

কর্জা ধান না দিলে কাকা

ছুয়ালা মোর না খাই মরিবে।

হাণ্ডিয়া ঃ কি? কর্জা ধান নিবা আসিলু। ধান তো দিম ভায়া। আর ধান মোর গলাত ছে। তোর যে, আগের বাঁকি ছে উলায় ধান তো সুজিস নি। ফের যদি ধান নিবু কেনং করি সুজিবু। আগিলা হিসাবট জানিস। কতলা ছে। উপেন খাতা খান দেখি কহেক ত বোরে।

উপেন ঃ (খাতা দেখি) উদাসু উদাসু হে ৫ বছরে কর্জা ধান সুদে মুলে ১৫ বিশ।

উদাসু ঃ ১৫ বিশ। হা-গে মণ্ডল কাকা মোর ধানের হিসাবট কি রকম গোল-মাল নাগেহে। উপেন জেঠ্ঠ মোক সেদিনকা কহিলে ৮ বিশ। আইজ কা কহেচে ফের ১৫ বিশ।

উপেন ঃ (কি করিম মিছা না কহিলে হয়তো মোর চাকিরিট যাবে) মানে বুঝিলু উদাসু সেদিন কা হিসাবট তোর গোল মাল ছিল। এলা ঠিক হইলে।

হাণ্ডিয়া ঃ ঐলা ভায়া তমার ঘরের অইভ্যাস খারাপ। এই তাংনে মুই কহচুংকি বছর বছর ধান কর্জা নে বছর বছর সুদেমুলে সুজি দে। তাইলে এই গোল মালট আর হয়নি। অইজকা কহচিস হিসাব মোর গোল-মাল। তোর মতন নেংঠা নোকক ঠকাই মোর কি হবে বোরে। তমার ঘরের দয়ায় কোনট মোর অভাব ছে। নাই দিবা পারিবু। কহিলেই হয়। আধিয়ার আর কর্জা ধান-

খুয়া নোকলাক ঐ একটয় ঢং। কিছুতেই তমরা মাহাজুনলাক বিশ্বাস করিবা চাহেননি। ধর্ম না থাকিলে কাহার এত ধন হয়। তমরা ত বেছুয়া মরদে খাটহেন এলাও কিছু করিবা পারিহান।

উদাসু ঃ হামার পরা কপাল মণ্ডল। হামার পরা কপাল। চৌদ্দ গুষ্টি হামারা জন খাটা। উলা সুখ কি হামার কপালত ছে। মোক মাপ করেক গে মণ্ডল কাকা মোর ভুল হইগেল আর কি। মুক আর ফুক। তে কাকা মোক কর্জা ধান দিবায় কি রকম হবে।

হাণ্ডিয়া ঃ না ভায়া উদাসু তুই অন্য মাহাজুন দেখেক। মুই সজা নোক। সজা পথে চলুং গোল মাল মোক ভাল নাগেহে নি।

উদাসু ঃ (পা ছুই) তোর পা ধরুং মণ্ডল কাকা মোর ঘুরাই দিস না। তোর দোহাই নাগে। কাইল থাকি মোর ছুয়া-পুয়া না খাইছে। একট দানা অমার মুখত দিবা পারুনি কাকা। এইট অপরাধ না ধরিস গে মণ্ডল কাকা। তোর দোহাই, তোর দোহাই।

হাণ্ডি য়া ঃ তমার ঐ কান্দা কাটিলা মোক এংনাও ভাল নাগেনি অসইয্য মোক বাঁচা দোহায় নাগে দোহায় নাগে।

উদাসু ঃ তমার ঘরের দয়ায় ত হামরা বাঁচি ছি মণ্ডল। তমরা গরীবের ভগবান। বাপ মা। ভগবান তমাক দয়া করিয়া।

হাণ্ডিয়া ঃ (এংনা মলায়মসুরে) তা হলে একট কাম করেক উদাসু। আগিলা ১৫ বিশ। আর বছর সুদে-মুলে অনেক হবে। এলা ফের নিবু। এতলা ধান সুজিবু কেনং করি। তার চাইতে একট কাম। মোর ঐ কান্দরটর কাদিত যে তোর এক বিঘা জমি ছে। সেই জমি খান মোক দিদে। তাইলে সব মাপ পাবু।

উদাসু ঃ ঐলা কাথা কহিস না মণ্ডল কাকা। ঐ খান জমিই মোর সম্ভল। মোর ঐ চৌদ্দ গুষ্টির মোর ঐনা জমি সম্ভল। তোর পা ধরি কহচুং মণ্ডল। ঐ জমি খান মোর নিস না। মুই হত ভাগা।

হাণ্ডিয়া ঃ তা-ইলে মোর গলা থাকি যে, তোক কর্জা ধান দিম। সেইলার বুঝি কোন দাম নাই। এইট যদি তুই না কহিস উদাসু। তালে বাপু অইন্য মাহাজুন দেখেক। মোর জমি কি কমছে। সামান্য এক বিঘা জমি দিবার হিয়া ধারনি।

উদাসু ঃ মোর বাপ-মা কত কষ্ট করি ঐ জমিখান সিজিল্ল। তোর জমি আধি আর কর্জা ধান খাই দিন কাটিহিল। কত শুকাই আবাই থাকিহিল তাহাও জমি খান ফুরায় নি।

হাণ্ডিয়া ঃ (ভিষণ আগি) আঃ হাঃ উদাসু তোর পেন-পেনানি মোক আর ভাল নাগেনি। (উদাসুর ঘার ধরিয়া যাবে) যা ভেরা ভেরা মোর বারি থাকি ভাল মানুষ যদি হইস এলায় ভেরা। যত সব ভেজাল।

উদাসু ঃ তোর দোহাই মণ্ডল কাকা। তোর মুই পা ধরুং। কি আর করিম। কোনঠি যাম তুই ছারা মোক কে দিবে। কাইল থাকি মোর ছুয়ালা না খাইছে। নে দিনু জমি খান। নে দিনু জমি খান। হায় ভগবান। হায় হায়! মুই আইজ থাকি সর্বহারা।

হাণ্ডিয়া ঃ উপেন বোরে যাতো ঐ বড় গলাট থাকি ধান মাপি দে। আর এই কাগইজ খানত উদাসুর টিপ সই নে।

উপেন ঃ (সর্বনাস মুই কি করিম) চল চল উদাসু চল।

উদাসু ঃ পন্নাম গে মণ্ডল কাকা। মুই গেনু। "উপেন-উদাসুর প্রস্থান"

"এই সময় হাণ্ডিয়া মাহাজুনেরঠি ফুলন আসিল"

ফুলন ঃ ভাশুর কি তাংনি মোক ডাকিয়ান (পা-অত ভক্তি দিবে)

হাণ্ডিয়া ঃ আঃ থাউক থাউক। ঐ ভাল মন্দ পুছিবা আর কি। হটাত করি গকুল ভাইট মারা গেলে। তে ছুয়া খান তমার কেনংছে। তমরা কেনং ছেন। গকুলট বর কামের নোক ছিল ভাউসান। তমার মতন এনং সুন্দর বহু খান থুই মারা গেলে।

ফুলন ঃ ভাল তছি ভাশুর। ঐ তমরা যেনং আখিয়ান আর কি।

হাণ্ডিয়া ঃ এ হে হে খুব ভাল কাথা শিখিয়ান ভাউসান। হামরা যেনং আখিয়াই। দিন কাল খুব খারা প। আর একট ছুয়ার মা হই আণ্ডি হলেন। তমার উপর সবার নজর। নাগিলে ঠেকিলে আসেন। পর ভাবেন না। তমার তাংনে দুয়ার খুলা। গকুল অসুক অবস্থায় কহি গেলে তোর ভাউসান থাকিল দাদা, দেখিস। ঐ তাংনে খোজ করিহি।

ফুলন ঃ পুন্না কাথা কহি আর দুঃখ দেননা ভাশুর। হামার কপাল দোশ। মোর পরা কপাল। না হইলে গাভুর বয়সে।

হাণ্ডিয়া ঃ আহা, আহা দুঃখ করেন না ভাউসান। তমার দুঃখে হামার বুকখান কেনং করেহে। এংনা কাছিত আইস। এখুন দেখিহি চেহারাংনা তমার ভালই হইলে। গতর পালা বেশ ডাবুশ ডুবুশ হইলে মনে হছে গাভুর ছুণ্ডি।

ফুলন ঃ ছিঃ ছিঃ ভাশুর ঐলা কাথা কেনং করি কহেচেন। তমার ফের ঐলা কহিবা সভায়। তমরা হচেন বর ভাশুর। সরমের কাথা। সরম-ভরম তমার মুখত নাই। ঐলা কামে মোক ডাকিহান।

হাণ্ডিয়া ঃ আগেন কেনে ভাউসান আগেন কেনে। কাছিত আইস শুন-শুন শুন। এংনা হাত-খান ধরিবা দদি। তমার নরম গতর গিনা নারি দেখি। তমাক দেখিলে তমার জা এর কাথা মনে পরে। আহা দেখতে ছিল ঠিক তমার মতন।

ফুলন ঃ না ভাশুর। তমার চাল চলন খারাপ। নিলাজা সরম ভরন বেচি খায়ান।

হাণ্ডিয়া ঃ তমার গতরট হামাক টানেহে ভাউসান। মনে হচে ভমরা হই তমার ঐ ফুলত বসি। কেনং চিলকেহে তমার গতর খান। ঝিলিক মারেহে। আইস আইস কাছিত আইস।

ফুলন ঃ গাউন—

তমরায় হচেন বর ভাশুর
হামরায় ভাউসানি
ঐলা কাথা কহিতে ভাশুর
তমার লজ্জায় করেননি।

ভমরা সাজি এ ফুলত। গতর দেখাই, বসি মধু খাবার ইচ্ছা ভাশুর।

হাণ্ডিয়া ঃ হে ভাউসান। হামার মনের কাথা বুঝিবা পারিয়ান।

ফুলন ঃ জিভাত জল আসিয়া বুঝি। না ভাশুর । আঃ হারে সাদের ভমরা ভাশুর।

হাণ্ডিয়া ঃ আহাহা ভাউসান। আহাহা ভাউসান। ফুটানিয়া ফুল দেখি কোন ভমরার জিভাত সুয়াদ না জাগে।

গাউন ঃ তমরায় সাজ ফুল ভাউসান
হামরায় সাজি ভমরা
তমার ঐ ফুলে বসি
মধু খাম ভাউসান

চুপ চুপ করিয়া।

কেহ জানিবা নাহা। ভমরার তানে ত ফুলের মধু হয় ভাউসান।

ফুলন ঃ বেশি লোভ করেন না ভাশুর। হূল ভাঙ্গি যাবে। তমার ঐলা কাথা হামরা শুনিবা আসিনি। হামরা চলিন।

প্রস্থান

হাণ্ডিয়া ঃ বর দেমাক। শুন শুন ভাউসান শুন শুন। কেনে আগি জাহান একট কাথা শুন। ভাউসান-ভাউসান—

'ডাকতে ডাকতে প্রস্থান'

দ্বিতীয় দৃশ্য

দৃশ্যে — উদাসু, বুলো, ভুজু

"উদাসুর বারি। ধানের বস্তা নিহনে উদাসুর প্রবেশ"

উদাসু ঃ বুলো বেটী। বেটী বুলো। কুন্না গেল বেটী। বারিত আয়।

বুলো ঃ আসিলু বায়ো। ছাগল বান্ধিবা গেন্নু। বায়ো ভাত আন্ধিবার তাংনি নকরি জল সব যগার করি থুইয়াউ। চাউল আনিলু

উদাসু ঃ হে বেটী চাউল আনিনু ধান আনিনু। বেটী মোর বর দুঃখের কপাল। তোর মা থাকিলে থাউক সেলা অনেক কাথা। মোক এক গিলাস জল দে বেটী। আঃ টুটিট মোর ফাটি গেল ফাটি গেল।

বুলো ঃ জল আনুহুং বায়ো। তোক জল দি টপ করি ভাত আন্থু সব কিছু ত যগার ছে।

উদাসু ঃ হায় ভগবান মাহাজুনের বারি জন খাটি। মাহাজুনের ধান কর্জা খাই আর কতদিন চলিবে। জীবনলা কি হামার এমনি করি শেষ হবে কোন দিন হামার সুখ হবানাহা।

বুলো ঃ নে। জল আনিনু বায়ো। নে আগে জল খা। কেনে এনং করিহিম বায়ো অস্থির হই যাহিস।

উদাসু ঃ (খুব অস্থির ভাব) আর কি কহিবু বেটি মোর ঠকঠকিয়া কপাল এই রকম অভাব তোক নি মুই কেনং করি দিন কাটিম বেটী। (কান্দুন)

বুলো ঃ বায়ো তুই কান্দিস না। সবার দিন যেমনি যাবে হামার দিন তেমনি যাবে। তোক খুব ভোক নাগিয়া।

"প্রস্থান"

"ডাকতে ডাকতে ভজু টুডুর প্রবেশ"

ভুজু ঃ উদাসু দাদা, উদাসু দাদা, বারিত ছিস দাদা, নাই। হায় হায় তোর কি হইলে উদাসু দাদা। কান্দা কাটি করিহিস কেনে কান্দিহিস কেনে।

উদাসু ঃ গাউন ঃ—

কি শুনিবু ভুজু ভায়া

মোর দুঃখের কাথা

মিছা মিছি হিসাব করি

হাণ্ডিয়া মাহাজুন

জমিখান নিলে ঠকাইয়া

মোর সর্বনাশ হইগেল ভুজু ভায়া মোর সর্বনাশ হই গেল। এক বিঘা জমি কত কষ্ট করি মোর বাপ সিজি দি গেল্ল। সেই ভুই খান চালাকি করি হাণ্ডিয়া মাহাজুন নি নিলে। সব মিছা, সব মিছা। হিসাব দি মোক ঠকাই নিলে।

ভুজু ঃ কি। সত্যি ঘটনা কহচিস উদাসু দাদা। সর্বনাস। গা-এ গা-এ মাহাজুনের অত্যাচার, অবিচার। আর কত সহ্য হবে।

উদাসু ঃ হে ভুজু ভাই। আর কি শুনিবু মিছা হিসাব বানাই মোর জমিখান নিলে। সন্দেহ করি কহিনু হিসাবট কেনং গোলমাল। এই কাথা শুনি মাহাজুন মোক মারে আরকি। জমির ফসল আর পরের বারি জন খাটি কোন রকমে দিন চলিহিল। ভুজু ভাই এলা মোর কেনং করি দিন যাবে।

ভুজু ঃ ছেচোয় উদাসু দাদা। এত অভাব এত দুরদিন এ দুনিয়াতে বাঁচা হামার কঠিন। জানিস উদাসু দাদা হামার গা এর সাতারের সব জমি নিয়ে নিলে দিনোরের সুরেশ মাহাজুন।

উদাসু ঃ কি বিপদ ভুজু ভাই-চাষী, কৃষক, আধিয়ার দিন মজুর সব শেষ। এমাক দেখিবার কেহ নাই। মাহাজুনের খপ্পর থাকি কেই হামাক বাচাবে।

ভুজু ঃ সেই টয় ত কাথা উদাসু দাদা। দ্যাশের সব বর নোক, মাহাজুন। জমিদার এক ভিতি। গরিব দুঃখির দেখিবার কেহ নাই।

উদাসু ঃ হায় ভগবান সম্বল হারা গা-এর কৃষক, আধিয়ার, দিন মজুর এমার কি মুক্তি নাই? কত দিন এমার উপর অনাচার অবিচারের দিন ফুরাবে।

ভুজু ঃ এই মাহাজুনের অবিচার, আনাচার এর একট কিছু ব্যবস্থা নিবায় হবে উদাসু দাদা। এর জইন্য দরকার 'এক জোট বান্ধি' সংগঠন করা।

উদাসু ঃ তুই ঠিক কয়হাইস ভুজু ভাই। হামাক জোট বাঁধা দরকার ছে। এর পতিবাদ করা দরকার। দ্যাশ থাকি মাহাজুন জোতদার উচ্ছেদ না করিবা পারিলে হামার নিস্তার নাহি। চল চল সংগঠন তিয়ার করি।

তৃতীয় দৃশ্য

দৃশ্যে— যদুনাথ, দয়াময়, হাণ্ডিয়া, ফুলন, কালুয়া, ভুজু

জমিদারের কাচারী। নায়েব ও তহশিলদার জমির খাজনা আদায় করছেন। প্রজারা এক এক করি জমির খাজনা দিতে আসচ্ছেন। কোন প্রজা খাজনা মুকুবের জন্য আবেদন নিবেদন করছেন।

যদুনাথ ঃ এইবার দেখছি জমিদারি উচ্ছন্নে যাবে। সব প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তারা জমির খাজনা বন্ধ করবে। তারা জমিদারী, জোতদারী, উচ্ছেদ চায়, ধ্বংস চায়। ব্রিটিশ রাজের তারা পতন চায়।

"চাবুক হাতে দয়াময় এর প্রবেশ"

দয়াময় ঃ চাপকাও চাপকাও বেটাদের বেটারা বিদ্রোহ করেছে। জমিদারী খাজনা বন্ধ করবে। কি পেয়েছে কি মগের মল্লুক। যত দিন এই ব্রিটীশ রাজ ভারতে আছে ততদিন বেটাদের চাপকায়ে ঠিক করব। রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সব শয়তানের দল। জমির ফসল খাবে জমির খাজনা দেবেনা। বেটারা ঠিক দেবে চাই চাবুক। কি বল যদুনাথ। আ-হা-হা-হা। এই চাবুক দিয়ে সব আদায় করব।

যদুনাথ ঃ আজ্ঞে হুজুর খাজনা একদম আদায় হচ্ছেনা। প্রজাদের দুঃখের শেষ নাই হুজুর। বছর বছর খরা আর বন্যা কৃষক জমি থেকে কোন ফসলই পাই নি। তারা কি দিয়ে খাজনা শোধ করবে হুজুর।

দয়াময় ঃ তুমি বলছ কি যদুনাথ? তুমি তো আমাকে অবাক করে দিচ্ছ। খাজনা একদম আদাই হচ্ছে না। খাজনা আদায় না করতে পারলে জমিদার যে, দেউলিয়া হয়ে যাবে। জমিদারী স্টেট নিলাম হয়ে যাবে। তাই তো জমিদারের হুকুম। যে করেই হোক খাজনা আদায় করতেই হবে।

যদুনাথ ঃ আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি নায়েব মশাই। কিন্তু প্রজারা করবে কি।

দয়াময় ঃ আহাঃ সে চিন্তা তোমার নয় যদুনাথ। প্রজাদের দুঃখের কথা শুনে তুমি যে একেবারে গলে যাচ্ছ যদুনাথ। ম্যা-ম্যা করলে প্রজা শুনবে কেন? খেকী কুত্তার মত খেক খেক করে দাঁত বার করতে হবে। দেখচ না ভারত বাসী আজ স্বরাজ চায়। তাই ব্রিটীশ রাজ করায় গণ্ডায় জমিদারের টেক্স না পেলে জমিদার উচ্ছেদ করে জমির নিলাম ডাকছে। তাই যে করেই হোক খাজনা আদাই চাই।

"হাণ্ডিয়া মাহাজুনের প্রবেশ"

হাণ্ডিয়া ঃ পন্নাম নায়েব বাবু পন্নাম।

দয়াময় ঃ কি খবর হাণ্ডিয়া মণ্ডল। খাজনার টাকা-কড়ি এনেছ ত।

হাণ্ডিয়া ঃ হা-হুজুর। খাজনা ত সুজিবা আসিনু। এই ন খাজনার টাকা নায়েব মশায়।

দয়াময় ঃ হ্যাঁ সব খাজনা শোধ করে দাও। এই বছর জমিদারের হুকুম। ৪,৫ বছর যাদের খাজনা বাঁকী আছে। সেই সব জমি নিলাম ডাকা হবে।

হাণ্ডিয়া ঃ সে দিক থাকি হামি ঝক ঝক নায়েব বাবু। পন্নাম নায়েব বাবু পন্নাম।

দয়াময় ঃ তুমি জমিদারের হুকুম মত কাজ কর যদুনাথ। যে, করেই হোক জমিদারী এবং জমিদারকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। জমিদার থাকলে নায়েব থাকবে তুমিও থাকবে। না হলে জেনে রাখো আমরা পথের ভিখারী। তুমি সেই বুঝে কাজ কর যদুনাথ। দেখো কেউ যেন ফাঁকি দিতে না পারে। আমি অন্দর থেকে এক্ষনি আসছি। "প্রস্থান"

"ফুলন বেওয়ার প্রবেশ"

ফুলন ঃ (কোন কথা না বলে তহশিলদার যদুনাথের পা ছুয়ে ভক্তি)

যদুনাথ ঃ থাক-থাক। মা লক্ষি পায়ে প্রনাম করতে হবে না। কি ব্যাপার বল দেখি? তোমার নাম কি মা।

ফুলন ঃ মোর নাম ফুলন বেওয়া। দেউল গাওত বারি।

যদুনাথ ঃ তুমি এখানে কি দরকারে মা লক্ষি।

ফুলন ঃ বাবু ৪ বছর মোর জমির খাজনা বাকী। বড় অভাবের সংসার। বাবু সেই তাংনে খাজনা মাপ চাহিবা আসিনু। ইবার হামাক দয়া করেন বাবু।

যদুনাথ ঃ (খাতা দেখতে দেখতে) ফুলন স্বামী মৃত গকুল দেবশর্মা গ্রাম দেউল। খাতায় ত দেখছি মা লক্ষ্মী তোমার ৪ বছরের খাজনা বাঁকী। চার বছরের মধ্যে এক বারও খাজনা দেওনি। জমিদার তো কোন কথা শুনবে না-মা-লক্ষ্মী। জমিদারের হুকুম এ বছর শোধ না করলে তোমার জমি নিলাম ডাকা হবে।

ফুলন ঃ হায়রে মোর দুখিয়া কপাল। মোর কি হবে। তমার চরণ ধরুঙ্গ বাবু। তমার মুই চরণ ধরুঙ্গ। মোর ঐনায় মাত্র ভুই। তমার দোহাই নাগে বাবু মোর জমিখান নিলাম ডাকেন না।

(এই সময় নায়েব দয়াময় ও একজন দ্বারোয়ানের প্রবেশ)

দয়াময় ঃ কি ব্যাপার যদুনাথ। একি হচ্ছে। এত কান্না কাটি কিসের।

যদুনাথ ঃ হুজুর। দেউল গ্রামের বিধবা ফুলন বালা খাজনা মাপ চায়।

দয়াময় ঃ তার কত দিনের খাজনা বাঁকি।

যদুনাথ ঃ ৪ বছরের হুজুর।

দয়াময় ঃ ৪ বছর খাজনা বাঁকি। না-না জমিদারের হুকুম কোন রকম খাজনা মাপ নেই। যত সব। জমির ফসল খেতে ভালো লাগে খাজনা দিতে ভালো লাগে না।

(এই সময় ফুলন এসে নায়েবের পা জরায়ে ধরবে)

ফুলন ঃ হামাক বাঁচান বাবু। হামাক বাঁচান। ছোট ছুয়া-পুয়া নি মোর দুঃখের সংসার। ভুই বলতে মোর মাত্র ঐনা। নিলাম ডাকেন না বাবু।

দয়াময় ঃ পা ছাড় বলছি।

ফুলন ঃ তমরা মোর বাপ-মা। মোক দয়া করেন।

দয়াময় ঃ আমার নাম দয়াময় হলেও। কর্মে আমি পাষণ্ড। মানুষের চোখের জলে পাষান গলতে পারে। কিন্তু দয়াময় এর হৃদয় কখনও গলবে না। খাজনা চাই। পা ছেড়ে দাও বলছি। এদের চাই উচিত শাস্তি। যত সব নেকামির দল। দারোয়ান একে নিয়ে যাও। অন্দরে কপালে পয়সা দিয়ে রোদ্রে দাড় করিয়ে রাখবে। মেয়ে বলে ওকে আমি চাবুক মারছিনা। যাও নিয়ে যাও।

দ্বারোয়ান ঃ আজ্ঞে হুজুর। নিয়ে যাচ্ছি। মিছা কান্না-কাটি করে কি করবে মা। আসেন আসেন। হুজুরের হুকুম। হুকুম পালন করাই মোর কাম। "প্রস্থান"

দয়াময় ঃ আমার কাছে নেকামি। যে করেই হোক খাজনা চাই-চাই।

"এই সময় এক সঙ্গে ভুজু কালুয়ার প্রবেশ"

কালুয়া ও ভুজু ঃ (এক সঙ্গে) পন্নাম নায়েব বাবু পন্নাম।

দয়াময় ঃ পন্নাম। ঠিক আছে। কি ব্যাপার বল দেখি। খাজনার টাকা কই।

ভুজু ঃ আজ্ঞে না হুজুর। মানে-মানে। খাজনা মাপ চাই।

দয়াময় ঃ কি বলছ, খাজনা মাপ চাই, তাই না? খুবই ভালো কথা। খা-জ-না মাপ চাই।

ভুজু ঃ হা-হুজুর।

দয়াময় ঃ দারোয়ান চাবুক দাও। বড় স্পর্দা। খাজনা দিবে না। এদের পিঠের চামরা তুলে নেব। জমির ফসল খাবে খাজনা দিবে না। পিঠের চাম তুলে তা শোধ নেব। এদের দাপট বন্ধ করতে হবে। (ভুজুকে চাবুক মারতে থাকবে)

ভুজু ঃ আঃ উহু-আঃ আঃ আঃ।

দয়াময় ঃ তোমার কি ব্যাপার। বলো।

কালুয়া ঃ হুজুর। হা-মার। ঐ হুজুর খাজনা মাপ চাই।

দয়াময় ঃ খাজনা মাপ চাই। (চাবুক) সব যুক্তি করে এসেছে।

কালুয়া ঃ আঃ আঃ আঃ।

যদুনাথ ঃ আজকের মতো এদের ছেড়ে দেন হুজুর। তোমাদের আগেই খবর দিয়েছি খাজনা মকুব হবে না। তবুও কাচারীতে এসেছ খাজনা মাপ চাইতে। এখন চাবুক খেয়ে মর।

দয়াময় ঃ কি বলছ ছেড়ে দিব। না এদের ছাড়া হবে না। খাজনা দিবেনা বেটারা জোট বেধেছে। বেটাদের চাই উচিত শাস্তি। দ্বারোয়ান এদেরকে ভিতরে নিয়ে যাও। চলো, চলো, চলো।

চতুর্থ দৃশ্য

দৃশ্যে- ভুজু, চুমকি, হাণ্ডিয়া, হাদাং ভাদাং

"গরু লাঙ্গল জুয়াল কান্ধে করি, গাউন গাইতে গাইতে ভুজুর প্রবেশ"

ভুজু ঃ কই মারী বিলে রে

ইবার ভাল বর্ষা এইমাছে

চলরে মোরল হাল ধরিয়া

ভোর হইছে মুরগা-মুরগী ডাকেরে

ঐ মরল চলরে চল বিলেরে

ধান ফলিবে সনার বরণ

ভরবে ধানের গলা রে

আসবে সালে ফসল উঠাই

বেটিক দিমু বিয়া রে

বেটিক দিমু বিয়া।

"চুমকির প্রবেশ"

চুমকি : মরলটা যে মোর কুত্তিনা হাল জুরিছে। ঐ মরল সাওনির বাবা তুই কুত্তিনা। সাওনির বাবা।

ভুজু : এই হেট হেট। চল চল। উঃ হুঃ উট, উট, বইস,বইস। ডাইনা ডাইনা। হেট হেট। ঐ ডাকবা ধরিয়া আন এত্তিনা আন।

চুমকি : তুই এত্তিনা হাল জুরেছি। আর মুই বিলের এই মাথা ঐ মাথা খরা কলা নি ঘুরি বেড়াছু।

ভুজু : চুমকি কি আনছি। আন এত্তিনা আন।

চুমকি : কি আর আনিম চাউল ভাজা আর তালের তারি আনিছু।

ভুজু : মল্লানটা মোর খুবেই ভাল। আইজ তাইলে জমবে ভাল। নে ঢাল আরকি।

চুমকি : এই নে। "গাউন"

মোর মতন ছুড়ি

পাবুনারে ছোড়া

পাবুতে পাবু তিন ছাওয়ালের মা।

ভুজু : মোর মতন ছোড়া

পাবুনারে ছুড়ি।।

পাবুতে পাবু বুড়া কাশুলা।

আইজকা মোক মাতাই দিলুরে চুমকি। তোর দিলটা আছে। তোর মনটা আছে। সোয়ামির পতি দরদ আছে। হালটা বাহু।

"এই সময় হাণ্ডিয়ার প্রবেশ"

হাণ্ডিয়া : কেই হাল বাহে। ঐ হালুয়া হাল থামা হাল থামা।

ভুজু : কে উট দুর থাকি চিল্লাচ্ছেন। বগলত আইস।

হাণ্ডিয়া : কিরে ভজু তোক সে দুরতে কহচুং হাল থামা হাল থামা। শুনা কি তুই পাইসনি। মোর জমিত হাল বাহাচি মোর হে কাথা শুনিসনি। না মোর সঙ্গে ঝগরা করিবা চাহাচিস।

ভুজু : এইট কিনং কাথা কহেচিস মণ্ডল। এত দিন থাকি তোর জমি আধি করু। তুই মোর অন্ন দাতা। নুন হারামি করিম নি মণ্ডল। কোন দিন তো ঝগরা হয়নি। এলা ফের কেনে ঝগরা হবে।

হাণ্ডিয়া ঃ ঠিক কহ্চিস ভুজু। ঝগরা করলেই ঝগরা। ঝগরা হয়নি ভাল কাথা তে শুন মোর হুকুম। এই জমিখান তুই ইবার আধি পাবুনি। মুই অন্য নোকক আধি দিয়াউ। জানিস ত একখান জমি বেশী দিন আধি করলে আধিয়ারের নামে রেকর্ড হয়। এখুন আধি নি খুব গোল-মাল হচে। সেই তাংনে।

ভুজু ঃ না মণ্ডল সত্যি করি কহ্চুং। তোর সঙ্গে মুই কোন গোল মাল করিম নি। আর এই জমি খান তোর অনেক দিনতে পরিছিল। উচল-খাল কাটি জমি খান বারাবোট কনু।

গাউন ঃ উচল-খাল কাটি মাহাজুন

জমিখান কনু বারা-বোট

ইখান জমি ও মাহাজুন

আধি ছাড়াইসনা মোর

তোর মুই পা ধরুং মাহাজুন পা ধরুং

পা ধরিয়া কহ্চুং মাহাজুন

না করিম এনং কাম

তোর জমি ছাড়া ও মাহাজুন

মুই কেনং করি খাম।

হাণ্ডিয়া ঃ না ভুজুয়া। এত কান্দা-কাটি করিস না। কান্দিলে জমি পাল যায়নি। টাকা নাগে।

ভুজু ঃ না মাহাজুন না এত নির্দয় হইস না। ইট বছর মোক আধি করিবা দে। তাছাড়া জমিখান মোর নামে।

হাণ্ডিয়া ঃ তোর নামে আধি রেকর্ড। ভুজু জমি খান মোর। মোর ইচ্ছা মতন কাম করিম। তুই এত দিন আধি করি খালু। ভালয় ভালয় হাল ছাড়ি বাড়ীত যা। বেশী গোল-মাল করিস না। ছাড় হাল ছাড়।

ভুজু ঃ না মাহাজুন মুই হাল ছারিম নি। কি করিবু। তুই যখুন যাচি ঝগরা করিবা আসিয়াইস। মোর হাতত পানঠি ছে।

হাণ্ডিয়া ঃ তোর বর স্পর্ধা হইলে ভজু। মোর নাম হাণ্ডিয়া মাহাজুন। তুই মোক পানঠি দেখাইস। তুই মোক দেখিবা চাহাচিস। ভালয় ভালয় কহ্চুং এখুন হাল ছাড়েক।

ভুজু ঃ না মাহাজুন। জীবন থাকিতে হাল ছাড়িম নি। নিজের মোর সামান্য জমি আর তোর জমি আধি করি মোর সংসার চলে। মুই আদিবাসী সাতালের বাচ্চা। বনুয়া জাইত। তোর কাথাতে জমির সর্ত ছাড়িম কেনে।

হাগুিয়া ঃ ছেচোয় নাকি ভুজুয়া। তাহলে তুই মোক দেখিবা চাহাচিস। মুই একেলায় আসুনি। কাহারে হাদাং ভাদাং।

"দুইজন লাঠিয়ালের প্রবেশ"

হাদাং ঃ হুকুম করেন মাহাজুন।

"হাদাং-ভাদাং"

ভুজুর হাল ছাড়ি দিবে ইচ্ছা মতন পিটাবে। ভুজু হাল-গরু সব নি যাবে।

ভুজু ঃ ঠি ছে। ইয়ার বিচার পরে হবে। মুই যদি বাঁচি থাকিনু হাগুিয়া মাহাজুন। তোক দেখি নিম, তোক দেখি নিম।

"পঞ্চম দৃশ্য"

"দৃশ্যে— উদাসু, বসন্ত, ভুজু, কালুয়া, ফুলন"

উদাসুর বাড়ি। সময় সন্ধে বেলা। গপন বৈঠক। এঠিনা উপস্থিত আছেন জেল খাটা এক নেতা। বসন্ত চাট্টার্জী।

বসন্ত ঃ গ্রামের লোক জন সব আসবে তো উদাসু। খবর ঠিক মত হয়েছে তো।

উদাসু ঃ হে বাবু। খবর ত দিয়াউ। বর বিপদ বাবু। এই মিটিং এর খবর যদি গা-এর মণ্ডল, মাহাজুন, প্রধান জানিবা পারে তাইলে, জমির আধি, কর্জা ধান সব বন্ধ করি দিবে বাবু। খুব গপনে সাবধানে মিটিং করিবা হচে।

বসন্ত ঃ উদাসু তোমাদের ঐ কর্জা ধান খাওয়া বন্ধ করতে হবে। জমি আধি করবে জমির উপর তোমার সত্ব থাকবে। আধি করলে তুমি হবে অর্দ্ধেক জমির মালিক। আধি জমির সত্ব তোমাদের আদায় করতে হবে।

ভুজু ঃ এই যে, মাহাজুনের অত্যাচার কালুয়া ভাই, ইবার একট কিছু ব্যবস্থা নিবায় হবে। হামরা কি শুধু জমির আধিয়ার জমিত হামার কোন অধিকার নাই।

বসন্ত ঃ নিশ্চই আধি জমির উপর তোমাদের অধিকার আছে। তোমাদের সত্ব আছে।

ভুজু ঃ হা বাবু তুমি ঠিক কয়হান। জমির সত্ব না পাইলে হামার বাচিবার কোন পথ নাই। এই সেদিনকার ঘটনা। অনেক দিনের আধি করা জমি হাগুিয়া মণ্ডল মোর ঠিতে ছুটায় নিলে। দু-ঝন লাঠিয়াল দি জমির উপর মোক মার ধর কোলে। গরু, লাঙ্গল সব নিগলি।

উদাসু ঃ সেলায় আলাপ আলোচনা ভুজু ভাই। বাবুট করিবা আসিয়া সবার সঙ্গে কমরেড বাবুটর আলাপ পরিচয় করাইদি। বাবু এই হচে ভুজু টুডু। আদিবাসী ভাইরা ইয়ার কাথা শুনে। আদিবাসীর নেতা। এ হচে কালুয়া দেবশর্মা। গাও কাঠাল বারি। এ হচে ফুলন বেওয়া। গাও দেউল।

বসন্ত ঃ আপনারা তো সবাই এসেছেন। ছট ছট ঘরোয়া মিটিং করেই আলোচনা করতে হবে। কি বলেন কমরেড।

ভুজু ঃ হা বাবু আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন। বেশী দেরী করা যাবানাহা আইতের অন্ধকারে সবাই নুকাই নুকাই আসিয়াই।

বসন্ত ঃ আজ থেকে আমরা সবাই সবাইকে কমরেড বলে ডাকব। কমরেড মানে বন্ধু বা সহকর্মী। কমরেড উদাসু তোমাকে তো বলেছি। তুমি এদেরকে কিছুটা বুঝিয়ে দাও।

উদাসু ঃ এই বাবুটার নাম বসন্ত চাট্টার্জী। বাবুট গরীব দুঃখির জন্য জেল খাটিয়ান। তমার ঠিনা আসিহান কিছু উপদেশ আলোচনা করিবা। তমরা মন দি শুন সবাই। মাহাজুনলার কর্জা ধান খুয়া হামাক বন্ধ করিবা হবে। কর্জা ধানের সুদ বেশী। সুদালী ধান নুয়া বন্ধ করিবা হবে।

কালুয়া ঃ সর্বনাস। কি কহচিস উদাসু ভাই। মাহাজুনলার কর্জা ধান খাই ত হামারা বাচি ছি।

উদাসু ঃ ঐলা তো হামার দোশ কালুয়া ভাই। দেড়া-দুনা-সুদে কর্জা ধান খাই। বছরের কামাই সব মাহাজুনের কর্জা ধান সুজিতেই চলি যায়।

কালুয়া ঃ তুই ঠিকেই কয়-হাইস উদাসু ভাই, ঠিক কয়-হাইস। কাথাট সত্যি। মাহাজুনলা হামাক জলুকের মতন চুষি খাহা। গটা বছর জমিত হাল বাহি, রোদে জলে খাটিয় হামার ঘরত নাই। কিন্তু উপাই কি?

বসন্ত ঃ সেই ব্যবস্থার কথাই তোমাদের আমি বলতে এসেছি। এমনি তো কষ্ট করই আরো একটু বেশী কষ্ট করতে হবে। তোমরা জমিতে খাটি মর কিন্তু খাইতে পাওনা। এখন থেকে তোমাদের কতকগুলি দাবি তুলতে হবে।

যেমন ঃ— আধি জমির সত্ব চাই

আধি ফসলের তে ভাগা চাই

লাঙ্গল যার জমি তার

গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গড়তে হবে।

এ যদি করতে পারেন মাহাজুনের হাত থাকি রক্ষা পাবেন।

"উপস্থিত সবাই একসঙ্গে"

ঠিক কহচেন কমরেড ঠিক কহচেন ।

আধিয়ারী সত্ব চাই

লাঙ্গল যার জমি তার

আধি ফসলের তে-ভাগা চাই

তে-ভাগা চাই

বসন্ত ঃ তোমরায় বল তোমরা কি আধি জমির সত্ব চাওনা, আধি ফসলের তে-ভাগা চাওনা। লাঙ্গল যার জমি তার চাওনা। সবাই এক সঙ্গে— চাই কমরেড চাই। হামরা জমির সত্ব চাই। ফসলের তে-ভাগা চাই।

বসন্ত ঃ হ্যা এটাই হবে তোমাদের স্বাধীনতা আর ভারতের স্বাধীনতার এক মাত্র পথ। গ্রামের কৃষক যদি তোমরা না জাগ কিছুই হবে না। ব্রিটীশ গভরমেন্ট, জমিদার, জোতদার, মহাজুনদের শোষনের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করতেই হবে। এরা দেশের শত্রু।

"আমাদের সবার শ্লোগান হবে সবাই এক সঙ্গে বলবেন"

ব্রিটীশ তুমি ভারত ছাড়ো। শাসন-শোষন বন্ধ করো। স্বরাজ আমাদের দিতে হবে। ভারত ভাগ করা চলবে না, চলবে না জমিদারী, জোতদারী, মাহাজুনী প্রথা ধ্বংশ হোক। আধিয়ারী সত্ব দিতে হবে। লাঙ্গল যার জমি তার। আধি ফসলের তে-ভাগা চাই, তে-ভাগা চাই।

"ষষ্ট দৃশ্য"

দৃশ্যে— ফুলন, হাণ্ডিয়া

ফুলনের বারি। সময় বেলা ভাটি। ফুলন বসি বসি চিন্তা করেহে এলা কি করিবে। ৮ দিনকার ভিতরে খাজনা না দিবা পারিলে উয়ার সবলা জমি নিলাম হবে।

ফুলন ঃ হায় ভগবান। এলা মুই কি করিম। খাজনা দিবা পারুনি সে তাংনে নায়েব বাবু মোক শাস্তি দিলে। ৮ দিন সময় দিয়া ইয়ার ভিতর খাজনা না দিবা পারিলে সব জমি মোর নিলাম হবে। তখুন ছুয়া পুয়া নি কেনং করি দিন কাটিম। এলা মুই টাকার তাংনে মোর ভাশুর হাণ্ডিয়া মাহাজুনের ঠিনা যাম। দেখুং ভাশুরট কি কহে।

"এই সময় হাণ্ডিয়ার প্রবেশ"

হাণ্ডিয়া ঃ ভাউসান বো, ভাউসান বারি ঘরে ছেন।

ফুলন ঃ কে আসিল। কে ডাকেহেন কে উটা। ভিতর আইস।

হাণ্ডিয়া ঃ হামরা বো ভাউসান হামরা। ইয়ে কত খুনতে ডাকিহি।

ফুলন ঃ ওই ভাশুর তমরা আসিয়ান। আইস আইস বারির ভিতর আইস। হায়রে মোর কপাল। ভাশুর তমার খাট পা-খান আইজ নাস্তা হইল। হামার কি কপাল। (পা ছুই ভক্তি দিবে)

হাণ্ডিয়া ঃ জানেন ত ভাউসান হামার মনট তমার ঠিনায় পরি ছে। আইতে দিনে তমার কাথা চিন্তা করি। আর চিন্তা করি কি হবে ভাউসান তমরা যে সেদিন মোর দাত ভাঙ্গিবার কাথা কয় হান। সেই তাংনে বর ভয় করি আসিন। কি যে কহিবেন।

ফুলন ঃ ভাশুর তমার পা ধরি কহ্চি। সেদিনকার কাথালাতে রাগ করেন না। হঠাৎ করি কোন মুখে যে তমাক অপমান কন। তমরাও যদি রাগ করেন হামাক দেখিবে কে।

হাণ্ডিয়া ঃ তমরা হচেন মাইয়া মানুষ। তমার উপর আগ করিলে হয়। আর আগ করিলে তোমার বারি আসি "বাহে" ভাউসান।

ফুলন ঃ সেই ভাশুর। তমরা হচেন হামার বড় ভাশুর। তমরা আগ করিলে হামার দুনিয়া অন্ধকার।

হাণ্ডিয়া ঃ ভাউসান তমাক একটা কাথা কহিবা আসিন। শুনিবেন ফের। যদি শুনেন তে কহি।

ফুলন ঃ কহিবা আসিয়ান কহ্। শুনি কি কাথা। একট কেনে কতলা কহিবেন কহ্।

হাণ্ডিয়া ঃ গাইন ঃ—

ওনা শয়নে স্বপনে ভাউসান

দেখুং তোমার ছবি

তমাক ছাড়া ও ভাউসানী

মোক ভালয় লাগেনী

ওনা ও ভাউসানী বৌ (বাহে)

তমরায় সাজ ফুল ভাউসান

হামরা সাজি ভাউসান ভমরা

মনের সুখে মধু খাম ভাউসানী

তমার ঐ ফুলে বসিয়া।

শুনা পালেন ভাউসান। মোর মনের আশা পুরন কর ভাউসান।

ফুলন ঃ শুনা ত পান ভাশুর। তমার মত নামি-ধামি নোকক ফের এনং কাম সাজে ভাশুর। মানুষ শুনিলে ছিঃ ছিঃ করিবে।

গাউন ঃ—

ওনা শুন-শুন শুন ভাশুর

শুন মোর কাথা,

তমার ভাইয়ের কাথা ভাশুর

হামরা ভুলিবায় পারিনা।

ওনা-ওকি , ও ভাশুর

নোক সমাজে ছিঃ ছিঃ করবে

মুখ দেখাম কেনং করিয়া।

এনং কাথা আর ভাশুর

মোকে কহেন না।

শুনা পালেন ভাশুর এনং কাথা মোক কহেন না। স্বামীর কুলট নষ্ট করিবা কহেননা ভাশুর। মানুষে নিন্দা করিবে। তমরা হামার বর ভাশুর। ভাশুরের মতন থাকিবেন আসবেন যাবেন।

হাণ্ডিয়া ঃ ভাউসানী তমাক যদি হামরা নিকা করি। মানুষে আর কি কহিবে। মরা মানুষের তাংনি চিন্তা কি করিবেন। তমাক কি ভাত কাপর দিবে।

গাউন ঃ—

ওনা-ও ভাউসানী

পাচ- বছরে বহু মরা

দিন দিন বারে ভাউসান মনের জ্বালা

ওকি ও ভাউসানী বো

ধন দৌলত টাকা কড়ি

যদি না থাকে ভাউসান

ঘরত সুন্দরী নারি

ইলার কোন দাম নাই।

ভাউসানী এক কানা কড়ি।

বুঝা পালেন ভাউসান। গিথানী হইল ভাউসান গৃহ-লক্ষ্মী। ঘরত লক্ষ্মী না থাকিলে এত ধন দৌলত টাকা পাইসা কি হবে ভাউসানী ইলা সব তমার ভাউসানী।

ফুলন ঃ মোক ছাড়ি তোমরা অন্য কাহাক নিকা কর ভাশুর। তাতে তমরা শান্তি পাবেন। যেট নারীর সুয়ামী মরে ভাশুর সে হতভাগী জনম দুঃখিনী।

হাণ্ডিয়া ঃ আর দুঃখ করেন না ভাউসান। তমরাও শুন। যেট মরদের মাউক মরে তার মতন দুখিয়া আর নাই। মাউক মরার দুঃখ তমরা কি বুঝিবেন ভাউসান। হামরা বুঝিবা পারি। শাল খুটার মতন আইতত মেজাত পরি থাকি। গতরট নারিবার কেহ নাই। যেদিন থাকি তমাক দেখিয়াই ভাউসান। তমার ঐ ডাবাম-ডুবুম চেহেরাংনা সব সময় হামাক চোখে ভাসেহে। কেনং চিলকেহে তমার গতর গিনা।

ফুলন ঃ মধু খাবার তাংনে তমার জিভাত জল আসিয়া ভাশুর। মায়ার গতরের উপর তমার এত লোভ। জীবনট ত শেষ, আর একট কাল বাকী।

হাণ্ডিয়া ঃ এই একট কালেই ত কাল ভাউসান। হে ভাউসান তমার ফুটানিয়া ফুল দেখি খুব লোভ হচে ভাউসান। নাম তমার ফুলন ফুলের মতন তমার মন।

ফুলন ঃ ঐলা শরমের কাথা থাউক ভাশুর। যখুন কেহ্ থাকি বানায় নিরি বিলি বসি সেদিন ঐলা গলফ হবে। এত নোকের ভিতর ফের ঐলা গলফ হয়।

হাণ্ডিয়া ঃ এ হে হে ঠিক কয়হান ভাউসান ঠিক কয়হান। নিরি বিলি ঘরের ভিতর ঐলা কাম— ই হি হি।

ফুলন ঃ ভাশুর আজে-বাজে ত অনেক গলফ হইল। আর তমার মনের ইচ্ছা হামরা বুঝিবা পারিয়াই। এলা একট কামের কাথা কহি।

হাণ্ডিয়া ঃ ই, হি, হি বুঝিবা পারিয়ান। ভাল কাথা ভাল কাথা একট কেনে ভাউসান এক শটা কহ্নি। তমার তাংনি এ দিল খুলা। মোর ঘরের দুয়ার খুলা।

ফুলন ঃ কাথাট ত কহিম ভাশুর যদি ফের চেমকি উঠেন। তমার বর নোকের ফের উনং ঢং। কেহ কিছু চাহিলে মুশকিল। ভরষা যদি দেন ভাশুর কহিবা পারি।

হাণ্ডিয়া ঃ নে দি খেনি। ধুর বাপু। কিনং কাথা কহিবেন যে, চেমকি উঠিম।

ফুলন ঃ ভাশুর চাইর বছর হইল হামার জমির খাজনা বাকি ছে। না দিবা পারিলে জমিখান হামার নিলাম হবে। ঐ বাবদ।

হাণ্ডিয়া ঃ কতলা টাকা নাগিবে। এই কাথা।

ফুলন ঃ বেশী নাহায় ভাশুর। মাত্র এক শ টাকা।

হাণ্ডিয়া ঃ তমাক ত আগেই কয়হাই ভাউসান নাগিলে ঠেকিলে যান। তমার তাংনি দুয়ার খুলা। এই ন ১০০ টাকা। আর ১০০ টাকা তমার কাপর কিনিবা দিন। ধর ২০০ টাকা হামরা থাকিতে ভাউসান তমার কেনে কষ্ট হবে।

ফুলন ঃ তমরা মোক বাচালেন ভাশুর। তমরা মোক বাচালেন।

হাণ্ডিয়া ঃ যত, সব সে ঝুনার কৃপা। হামার ঘরে ছে বলেই ত গা-এর গরীব দুঃখির নাগিলে ঠেকিলে পাহা। সব তিনার দয়া।

ফুলন ঃ দেখিয়ান ভাশুর ওত খুনতে তমার সঙ্গে গলফ করিহি শুকানে শুকানে। ঐ-সেন তমার তাংনে সরবত করি আনি।

হাণ্ডিয়া ঃ সরবত খিলাবেন। থাউক থাউক ভাউসান। অন্য দিন আসিলে খিলান।

ফুলন ঃ এক্ষুনি বানাই আনিহি ভাশুর। সরবত খাইলে উত্তপ্ত মনট তমার ঠাণ্ডা হবে। (সরবত আনিবা যাবে)

হাণ্ডিয়া ঃ কাঠি নাগিয়া এইবার কেনে। মোক ত চিনেনি মুই হাণ্ডিয়া মাহাজুন। এইনং কত আণ্ডি বেছুয়া মোর পা চাটেহে। রূপের তমার এত দেমাক ভাউসান। তমাক একদিন না একদিন মোর দুয়ারত নাচাম তে ছাড়িম।

ফুলন ঃ ন ধর ভাশুর। সরবত খাও।

হাণ্ডিয়া ঃ আহা। সরবত খিলাই সত্যি হামার উত্তপ্ত মনট ঠাণ্ডা কলেন ভাউসান গতরট হামার বরফের মতন শিতল হইল। যেমন তমার নাম তেমন কাম। গতর গিনা তমার ফুলের মতন।

ফুলন ঃ ভাশুর তমার সঙ্গে গলফ করিতে বেলা চলি গেল। জানেন ত আণ্ডি মানুষের ফের নিয়ম কানুন কিছু মানিবা হয়। মাঝে মাঝে ফের বেড়াবা আসেন ভাশুর। "প্রস্থান"

হাণ্ডিয়া ঃ ই, হি, হি, হি। এই বার বগী ফান্দে পরিয়া, আর যাবে কুনঠি টাকা যখুন নিলে। মুইহ হাণ্ডিয়া মাহাজুন।

'সপ্তম দৃশ্য'

ব্রিটীশ, জমিদার, জোতদার, মাহাজুন এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হাটে বাজারে, পাথে ঘাটে ছড়িয়ে পরল।

দৃশ্যে ঃ উদাসু, ভুজু, কালুয়া, ফুলন, নালসিং, ভজন লাল।

ঝাণ্ডা হাতে শ্লোগান দিতে দিতে উদাসু, ভুজু, কালুয়া, ফুলন সহ আরো অনেকের প্রবেশ।

"এক সঙ্গে শ্লোগান"

জমিদারী, জোতদারী, ধ্বংশ হোক, আধি জমির সত্ব দিতে হবে। তে-ভাগা চাই, তে-ভাগা চাই। কৃষক, মজুর জোট বাঁধো তৈরী হও, লাঙ্গল যার জমি তার। আধিয়ার ভাই তমরা নিজ খলানে ধান তুলো।

ব্রিটীশ তুমি দূর হটো ভারত ছাড়ো দূর হটো ভারত ছাড়ো। ভারত ভাগ চলবে না, চলবে না।

শ্লোগান দিতে দিতে একবার চলে যাবে আবার আসবে।

"এই সময় নালু সিং, ভজন লাল মিছিলের উপর লাঠি চালাবে।"

নালু সিং ঃ পিটাও বেটাদের পিটাও। দেশ স্বাধীন করবে। বিদ্রোহ করবে। ব্রিটীশ তারাবে।

"অষ্টম দৃশ্য"

দৃশ্য ঃ বুলো, হাণ্ডিয়া, উদাসু

উদাসুর বারি। সময় বেলা ভাটি। বুলো বারি-ঘর সামটিবে। গানের সুর উঠাবে। এমন সময় ডাকিতে ডাকিতে হাণ্ডিয়া মাহাজুন আসিল।

হাণ্ডিয়া ঃ উদাসু বোরে, বোরে উদাসু। বারি ঘরে ছিস বোরে। এই ত বুলো এহ্ এত ডাকিহুং তাহাও বুলো সারা দিসনি।

বুলো ঃ ও মণ্ডল আতা আয় এত্তিনা আয়। এঠিনা বসেক। ডাক শুনি চিনিবা পারুনি। ঐ তাংনে চুপ করি ছিনু। মুবা ত বারিত নাই আতা। ধন-কোল হাট গেলে।

হাণ্ডিয়া ঃ বুলো তোর বাপের ঠিনায় আসিননু। একট বর দরকারে তুবা তোক কিছু কহি গেলে। কুংকা হাটতে আসিবে।

বুলো ঃ মুবা ত বেলা থাকতে আসিবা চায়হা। হাটতে আসিহনে ফের, কোন ঠিনা মিটিং করিবা যাবে।

হাণ্ডিয়া ঃ কি কহচিস মিটিং করিবা যাবে। উদাসুটার কোন আক্কেল নাই। এনং গাভুর বেটী থুই আইত আন্ধারে মিটিং করি বেরাহা। বুলো তোক ত দেখুং দিন দিন বেশ ডাবাশ-ডুবুশ হচিস। চিলকেহে তোর গতর খান। সে তাংনে পারার ছণ্ডলা তোক দেখি উমচি গেলে। বর খারাপ ঢং। তার চে—

বুলো ঃ মণ্ডল আতা মুক সামলি কাথা কহিস। বর নোক হই বুঝি সরম-ভরম বেচি খায়াইস। বুরা হইলিস তাহাও ঐট ঢং যায়নি।

হাণ্ডিয়া ঃ আঃ হাঃ আগিস কেনে যাহিস বুলো। সমন্ধে তুই মোর নাতিন হবু সে তাংনে এংনা হাসি মাজাক করিনু। আয় বগলত আয় মুই কহচুং কি সবার সঙ্গে এরকম ফাশুর-ফুশুর না করি তোর বাপোক বেহা দিবা কহো।

বুলো ঃ খবরদার মণ্ডল আতা মোর ঐ রকম কেলেংকারী উঠাইসনা। ঐলা বুঝি করিবা আসিয়াইস। ভেরা বারিতে ভেরা। মোর বাপ নাই দেখি খুব সুযোগ পাই-হাইস। পালা কহচুং।

হাণ্ডিয়া ঃ পালাম ত বুলো কিন্তুক মুই কি তোক বানানিয়া কাথা কহচুং। ঐ পারার ছণ্ডালা তোর নামে ফাসার ফুশুর করে সেই তাংনে মুই তোক সাবধান করি দিনু। যা রটে তা কিছু বটে।

বুলো ঃ আতা মোর নামে কলঙ্ক উঠাবু। পরের সর্বনাশ আর কত করিবু। পাপ পুন্ন কি তোর নাই।

এই সময় ডাকতে ডাকতে উদাসুর প্রবেশ

উদাসু ঃ বুলো, বুলো বেটি বুলো। পাপ পুন্ন করি কি হবে মা। দিন দুখিয়ালা মহাপাপি। এই ত মণ্ডল কাকা কুংকা আসিলু ও তোর সঙ্গেই বুঝি বুলো কাথা কাটা কাটি করিহিল।

হাণ্ডিয়া ঃ ভায়া উদাসু একখান বেটী বানাহিস আর কি? মুখত ছুই দুয়া যায়নি। এংনা কাথাতে বাপু তোর বেটি মোক অপমান কলে। ইট বেটী তুই কেনং করি বেহাবু।

উদাসু ঃ ছিঃ বেটী বুলো। ঐলা কেনং ঢং করিহিস। মানুষ আসিলে বসিবা দিবু। ভালো মন্দ গলফ করিবু। না করি তুই ঝগরা করিহিস নোকে কি কহিবে। যা যা বারির ভিতর যা। মণ্ডল কাকা তুই কিছু কয়হালু।

বুলো ঃ বায়ো না আসিলে আইজকা নি লাজুয়া মণ্ডল আতাক "প্রস্থান"

উদাসু ঃ আঃ বুলো থামত বেটী। যা ভিতর যা।

হাণ্ডিয়া ঃ দেখিয়াইস দেখিয়াইস তোর বেটির কেনং মুখ। দেখিনু আর কি একখান মাইয়া।

উদাসু ঃ ছুয়ার কাথাত আগ করিসনা কাকা। কি দরকারে কাকা কহেক দি। মোর ফের তারা হুরা ছে। একঠিনা যাবা হোবে।

হাণ্ডিয়া ঃ শুনুহুং তুই নাকি আইজ-কাইল কমরেড হইলিস। সেইলায় তোর সঙ্গে আলাপ করিবা আসিনু। কেনং করি সব শুনা যাহা। ছেচোয় না মিছায় কহেকদি বোরে।

উদাসু ঃ হে মণ্ডল কাকা। তোর ঠিনা নুকাই কি হবে। তুই যা শুনিয়াইস সব ঠিকেই কাকা।

হাণ্ডিয়া ঃ আচ্ছা উদাসু কহোদি তমার আসল বেপারট কি। কাথালা মোক ঠক বাজির মতন নাগেহে। কহো ত শুনং কি কি নি তমরা আন্দোলন করেহেন, দাবি করেহেন।

উদাসু ঃ হামরা ভারতের স্বাধীনতা চাই। লাঙ্গল যার জমি তার। আধি জমির সত্ব চাই। আধি ফসলের তিন ভাগ চাই। এইলা আর কি আরও অনেক দাবি ছে।

হাণ্ডিয়া ঃ হে খুব ভাল করি বুঝা যাহা তমাক ধনদোলের গাছ ত চরায়া আরকি। এইলা মিছায় মাতিয়ান ঐলা ফের কোন দিন হয়। তাইলে ত মুলুকট উলটি যাবে। পুরুবের সুরুজট পশ্চিমে উঠিবে। সব মিছা।

উদাসু ঃ হে ছেচোয় হবে। নেখা পরা জানা ভাল ভাল নোক ছে এর ভিতর। ছে। অমরা কি মিছা কহিবে। হবে নিশ্চই হবে। আপনি দেখিবু।

হাণ্ডিয়া ঃ ধুর। ইলা হয় নাকি বোরে। ভারত স্বাধীন। আধি জমির সত্ব। লাঙ্গল যার জমি তার। ফসলের তিন ভাগ।

উদাসু ঃ আপনি দেখিবু। সব হবে। সব হবে।

হাণ্ডিয়া ঃ হে, হে, রে উদাসু সব জানা ছে। হুজুগ। হুজুগে মাতেহেন আরকি। ঐ মিটিং ফিটিং করি কি হবে। মিটিং করি কি কার পেট ভরে। গরীব ঠকানিয়া সব চালাকি। তুই বাহে ঐলা বাদ দে।

উদাসু ঃ না মণ্ডল কাকা। এই আন্দোলন, এই দাবী মোর এক-লার তাংনে নাহায় সবারে তাংনে। জীবন যায় যাবে তবু পিছা যাবেনি।

হাণ্ডিয়া ঃ উদাসু তুই মোর একট কাথা শুনিবু। তুই ত মোর জমি আধি করিহিস। যা তোর ঠিনা কোন ফসলেই নিমনি। তুই এমনি খা আর অন্য আধিয়ারলার ঠিতে জমি ছুটাই নিম তুই কিছু কহিস না। ঐলা কাম বাদ দে। তোর ভাল হবে।

উদাসু ঃ মোক লোভ দেখাইসনা কাকা। এত নোকের দুঃখ জ্বালা। হামাক দূর করিবায় হবে।

হাণ্ডিয়া ঃ ঐ ত ভাল কাথা কহিলে আল্লা বেজার। এলাও কহচুং কাথাট মোর ভাল করি বুঝি দেখেক।

উদাসু ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ কাকা। ঐ তমার মতন মাহাজুনলায় দেশট ধ্বংস কলে। গা এর গরীব কৃষক লাক সর্বশান্ত করি ব্রিটীশ জমিদার জোতদার লাক তমরা সুযোগ দিয়ান।

হাণ্ডিয়া ঃ কি কহচিস উদাসু। ছোট মুখে বর কাথা। এই ব্রিটীশ জমিদার, জোতদারলা ছে বলেই ত তমরা গরীবলা ধার দেনা , কর্জা ধান খাই বাঁচিছেন। একট কাথা কহিনু তোর কপালত দুঃখছে। মোর কাথালা বুঝি দেখিস।

উদাসু ঃ তাইলে হাণ্ডিয়া মাহাজুন ভয় পায়হা। এই সুযোগ ব্রিটীশ, জমিদার, জোতদার, মাহাজুনলার দাপট বন্ধ করিবা হবে। সময় হই গেল। মুই এলা মিটিংগত যাম। "প্রস্থান"

"নবম দৃশ্য"

দৃশ্যে- যদুনাথ , দয়াময়, হাণ্ডিয়া

"জমিদারের কাচারী বাড়ী।"

"নায়েব দয়াময় ব্যানার্জী ও তহশিলদার যদুনাথের প্রবেশ"

দয়াময় ঃ যদুনাথ দেশের খবর কিছু জানো?

যদুনাথ ঃ না হুজুর। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকি ওসব খবর নেবার ফুসুরত কই?

দয়াময় ঃ জানো? ব্রিটীশ রাজের গদি আজ টলো-মলো। যে কোন মুহুর্তে তাকে ভারত ছেড়ে পালাতে হবে। রেঙ্গুন থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দু ফৌজ ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে। এদিকে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারত বাসী স্বাধীনতা আন্দোলনে মেতে উঠেছে। ব্রিটীশ রাজ আজ কোন ঠাসা। তাকে ভারত ছাড়তেই হবে। ভারত বাসী স্বরাজ গঠন করবে। ব্রিটীশ রাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী, জোতদারী প্রথাও ধ্বংশ হবে। প্রজারা জমিদারী জোতদারী উচ্ছেদ চায়। "ভারত ছাড়" শ্লোগান আজ পথে পথে আঃ হাঃ হাঃ হাঃ (হাসি) প্রজারা স্বপ্ন দেখছে তাই না যদুনাথ। এত বড়ো স্পর্ধা তাদের। ঐ নেংঠি পরা কৃষক মানুষ গুলোর মধ্যে এমন কি শক্তি লুকিয়ে আছে। তুমি বলতে পারো। তারা কিনা জমিদারী, জোতদারী, মজুতদারী, ধ্বংশ করবে। ব্রিটীশ রাজকে করবে ভারত থেকে বিতারিত। স্বপ্ন সব স্বপ্ন।

যদুনাথ ঃ নেংঠি পরা লোকেরা ঠিকই করছে হুজুর। শাষন এবং শোষনের জ্বালায় যে, তারা যে আজ দিশে হারা। তারা এর অবশান চায়। আর ব্রিটীশ ভারত থেকে চলে গেলে তো আমাদের ভালো হুজুর। ভারত স্বাধীন হবে। ভারত বাসী স্বাধীনতা পাবে। বিদেশী শাষন থেকে মুক্তি আমরা সবাই চাই। তখন দেশের লোক দেশ শাসন করবে। খুবই ভালো হবে হুজুর।

দয়াময় ঃ কি বলছ যদুনাথ। ভারত স্বাধীন হবে। ভারত স্বাধীনতা পাবে। ভারত বাসী দেশ চালনা করবে। তাতে কি তুমি মনে করেছ ব্রিটীশ দেশ থেকে চলে গেছে ব্রিটীশের আইন ভারত থেকে উঠে যাবে। তখন দেখবে ভারতীয়রাই নকল ব্রিটীশ সেজে ব্রিটীশের তৈরী আইনে দেশ শাষন করবে। তাতে তোমার আমার কাচাকলা হবে।

যদুনাথ ঃ তা হলেও ভারত বাসীই দেশ শাষন করবে হুজুর।

দয়াময় ঃ তুমি যা ভাবছ সে তোমার গুরে বালি যদুনাথ সে তোমার গুরে বালি, তখন বুঝতে পারবে নকল ব্রিটীশের ঠেলা। এ ভবিষ্যৎ বানী তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।

"এই সময় হাপাতে হাপাতে হাণ্ডিয়া মাহাজুনের প্রবেশ"

হাণ্ডিয়া ঃ হামাক বাঁচান বাবু। হামাক বাঁচান। হামার সব সর্বনাশ করি দিলে। হামার ধানের পুলা আধিয়ারলা ভাঙ্গি নিগাল বাবু। সব ধান মোর লুট কলে। শত শত মানুষ নাঠি, তির-ধনদুক আর ডুকডুগি বাজাই....তমার। দোহাই ইয়ার একট ব্যবস্থা করেন বাবু। আধিয়ারলা ফসলের তে-ভাগা চায়।

দয়াময় ঃ কি সর্বনাস। আধিয়ার করছে ফসলের "তে-ভাগার দাবী" বেটারা উশকানীতে এই সব করছে। এই সব করছে। এই দাবী তাদের নায্য নয়। পুলিশ দিয়ে বেটাদের ঠেঙ্গাতে হবে। লাঠি চালাও, গুলি চালাও। সব নিমক হারামের দল। বেইমান সব বেইমান।

"ভিতর থেকে শ্লোগান শুনা যাবে"

ব্রিটীশ তুমি দূর হটো, জমিদারী জোতদারী ধ্বংশ হোক। ভারত ভাগ চলবে না। আধি জমির সত্ব দিতে হবে। লাঙ্গল যার জমি তার। কৃষক তমরা জোট বাঁধো তৈরী হও। আধিয়ার নিজ খোলানে ফসল তুলো। তে-ভাগা চাই, তে-ভাগা চাই।

হাণ্ডিয়া ঃ শুনা পাচ্ছেন হুজুর। ঐ শ্লোগান চলেছে। গাও গেরাম তোলপাল। সর্বনাস মোর সব শেষ।

দয়াময় ঃ হ্যা শুনতে পাচ্ছি। হাজার লোকের শ্লোগান। হাণ্ডিয়া মণ্ডল কারা কারা এই "তে-ভাগার" আন্দোলন করছে। বলতে পার তাদের নাম ধাম বল। দিনাজপুর কোর্টে তাদের নামে ধান লুটের মামলা দায়ের করতে হবে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ কেম্প বসাতে হবে। জমিদারী, জোতদারী এবং ব্রিটীশ রাজ যে করেই হোক রক্ষা আমাদের করতেই হবে।

হাণ্ডিয়া ঃ নিখি ন হুজুর। এই আন্দোলনের নেতা কঠাল বাড়ীর কালুয়া দেবশর্ম্মা, উদাসু, ভুজু, মানিকোরের সদাই, মটর কবিরাজ। দেউলের মতম প্রধান, বসন্ত, নাভোরের গেড়ে মুর্মু। সরলার ক্ষেত্র মহন, বলরাম পুরের লক্ষন দেবশর্মা আরো অনেকেই আছে বাবু।

দয়াময় ঃ চলো, চলো আর বসে থাকলে চলবে না। যে কোরেই হোক ওদের ঠেকাতেই হবে। কালই ওদের নামে ধান লুটের মামলা দায়ের হবে। বেটাদের জেলে পচাতে হবে। তা হলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল। জমিদারী, জোতদারী বাঁচাতে হবে। বাঁচাতেই হবে।

"দশম দৃশ্য"

দৃশ্যে- বুলো, নালু সিং, ভজন লাল।

উদাসুর বারি। সময় সান্ধ বেলা। সইন্ধ্যা বাতি নি বুলো ঠাকুরের সইন্ধ্যা আরতি করবে।

বুলো : উলু-লুই। উলু-লুই। উলু-লুই। (শংখ বাজাবে)

এই সময় দুই পুলিশের প্রবেশ—

নালু : ভজন লাল এই ভাঙ্গা বারিটায়—উদাসুর থাকিবার ঘর।

ভজন : কই উদাসু, বারি আছ নাকি—উদাসু বাড়ীতে আছো।

বুলো : কে তমরা বাবু। পু-লি-শ। না বাবু মোর বাপ বারিত নাই ছে। মাহাজুনের বারি খাটিবা গেলে। এলাও আসে নি। বস বাবু বস।

নালু : আমরা বসতে আসিনি। তোমার বাবাকে ধরতে এসেছি। কি বললে উদাসু জন খাটি এখনও বাড়ীতে আসেনি। তুমি জাননা কোথায় গেছে। বল চট পট বল। কোথায় গেছে।

বুলো : না বাবু কুঠিনা গেলে মুই জানুং নি।

নালু : বড় শিকারী মেয়ে। সব জানে কিন্তু বলবেনা। ভজন লাল কিছু উত্তম মধ্যম দরকার। না হলে কিছু বেরোবেনা।

বুলো : না বাবু কুঠিনা গেলে ছেচায় মুই জানুং নি।

ভজন : তুমি ঠিক বলছ জাননা। বলো না হলে এই লাঠি দিয়ে তোমার গায়ের চাম তুলে নেব। সত্যি কথা বলো, বলো না হলে দেখেছ। জানো? তোমার বাবার নামে ধান লুঠের নালিশ আছে। তাই তোমার বাবাকে ধরে জেলে পুরব।

বুলো : মোক মারেন না বাবু মোক মারেন না। তমার মুই পাও ধরুং। তোর মুই পাও ধরুং। হায় ভগবান মোর কি হবে।

ভজন : তা হলে বলো। সত্যি কথা। তোমার বাবা কোথায়।

বুলো : কহচুং বাবু কহচুং। সত্যি বাবু মুই জানুং নি।

ভজন : আবার মিথ্যা কথা। (মার দিবে) কি বলবে না।

বুলো : কহচুং বাবু কহচুং মুবা মুবা গেলে মিটিং করিবা।

ভজন : এই কথা বললেই হয়। আহা বড় লেগেছে। উঠ, উঠ তোমার নাম কি।

বুলো : খবরদার বাবু। মোর গতর ছুইবেন না। তমার ঘরের সরম নাই। দেখিয়ান।

ভজন : এত বড় স্পর্দা। গায়ের সামান্য দিন মজুরের মেয়ে আমাদের হিম্মদ দেখতে চায়। চল চল। যত সব। "প্রস্থান"

বুলো : হায় ভগবান কি করি মোর দিন কাটিবে।

গাউন : ও কি ও মোর

পরা কপাল রে
মোর কি-রে মরন
হবে না দুনিয়ায়?
ওনা মা মইল মোর
ছট থাকি
বাপক নিগাবে জেলত ধরি
মোর মতন জনম দুঃখিনি
আর নাই রে এই ধরায়।
মাহাজুন আসে পুলিস আসে
করে অত্যাচার
সর্ব হারা গরীব দুঃখীর তানে
এমার কে করিবে বিচার।

"একাদশ দৃশ্য"

দৃশ্যে- উদাসু, ভুজু, কালুয়া, ফুলন।

উদাসু ঃ কমরেড কঠিন বিপদ। বনে জঙ্গলে নুকাই নুকাই আর কত দিন কাটবে বারি বারি বেটি ছুয়ার উপর পুলিশের জুলুম। এখুন কি করা যায় কমরেড। দিনাজপুর কোর্টে হামার বিরুদ্ধে ধান লুটের নালিশ। হামাক জেলত ভরার জন্য ডহরোল বসিলে পুলিশ কেম্প। দারুণ অনাচার অত্যাচার। ব্রিটীশ জমিদার, জোতদার, মাহাজুন সবাই এক ভিতি। এখুন উপায় কি?

ভুজু ঃ এলা ভাঙ্গি পরিলে হবেনি কমরেড। হামার জয় হবেই হামি খবর পানু রংপুর, ঠাকুর গা, চিনির বন্দর, মালদহ, আন্দোলন চলছে। পশ্চিম দিনাজপুর বালুঘাট খাঁ-পুরে ফসলের তে-ভাগার দাবীতে আধিয়ার পুলিশের কঠিন নারেঙ্গ লাগিয়া। পুলিশের বন্দুকের গুলিতে অনেক আধিয়ার জীবন দিলে। দরকার হলে হামাক জীবনটা দিবা হবে।

"দৌরিতে দৌরিতে ফুলনের প্রবেশ"

ফুলন ঃ দরকার হইলে বেছুয়ালাও বুক পাতি দিম কমরেড। সবাই জানোক, দেখোক দাবি আদায় করিবা তাংনে মরনক হামরা ভয় করিনি।

কালুয়া ঃ হামরা নিরুপায়। তার চেয়ে একট কাম করি কমরেড। কাইল থাকি হামরা সবাই আইনের ঘরে নিজা নিজি ধরা দি। গভর্মেনটের ঘরত এই নালিশট করা দরকার। হামরা যতলা আধিয়ার

ছি সবাই কাইল থাকি ডহরেল পুলিশ কেম্পে ধরা দি। কাইল থাকি জেল ভর আন্দোলন শুরু করি।

ভুজু ঃ এই সিদ্ধান্ত ঠিক কমরেড। কাইল থাকি শ্লোগান তুলি।

"সবাই এক সঙ্গে"

ব্রিটীশ তুমি দূর হটোর দাবীতে জেল ভরো, জেল ভরো ভারত স্বাধীনতার দাবীতে জেল ভরো, জেল ভরো ভারত ভাগ চলবে নার দাবীতে জেল ভরো, জেল ভরো জমিদারী জোতদারী ধ্বংশের দাবীতে জেল ভরো, জেল ভরো আধি জমির সত্বের দাবীতে জেল ভরো, জেল ভরো লাঙ্গল যার জমি তার দাবীতে জেল ভরো ফসলের তে-ভাগার দাবীতে জেল ভরো, জেল ভরো।

"দুনিয়ার আধিয়ার এক হও"

এই সময় বসন্ত চাট্টার্জীর প্রবেশ"

বসন্ত ঃ কমরেড তোমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আর বনে জঙ্গলে না ঘুরে তোমরা নিজে ধরা দিয়ে জেল ভরো। গ্রামের সাধারণ মানুষ কৃষক, দিন মুজুর, ক্ষেত মজুর তাদের ন্যায্য বাঁচার দারী নিয়ে আন্দোলন করতে পারে? দাবী আদায় করতে পারে? দেশের শিক্ষিত, চালাক, চতুর লোকেরাজানুক। শাষন শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই করার এই একমাত্র পথ।

কালের গতি কাউকে ক্ষমা করবেনা। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণ অক্ষরে লেখা থাকবে তোমাদের এই মুক্তির লড়াই। আর ইতিহাস ধিককার দিবে তাদের যারা এতদিন সমাজের উচুস্তর থেকে গ্রামের সোজা, সরল, কৃষক, ক্ষেত মজুরদের উপর জুলুম বাজি, অমানষিক অত্যাচার করেছে। জেল ভরো আন্দোলন আজ থেকে পথে, ঘাটে ঘাটে, হাটে, বাজারে ছড়িয়ে দাও।

"শ্লোগান সবাই এক সঙ্গে"

ব্রিটীশ তুমি দূর হটো, দূর হটো। জমিদারী জোতদারী ধ্বংশ হোক, ধ্বংশ হোক। শাষন শোষন বন্ধ কর। স্বরাজ আমাদের দিতে হবে। ভারত ভাগ চলবে না চলবে না। আধিয়ার তোমরা জেল চল জেল ভরো। আধি জমির সত্ব দিতে হবে। দিতে হবে। তে-ভাগা চাই তে-ভাগা চাই।

"ভিতর থাকি ঘোষনা হবে"

আধিয়ার বিদ্রোহ 'তে-ভাগা' আন্দোলন মূলত আধি ফসলের তে-ভাগা নিয়ে হলেও তা ছিল ধাপে ধাপে গা এর মাহাজুন, জোতদার, জমিদার ও ব্রিটীশের শাষন শোষনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই। ভারতের স্বাধীনতার লড়াই গ্রামে-গঞ্জে, পথে-ঘাটে, টাউন-বন্দরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সাধারন মানুষ স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ল। জীবন দিল।

"আমরা স্বাধীনতা পেলাম"

"এক সঙ্গে জয়ের গান"

হামরা করিয়াই জয়- হামরা করিয়াই জয়

আধিয়ার আর-দিন মজুর-হামরা করিয়াই জয়

তে-ভাগা আর আধি সত্ব-হামরা করিয়াই জয়

জমিদার, জোতদার ধ্বংস হল

ভারত ছাড়ে ইংরাজ রাজ

হামরা করিয়াই জয়

হামরা করিয়াই জয়

আধিয়ারের জয়-দিন মজুরের জয়

জয়-জয়-জয়

সংগ্রহসূত্র ঃ শ্রী খুশী সরকারের খন 'তে-ভাগা'
(২০০৩) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

খন গান

সুখ ও শান্তির কথা

চরিত্র —

পুরুষ -	শশধর - কৃষক	মহিলা -	শান্তিদিদি - স্বাস্থ্যকর্মী
	বলাই - গায়ের ছেলে		কামনা - শশধরের বৌ
	অনন্ত - মাহাত (ওঝা)		পুতল - শশধরের মেয়ে
	ফুলধর - গায়ের ঘটক (কারুয়া)		

গাউন ঃ শুনেন শুনেন ভাই দশজনা (গাউনের তালে তালে নাচ হবে)

অজানা আর থাকিবে না কেউ

আনিবেন চেতনা।

সবার চেতনা হলে পরে

সুখ শান্তি হবে ঘরে ঘরে

সুখ শান্তির জন্য আমরা করি কামনা

শুনেন ....

............আনিবেন চেতনা।

অপুষ্টিতে ভুগলে শিশু

ডাইরিয়াতে যায় যে মরে

পুয়াতির না যত্ন নিলে যায় যমের ঘরে

শুনেন ...:...........................চেতনা।

স্বাস্থ্য বিধান মানিয়া চলিলে

রোগ ব্যাধি হয় না তাতে

ঘরে ঘরে রবে সবাই সুখ শান্তিতে

শুনেন শুনেন ভাই দশজনা

অজানা আর থাকিবে না কেউ

আনিবেন চেতনা।

প্রথম দৃশ্য

(দৃশ্যে শান্তি ও জলধর)

শান্তি ঃ মোর নাম শান্তি। গাও-এর সবাই মোক চিনে। সাব-সেন্টারে মুই কাম করুং। কেহ মোক ডাকে শান্তি দি করি, কেহ ডাকে শান্তি পিসি-মাসি করি। আর কি কহিবেন হামরা স্বাস্থ্যকর্মীলা গাও গাও ঘুরি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করি। তাহাও গাও-এর মানুষলাক বুঝাবা পারননি। অমরা ঝারফুক মাহাতালি এইলা নি করি থাকে। এর জন্য দায়ি অশিক্ষা-কুশিক্ষা। পেটোত বিদ্যা না থাকিলে যা অবস্থা হয়। অশিক্ষার জন্য মেয়েলার ক্ষতি হচে বেশি। পুতুল নামে একটা মেয়ের গলফ শুনিলেই সব বুঝিবা পারিবেন। পুতুল যখন ছোট কলাত তখন থাকি পুতুলের বাপের সঙ্গে মোর পরিচয়।

(এই সময় পুতুলের বাবা শশধরের প্রবেশ)

শশধর ঃ এই হইল। ঐ তো শান্তি দি। যেঠিনা বাঘের ভয় সেটিনা বলে রাত্রি হয়। যদি খালি জানিবা পারে মুই অনন্ত মাহাতের ঠিনা জলপরা আনিবা যাছুং। কলার ছুয়াট পুতুল দিন দিন কেনং হই যাহা শুকাই বাত বাত। ঝার-ফুক, গ্রাম ঠাকুর, কালি ঠাকুরে কত মানতি, কতলা ঠাকুরের তাবিজ পরানু তাহাও ছুয়াট ভাল হচেনি। যাবা হবে অনন্ত মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা। অনন্তদার জলপরায় নাকি ভুত পেরত সব পালায়। কিন্তু কি মুশকিল এলায় মোক দেখা পাবে শান্তি দি। চেকেট-ভেকেট করি সব কিছু শুনি নিবে।

শান্তি ঃ শশধর দা নাকি — এত সাকালে কোনঠি যাহিস।

শশধর ঃ এই দেখা পালে এলায় ফেচের ফেচের শুরু করি দিবে। হাতের গিলাসট দেখা পাইলে আর কথা নাই, সব শুনিবে তে ছাড়িবে। না গিলাসট নুকাই থুং। কেই শান্তি দি।

শান্তি ঃ এত সাকালে গম গম করি কুন্না যাহিস।

শশধর ঃ মোর সময় নাই শান্তি দি, অন্য দিন কহিম।

শান্তি ঃ কি যেন নুকালু শশধর দা।

শশধর ঃ না-না কিছু নাহায় একটা গিলাস।

শান্তি ঃ কি হবে?

শশধর ঃ কহচুং তো অন্যদিন কহিম। আইজ মোর সময় নাই, টপ করি বাড়ি ফিরবা হবে।

শান্তি ঃ তোর বাড়িত কিছু হইলে শশধর দা।

শশধর ঃ হইলে নিতে কি। ঐ কলার ছুয়াটার অসুখ। খালি কান্দে আর কিছু খাবা চাহেনি, ঐ তাংনে মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা যাছুং। পারার মানুষলা কহচে ভুত ধরিয়া বাতাস ঠেকিয়া জলপরা, তেলপরা দিলেই ভাল হই যাবে।

শান্তি ঃ তমাক আর কত বুঝাব শশধর দা। তোক আর জলপরা আনিবা যাবা হবা নহ্য। মোর ঠিনা ওষুধ ছে—চল ছুয়াটাক ডাক্তারের ঠিনা নিগাই। ডাক্তারের ওষুধ খাইলেই ভাল হই যাবে। এত দিন হইল ছুয়াটাক সাব-সেন্টারত পাঠালু নি ইনজেকশান দিবা।

শশধর ঃ বহিন ঐলা কামা সর্বনাশ। ছুয়ার ইনজেকশন মোক খুবেই ভয় নাগে। বহিন তোর দোহাই নাগে— ছুয়াটাক ইনজেকশন দি ওষুধ দিস না। মুই গেনু মাহাতের বাড়ি জলপরা আনিবা।

(প্রস্থান)

শান্তি ঃ এই মানুষলাক আর বুঝা গেলনি। কত আর বুঝা যাবে অশিক্ষার জইন্য ঝার-ফুক, মাহাতালি এইলা নিয়েই থাকবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শশধরের বাড়ি

[কামনা ছুয়াক তেল দিবে। উঠি উঠি ভাত আনধিবে ধয়ায় চোখ জ্বলিবে।]

দৃশ্যে কামনা, শান্তি ও শশধর

কামনা ঃ (ছুয়ার কান্দুন-কাহা-কাহা) ও-রে, ও রে মোর মা মোর, নাই কান্দে গে-ও-ও-ও মা-মা। (শান্তির প্রবেশ)

শান্তি ঃ বাড়িত ছিস বৌদি, বৌদি।

কামনা ঃ কেই গে, শান্তি দিদি আয় আয়। এই তো ভাই ছুয়াটাক তেল বুলাই দুহুং। বেটি গে বেটি। নাম থুইয়াই পুতুল।

শান্তি ঃ দেখুং দেখুং ছুয়াট কেনং হইলে। ছুয়াটার ফের নাম লিখিয়ান দিদি জন্ম সার্টিফিকেটের তাংনি। জন্ম সার্টিফিকেট না হইলে ছুয়াট অনেক সুযোগ সুবিধা পাবা নাহ্য। রেশন কার্ড হবা পাহ্য, ইসকুলত ভর্তি হবা পাহ্য।

কামনা ঃ পুতুলের বাবা গেল তো নাম লিখিবা প্রধান অপিশত, নেখি দিয়া।

শান্তি ঃ ভাল করিয়ান। এহে ছুয়াটার যে অবস্থা। দেহটাট একদম মাংস নাই।

কামনা ঃ কি কহিবু দিদি, ভাল রকম বুকের দুধ হচেনি। ভাল-মন্দ যে খিলাবু পাইসা কড়ি নাই।

শান্তি ঃ বৌদি ভাল-মন্দ তোর বাড়িতেই ছে। পেট ভরাই ভাত-রুটি তারপর শাক-পাতা, ডাইল এইলাতে ভাল ভিটামিন ছে। এইলা পেট ভরাই খিলালেই ছুয়াট তোর ভাল হই যাবে। আর ধুয়াহীন চুল্লি-তিয়ারি করিবু চোখত ধুয়া ধরিবানা, চোখ ভাল থাকবে।

কামনা ঃ সবাই কহছে, বাতাস টেকিয়া ভুত ধরিয়া। তুই কহচিস শাক পাতা, ডাইল খিলালেই ভাল হবে।

শান্তি ঃ খাওয়ার অভাবে ছুয়াট তোর এনং হইলে। শাক-সবজি, ডাইল সিদ্ধ করি খিচরি করিবু। আর পেট ভরাই খিলাবু। আব সাব-সেন্টারত যাই টিকা নিবু, পোলিও খিলাবু। দেখবু ছুয়াট তোর টনটনা হই যাবে। (প্রস্থান)

কামনা ঃ তুই মোক ভাল বুদ্ধি দিলু দিদি।

(এই সময় জলপরা ধরি শশধরের প্রবেশ)

শশধর ঃ এই নে কামনা জলপরা। মাহাত কহিলে, এই জলপরাতে ভুত-পেরত যা ধরিয়া সব পালাই যাবে। ভাল করি ছুয়াটার গতরটাত বুলাই দে। আর এই ধূলপরা গতরটাত ভাল করি ছিটাই দিবু।

কামনা ঃ জলপরা-ধূলপরা ঐলা কিছুই নাগিবা নাহা। সাব-সেন্টারের শান্তি দি আসিন্ন, কহিলে খাওয়ার অভাবে ছুয়াট এনং হইলে। পতিদিন শাক-সবজি, ডাইল খিচরি আন্ধি পেট ভরাই খিলাবা কহিলে।

শশধর ঃ এতলা জড়ি পটি তাবিজ কিছুই কাম কলেনি। আর শাক-সবজি খিচুরি খিলাইলেই হবে।

কামনা ঃ হবে মোক কহি গেল। আর সাব-সেন্টারত যাই ইনজেকশন নিবা কহিলে।

শশধর ঃ ঠিক ছে শান্তি দির কাথায় ধরেক, যদি ছুয়ার কিছু হয় দেখা পাবু। (প্রস্থান)

কামনা ঃ কতদিন কহচুং মাহাতালি তো অনেক কলেন, এলা ডাক্তার দেখাও। বলে সময় নাই। না মুই আর দেরি করিমনি। শান্তিদির কাথা মতন ডাক্তারের পরামর্শ নিম। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য (পথ)

(দৃশ্যে বলাই, পুতুল, শান্তি)

বলাই ঃ মোর অনেক দিনের ইচ্ছা পুতুলের সঙ্গে কাথা কহুং। কিন্তু পুতুল মোক পাত্তায় দেয়নি। ঐ তো পুতুল বই ধরি ইসকুলে যাহা।

(হাতে বই নিয়া পুতুলের প্রবেশ)

পুতুল ঃ পথত বলাই দা দাড়াই ছে, এলায় মোক ডাকিবে।

বলাই ঃ ঐ পুতুল শুন শুন। মোর একট কাথা শুনি যা।

পুতুল ঃ কি কাথা বলাই দা, মোর ইসকুলের বেলা হচে।

বলাই ঃ কাথা হচে কি — (গাউন)

মোর মনে তার নাম লেখা

তোর মনে মোর নাম

তোর সঙ্গে প্রেম করিতে

পুতুল চাহেছে মোর প্রান

ওকি ও পুতুল রে —

তোর বুকে ফুটা ফুল

মুই হনুরে ভমরা

তোর ঐ ফুটা ফুলের মধু খাইতে

মোর মন হয়েছে চঞ্চলা।

শান্তি ঃ বাঃ বাঃ। পুতুল আর বলাই না বেশ প্রেম জমিয়া। (দেখি চলি যাবে)

পুতুল ঃ ঐলা সরমের কাথা কহিস না বলাই দা। মানুষ দেখি ফেলাইলে কলঙ্ক উঠিবে— মুই চলিনু।

বলাই ঃ যা পুতুল, মোর কাথা মনে থুইস। তোক খুবেই মোক ভাল নাগে। তোক মুই ভালবাসু।

চতুর্থ দৃশ্য

(শশধরের বাড়ি)

(দৃশ্যে পুতুল ও শশধর)

পুতুল ঃ (বই নিয়ে পড়তে বসবে ও ঘুমোবে)

শশধর ঃ পুতুল, পুতুল, এই পুতুল। এই মা-বেটির বড় দোষ। বাড়ি-ঘর হা করি ফেলাই থুই কুন্না যে যায় কে জানে। মেয়েটার ভারি দোষ, যেঠিনা সেঠিনা মানুষের সঙ্গে গলফো করিবে। যারে তারে আরিত করিবে। গলফো শুনিবে। মা-বেটি কাহার বাড়ি যাই যে গলফো করেছে কে জানে। পুতুল, পুতুল, এই পুতুল।

পুতুল ঃ (এই সময় পুতুল টের পেয়ে হেসে ফেলবে।) বাবা, তুই মোক ডাকিহিস। মুই পড়িবা বসিয়াউ বাবা। পড়িবা বসি মাথাট মোর ঘুরেছে— দুর্বল নাগেহে।

শশধর ঃ পড়িবা বসিয়াইস বেটি। পোড় পোড় ভাল করি পোড় তোক মেট্রিক পাশ করিবায় হবে।

পুতুল ঃ মাথাট মোর ঘুরেছে বাবা। (গাউন)

পড়িবা বসিলে বাবা মোর

ঘুরেছে মাথাটা

দুর্বল নাগেহে মোক

পড়িবায় মেনায় না।

বাংলা-ইংরাজি অঙ্ক ভুগোল

নাগেহে মোক গণ্ডগোল

এত কঠিন পড়ালা বাবা গে

মাথাতে মোর ঢুকে না।

শশধর ঃ তোক দুর্বল নাগে হে বেটি। তুই শান্তি পিসির সঙ্গে দেখা করিস তো। তোক দেখা করিবা কয়হা।

পুতুল ঃ মুই এলায় যাউ বাবা। শান্তি পিসি মোক ডাকিয়া শান্তি পিসির উপদেশলা মোক খুবেই ভাল লাগে। মুই তাইলে যাউ বাবা।

শশধর ঃ না, না খালি পেটে যাইস না মা। কিছু খাই যা।

পুতুল ঃ পিসির সঙ্গে দেখা করি আসি খাইলে হবা নাহা বাবা।

শশধর ঃ এমনি তো তোর মাথা ঘুরেহে। এই সময় খালি পেটে থাকা ঠিক না হায়। খালি পেটে থাকিলে অনেক রোগ শরিলে আক্রমণ করে। পেট ভরাই— খাই দাই তারপর যা।

পুতুল ঃ ঠিক ছে বাবা, কিছু খাই-দাই তারপর যাম। শান্তি পিসি মোক এত ভালবাসে।

শশধর ঃ চল মা পুতুল। তোর মাক তোক খাবা দিবা কহুং।

পঞ্চম দৃশ্য

(সাব-সেন্টার শান্তির অপিস)

(দৃশ্যে শান্তি ও পুতুল)

শান্তি ঃ অশিক্ষার জন্য গা-এর নোকলাক আর কত বুঝা যাবে। তবে অনেক নোক ভাল করি বুঝিয়া, অনেকে বুঝিবা চাহেনি।

(পুতুলের প্রবেশ)

পুতুল ঃ পিসি, পিসি তুই মোক ডাকিয়াইস পিসি। বাবা কহিলো।

শান্তি ঃ কে পুতুল। আয় আয়। হে হে ডাকিয়াউ। তোর সঙ্গে মোর অনেক গলফ ছে।

পুতুল ঃ কি গলফ পিসি।

শান্তি ঃ দেখেহ তোর এলা অনেক বন্ধু জুটিয়া। সিনেমা, ভিডিও দেখিস।

পুতুল ঃ দেখুং মাঝে মধ্যে।

শান্তি ঃ কাজল, বকুল তোর বন্ধু নারে পুতুল।

পুতুল ঃ হে মোর বন্ধু।

শান্তি ঃ আর বলাই তোর কেনং বন্ধু।

পুতুল ঃ (লজ্জা করে) বলাই মোর কেনে বন্ধু হবে পিসি। বলাই মোর দাদা। মোর চাইতে অনেক বড়।

শান্তি ঃ সরমের কিছু না হায়, একসময় সবাই বন্ধু হয়। যেনং মুইহ তোর বন্ধু।

পুতুল ঃ তুই মোর পিসি। তবে বন্ধু মতন কাথা কহিস।

শান্তি ঃ এই বয়সে খুবই সাবধান করি চলিবা হবে পুতুল। পা পিছিলে জীবন নষ্ট হই যাবে। এই সময় দেহে মনে অনেক পরিবর্তন হবে। মাসে মাসে মাসিক হবে, দেহের অনেক রক্ত বাহির হই যাবে। ভয়ের কোন কারন নাই।

পুতুল ঃ তুই যে কি কহচিস পিসি সরমের কাথা। একদম সরম করিস নি।

শান্তি ঃ সরম করিলে হবে পুতুল। এইলা উপদেশ ভাল করি শুনিস। তাইলে তোর মাসিক হইলে পুতুল।

পুতুল ঃ হে পিসি। একদিন তো গপগপ করি অনেকলা রক্ত বাহির হই গেল। মোর কি ভয়। মা কহিলে কোন ভয় নাই। বয়স হইলে নাকি এনং হয়।

শান্তি ঃ হে কোন ভয় নাই। এই সময় পরিষ্কার থাকিবা হয়। আর ভাল নেকরা নিবা হয়। পুকুরে সিনান করিবা হয়নি। মেয়ে মানুষের এইটয় আসল জিনিস মা হবার জন্য।

পুতুল ঃ পিসি মোক খুবেই দুর্বল নাগেছে। ইসকুল থাকি এইলা বড়ি খাবা দিয়া। দুর্বলট কাটিবার তাংনি।

শান্তি ঃ দেখু দেখু। হে তোক ভাল বড়ি দিয়া। আয়রন ভিটামিন বড়ি। এইলা বড়ি খাইলেই তোর দুর্বলতা কাটি যাবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ফুলধর ঘটকের বাড়ি

(দৃশ্যে শশধর ও ফুলধর)

শশধর ঃ হাটতে হাটতে ফুলধর ঘটকের বাড়ি চলি আসিনু। বেটি বড় হই গেলে পাত্র দরকার, এখুন থাকি চেষ্টা করিবা হবে। ডাকু তো ফুলধর দা বাড়িত ছে না নিহি। ফুলধর দা— ফুলধর দা।

ফুলধর ঃ কে ও শশধর দা, আয়, আয়। তে হঠাৎ করি কি খবর।

শশধর ঃ হে ঘটক দা, তোর ঠিনা আসিনু একট পাত্রের খবর নিবা। তুই এলাকার নাম করা ঘটক। মোক যে একট পাত্র যোগাড় করি দিবা হবে। মোর বেটি পুতুলের জন্য।

ফুলধর ঃ তোর বেটি পুতুল। হে মোর তো ঐলায় কাম। তে পুতুলের বয়স কত।

শশধর ঃ এই কত হবে ১৫-১৬ বছর।

ফুলধর ঃ সর্বনাশ এত ছোট। তুই বেটি বেহাই জেল খাটিবু। আর মহ ঘটকালি করি জেল খাটিম।

শশধর ঃ কি কহচিস ঘটক দা। মোর বেটির সম্বন্ধে তুই ইলা কি কহচিস। জেল খাটা তার মানে মুই কিছুই বুঝিবা পারিনুনি।

ফুলধর ঃ সরকারের আইন ১৮ বছরের নিচে মেয়ের বেহা আর ২১ বছরের নিচে ছেলে বেহা দুইটায় আইনত অপরাধ। সরকার জানিবা পারিলে বাপ-মায়ের, ঘটকের সবারে জেল হবে।

শশধর ঃ আইন হইলে। মেয়ের ১৮ আর ছেলের ২১ বছরের নিচে বেহা দুয়া যাবা নাহা। সরকারের আইন তো মানিবায় হবে।

ফুলধর ঃ কাঁচা বয়সে বেহা দিলে অনেক অসুক হবা পারে। যেনং কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরে।

শশধর ঃ তুই ভাল উপদেশ দিলু ঘটক দা। মুই চলিনু।

সপ্তম দৃশ্য

শান্তির অপিস

দৃশ্যে শান্তি, পুতুল ও বলাই

শান্তি ঃ আজ কয় বছর হই গেল পুতুলের বেহা হই গেলে। কোন খবর পাল যায়নি। মেয়েটার তাংনি মনট খারাপ করে। ছোট থাকি উয়ার শরিরট তৈরি হয়নি।

(এই সময় পুতুলের প্রবেশ)

পুতুল ঃ পিসি, পিসি তুই অপিসত ছিস পিসি।

শান্তি ঃ কে পুতুল। তোর কাথা চিন্তা করিহিনু। দেখতে দেখতে বড় হই গেলু, বেহাও হইল। বেহার পর তোর সঙ্গে আর দেখা নাই। কেনং ছিস পুতুল। ছুয়া-পুয়া কয়টা। আর তোর শরীরের অবস্থা এনং কেনে রক্তশূন্য। কেনং হই গেলিস।

পুতুল ঃ মুই ভাল নাই পিসি। দেখাই তো পাহিস শরীরট কেনং হই গেলে। পিসি মোর পেটত বুঝি কিছু হইলে।

শান্তি ঃ তোর মাসিক ঠিক মতন হচে তো পুতুল।

পুতুল ঃ না পিসি, দু-মাস থাকি মাসিকট বন্ধ হইছে। কেনং খালি বমি বমি নাগেহে।

শান্তি ঃ তাইলে তো তোর পেটে ফের ছুয়া আসি গেলে। বর্তমানে তোর বাচ্চা-কাচ্চা কয়টা।

পুতুল ঃ দুইটা মেয়ে বর্তমান ছে। আর একটা নষ্ট হই গেলে।

শান্তি ঃ সর্বনাশ, এই বয়সে তিনটা বাচ্চার মা। তারপর গতরে আর একটো। শরীলত তো কিছু নাই রক্তশূন্য।

(ডাকতে ডাকতে বলাই-এর প্রবেশ)

বলাই ঃ পুতুল, পুতুল তুই এটিনা আসি বসিছিস। আর মুই খুজি বেরাহু। যতসব, পিসি হইল নষ্টের গড়া। কি সব উপদেশ দিহিস পিসি। পুতুলের মুখে খালি তোর কাথা—পিসি এই কহিলে, ঐ কহিলে। শুনি শুনি কান ঝালাপালা।

শান্তি ঃ তোর সংসারের ভালর জন্য ইলা কাথা কহচুং রে বলাই। আর তুই মোক খারাপ ভাবিস। তুই কি পুতুলক সত্যি সত্যি ভালবাসিস।

বলাই ঃ তার মানে কি পিসি। সবাই জানে মুই পুতুলক ভালবাসা করি বেহা করিয়াউ। তুই কহচিস ভালবাসুং নি। ঝগড়া নাগাবার চেষ্টা করিহিস। মোর প্রাণের চেয়ে পুতুলকে ভাল বাসুং।

শান্তি ঃ মিথ্যা কাথা। ভালবাসিলে পুতুলের এই অবস্থা করিস। পুতুলের চেহারাট একবার ভাল করি চাহি দেখিয়াই। কি হইলে পুতুলের অবস্থা। শরীরট তো একদম রক্ত নাই, মাংস নাই, তারপর পেটে বাচ্চা। এই বাচ্চার মা হইলে পুতুল আর বাঁচিবা নাহা।

বলাই ঃ কি কহচিস পিসি। তাইলে উপাই কি হবে।

শান্তি ঃ পুতুলের বাচ্চা নষ্ট করিবা হবে, তাইলেই রক্ষা। আর জমি থাকলে ফসল হবেই।

বলাই ঃ ঐ হামার গা-এর মাহাতোলা ছে; অমরা বাচ্চা নষ্ট করে তাইলে নষ্ট করি নিম।

শান্তি ঃ ফের ভুল করিস। মাহাতের দ্বারা পেট পারি পুতুলক কি মারিবু। ভাল ডাক্তারের দ্বারায় এই কাম করিবা হবে।

বলাই ঃ ঠিক ছে পিসি, তোর দোহাই নাগে এই কামট মোক করি দে।

(গাউন) অজানা আর অশিক্ষায়
সুখ নাই আজি হামার সংসারে
ভুলের মাশুল দিতে দিতে
যায় জীবন চলে
তাই গাও বাসি ভাই
গান গেয়ে শুনাই
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আচরণবিধি
আরও জানতে হবে শিখতে হবে
শিক্ষার নাইরে শেষ
ঘরে ঘরে আনিম হামরা
সুখ আর শান্তির দেশ।

সংগ্রহসূত্র ঃ খুশী সরকার (৫২), কুশমুণ্ডী,
দক্ষিণ দিনাজপুর তাং-২০.০৩.১০।

খন গান

কামেই মোর অধিকার

চরিত্র —

পুরুষ ঃ	পেলকা	মহিলা ঃ	অহিলা
	দিশারু		
	পাইকারু		
	ককর		

গাউন (গাউনের তালে তালে নাচ হোবে)

দেশে আইল রে কামের জোয়ার
খাটি খুয়া মানুষলার চিন্তা নাইরে আর
সবাইকে ১০০ দিনের কাম দিবে
হামার এই সরকার।

এই কাম পাইতে হইলে করিবা হবে জবকার্ড
বাড়িত ক্ষেতিত কাম করিম ২৬৫ দিন নিত্য দিন
১০০ দিনের কাম করিম সরকারের অধিন
দেশে আইলরে ....এই সরকার।

তাতে তিয়ার হবে গায়ের সম্পদ
রাস্তা-পুকুর জলাধার হবে হবে পতিত জমিত বাগান
এই কাম পাইতে ভাই
প্রধান অপিসত নেখাবা হবে নাম

দেশে আইল রে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টির জোয়ার
দিন আনা দিন খুয়া মানুষলার চিন্তা নাইরে আর
সবাইকে ১০০ দিনের কাম দিবে
হামার এই সরকার।

এইট মোর অধিকার এইট সব্বার অধিকার
খাটি খালে দুঃখ নাই হামার।

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্যে অহিলা ও পেলকা

অহিলা ঃ দিন গুজরান যে কি করি হোবে। মরদট উলা হুশ নাই। বাড়িত বসি বসি মোর অংঠি দেখেহে। কাম না যাই বাড়িত বসি ছে। বেভানে গাইট বান্ধিবা গেলে ত গেলেয় এলাঅ নাই।

পেলকা ঃ হেট— হেট চল, চল।

অহিলা ঃ হুই হুই গাইট না বান্ধিবা গেল্লেন। না বান্ধি বাড়িত নি আসিলেন। বাড়িত কি খাবে।

পেলকা ঃ হে রে অহিলা। গাইট বাড়িত আনিনু। গরুটাক খ্যাড় দে।

অহিলা ঃ পাথারটাত ঘাসলা দলদলাহা। না বান্ধি দি বাড়িটত আনিলেন খ্যাড় খিলাবা।

পেলকা ঃ কি বা রে দিন তো চলেনি, গাইট আইজকা বেচিবা নিগাম পতিরাজের হাটত।

অহিলা ঃ কম নি বড্ড কাথাটা কহচেন, মোর বেহার দানের গরুট তমাক বেচিবা দিম।

পেলকা ঃ গাইট মোর শ্বশুর মোক দান দিয়া। কহিলেই হোবে মোর গরু। মোর জিনিস বেচিম না থুম মুই জানিম।

অহিলা ঃ মোর গাই। গাইট বেচি সংসার চালাবেন। বাড়িত বসি বসি থাক। মানুষলা কামের তাংনি খিত-খিতাই বেড়াহা। আর তমরা ডিং ডিং করি শুতি শুতি দিন কাটেহেন। মাউগের কামাই খাহান।

পেলকা ঃ তোর কামাই খাহুং।

অহিলা ঃ খান নি। কেনং তমরা মরদ, মাউগটাক পাঠাহান মাহাজুনের বাড়ি কাম করিবা। মুই না খাটলে নহলা মাছের শুটকা হলেন।

পেলকা ঃ ঐ তাংনে গাইট বেচি বিদেশ খাটিবা যাম। তমার ফেকের ফেকের আর ভাল লাগেনি।

অহিলা ঃ আলসিয়া নোকলা তো বহুর বকন খাবেই। বহুর উপর আগ করি বিদেশ খাটিবা যাবেন। তাইলে মোর একট কাথা শুন —

গাউন ঃ স্বামী গাই গরু বেচিয়া খাইলে
সংসারে কি আটে
গাই-র দুধ বেচিলে, খাটিয়া খাইলে
স্বামী লক্ষী আসে ঘরে।
তিন সের করি দুধ হয় গাইটার
অভাবের দিনে সম্বল
সেই গাইট বেচিবেন তমরা

মোর চোখে আসেছে জল।

শুনা পালেন তমার মুই পা-অ ধরুং। বেহার দানের গরু বেচিবা হয়নি। ইলাতে সংসারের অমঙ্গল হয়। তমাক বিদেশ যাবা হবা নাহা। টুকরি কদাল ধরি পিত্যেক দিন মানুষলা কাম করিবা যাহা। প্রধান অপিসের কাম। মুই টুকরি কদাল খান আনি দিহুং, কাম করিবা যা-অ।

পেলকা ঃ মনে করিয়ানু গাইট বেচি বিদেশ খাটিবা যাম। মেলা নোক যাহা। যাইলে দেশট দেখা গেল হয়, টাকাও কামাই হল হয়।

অহিলা ঃ এই ধর টুকরি কদাল। গটাকায় চাউল ভাজা, গামছাখানত বান্ধি দিনু ভোগ নাগিলে খান। মুই বাড়ির কামলা করুং।

পেলকা ঃ কি করা যাবে কামত যাবায় হোবে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ — (একঝুন, দু-ঝন টুকরি কদাল ধরি কামত যাবে। পেলকা কদাল-টুকরি ধরি পথ বসি থাকবে।)

পেলকা ঃ ঐ দাদারা, ঐ ছওয়ালা তমরা কাম করিবা যাহান। তমার সঙ্গে মহ যাম।

ককর ঃ তহ হামার সঙ্গে কাম করিবা যাবু। তোর প্রধান আপিসত নাম নেখা ছে। জবকার্ড ছে।

পেলকা ঃ জবকার্ড! কি কহচেন মুই বুঝিবা পারুনি।

ককর ঃ বুঝিবা পারিস নি, কদাল টুকরি ধরি বসি থাক।

পেলকা ঃ ঐ ভাই দিশারু, শুন।

দিশারু ঃ কেই পেলকা দা।

পেলকা ঃ হে ভাই মুই।

দিশারু ঃ শুনেক পেলকা দা— বসিছিস টুকরি কদাল ধরি, তুই পেলকাদা কামে তো রে পাবুনা।

পেলকা ঃ ছোচায় ভাইরে তুই ঠিকেই কহচিস। মোর আগাদি দিরদির করি সবাই কামত যাহা। অমরা কহচে মোর বলে কাম হবা নাহা। মহ তো ভাই জনখাটা মানুষ, মোর কেনে কাম হবা নাহা। সবাই পুচেছে তোর জবকার্ড ছে। মুই তো কিছুই বুঝিবা পারুংনি। তারপর নাকি কামের তাংনি প্রধান অপিসত দরকাস্ত করিবা হোবে।

(গাউন) ও না বেভানতে বসিছুং ভাই

টুকরি কদাল ধরি

এলা বেলা হইল দুফর

এতট বেলা হইল

কেহ নাই কলে মোর খবর।

দিশারু ঃ শুনেক পেলকাদা— (গাউন)

মোর কাথাতে আগে প্রধান অপিসত যা

সেঠিনা করিবু নাম রেকর্ড

প্রধান তোক দিবে জবকার্ড

তাতে পাবু ১০০ দিনের কাম।

সময় মতন কামের তাংনি তোক আবেদন করিবা হোবে, তাইলেই কাম পাবু। শুনেক পেলকাদা— (গাউন) বসিছিস টুকরি কদাল ধরি

জবকার্ড না থাকিলে

কাম তো রে পাবুনা।

চল মোর সঙ্গে প্রধান অপিসত। প্রধান অপিসত মোর কাম ছে। মোর কামট হোবে। আর তোর জবকার্ডের ব্যবস্থাঅ করি দিম। চল, চল—আয়।

পেলকা ঃ তুই ভাই মোক ভাল বুদ্ধি দিলু। এনং করি তো মোক কেহ বুঝায় নি। মুই তো ইলা শুনুং সন্ধান কিছুই জানুংনি। চল, চল।

দিশারু ঃ দিন ভাই পালটি গেলে। নয়া দিনের নয়া খবর, তাল মিলাই চলিবা হোবে। চল।

পাইকারুঃ ঐ পেলকা, শুন—শুন দিশারু তোক কি দিশা দিলে।

পেলকা ঃ দিশারু মোক ভালায় দিশা দিলে।

পাইকারুঃ ভাল পথ দেখালে। অমার ছল-চাতুরি তুই কি বুঝিবু। হবে পুত্র কহিবে বাপ। প্যাট তাহায় মোর ভোকে শুকাক। তার চাইরতে মোর কাথা শুনেক চল দিল্লি খাটিবা। যেমন কাম তেমদি দাম। কচকচা টাকা। দেশঅ দেখিবু, বাড়িত টাকাঅ পাঠাবু।

পেলকা ঃ খবরট তো ভালয় দিলু। মেলা কাম মেলা দাম। মেলায় মানুষ দিল্লী খাটিবা যাহা। আচ্ছা দেখুং দিশারু যখুন একট দিশা দিলে। কাম না পাইলে দিল্লী যাবায় হোবে। যদি ফের এত্তিনায় কাম পাউঙ্গ, দিল্লী যাবায় কি দরকার।

তৃতীয় দৃশ্য

পেলকার বাড়ি

অহিলা ঃ ভেল্লা দিনতে প্রধান অপিসত ঘুরাঘুরি কলে। জব-কার্ডঅ প্রধানট দিয়া। বেলা শেষ এলাও তো আসিলনি। আইজ বুঝি কাম পায়হা, তাহায় ভাতের জল নকড়ি আনুং।

পেলকা ঃ অহিলা-অহিলা। তুই বাড়িতে ছিস।

অহিলা ঃ বাড়ি ছাড়ি যে ফের কুন্না যাউঙ্গ। বাড়ি ঘরের কামলায় করুহুং।

পেলকা ঃ কি জানি কাহার বাড়ি টিভি দেখিবা যাইস। আর চিন্তা নাই অহিলা। প্রধান অপিস থাকি ১০০ দিনের কাজের জব-কার্ড পাহাউঙ্গ। প্রধান অপিসের কামতো পানু, কিন্তু আকাশের গতি দেখি মনটো ভাল নাই। ধিক ধিক করহে বিললা, কেহই ধান রুপিবা পারেনি। বিলের মাটি ফাটি বেংবেং হই গেলে।

অহিলা ঃ হামরা স্বনির্ভর দলের বৌ-বেটিলা কম চেষ্টা কন। কতদিন জল মাংগি বেড়ানো। কেহ্ কেহ ব্যাঙ্গের বেহা দিন।

(গাউন) ওনা বাষিয়ার দিনে ওদের ঝিলমিল

গরমে রহাল না যায়, সহাল না যায়

দূরের আকাশটাত মেঘের আনাগনা

বৃষ্টি নাহি হয়।

ওকি ওহো মরিরে —

কি হবে হামার হালুয়া চাষুয়ার

যদি না হয়রে ফসল

ও মেঘ তুই না করিস গোসা দেরে জল

মাটিতে ফেলা রে জল

জল দিলে হামরা বুনিম ফসল।

পেলকা ঃ তুই ঠিকেই কহচিস অহিলা। হালুয়া-চাষুয়ালা যদি ফসল না করিবা পারি, কি খাম-কেনং করি দিন গুজরান করিম।

(গাউন) এইলা দিনতে আশার আলোই

সরকারের ১০০ দিনের কাম

খাটিবা পারিলে ওরে অহিলা

বাঁচিবে হামার জান।

অহিলা ঃ কি কহানে সরকার সব্বার তাংনি ১০০ দিনের কামের সুযোগ দিয়া। তাইলে তো আর চিন্তা নাই। খাটিম আর খাম।

পেলকা ঃ হে রে অহিলা। আর চিন্তা নাই। এই যে হামার বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশে কুনঠিনা খরা হয়, কুনঠিনা বন্যা হয়। তার তাংনি সরকারটো ১০০ দিনের কামের অধিকার দিয়া। কামের টাকা প্রধান অপিসত পাঠাই দিয়া।

অহিলা ঃ অঞ্চল অপিসত টাকা পাঠাই দিয়া।

পেলকা ঃ অঞ্চলের কাম করি সেইলা টাকায় চাউল, ডাইল কিনি আনিনু। জানিস পিত্যেক দিন ৬৮ টাকা দিন। চল, খাই-দাই সুখের গাউন গাই।

(এই সময় পাইকারু দালালের প্রবেশ)

পাইকারুঃ মানুষের কারবারি করি মুই ভালয় টাকা কামানু। ৫০ ঝন কামাইল নিগাই দিবা পারিলেই পাঁচ হাজার টাকা কামাই। পেলকা দিল্লি খাটিবা যাবার কাথা ছিল। পেলকা—পেলকা বাড়ি ঘরে ছিস।

পেলকা ঃ হে হুং তো পাইকারু দা।

পাইকারুঃ তোর খবর কি।

পেলকা ঃ কি খবর দাদা।

পাইকারুঃ কেনে তোর মনে নাই।

পেলকা ঃ কাহা মোর মনে।

পাইকারুঃ বিদেশ খাটিবা না যাবা চায়হালু।

পেলকা ঃ ওহো, মনে পইল দিল্লি খাটিবা।

পাইকারুঃ হে-হে-হে।

পেলকা ঃ যাবা চায়হালু দাদা। আর যাবা হবা নাহা। হামার এত্তিনায় মেলায় কাম। সরকার হামার তাংনি ১০০ দিনের কাম দিয়া। বাড়ির কিছু জমি-জমা আর সরকারের ১০০ দিনের কাম, দিন চলি যাবে। দিল্লি খাটিবা যাবা হবা নাহা। আর একট খবর পানু দিল্লি খাটা নোকলা বাঁচেনি। মুরগির রোগের মতন টুপতে টুপতে মরি যাহা। দিল্লি খাটি হামার রতন মারা গেল। জানি শুনি নাই যাম দাদা মরিবা।

অহিলা ঃ কি কহচেন, মোর মরদটাক দিল্লি খাটিবা যাবা। তমরায় মানুষলাক খারাপ বুদ্ধি দি বেড়াহান। কতলা সংসারের সর্বনাশ কলেন। তমার কাথায় বিদেশ খাটি আসি কতলা নোক মরি ভুত হই গেল। ভেরাঅ-ভেরাঅ-ভেরাঅ হামার বাড়ি থাকি।

(গাউন) কামের দুয়ার খুলি গেলে
আয়রে কামত আয়
কাম করিম দেশ গড়াম
আয়রে কামত আয়।
আলিস করে ঘরের কনত
থাকিস না রে আর

১০০ দিনের কামের অধিকার দিয়া

হামার এই সরকার ।

মিছামিছি কাম করিম

তাহা কিন্তু না হায়

এই কামতে গেরামে হামার

সম্পদ সৃষ্টি হয় ।

কাম করিলে গতর খাটালে

হবে ঘরঘর উন্নতি

দেশ হামার, অঞ্চল হামার, গেরাম হামার

কাম করিয়া বানাম হামার ক্ষেতি

কামের দুয়ার .... কামত আয় ।

সংগ্রহসূত্র ঃ খুশী সরকার (৫২), কুশমুণ্ডি,

দক্ষিণ দিনাজপুর, তাং-০২.১০.১০।

নটুয়া

কুঞ্জবান্ খণ্ড

কালী সাজে, দেবী সাজে, —

এ পঞ্চ বহিনি সাজে,

উধবো-মাধবো সাজে—

হুমরা দুইয়ো ভাই।।

....

সরিষার ত্যালত্ দিয়া রাম

জুড়ি গেইল্ বাতি।

সইন্‌ঝা করিতে আইলে এহো সইন্‌ঝা বাতি।।

....

কুঞ্জ না বান্দিয়া কুঞ্জের দেখে উপ।

কুঞ্জতে নিখিয়া দিলে চান্দ আর সুরজ।।

....

সোনারে আরুনী আধে গে, উপারে ঝাড়ুনী

উঠো আধে, বান্ধো কেশ;

বাহুড়ো আঙিনাখান গে।।

....

অলঙ্গা দলঙ্গা হে, আরো আলোক নতা।

মধু না মালঞ্চ ফুলো হে আনি' দে নলিতা।।

....

দুয়ারের আগত্ কুহুলী বোলে রে ময়না

মুই তোরে সঙ্গে যাইম রে দরিয়া।।

....

ছবা গেইল্ শিতানখান,

উড়ি' গেইল্ ধোমা।

ওরে এলাও নাই আইসে

ওহো রে মোর ওভাগোনী রে।।

....

ঘোটোতে ঢালিয়া দিলে পরভু

বাসি গাঙ্গের জল।

উড়ি' যায় সারি-সুয়া—

পড়িয়া অহিল্ সাধের পালং।।

।। নটুয়ার আরো তিনটি বিচ্ছিন্ন স্তবক।।

ফলো মইধ্যে গুয়া রে পাতারি মইধ্যে পান।।

তিরি মইধ্যে আধে গো পুরুষো মইধ্যে শ্যাম।।

....

হে কালো, কালো গাইয়, কালো হে বাছুর।

কালো গাইয় ছেঁকে হে আধে কিষ্ণো ।।

....

পিরিতি পাগেলা হয়া ছাড়িনু কলার হালুয়া।

তোরে বাদে কান্দু, ওহোরে বন্দু,

বিছিনাত্ থাকিয়া—

ওহো রে বন্ধুয়া।।

সংগ্রহসূত্র ঃ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (১৯৭৩) গ্রন্থ থেকে উক্ত পালাটি সংগৃহীত।

নাটুয়া

বন্দা দেবা কালী গে সরস্বতী গে মাই
তোহাঁরো চরণা আগে মাতা শিরা মে উঠা এঁ
গুণা শিখা গেলা কালীমাই কামরু খারাজ
গুণা শিখা আলি কালী গে নিশি ভেলো রাত।
বামা লেলো খাপাড়া দাহেনা হাতে তারওয়াল
আসুরা কাটিয়া কালী গে ক্যারালে সংহার
তোহারা চরণা কালীমাতা শিরামে উঠাএঁ।।
বন্দা দেবা কালীগে সরস্বতীগে মাএঁ।
লারা লোক কাটিয়ে কালীগে গলার গুঁথ্‌লে হার
ভাগানা কাটিয়ে হাতা লেলে লাঠকাএঁ
তোহারা চরণা কালীমাতা শিরা মে উঠাএঁ।।

কাহা মনে আগে কালীমাতা জনামো তোহাঁর
কাহা মনে আহে কালী তোহাঁর মন্দির ঘর।
দুর্গাকে ঘাম্যো কালী মাগে জনামো তোহাঁর
কামরুখমে আহে কালী তোহার মন্দির ঘর।
বামা লেলে খাপড়া মাতা দাহেনা হাতে তারওয়াল
আসুরাকা ক্যুলা কালী ম্যায়গে ক্যরালে বিনাশ
লারা লোক কাটিয়ে কালীগে গলাকা গুথলেই হার।
কাহামনে আগে কালী মাতা জনামো তোহাঁর।।

চোখ খাইলে বাপো মাওরে আরো টোলার লোক
ছোটো দেখে বিহা দিলে হে কোলের বালক।
স্বামীকে কোলে নয়ে গো চলিলাম বাজার
বাজারের লোক শোধাই গো, কেলাগে তোমার।
চোখ খাইলে বাপো মাওরে আরো টোলার লোক
ছোট দেখে বিহা দিলেহে কোলের বালক।
শাশুড়ীরো ব্যাটা লাগে গো

ননদিরো ভাই

বাবারো জামাই লাগেগো আমার স্বামী হয়।

চোখ খাইলে বাপো মাওরে আরো টোলার লোক।

ছোট দেখে বিহা দিলেহে কোলের বালক।

বাবাজীকে বলো গিয়ে গো কিনবে ধেনু গাই

সেও দুধায়া খিলায়ে আমি গো স্বামীকে বাঁচাই।।

কাউনো বনে হে কৃষ্ণ গাইয়া চড়াবে

কাউনো বনে ওহে কৃষ্ণ গাইয়া চড়াবে।

কাঁহামে কৃষ্ণ পানিয়া পিলাবে।

গোকুলা মে ওহে কৃষ্ণ গাইয়া চড়াইলে

কালীদাহামে কৃষ্ণ পানিয়া পিলাইলে

কাউনো মুখা হে কৃষ্ণ গাইয়া দুহাইলে

কাউনো মুখা কৃষ্ণ দুধা ধার

চোঙা মুখা হে কৃষ্ণ গাইয়া দুহাইলে

সুরুয়া মুখা কৃষ্ণ দেলা দুধা ধার।।

আঙা ভবু ওর গল্লে উদ্র মালা

শিবাজি আওউলে শ্বশুরালয় হে

দাতাঁভি ভাঙালা মোচাভি পাকালা

আভা বিচা ভসমা লাগাউলা হে

আইসান বরা কে হাম্মা বিহা নাহি দেব

গাউরী না রাহাতা মোর কুমারা হে।

এতনা শুনিয়ে শিবাজি গঙ্গা লাহাবে গেলা

কাপালামে কাটালে তিলকা হে।

এইসানা শিবাজি রুপাজে ভেয়াল্যা

সূরয়াকে তেজ ভেল মালিনা হে।।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি শ্রী ফণীগোপাল পালের গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'উত্তর বাঙ্লার লোকসাহিত্য' ২য় খণ্ড (নির্বাচিত সংকলন), (১৯৮১) থেকে সংগৃহীত।

নটুয়া

১

রাধা ঃ বেহানে উঠিয়ে ওহে গোরা দিয়ে গেলো সারা
যোল শ গোপিনী সাজে একেটি রাধেকা
পার কর নিলাজ কানাই রে বেড়িবাক চাই
নষ্ট হবে দহি দুধ বিক্রি বহে যায়।
তুই হোলো সুন্দর কানু ঘাটে ভাঙ্গা লাও
কুণ্ঠা রাখিম্ দধি প্রসাদ কুণ্ঠা জুরাম গাও।

২

কৃষ্ণ ঃ ভাঙ্গা নাহি টুটা নাহি বজরিয়া ভারি
হাতি ঘড়া পার করু তুই কতয় ভারি
কেশবা ছাড়িয়া রাধে গড়ায় চাপে বস
মুটে মুটে পানি ছেক লজ্জায় কেন মর
কাচলি চিড়িয়া রাধে গারিনু সকল
প্রাণ শান্তি হইয়া রাধে টুটে গেল্ জল

৩

রাধা ঃ বহেরে দক্ষিণা বায় টলমল করে লাও
ডুবাইলো মোক আগম দরিয়ার জলে

ফাকরি এক

গাইন ঃ কাক কলঙ্কে পাখি শিয়াল চন্দ্রমুখি
রাজহংস হল্লা ব্যাঙ ব্রাহ্মণের আঘুতি
ফেচকাইচু ঠ্যাঙ
তুইরে বোগলা মোক খাবো।

প্যাংচিয়াঃ সেইড মানে তু বুঝবায়নি পারনু বারে। মোক বুঝায় দেতবারে। ইড কাথা কে কোহালে দেয়ার বারে।

গাইন ঃ সেই ড মানে উড চ্যাঙ মাছট কহচে বারে। একদিনকা একজন বারাহ্মাণ জজমান করা যাতে যাতে আরকি আষার শায়নের দিনত্ বিলডত্ একটা চ্যাঙ মাছ পাইচে বারে। তে মাছট ত শানে গিছে ঐ জলত্ কনিক অয় ধুবা চাহিসল আরকি আর চ্যাঙ মাছত ছড়পিয়ে পালান

দিছে। ঐঠিনা ছিলে একটা বোগলা তে সেই চ্যাঙ মাছট কহচে আর ইড।

৪

কৃষ্ণ ঃ কোথা হইতে আইলো রাধে কোথায় তুমার ঘর কিসের প্রসাদ আছে মস্তকের উপর।

রাধা ঃ দহি আছে দুধ আছে খাওরে কানাই
সেই তুমার মনে আছে তাই তো হবার নাই।

ফাকরি দুই

গাইন ঃ তালের পর তাল তিন চক্কর তাল
গুজ-গুজিয়া পড়িয়ে মোর মাথার গেল ছাল
পড়িয়া ছিনু মুই মালার ফানত্
মালা বেটা বেচিয়ে খালে আধ কাঠা ধানত্
ধুলাই লুট-পুট-ধুলায় সুট-পুট, কাটিল তিন ফেচা
তিন ভুবন দেখাল মোক চিলা বেটা
একছিলে চিলা রানী তার প্রসাদে পানু মুই
আগম দরিয়ার পানি।
(কথায়) ম্যুই একটা ফের শালুক পানু বারে।

প্যাংচিয়া ঃ শালুক না শিলুক বারে?

গাইন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ শিলুক বারে।

প্যাংচিয়া দোয়ার ঃ কোহোদিতে ইড কিসের খন্ড বারে।

গাইন ঃ ইড হচে শোল মাছটর খনড বারে। একটা শোল মাছ ছিল বারে। একদিনকাত একটা মাছুয়া মাছমারবা আসিয়ে জাল দিয়ে অক মারে লিলে তারপর আধকাঠা ধান দিয়ে বদ্‌লায় লিলে তেসেনা মালকানি ড ত ভূয়াবা বসিচে আরকি তিনখান ফেচা কাটিয়ে গিসল জাল আনবা ঐখুনা আর উপরতে একটা চিলা আসিয়ে ছে দিয়ে লিয়ে চুলে গেল আসমানত আর হিতিতে চিলানী কহচে দে তুই একলায় খাবো তেসেনা লাগায় দিছে মারামারি ঐ মারামারি করতে করতে শোল মাছ ফের ঐ সুযোগে পড়ে গিছে জলত্। তে হোল্ জীবনড রক্ষা। তাতে মুই ইড লাগায় লুগায় তাকরি বান্ধিচুবারে।

প্যাংচিয়া দোয়ার ঃ তাকরি না ফাকরি বারে।

গাইন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে।

৬

রাধা : পরের রমণী দেখিয়ে কানু জলে কেনে মর
নিজ জান ভাঙ্গায় কানু বেহ্া কেনেনি কর।

৭

কৃষ্ণ : ভাল্ ভাল্ সুন্দর নারী ভাল বলিস মোরে
মোর কপালে বেহ্া নাই কাইন করিম তোরে।

ফাকরি তিন

গাইন : কুহু কুহু বইলে যায় কুহুকি নন্দন
বিরপাকে পড়ে গেল পেঁচার বন্ধন
ঠকায় ঠকায় পেঁচার মাথাত্ কইচু ঘাও
তাহনি ছেড়ে, প্যাঁচা আপনার রাও
ক্যাচ ম্যাচ করি হামরা ক্যাচ ম্যাচ করি
পুন্দিত ঘুতা দিলে সহজে মরি।
(কথায়) মুই ত একটা ফের শালুক পানু বারে

প্যাংচিয়া দোয়ার : শালুক না শিলুক বারে।

অধিকারী গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ শিলুক বারে।

প্যাংচিয়া : তে ই ড কার খনডতে বারে কোহোদিতে বারে।

গাইন : ইড পেঁচডর খন্ ড বারে একটা ফানপেতা ফান বসাইচে কুহুলিডর তানে তে কুহুলিড নি পড়িয়েপাড়ে গিছে পেঁচ ড তে সেই পেঁচড কহচে ক্যাচ ম্যাচ করি হামরা ক্যাচ ম্যাচ করি পুন্দিত ঘুতা দিলে সহজে মরি তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় তাকরি বান্ধিছু বারে।

প্যাংচিয়া : তাকরি না ফাকরি বারে?

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে।

৮

রাধা : শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ওহে প্রভু দয়া কর মোরে
দয়া কর ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে
কৃষ্ণের কথা কৃষ্ণের নাম ব্রজলিলের সঙ্গে
সদা সেবা আছে মন মনতে পড়িল

কৃষ্ণ	ঃ	কালো কালো বলিস ওহে গোপীজি
		মোক বিধুতায় করাইচে কালো আমরা করবো কি

ফাকরি চার

গাইন	ঃ	কাঙ্কুরী কুঙ্কুরী পরম সুন্দরী
		ঘরতে বাহির হো নমস্কার করি
		লেপিচু মুছিচু সন্ধাইচু ঘর
		পরণাম কোরাবোতে দূরে দূরে কর।
		কালকার ঘুকনে মোর আজি আইচ্চে জ্বর
প্যাংচিয়া	ঃ	ইড ফের কিডর খন্ড কহচে বারে
গাইন	ঃ	ইড মানে বুঝবা পারলো নি বারে শিয়াল ড আর কাকড়টর খন্ড বারে। শিয়াল গিছে কাকরটক আহার করবা। তাস্তে কাকরট কহচে আরকি— তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় তাকরি বান্ধিচু আরকি—
প্যাংচিয়া	ঃ	তাকরি না ফাকরি বারে
গাইন	ঃ	হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে

১০

রাধা	ঃ	ভাত শাগ নান্ধিয়ে ওগে রাধে হয় গেল তৈয়ারী
		কৈসে জাগামু রাধে আজল সুয়ামী
		শাশুড়ি হোল্ মোর বিরহলি
		নন্দন মেরা ওহোরে হয় গেল কুটুনী
		অগর চন্দন লেহ রাধে কটরা ভরাইয়া
		সুয়ামী জাগাইতে সুন্দরী চলে গেলা
		একছিটা দুই ছিটা ছিটা তিনবার
		ছিটাতে মোর সুয়ামী জাগেলা

ফাকরি পাঁচ

গাইন	ঃ	ভাবের বন্ধু জুয়ারে মিঠ
		মাথত্ করে আনে দিলে কাউনের পিঠ
		মুই দিনু রস তে হোল ধসধস
		নিতে মরে গেলহলি

প্যাংচিয়া : ইড ফের কিসের খন্ড বারে

গাইন : ইড আর কহিস না বারে— একটা ছণ্ডার সঙ্গে একটা ছুণ্ডীর ভাব ছিলে আর কি তে ভাবুয়া বন্ধুডর তুনে ত বন্ধুয়ানী ড একেবারে গরম গরম কাউনের পিঠ না মনে মনে খাবা আনিয়ে দিছে আর ঐ নে ভাবুয়া বন্ধু ড গরম গরম খাবা ধুইচে আরকি বড় বড় গাসে গরম জিনিস ছুবেছে আর ত টুটিত্ গিছে লাগিয়ে। তেসেনা ঐ নে একটা ফের ছণ্ডা ছিলে আর কি অয় তেসেনা দেখেছে যে লোকটত আলায় মরবে তে অয় দৌড়িয়েহেনে জল আনিয়ে টুটিডত দিলে ঢালিয়ে তে ত লোকটি যায় হেনে পরসগিলোক তেসেনা আরাম পালে। নিতে মরিয়ে গেলহি। তাতে ম্যুই ইড তাকরি বেনাইচু আর কি।

প্যাংচিয়া : তাকরি না ফাকরি বারে।

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে।

১১

রাধা : ভাত বা খাইয়া কানু মুখ পাখুরায়
ধুতিয়া পঘড়ি কান্দে ধনি ধরতি লটায়
রাজা বিনে রাজ্য শুন্ হেংস বিনে দহ্ শুন
শুন হোল্ মোর এঘর মুন্দিল
মুই ধনি কারনা করুরে।
ঘূর রে ঘুর রে কানু শ্রীপুর
মোর খায়ে যাওরে
কপালের লেখা করমের দোষ খণ্ডাল না যায়রে।
তেলসে জ্বলি গেলি রাম গেলো রাতি
নয়নের জলে ভিজে গেলো মেরা ছাতি।

গাইন : হাসলি নি সনানি ঢলকিয়ে বেড়ায়
কুড়ো নি কাসাই নি মল মল বাসায়

প্যাংচিয়া : ইড কিসের খন্ড কোহোদিতে বারে

গাইন : ইড হচে বকরা ডর খন্ড বারে।

১২

রাধা : শুকুনা লাখরি ও হোরে মোর মচকি গেলারে আরওত না লাগিবে জড়া

কাউন বিরোগে সাইয়া মোকে ত্যাজি গেলা

কাল মেঘা লীল মেঘা হো মিনতি করু তোর

আজ মেঘা বরষিলে রে এ দুন্দা পাথর

ফাকরি সাত

গাইন ঃ চাকাত্ কোলে চিকিত কোলে মেঘের গর্জন

ঐ ঠিনা দে পানু মুই বাপ-পুতের ধন

হকস বকস করে লিয়ানুন ঘর

থায় দিনু চাকার পর হয় গেল পানি

খায় নিলে মোর ঐ চুতমারানি

(কথায়) মুই ফের একটা শালুক কুড়ায় পানু বারে

প্যাংচিয়া ঃ শালুক না শিলুক বারে

গাইন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ শিলুক বারে। একটা হালুয়া গিসলে হাল বহবা তেসেনা মেঘ বলবা ধরিলনা আর পানি দুনে বাতাসে পথলে পড়বা ধরিল হেই বড়া বড়া পথল তেসেনা একখান বড় পথল ত কুড়ায় আনিলে রাখে দিলে। অয় মনে করচে দেইখান মুই বুঝি খুব ভালো জিনিস পানু লিয়ে যায় হেনে চাকার উপরত্ ত রাখে দিছে। তেসেনা পথল খান হয় গিছে জল তার মানে গলে গিছে তেসেনা তার তিরমাতটক্ ধরিচে মারবা দে তুহে খালো মোর জিনিস খান তাতে ম্যুই ইড লাসায় লুসায় তাকরি বান্ধিচু।

প্যাংচিয়া ঃ তাকরি না ফাকরি বারে

গাইন ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে

ফাকরি আট

বড় ঘর দেখালো হরি

কাহার নি কিছু করি

বড় বড় খপা লাড়িয়ে দেখি

কমরত নিছে দড়ি

প্যাংচিয়া ঃ ইড কিড হোলতে বারে কোহোদিতে বারে।

গাইন ঃ ইড বুঝবা পালো নি বারে! ইড হচে গসাই ড আর শিষটর খন্ড বারে। গসাই ড শিষটক লিয়ে খিয়ে আর একখান বড় ঘরত্ বোহতলা গসাই শুতিয়েছে। তে শিষট আর দেখেছে দে সভারে বড় বড় খপাছে, আর কমরত ফের দড়ি কাহারনি।

সেই মুই ইড লাসায় লুসায় ফাকরি বান্ধিছু বারে।

ফাকরি নয়

কেশপুর মে চোর ধরেলা

তালাপুর সে বিচার হুয়া

কটপুর সে পেচেত

প্যাংচিয়া	ঃ	ইড ফের কিড বারে?
গাইন	ঃ	ইড বুঝলো নি বারে। মায়া লোকলার মাথাত্ কিবা বহচে বারে?
প্যাংচিয়া	ঃ	মায়া লোকলার মাথাত্ নুকুন বারে।
গাইন	ঃ	হ্যাঁ হ্যাঁ নুকুনলা ড বারে। যখুনা মায়ালোকলা নুকুন মারে অখুনা মাথাডক চুলিলাতে নুকুনডক ধরচে আর হাতের তালাখনত্ রাখিয়ে বিচার করবে দে ইড কি ডিমাওনা নুকুন ড তেসেনা আঙ্গুলের খুড়ালা দিয়ে পেচেত্ করে মারে ফিলাচে। তাতে মুই ইড জড়ায় জটায় ফাকরি বান্ধিচু বারে।

ফাকরি দশ

কুশ কুশিয়ার ভাই কুশকুশিয়া

লাম্বা ফোরটি রসিয়া

ঘাট ফোরটি নি রসিয়া

তিরিশ দশাংয়ে তিরিশ

ই ঢণ্ডার পানি ই ঢণ্ডাত্ দিস।।

তাই দে মুই একট যে শালুক পানু বারে।

প্যাংচিয়া	ঃ	শালুক না শিলুক বারে।
গাইন	ঃ	হ্যাঁ হ্যাঁ শিলুক বারে।
প্যাংচিয়া	ঃ	ইড কিডর খণ্ডতে বারে কোহোদিতে বারে।
গাইন	ঃ	ইড হচে গসাইড আর ঘটবারে। একদিনকা আর কুহিস না। গসাইড আর শিষটয় চুলে যাছে। আরকি শিষের বাড়ি। আরদেনা রাস্তাডর বগলত্ ছে একখান কুশিয়ারের ক্ষেত। তেসেনা দেখিয়ে ওমাক কুশিয়ার খাবা মেনাইচে। শিষ্ট ভিতরতি ঢুকিচে কাটবা। ওয় ত বাশ বাড়ি ঢুকিয়ে বাশকানা। তাতে গসাইড কহচে কুশিয়ার ঢণ্ডাত দিস।

ফাকরি এগারো

হর হর হর খাইতে হেমন দড়
একে লাথে ফিকে দিলে হাত দশেক বার
শিকনীর শৃগাল ছিটকিয়ে উঠে মহিপাল
সটকালপুন্দি মটকাল ঘাড়
ইখান কাম কেধনি করিম আর।।

গাইন : কোহোদি বারে ইড কিড বারে

প্যাংচিয়া : মুই কাহা বুঝবা পারছু বারে

গাইন : ইড গুরুড বারে। মানে ছে শুতিয়ে চিতর ভেলটাং হয়ে হেনে আরকি। আর ইড কিবা কহচে শিকনী ড মনে করিচে সে গুরু বুঝি মরে গিছে। যায় হেনে ত কটিখানত্ মুখখান ঢুকায় দিছে যেমনে ঢুকাইচে তেমনে গুরু ছিট পিটায় উঠিয়ে ঠুকিল যে একটা লাত্ একেবারে শিকনির দশ বার হাত ফিকে দিলে। তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় তাকরি বান্ধিচু বারে।

প্যাংচিয়া : তাকরি না ফাকরি বারে।

গাইন : হ্যাঁ হ্যাঁ ফাকরি বারে।

ফাস গান

জপেত মিরদঙ্গ ভায়ারে মোর মিরদঙ্গ রাখে তাল
বামে বসে কালী মায় রে মোর ডায়নে হনুমান

ফাকরি বারো

ছেলেক লকার ভাই ছোলেক লেকা
বসিয়ে করচিস কি?
ঢুক দিখি তুই শক্ত কেমন মুই
দেখবা আসবে মোক লয়ে যাবে তোক
জান যাবে তোর গুহ্য ফাটবে মোর।

প্যাংচিয়া : শালুকট ফের বুঝবা কাহা পারনু বারে।

গাইন : বুঝবা পারলেনি বারে। ইড মাছ মারা ডিহিরি ডর খনড বারে। ডিহিরিড মাছটক কহছে বারে।

১৩

কৃষ্ণ ঃ শিকিয়া ছিণ্ডিল বাংঘিয়া ভাঙ্গিল
ও মোর কাঙ্গের গেলি ছাল
কেমনে বহিমু রাধে তুমহার দধি ভাড়

ফাকরি তেরো

গাইন ঃ শ্যামসুন্দরী নারীড ভাল পুরুষের ঠা বসে
ঢকিলে ককট মকট বাহিরতি যায় খিটখিটায় হাসে।

প্যাংচিয়া ঃ ইড যে কিসের খনড বারে।

গাইন ঃ ইড ত বেটিছুয়ার খনড বারে। বেটিছুয়ালা চুড়ি পিনবা বেটাছুয়ালার ঠিন বসবে না। আর যখুনা চুড়িলা ঢুকাচে অখু কসাছচে আর ককট মকট করে ঢুকপা হচে। ঢুকা হয় গালে বাহিরতি যায় খিট খিটায় হাসচে। তাতে মুই ইড লাসায় লুসায় ফাকরি বান্ধিচু বারে।

১৪

রাধা ঃ তুই হলো সুন্দর নায়া ঘাটে ভাঙা লাও
কুণ্ঠী থুম্ দধির ভাণ্ডরে মুই কুণ্ঠা জুড়াম গাও

ফাকরি চোদ্দ

স্বর্গে মুছে ডারি বিন কুমারে হাণ্ডি
বিন গঙ্গায় পানি বিন দুধে ছানি।

প্যাংচিয়া ঃ ইড ফের কিড বারে?

গাইন ঃ ইড হচে নারিগোলডর খনড বারে।

১৫

কৃষ্ণ ঃ পাথারের শোভাং মেরা ধানুয়ারে
গুহালির শোভাং মেরা ধেনু গাইরে
গাই করে হাম্বা হাম্বা বাছুর পাড়ায় রোল
বাথানে যায়ে দেখুরে মুই কতয় বেলা হোল।।

সংযোজন

নটুয়া

এক. যে সোনা কদমকা ফুলা
সে সোনা মোর সৈঁয়া নাই মোর ঘররে
ও মোর শখিয়া ফুলত দেইখা মুই
কেইসে বান্ধিম হিয়ারে কদমকা ফুলা

দুই. মা হইল নবনীরে মোর বাপ হইল বাতেসা
ওহোরে কলারও সোয়ামীরে ছিল
পরভু মোর যেমন অসগল্লারে

তিন. এখে অঙ্গে একে সঙ্গে ওহে পরভু মুই
নাই রহিম দুই ঘরেরে পরভু
হামু না যামু মুই অরণে জঙ্গলে

সংগ্রহসূত্র ঃ ড. শিশির মজুমদারের 'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য' (১৯৮৬) গ্রন্থ থেকে উক্ত পালাটি সংগৃহীত।

নটুয়া পালা

বন্দনা

গীদাল ঃ আইসো আইসো কালীমা সভা রঞ্জায়ে যা

সভা ভঙ্গ হইলে লইজ্জা হবে তোর কালীমা

দেবী সাজে কালী সাজে সাজে পঞ্চ বহিন

শ্রীমতি রাধিকা সাজে উধব মাধব দনো ভাই

ও দেবের মহামায়া

পূজার কারনে নামিল ভবানী

হে দেবের মহামায়া

হাতে লিনু বাটারে মুই মিঠা পান

কণ্ঠে আসিলো রাধাগে দশমুনিক করনু পরনাম।

ধুয়া ঃ হায়— আ হা ....

গীদাল ঃ উধব, তোর মামিটা কান্দিছে। তোর মামাটা আসে নি।

গান ঃ সানঝো পড়িয়া গেল রাম জোড়ালো নি রাতি

ভাগের ভগতী লাগে আর সানঝো বাতি

উধব ঃ ওর ওরিয়া গেল গোড় গোড়ীয়ার ঘাটে

সাকায় শুকায় কোলাত করে

টিপিস টিপিস করি পানি পড়ে

ওই কিনা পানি সবাকে নাগে

হামাক উখান না নাগে।

গীদাল ঃ হে, তুই তুরী ঘানিত ত্যাল পিষার কাথা কহিলো।

উধব ঃ তুই ঠিক কাথা কহিলো।

গীদাল ঃ বাপ মায়ে নাহি বুঝে ছোটতে বেচিয়া খাচে

কেমনে যাইমু শ্বশুরালী গো

বয়স হল মোর লবীন।

উধব ঃ দন্তের তেরি মেরি মুখের জরনা

লগত আছে শহর বন্দর কাহয় কি কান্দে না

আচ্ছা কান্দে না তে কান্দে না

গোড়ত থুইচিস আরহ্ এখান এত বড় বদনা।

গীদাল ঃ তুই শিয়াল আর কুশিয়ারের মালিকটার কাথা কহিলো।

উধব ঃ তুই ঠিক কহচিস।

গীদাল ঃ খাটো খুটো বৃন্দাবনে,

ফুল তুলিবা গেনু তিনঝনে

ফুল তুলিতে হারানু স্বামীরে

সায়া গেল মোর বৃন্দাবনে।

উধব ঃ দাড়ি ছুলবুল মুখ ভাকুরা

কাহাসে আইলো রে বন ঠাকুরা

বন মে রই বনফুল খাই

হরিণ খাই পঞ্চাশ

যেইদিনা বারোটা বাঘ বারোটা বাঘিনী না খাই

সারা দিনটায় উপবাস।

গীদাল ঃ এইটা মুই বুঝি পাহচু। উত্তরটা হইল বাঘ আর বকরা ছাগল।

উধব ঃ তোর মাথাত বুদ্ধি ছে রে, ঠিক কহচিস।

গীদাল ঃ শুন শুন দশ মুনি

এঠে হারানো মোর সোয়ামী

সোয়ামী হারা হইচি মুই।

উধব ঃ ঝাপ হইতে বাহির কর

সাকায় শুকায় কলাত কর

তেরি মেরি করলে লাগা দুই থাপর

বুকের বানডা খলায় দিয়া লাগা ঝকর ঝকর।

গীদাল ঃ তুই পাট্টা ধুয়ার কাথা কহিলো।

উধব ঃ তুই ঠিক কাথা কহিলো।

গীদাল ঃ ও ব্রজের ভাবুনি গে

রসাল সোয়ামী তোর গেইছে বিদেশ

ধরিছে রাজার বেশ.

		সেজা গুছাইতে পারিস গানি
		ঘুরিয়া আয় রে ব্রজের রাখাল
		ও তুই ব্রজের বনমালী।
উধব	ঃ	টাকরখানি চেপ্টা, মধ্যেখানি একটা ডেটা
		ঢুকুবার কাম নাই উপরেতে লটপটালে ঠাণ্ডা।
গীদাল	ঃ	হারে এটা তো বিচনের কাথা কহচিস।
উধব-মাধব	ঃ	মামি গরমিত বিচন দিয়া হাওয়া নি করে। তাতে মামাডা রাগ করি পলাইচে।
গীদাল	ঃ	আরে ইডা একটা ঝগড়া হইল। তোর মামা গেইচে বৃন্দাবন লীলা করিবা। তমহার মামিডা যে কান্দেচে। তমহা মামাক অনষেবার যাও। তমহা ছাড়া আর কায় ছে।
গান	ঃ	নন্দের ভাই তেজি গেলারে
		কাহ নাহি দিল বাধা
		জল ভরিবা গেনু গে
		ও মুই কোলংকিনী রাধা
উধব-মাধব	ঃ	মামি তোমা কান্দেন নি। হামা দোনোঝন যাছি মামাক অনষেবার।
উধব	ঃ	সব রং ময়ূরা আধা রং কুকরা
		কিঞ্চিত কিঞ্চিত পূর্নী
		কটি সটকা মাথা টকরা
		সব পুরুষের চাহিতে বড় মুই।
গীদাল	ঃ	ইডা তো পেঁচা পখির নিজের গর্বর কাথা কহচিস।
মাধব	ঃ	ঠিক কহলো।
গীদাল	ঃ	বিরিক্ষ মইধে শিমিলার খুটা
		গছে পাতে রাঙ্গা
		গাভুর বয়সে রে দৈরজ্ঞ
উধব	ঃ	ঠিক কহচিস।
গীদাল	ঃ	এখেতো আন্ধার রাতি
		একাশরে রহালনি যায়, ওহে পরভুজি
		হায় দেখি মোর কপাল লেখারে
		জার গেল মোর কাপড়া বিনে

বয়াস গেল মোর সোয়ামী বিনে
একাশরে রহ্লনি যায়
গোকুলা নগরে, ওহে পরভুজি।

উধব ঃ চাকচাক মুলাইর চাক
আধাআধি ঢুকিলে করে আঁকোবাকো
গটরায় ঢুকিলে বাঁচিনু গে বাপু।

গীদাল ঃ সোজাসুজি কহুম।

উধব ঃ কহে দে।

গীদাল ঃ তুই সাঁকোটার কাথা কহিলো।

গান ঃ মনের আগুন তলে জ্বলেরে নিকটের আগুন ধায়
জ্বলেছে মনের আগুন সখিরে কি খাইলে জুড়ায়।

উধব ঃ ক নামে নারীডা হইচে কুল্যবতী
বিনা পুরুষে নারীডা হইচে গর্ভবতী
মাথায় মুকুট লইয়া সিংহাসনে বসে
তাক খায়া দেবতা তুষ্টি হয়।

গীদাল ঃ আরে ইটার উত্তরডা হইল কলার গছ।

উধব ঃ ঠিক কহচু।

গীদাল ঃ ঘুচাইয়া শাংখা মুঠি চুড়িয়া
মুছাইম সিতার সেন্দুর
আংগুঠি বিছুয়া
কিছু নাই রাখিমো হে
এ ভাব রঙ্গিয়া না বোলান সারাঙ্গী
চিৎ মোর উধাসী

উধব ঃ গুর গুর গুরিয়া যাবে গুর ঝুরিয়া
ডসকা ডুসকী ভাতার মুসকী
ভাতারক ছাড়িয়া খাইলে
এই চলন তোর এই দুর্গতি
ঝর ঝর নিঝর ঝর
মামির টুটিত পিঠো নাগিচে
গোড়োলের হাংকারে তে ভূমিত পড়।

গীদাল ঃ উধব তোর চালাকি মুই বুঝির পাহচু। তোর মামি একেলায় পিঠো খাইচে। তহো নি দেয়।

উধব ঃ তুই ঠিক বুঝির পাহচিস। মামিটা একেলায় সবলা খাইচে। মামাকো নি দেয়। তয় মামাটা

রাগ করি পালান দিচে।

গীদাল ঃ আরে তমহার মামি হইল সতী নারী। তমহার মামা গেইচে ষোলশ গোপিনী নিয়া লীলা করিবা।

গান ঃ পিয়াস নাগি নারী মুই গেনু যমুনা নদী
সেই যমুনা নদী হয়া গেল বালুচরী রে
ও হো রে বিধুতা।

উধব ঃ এই কুজা খালে সে পাবো বুঝা
হেই কুজা ছোড় ছোড় ছোড়
তুই কহচিস ছোড়
তোর কারণে মোর কটিত
নাগেচে ডোর।

গীদাল ঃ ইটা মুই বুঝি পাহচু। উত্তরডা হইল 'বনছি' আর 'শোল মাছ'।

উধব ঃ ঠিক কহচু। এ ভাই খালি হামার মামিটাক নিয়াই তোর গান। উয়ার দুঃখটাই তুই ভাবিচু।

গীদাল ঃ আষাঢ় শাওন মাসে নদী বহেছে ঘোর
উলটি পুলটি দেখুরে সোয়ামী নাই মোর ঘর।

উধব ঃ হেই মাতা হোল বুরুক সেই মাতা হোল
হরবোরিয়া শাকখানের মাতা দেও কনেক ঝোল।

গীদাল ঃ ইটার উত্তর হইল জুয়াই শাউড়িরটে গুজরী শাক চাহাচে।

উধব ঃ ঠিক কহচিস।

গীদাল ঃ সখি দেখিনু স্বপন হাম
আসিছে তোর কানু শ্যাম
আসিবে আসিবে সখি
মনের না বাহুর ভেল।

গান ঃ কি কথা কহল সখি চিত ভরল
ও মোর সখিরে
রাখচিত মোর মনকে বুঝায়ে।

উধব ঃ হেই মাতা ভিটিশ করিল কী
হে বাঃ ছোবা দিছু কঠালের বিঁচি

দে মা দুই একটা হামার ভিতি

হে বাঃ উখান মোর বাও

তাহলে মাতা তমায় খাও।

গীদাল ঃ উত্তরডা হইল জুয়াই খাবার বসেচে আর শাউড়িটা দেছে পাদ। আর কয়কি কঠালের বিঁচিটা ভিটিশ করেচে।

মাধব ঃ তোর মাথাত বুদ্ধি ছে রে গীদাল।

গীদাল ঃ রাধিকার কান্দনে বিরিক্ষের পত্র

সখি মোর ঝরিয়া পড়ে

ও মোর সখিরে তুই হেনা ছেড়ালো

ও হো মোর ভাইয়ার দ্যাশরে

যেদিন হাতে সায়া গেল কপাট নাগেয়া গে ননন

ও মোর ননন গে

রাখ চিত মোর মনকে বুঝায়ে

উধব ঃ মামিটার জইন্য চিত্খান মোর ফাটি যাহাচে।

গীদাল ঃ এ খাট পালাঙ্কী সেজা

মাকড়া জলে নি ভেলা

নিন্দ মোর হয়া গেল ওর

ও-হো রে দৈব মুই নারী একেলা।

মাধব ঃ ইটা তুই কি কহচিস। মুই বুঝির পানুনি।

গীদাল ঃ লেহ গে বান্দী দাসি

এ খাট পালাঙ্কী সেজা

নিয়া চল কদমের তলে

কদম ফুল দেখি হরি জুড়াব হিয়া

সখি পাশুরিমু মুই সায়ার শোক।

(উধব কৃষ্ণভাবে রাধার সাথে মিলিত হয়।)

গান ঃ ঝোচু করে ছলমল, কোংকিলায় ছাড়ে আও

রাধাকৃষ্ণ মিলন হইল রে খরাখরি যাও।

সংগ্রহসূত্র ঃ প্রফুল্ল সিংহ (৫৪), রাঙাপানি,

ফাঁসিদেওয়া, দার্জিলিং, তাং- ১২.০৯.১০।

নটুয়া

বন্দনা

আইসো মাগো সরস্বতী তোক বন্দিছু
জিবারে আগালে মাগো কর খেলা

চিতান ঃ পূর্বে যে বন্দিয়া লইনু ধরমো নিরাইজন হে জয় হে বন্ধু
উত্তরে বন্দিয়া লইনু কালীমা চরন ওরে জয় বন্ধু।
পছিমে বন্দিয়া লইনু বাসুকীনন্দন হে জয় বন্ধু
দখিনে বন্দিয়া লইনু গঙ্গামাই চরন হে জয় বন্ধু।
উড়ালো হে জয় বন্ধু আকাশে
বন্দিয়া লইনু আকাশের মুনি হে জয় বন্ধু।
পাতালে বন্দিয়া লইনু পাতালের মুনি হে জয় বন্ধু
দশমুনিকে বন্দি আমি ধরি দুই চরন।

মূল ঃ স্বর্গ ছে আইলো নটনী দেবী রাইজ্য দরবার।

বতিয়া ঃ হা হা মুই বান বান্দিনু দক্ষিণতি, মাছ শালা খায়া গেল বগলা।

মূল ঃ এ হো উদুমাদো তুই এলা এইলা কাথা বুঝিবা পাইসনি। ইটায় তো বগলা না হয় রে। ইটায় তো সর্গ ছে নটিনী আসিল নট করার তানে। তোমরা একে বগলা কছেন, বগলা না হয়। এইলা হয়ছে শ্রীকৃষ্ণ রাধেকা।

গীত ঃ সানঝা পড়িয়া গেল রাধে জুড়ালো নি রাতি।

মূল ঃ ভাগে ভগতি লাগে রে আরো সানঝো বাতি।

ফাকিরি ঃ কা কা বলে কালকাতুয়া, তোতা বলে ততি
পাবুয়া চরনো পঙ্খি শিব দূর্গা হরি।
শিব দূর্গা হরি নামো ডিস্ফো বড়ো আস্থা।
সারালা সোয়ালা পঙ্খি হেট মুখে ধিয়ান করে বগলা বগলি।
পানি করে যম করে জুবিয়া আহার করে।
লাগাল পীরিত টুটিয়া যাইলে সর গরগর করে।
চিতরাঙ্গা পঙ্খি রে ভাই নাকোতে কাজল
চেঙরা বিনে চেঙরি রে ভাই হইছে পাগল।

কলিযুগের চেঙরা ভাইয়া কোচবান্দা ধুতি
গাওত লাগায় কুর্তা জামা কোটিত লাগায় মিশি।

রাধে ঃ তোমা যাবেন দূর দ্যাশে প্রভু হামার পড়িবে ধান্দাওয়া,
তোমার হাতে মোহন বাঁশী রাখি দেহ বান্দাওয়া।

গীত ঃ দাওরে হুনু আপনার মন্দিরের ঘর / রুমুনী রে রুমুনী গেল হারায়।

রাধে ঃ আয়রে আয়রে হাঙেশা পুছ তোরে জ্ঞান
দুঃখোতে পড়িয়া হারানু বুদ্ধি আর জ্ঞান।
শিবকো দুয়ারো মেইরঙ্গ বেরঙ্গ ফুলও
হে শিবো মুই হারানু কলার হায়রে স্বামীধন।

খোসা ঃ সুরঙ্গ শিমূলে দেখি আইলো ভোরমোষে পঙ্খি।
দিনু ধোকা লাগিল ফোকা মিছাতে ঠেকিনু হে পরবাসা।
হায় হায় দৈবা আজ কিনা হইবা।
ভাসিমো সাগরে বিকিরমো নগরে
হায় হায় জলপঙ্খি মোর আজি কেন মরে।

রাধে ঃ সোনা ঘেরি কইয়া রূপর ঘেরি গে
ভরিয়া পানি ভরালো রাম জোলানি বাতি।

ফাকির ঃ ভানু বিক্রম হোলসা বাড়ি মনো হইল খুশী।
বিরতা জমিন না পাইলে ভাই জামা করিল বেশি।
বিষ্ণুপ্রসাদ জমিদার বিছত করে ঘর।
ফাউদারি মচাইমো ভাই রই তিলার উপর।
ভুপাল সিং লপটেন মামলা বানে সন্দি।
নেপাল হাতে আসিল কাগজ, লোকলা হইছে বন্দি।

কৃষ্ণ ঃ সতী হোনা ছিল রাধে ইয়ারালিকে ফুল ছাড়িয়া না গেল রাধে অনেকদূর।

রাধা ঃ কাশী কুশি বৃন্দাবনে ফুল তুলিতে তিনজনে
ফুল তুলিতে হারানু স্বামী গে ঐ না কুঞ্জবনে।

ফাকিরি ঃ হে বক বগলা ঠক ঠকলা খাইতে নি মোর

রাধে ঃ মন আসিছিল চন্দ্রাবলী ঘুরি গেল ঘর।
কদমোকো ডালি ধরি নেহরা করেছ হরি

তাহো ছায়া মোর না হয় মনুমান।

বতিয়া ঃ হে সোন্না চোরা রূপ গে মামি সোনা চোরায় মুখ।

(নারদ) সোনা রূপা খোলায় নিলে চুকায় রবে মুখ।

ফাকিরি ঃ আইসা বাড়ি বাইশা বাড়ি

ডামডিম চিল্লামারি

শতকিয়া পার্বতীপুল গয়াগঙ্গা শতদ্রুর।

আঠারো কামারো বন্ধু ধাক্কা মারে পাক্কা

কিষণগঞ্জের রেল্লীবাবু পাটা কিনে বেশি। কল মইধ্যে কল কইল্যে ভাই টিকট কাটা ঘর।

তাহার অধিকার দেখো জলপাই শহর। জলপাই শহরে ভাই ভালো ভদ্রলোক। পশ্চিম

তিকার পছিমা ভাইরে দোকান করে খুব।

মূল ঃ কাচি কুচি পয়া মাছের ভাজি

তুইরে চেঙরা লোক পাকাছিস ঘোরে নাই রে রাজি।

বতিয়া ঃ ঘরের আগোত বকাতি চুঁয়া হেলা পইছে বন।

আর তুইরে চেঙরি নুক পুকাছিস মোরে নাহি মন।

রাধে ঃ গালা ভোরে গালা সোবে গাহে

নারীকে দেখিবে সীতারে সিঁদুর।

ঘুরোয়ে ঘুরোয়ে ওহে পরভু

সিঁড়ি লোয়ে ভূমে পরভু

তোরে শোকে ও দরিয়াত দিমো ঝাপ।

ফাকিরি ঃ এল্লে ঘুঘু বেল্লে ঘুঘু সবে ঘুঘু চোর

মাটিয়া ঘুঘু ডিমা পাড়ে লোটর পোটর।

নট করে নটুয়া ভইষের কটুয়া আনাকো

বেটি জুয়াকো তেল, তেল পাড়িয়া কুন্তি গেইল,

এক নারী তেল লিয়া ডাণ্ডি ঘর গেইল।

কাক বলে কালকাতুয়া লাল কিনা তোর ঠোঁট।

কুনঠে খালো মহা মাংস কোহে দেনা মোক।

ঐঠে খানু মহা মাংস খেপিনু বাসর বাতি

মূল ঃ আশা দিয়া নৈরাশা কইলু তুই ছনছনমতি।

কলসি ওঠায় কলসি জুবায় কলসি না যায় তোলা।

হাসিয়া হাসিয়া আসিয়া চেঙরি কান্দিয়া গেইল ঘর।

বতিয়া ঃ দিন হইলো কুদিন, বর্ষা হইল মোর কাল

এমন দিন পইছে মামি হরিণ চাটে বাঘের গাল।

রাধা ঃ দাও রে হোনা গেলো রাধে আপনারো মন্দিরে

রোমোনী রোমোনী বইলে গেলো হারায়ে।

ফাকিরি ঃ শাল মাছে গিবিং গাবাং শোল মারে হুয়া

সবে মাছ গুয়া পাইলো না পাইলো টেপুয়া।

আছেন দরো পইয়া মাছ বলায় ডগর ঘাটি

সাজনি করিল পুটি হাগুা চারি।

(মিলন গান)

মূল ঃ আনোরে বাটার পান সর্বলোকে খায়

রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইলো স্বর্গলোকে যায়। (চারবার)

সংগ্রহসূত্র ঃ নগেন মল্লিক (৭০) ও রণ মল্লিক (৬৩), কেটুগাবুর জোত, নকশালবাড়ি, দার্জিলিং, তাং- ০৫.১০.১০।

পালাটিয়া— খাস পাঁচালি

কাঙ্‌ভাঙ্গা-ঢেঙপাড়ীর পালা

।। বন্দনা।।

আসরেতে উঠিয়া
ভক্তি করি' বন্দু মাতা—
ওমা কমলা,
বুঝা না যায় বৈভোবের খেলা
ওমা, খেলাইতে খেলাইতে খেলা,
গগনে ডুবিল বেলা;
জলে উপর ভাসেরে শিলা—
একি তমার অনন্ত নীলা।।
দেখিয়া কলির ভাব
অন্তরে নাগেছে তাপ;
কতো আর করিমো ভাবেনা।।

[কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ

কাঙ্গভাঙ্গা ।। আরে ভাই বস্তি-আওলার ঘর,
কুন্‌দিয়া যাম মুই জালু দেউনিয়ার ঘর।।
বাজেলোক ।। তুই কাঁয় রে ভানি? তোর কি নাম?
বাউধিয়া ।। মোর নাম কাঙ্গভাঙ্গা;
মোর বাপোর নাম নাঢেঙ্গা।
দেউনিয়া দিছে পাশ
মামেলা করি' কত্ ঝনকাক
খিলায় দিছে মাঁস।
তার বেটা মুই জলটুপা—
ভগমান কইছে মোক
সগারে ভার-উভা।।

বাজেলোক ।। কিসের ভার উভাচিত্?

বাউধিয়া ।। দহির ভার উভাছুঁ।

বাড়িটার কার বেহা হোক—

দহির ভার উভিবা' নাগে মোক।।

দহি আনিবা' গেইছুঁ একবার

মানিকডাঙ্গা।

কাঙ্গ ভাঙ্গিয়া নাম পইছে মোর

কাঙ্গভাঙ্গা।।

বাজেলোক ।। কাঙ্গ্ ভাঙ্গিচে না কি তে?

বাউধিয়া ।। ভাঙ্গিচে না তে!

তাতে ভাই এলা

দেউনিয়াগি' শিকিবা' চাহাচুঁ।।

বাজেলোক ।। তা হোলে যা, —

হামার আজি তাংকু নাই,

বিড়ি একটা খা।

দেউনিয়ার পাকে জালু-দেউনিয়া

নামটা কইছে জারি।

চলিয়া যা, ওইটা হয়

জালু-দেউনিয়ার বাড়ী।। [প্রস্থান

বাউধিয়া ।। ন'স ভাই, মুই যাও। .....

—দেউনিয়া ভাই, দেউনিয়া ভাই,

বাড়ীত্ আছিত্, না নাই।।

জালু ।। কাঁয় রে বা', তুই কাঁয়?

ব'স ব'স, ঘরের্তি আয়;

কহদি' বা কিতায়—?

বাউধিয়া ।। মুই বা' তোক গুরুদাই দিব' আসিনু, মোক দেউনিয়া-গি' শিকাও। মোর একটা কাথা শুন্।

।। গান ।।

হামার ভাগ্যে কাঁহো নাই

বড় দুঃখে দেউনিয়া ভাই,

দিনু গুরুদাই।।

ধন-সম্পতি ফুরায় যায়য়া

মান্‌ষির ভিতরে ও মুই

নাই রে নাই ।।

এমন মোর করমের ফল

খাটে না মোর বুদ্ধি বল;

থমকে থমকে পড়ে চক্ষের জল।

এই ছিল মোর কপালে নেখা

ঈশ্বর কইছে মোকে কলুর কল।।

এমন হোলে ভগবান—

নাইরো মোর মান-সন্মান;

এমন শালার ধাতিংধিঙ্গা কপালখান—

অঘনি জ্বলেছে দেহা—

দুঃখের নাইরো মোর অবসান।।

বাউধিয়া ।। গুরুজী, শুনিলেন না মোর বা' বড় দুঃখ।

মোর দুঃখের সীমা নাই,

তাতে দিনু গুরুদাই।

মোক বা' দেউনিয়াগি' শিকাও।।

জালু ।। হে বা', আজিকালিকার মইধ্যে মুই

দেউনিয়া হইচুঁ খোপা;

দেউনিয়াগি'তে বোকশিশ্ পাইছুঁ

সাহেবের টোপ।

আর হইচুঁ ইউনিয়ান বোটের মেম্বর

কুন্ বেটাক্ মুই করিম ডর।।

আচ্ছা, বা', দেউনিয়াগি' শিকিবো, শিকেক।

কিছুদিন বা' মোর বাড়ী টিকেক।।

— কইরো, শুনিলো না?

[ঢেঙপাড়ীর প্রবেশ

ঢেঙপাড়ী ।। কিতায় ডাকাছিত্?

জালু ।। এইটা চেঙ্গেড়া বোলে মোরে ঘর ওভে;
শিষ্-বেটা হোবে।
চেঙ্গেড়াটাক চাইটা খরাক দে।
মুই যাছুঁ ইউনিয়ান বোট্,—
নিকলায় দে একখান দশটাকিয়া নোট;
কালি হোবে ইলেকশন,
দিবা' নাগে ভোট।। [প্রস্থান

ঢেঙপাড়ী ।। আচ্ছা বাউ, তোর কাঁয় কাঁয় আছে?

বাউধিয়া ।। মোর বা কাঁহোয় নাই।
বেহা-সাদিও হয় নাই।
তমার ত গুরুজীয়ানী,
বুঝি জিহা-পুতা নাই।।

ঢেঙপাড়ী ।। নাজের কাথা বা কাঁয় কোভে,
কুনকালে হামার জিয়া-পুতা হোবে
কান্দিতে-ভাবিতে মোর দিন যাবে।।

বাউধিয়া ।। দেউনিয়া নোকের টাকা মেলা;
তমার ভানি কিসের জ্বালা।
তমা' আর কিতায় ভাবিবেন!

ঢেঙপাড়ী ।। মুইতে বাপোই কিতায় ভাবেছুঁ, মোর কাথা শুনেক।

।। গান।।

ও মোর বাপোই রে,
নাজের কাথা কভা' না মনায়।
ধানটার পেটত্ চাউলটা বাপোই
জানে না আর কাঁয়।।
কি ভাগ্যের কপালের ফলে
নিধি মোক ছলিল্ কুন্ ছলে হে;

অন্তরে মোর অঘনি জ্বলে,

শাগে-ভাতে না মিলিলে—

পেট ভরে কি চুয়ার জলে?

শুনিয়া তোর গুরুজীর রাও

জ্বলিয়া ওঠে মোর গাও;

তোর লাখা স্বয়ামী যদি পাওঁ —

এলাও মুই হবা' পারুঁ

সাত ছাওয়ালের মাও।।

ঢেঙপাড়ী ।। শুনিলো না তোর গুরুজীর কাথা।

হিনে সে তোর গুরুজী, দেউনিয়া পাকে পাশ—

যেই ধইচে অক্ মরণ কাশ

কটি নাইতে

তোর গুরুজী উঠিয়া খায় ঘাস।

তুইহে বাপোই,

মোর পূরা মনের আশ।।

বাউধিয়া ।। যেইটা কাথা কোলো বা

সেইটা ত হয়;

হুলা কাম করিতে মোক

নাগেছে ভয়।

গুরুদাই দিয়া

দেওঁ যদি মন্দ কামত্ পাও

তমা'তে হবেন মোর গুরুয়ানী মাও।।

ঢেঙপাড়ী ।। সেইটা কাথা বাপোই তোর

বুঝিবার ভুল,

গুরুয়ানী মাওটা নদীর কূল।

যেমন নদীর জলে সগায় করে চান

মাইয়া নোক হামা' নদীর সমান।

মাইয়া নোকের হামার

দেও-দেবতা নাই;

রাধা ছিলেক মুহাসোতী

তাঁয় বোলে নাংঘাই।

গুরু-শিষের বাপোই সমন্দে নাই।।

বাউধিয়া ।। তা হোলে বা মোরো কাথা শুন্।

।। গান ।।

আজি হাতে তোর হাতত্

সঁপিয়া দিনু জান;

আখে-মারে যা করে

মোক ভগমান।।

এই নে কি মোর কাঁহয় নাই

ইষ্ট-কুটুম বাপ-ভাই;

হে গুরুজীয়ানী,

তুই আর মোক কি পাকত্ ফেলাইস ভানি।।

গুরুজী যদি পায় সন্ধান

বাঁচিবা' মোর ন হায়;

হায় রে হায় রে ভগমান,

গুরুজীয়ানী করেছে মোক যৈবন দান।।

বাউধিয়া ।। মরণ-জীয়নটা সে বা' তোরে হাতত্;

আজি হাতে খামো মহ এখে পাতত্।।

ঢেঙপাড়ী ।। দেউনিয়া হোলে আগত্ হবা' নাগে চোর।

দেউনিয়াগি' বিদ্যাটার

নুচাখিটায় গোড়।

যাঁয় না করে উছুরামি কাম,

তার কি উঠে বাপোই

দেউনিয়াগি' নাম?

তুই অয়হা যা, খায়য়া যা,

কিছুই হাতাশ নাই;

দেখিবা' পারিবো হামার

মাইয়া নোকের ফাই।।

বাউধিয়া ।। সেই বা, মুই সে তোরে সে কাথা ধনু।

এইনং করি' একঠে মুই

ভাগ্যে বাঁচিনু।।

[এমন সমে জালু দেউনিয়া বোট্ হইতে বাড়ী ফিরিল। ঢেঙপাড়ীর প্রস্থান

জালু ।। হাঁ বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা, গোরুলার এলাও জল দিবা' যাইস নাই?

কাঙ্গভাঙ্গা ।। যাছুঁ গে। কণেক তাংকু খাওঁ।

জালু ।। আন্ ছিলিমটা, শুল্কায় আন্, খাই;

আজি বোটোত্ মামেলার নেখা-জখায় নাই। [কাঙ্গভাঙ্গার প্রস্থান

— কইরো, শুনেচিত্ না নাই,

আন, ভাত আন্;

ভোকে আজি মোর গেইল জান।।

[ঢেঙপাড়ীর প্রবেশ

ঢেঙপাড়ী ।। কিতায় ভানি ডাকাছিত্ ভাই,

জ্বরে-জ্বারি আজি সে মুই ভাতে

আন্ধু নাই।

চেঙ্গেড়াটাও আছে চুঁড়া খায়য়া,

জল খাচে ধায়য়া ধয়য়া।

চুঁড়া খাবো তে আনেক জল

আজি দেহাটাত মোর কণকয় না হয় বল।।

জালু ।। এই নে কি মোর শরীল বুড়া

তুই খাবা কহচিত্ মোক শুকান চুঁড়া।

এইলাতে তুই কিতায় না খাইস গালি

জ্বরটা তোর নিকিলাম শালী।।

তোক আজি মাইরটায় দিন।

[মাইর। ঢেঙপাড়ী অজ্ঞানের ভান করিল

জালু ।। এইনং কিতায় করেছিত্। এ বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা, দৌড়া দৌড়া; তোর গুরুজীয়ানী কেনং হয়েয়া

গেল্। বাই বাই, মোক কি ছেড়িবো!

[কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ

কাঙ্গভাঙ্গা ।। হে গুরুজী, এলায় তো গুরুজীয়ানীটা সঙ্গতে ছিলো—

জালু ।। খালি একটা কোপ দিনু বা'রে

আর কিছুই করুঁ নাই;

তাহে মাইয়াটার দম-দুরাশে নাই।

কামটা বা হইল্, নোকটা বুঝি মইল্।।

ঢেঙপাড়ী ।। কান্দিস না, কান্দিস না মড়া;

এইলাতে সয়ামী বুঝিস না তুই।

মুই তো তোক কহচুঁ —

মোক ডাংঘাইস না , গালিও পাড়াইস না;

মোক তে কি দেওটা ধইচে

দেহাটা সে মোর সহে না;

তাঁহ তুই ভাই বুঝিস না।

ভাত আন্ধিবার বাদে

ধান ভুকিবা' ধনু;

ভুকাইতে ভুকাইতে হালিয়া কাঁপিয়া

জ্বরত পনু।।

জালু ।। যা মোর বাইটা

থাকিয়া অহনে যা।

মুইহে ধরেচুঁ ধান ভুকিবা'।

যা বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা ,

তুই চুলা-চৌকা নাগা।।

কাঙ্গভাঙ্গা ।। মুই গুরুজী পারিমো নি।

মুই জল্মে ভাত আন্ধু নি।।

[জালু নিজেই ভাত আন্ধিলো

জালু ।। তুই ভাত খাবো না কি? খাবো তে উঠেক।

ঢেঙপাড়ী ।। দে দি', কনেক খায়য়া বুঝুঁ।

জালু ।। ব'স ব'স, আগোত তোক দেওঁ —

খায়য়া দায়য়া অহিস তুই,

জোলপইগুড়ি যাঁছু মুই।

যা বা'রে কাঙ্গাভাঙ্গা,

জোলপইগুড়ি যাই;

যেইনং জ্বালা পইল্ তে

তোক আখা যাবে নাই।।

কাঙ্গভাঙ্গা ।। মহ গুরুজী না রহুঁ আর—

তমারে খাইতে হইচে ভার।।

মুই তমার নি পারিম ভাত আন্ধিবার।

তমা' আজি যাও,

মুই কালি সাকালে যাম।

আজি গুরুজীয়ানীর জ্বরটাও দেখুঁ।।

জালু ।। কালি তুই সাকালে যাইস। মুই বা যাছুঁ। [প্রস্থান

ঢেঙপাড়ী ।। দেক্ বাপোই, মুই কেমন মাইয়া

মজা মানু ফাঁকত্।

গাহিনী দিছুঁ দেউনিয়ার হাতত্।

অয় কি মোক হেমন্ মাইয়া পাইছে —

আন্ধি' নি খাবে তে

মোক বিহো কিতায় কইছে।।

কাঙ্গভাঙ্গা ।। সেই তো কাথায় বা।

মাইয়া নোক তমার বুদ্ধি ভারি।

অখড়েবা পারেন তমা'

জিয়ত্ বাঘের দাড়ী।।

মুই যাছুঁ জোলপইগুড়ি—

খায়েন তে আনু নাড়ু-মুড়ি।।

ঢেঙপাড়ী ।। শুন্ শুন্ প্রাণো বন্দু,

হাত ধরেচু তোর—

একটা কাথা শুনেক মোর।

।। গান।।

ডালে বসি' বাজাও বাঁশী,

তবক-খিলি বন্দু খা রে খা; —

ওহোরে কাঙ্গাভাঙ্গা, —

মোর বাউধিয়া।।

তুই বন্দু মোর স্বর্গের তারা

মোর নারীটার কপাল পড়া;

কোন্‌কালে করাবে বিধি রে হে বন্দু,

তুইহে-মুইহে একজড়া।।

যদি বাপোই মোক ছেড়িবো;

মোর নারীটার মাথা খাবো।

মোর নাখাতি ঢকের মাইয়া

রে হে বাপোই,

অংসালে তুই কুন্‌ঠে পাবো।।

কাঙ্গভাঙ্গা ।। গুরুজীয়ানী, মোরো একটা কাথা শুন্

।। গান।।

এমন দিন গুরুজীয়ানী

আর কুন কালে হোবে;

ভোকোত্ ভাত, পিয়াসত্ পানি

কাঁয় মোকে দিবে।।

ওগে জান গেলে নাই ছেড়িম পাছ

তুই হোলো মোর শান্তির গাছ;

গে গুরুজীয়ানী,

দেউনিয়া-ভাতারের হাতত্

দিলো গাহিনী।।

ওগে, নারীজাতি অবিশ্বাস

তাতে মোর না হয় সাহাস;

তুই যদি মোর পূরাইস মনের আশ।।

কাঙ্গভাঙ্গা ।। গুরুজীয়ানী, মুই যাছুঁ।

যাছুঁ তে যাছুঁ,

নাইতে খাড়ায় আসেছুঁ।

[চেরকেটুর প্রবেশ

— আচ্ছা গুরুজীয়ানী, তমার বোলে ছয়ায় নাই, হিটা ছয়া কার?

ঢেঙপাড়ী ।। হিটা ছয়া পষানী আনিছি।

পরার ছয়া দেখিয়া কি জুড়ায় দেহা।

তোর গুরুজী কইল্ মোক সাদের বেহা।।

এইটারতে অয় করেছে দয়য়া;

মোর সে নাইরো ময়হা।।

[চেরকেটুর প্রস্থান

কাঙ্গভাঙ্গা ।। গুরুজীয়ানী, মোর বেলা হইল্, মুই যাছুঁ।

[কাঙ্গভাঙ্গার প্রস্থান। জালুর প্রবেশ

জালু ।। কেনং তে জ্বর তোর

পালাইছে না নাই; —

কাঙ্গভাঙ্গা জোলপইগুড়ি

কিতায় যায় নাই?

ঢেঙপাড়ী ।। গেইছে নি তে, কেত সাকালে গেইছে।

তহ ছাড়িলো ঘর—

মোর আসিল্ জ্বর।

তুই বেড়াছিত্ দেউনিয়াগি' করি'

মোর কাঁয় করে খবর।।

জালু ।। তা হোলে তো আজিও ভাত আন্ধিস নাই!

ঢেঙপাড়ী ।। নি আন্ধু।

জালু ।। এত কাচাল কি করিবা' মনাছে ভাই, —

আজিও ভাত আন্ধিস নাই।।

[চেরকেটুর প্রবেশ

ছয়া, চেরকেটু।। বা' গে বা' মুই নাড়ু খাম।

জালু ।। ধাইৎ, ছয়াটাও আরো কাচাল নাগাইল্।

হে নিগা, জুলাপি আনিছুঁ এক পোয়া—

তোর মাওর নগত বসিয়া খা।

মুই যাছুঁ ভাত আন্ধিবা।।

ঢেঙপাড়ী ।। কী-টা ভানি আন্ধিবো ভাই —

চাউলের একটা গুষ্টি নাই।

ভাত খাবো তে ধান ভুকা

নাইতে তুই কটি শুকা।।

জালু ।। যেই দিনা বোট হাতে আসিনু

ভাত আন্ধিয়া খানু।

আজি জোলপইগুড়ি হাতে আসিনু

থকিয়া-নটিয়া—

এলা কি মনাছে ধান ভুকিয়া ভাত আন্ধিবা'।

ন হায় হিলা ভালো কাম

কালি পাঞ্জি দেখিবা' যাম।

কি দেওটাতে ধোলে তোক—

সাঁতেবা' তুই আছায় ধোলো মোক।।

[দেউনিয়া ধান ভুকায় ভাত আন্ধিলো

জালু ।। ভাত খাবো না কি,

তোর বাদে আনিছুঁ মুই ভেজিটেবিল ঘি।

বাদাম তেলের তরকারি

খায়া যা কেনা;

ঘিউ দিয়া ভাত গুটিক

খায়া বুঝেক না।।

ঢেঙপাড়ী ।। দে দি', কণেক খায়া বুঝুঁ

ভেজিটেবল ঘিউ;

চোপোর রাতি জাড়ে মোর

ধস্ ধসাছে জিউ।।

জ্বরে জ্বারি কি আর

খাবা' মনায় ভাত;

না পইতাইস তে আসিয়া মোর

নাড়িয়া দেখ্ দি' হাত।।

জালু ।। আগত্ মুই খাওঁ ভাত—

সেলা তোর নাড়িয়া দেখেচুঁ হাত।

খাবা' বসিচুঁ মুই আন্ধন ঘরটাত্।।

[জালু আন্ধন ঘরে খাবা' বসিলো। কাঙ্গভাঙ্গা আসিলো

কাঙ্গভাঙ্গা ।। গুরুজীয়ানী, গুরুজীটা কি জোলপইগুড়ি তকা আসিচে?

ঢেঙপাড়ী ।। তোর গুরুজী আসিয়া

খাবা' ধইচে ভাত; —

চুপ করিয়া থাকিয়া অহ

মোর বিছানাত্।।

[কাঙ্গভাঙ্গা ঢেঙপাড়ীর বিছিনাত্ থাকিল। জালু আসিয়া ঢেঙ্পাড়ীর হাত নাড়িয়া দেখিল

জালু ।। বা রে বা, কি ভয়ানক জ্বর;

তাহে মুই ছেড়িয়া বেড়াছুঁ ঘর।

নাড়ীটা যেমন চলেছে এলগাড়ির তার;

দুইখান ঠেং তো তোরে

দুইখান ঠেঙ্গা কার?

ঢেঙপারি ।। দুইখান ঠেঙ্গা জ্বরের

দুইখান ঠেঙ্গা মোর;

হুলা ঠেং না নাড়িস

জ্বর হোবে তোর।।

ছয়াটাক নিগিয়া

তোরে শেষাত্ থাকা;

জ্বরে সে আজি মুই

করেছু আঁকাবাঁকা।।

জালু ।। ঠেং-আওলা জ্বর তো মুই দেখুঁ নাই;

হিখান জ্বরের এলা কি করু উপাই।

পাঞ্জি না দেখালে আর চলিবে নাই।

তোর জ্বর দেখিয়া

মোর মুখত্ নাইরো আও;

তুই কি মোক ছেড়িবো

চেরকেটুর মাও?

—মোর একটা কাথা শুন্।

।। গান।।

তুই মোর বড়য় আদরের মাইয়া

গে হে চেরকেটুর মাও;

তুই মরিলে মাইয়া কুন্ঠে পাওঁ।

করিয়া তোক বিহো-সাদি

ফুরাইসে মোর ধন-সম্পতি;

জ্বর দেখিয়া মুখত্ নাই মোর আও।।

ঠেকাবে কি পর্মেশর

জিউটা মোর নাগেছে ডর;

কুন্কালে নাই দেখুঁ মুই

ঠেং-আওলা জ্বর।।

জালু ।। আজিকার আতিটা যদি

ভালে ওলো তুই;

পাঞ্জি দেখিবা' কালি সাকালে

যাম মুই।।

[জালু পথে চলিতেছে। ফাঁস গান—

রে বল্দা নইয়া

কেমনে যাবো ভোবো-নদীটা বইয়া।।

ভোবো-নদী ওই পারে

সাধুগুরুর থানা;

সাধু হইলে যাইতে পারে—

পাপী যাইতে মানা।।

ধন-সম্পতি ফুরায় দিয়া

সাদের কোলো বিহা;

মাইয়ায় তোর মারিবে জীবন—

শুনেক রে দেউনিয়া।।

[প্রস্থান

জালু ।। যাওঁ দি' কণেক

শামুক পাঞ্জিয়ারের ঘর;

মাইয়াটাক ধোলে মোর

কেমন জ্বর। ...

— শামুক দাদা, শামুক দাদা,

বাড়ীত্ আছিত্, না নাই;

মোর কণেক পাঞ্জি দেখ্ তো ভাই।

মোর মাইয়াটার জ্বরখান

পালাবে, না নাই।।

শামুক ।। হে জালুদা, বস' ব'স,

তাংকু খাই;

পাঞ্জি দেখিয়া এলায় কহচুঁ ভাই।

— আন তো বেটী পাঞ্জিখান।

[বেটি পাঞ্জি আনিলো। পাঞ্জি দেখিয়া

।। গান।।

মেষ-বিরিষ-মিথন—

তোর মাইয়াক ধইচে খিয়াল স্বপন।

মকর-কুম্ভ-ধনু-মীন—

জ্বর পালেবার নাইকো চিন্।

কইন্যা-তূলা আর সিং—

জ্বর চলেছে আতি-দিন।

পাঞ্জি দেখিয়া মোর

নাই নাগিল খোশ্;

তোর মাইয়াক ধইচে

পর ছুঁতি দোষ।

একে শূন্য দশ, দুইয়ে শূন্য বিশ—

ভালো অধিকারী দিয়া

একটা স্যাবা দিস্।

তাহোলে পালাবে জ্বর—

পাঞ্জি দেখা হইল্ মোর

চলিয়া যা ঘর।। [জালু বাড়িতে আসিল

জালু ।। শুনেচিত্ না চেরকেটুর মাও,

জ্বরখান কি আজি

খুবে দেছে তাও?

পাঞ্জি দেখিয়া আসিনু ভাই,

স্যাবা না দিলে বোলে হোবে নাই।।

ঠাকুর বাড়ীটা করেক ভাও

মুই একটা অধিকারীর বাড়ী যাওঁ।

দুত-কলো-দহি-মিঠাই

বাড়ীত্ নিমো;

তাঁহো আজি স্যাবা দিমো।।

ঢেঙ্পাড়ী ।। জ্বরে-জ্বারি মুই

ঠাকুর মুছিবা' নি পারিম;

তুই পারিস তে ভাই কর—

নাইতে '—' জ্বর।

জালু ।। অধিকারী বৈরাগীক

আগোত গুয়া দিয়া আসুঁ;

না পারিস তে মুছিবা'

মুইহে মুছেচুঁ।।

[জালু-দেউনিয়া নিমতরণ দিয়া আসিয়া ঘর দুয়ার মুছিলো। দুত-কেলা-দহি-মিঠাই সপ আনিলো। মাইয়াটা ছয়াটাক চিম্‌ঠায়, ছয়া কান্দে—

জালু ।। ছয়াটা আরো কিতায় কান্দেছে হে —

ঢেঙপাড়ী ।। তোর ছয়া কলো চাহাচে।

জালু ।। দে, দে দুইটা, খাউক।

[এই রকমে ছয়া সেবার খরচ সপ খাইলো। অধিকারী-বৈষ্টম সবে আসিল

অধিকারী ।। দেউনিয়া ভাই,

স্যাবার জগাড় হইচে, না নাই?

জালু ।। কত্‌খুণে জগাড় হইচে।

বৈষ্টম ।। হরিবোল, হরিবোল।

জালু ।। ঠাকুর , ব'স ব'স,

ঠেং-গা ধো।

ঝলাটা তুলিয়া থো।

তমা' পান-তাংকু খাও—

ঠাকুর বাড়ীর খরচলা মুই

নিয়া আসুঁ যাওঁ।।

বৈষ্টম ।। নেওঁ বাবা, তাড়াতাড়ি স্যাবা দেও। আমাকে ভোক নাগিছে।

[জালু যাইয়া দেখে কলো-মিঠাই কিছুই নাই

জালু ।। হিলা আরো কেনং কাথা ভাই;

দহি-চুঁড়া-কলো-মিঠাই

কিছুই নাই।

ছয়াটা কি তামানে খাইল্।

ছয়াটা খাইল্ কি ভুরী টায় খাইল্

মুই কিছুই বুঝুঁ না।।

ঢেঙপাড়ী ।। তুইহে তো খাবা' কোলো—

মাথার উপর কুন্‌ঠে মোর

ভেদ্-ভেদেবা' ধোলো।।

অধিকারী ।। কই রে ভাই,

দুত-কেলা এলাও নাই ।

চকর কাটিয়া বসি' আছুঁ —

নাইতে মুই চলি' যাছুঁ ।।

জালু ।। অধিকারী ভাই,

স্যাবা দেওয়া আর হোবে নাই।

ছয়াটা মোর পাইচে আর চাইচে —

দুত-কেলা-দহি-মিঠাই

তামানে খাইচে ।।

এইলা কি ভাই ছয়ার ঠাট,

স্যাবা দিলে আরো মোক

করিবা' নাগে হাট।

আজি ভাই যা,

আজি খালি শংটায় বাজা ।।

— ঠাকুর তমরাও যাও,

স্যাবা দেওয়া হইল্ নাই

পান-তাম্কু খাও ।।

বৈষ্টম ।। হে বাবা, হিনং তোমার কেমন কাথা,

ভোকে যে মোর ঘুরেছে মাথা ।।

জালু ।। হুলা কাথা ঠাকুর

না যায় কহা;

তামান খায়য়া ফেলাইসে

মোর আইকস্ ছয়া ।।

বৈষ্টম ।। রামরাম, রামরাম,

ভালো তো ন হায় বাবা

বৈষ্টম হওয়া কাম।

দহি-চুঁড়া খরাকটা এলা

কন্ঠে খা'ম ।।

— তা হোলে বাবা, মোর একটা কাথা শুন।

।। গান।।

মুই হনু ভুতিয়া তমার কথা শুনিয়া;

খুশী ভং করিলো তুই

মোক নিমরতণ দিয়া।।

ওরে, বাড়ী যায়য়া কী-টা খাই

খরাক পানি কিছুই নাই;

চুঁড়া চাইট্টা জগাড় কর—

চাহা দিয়া খাই।।

জালু ।। ঠাকুর, দুত-চিনি কিছুই নাই;

কেমন করি' চাহা খিলাই।।

বৈষ্টম ।। শুনেক রে দেউনিয়া ভাই,

দুত-চিনি তোর নাইতে নাই —

নুন দিয়া চাহা খিলা

বাড়ী চলিয়া যাই।।

জালু ।। ঠাকুর, তুই বড় নোকটা একবাই-একবাই;

কহচুঁ তে হামার চুঁড়ায় নাই।

মোর সে ঠাকুর যাছে জান

তোর খালি হইচে চুঁড়া-দহির টান।

— তুই বাড়ী চলিয়া যা।

বৈষ্টম ।। আচ্ছা বাবা, যাই।

তোর স্যাবা আর

খাবা' আসিমো নাই।

— হরিবোল, হরিবোল। [বৈষ্টমের প্রস্থান

জালু ।। এখন কি করুঁ, কুন্‌ঠে যাওঁ।

অঝা একটা কুন্‌ঠে পাওঁ।

ভাগিনাটা বোলে অঝা হইচে—

অরে বাড়িত্ যাওঁ। ...

— ভাগিনা, ভাগিনা

বাড়ীত আছিত্, না নাই?

শামকুড়া ।। আয় মামা, ব'স ব'স,

খোপ আজি গমন।

জালু ।। হৈ ভাগিনা, বড় কামে আসিনু।

তুই বোলে অঝা হইচিত্,

তাতে আসিনু।

তোর মামীর হইচে জ্বর

তাতে আসিনু তোর ঘর।

জ্বর দেখিয়া মোর নাগেছে ডর

তোর মামীক ধইচে ঠেং-আওলা জ্বর।

নে দি'বা', কি কি করিবো, কর।।

শামকুড়া ।। তা হোলে মামা মুই বুঝিচুঁ—

হুনং জ্বর মুই কতয় খেদাচুঁ।

মামীটাক যেইনং জ্বরখান ধইচে—

যা মামা, বাড়ী যা—

কালি মুই সাকালে যাম বা'।।

জালু ।। সেই বা, কালি ফের যাইস।

জ্বরখান খেদায় দে,

দুই টাকা খাইস।

— মুই বা যাছুঁ।

শামকুড়া ।। ব'স্ তো মামা, একটা কাথা শুন।

।। গান।।

মামা, তুই ছাড়ি' বেড়াছিত্ ঘর

মামীক ধইচে যেমন জ্বর, —

মোর মামা গে,

হুখান জ্বর খেদাইতে মামা

খোপ '—' খাবে।।

ওগে, যা যা মামা কালি যাম।

পছিম পাকের করিম কাম;

হুখান জ্বর মুই একদিনে খেদাম।।

ওরে, হুমন জ্বরের বড়য় ঠেলা,

নাগে একটা মালভোগ কেলা;

হিসাবতে তুই তো মামা

খোবে আজেলা।।

শামকুড়া ।। তোক তো মামা আজেলা কছে

মামীর দুষী নাই।

জ্বরটার দিশাত্ তোক

বাতায় দিছে ভাই।

তাঁহ তুই বুঝিবা পারিস নাই।

যা তুই চলিয়া যা ঘর—

কালি যায়য়া খেদায় দিম

ঠেং-আওলা জ্বর।।

জালু ।। তা হোলে বা, মুই যাছুঁ,

কালি তুই যাইস।

খরাক যায়য়া মোরে বাড়ী খাইস

— মুই বা যাছুঁ।

[বাড়ী যায়য়া

জালু ।। ।। গান ।।

শুনেক গে চেরকেটুর মাও,

হিলা আউষোত কুন্ঠে পাওঁ।

অঝার কাথা শুনিয়া মোর

মুখত্ নাইরো আও।।

ওকি রে এ-এ হে।।

আলোক নতার শিপা নাগে

শলা কচুর পাত;

ঢোপ ভরেবা' নাগে বোলে

বনুয়া হাতীর দাঁত।।

ওকি রে এ-এ হে।।

বেইশার ঘরের মাটি নাগে

মুচির ঘরের চাম;

তেল মাড়িবা' নাগে বোলে

জীয়ত বাঘের ঘাম।।

ওকি রে এ-এ হে।।

দার্জিলিঙের পাথর নাগে

অংপুরের শুকাতি;

আরো একটা নাগে বোলে

খাতেরা চিতি।।

ওকি রে এ-এ হে।।

জালু ।। এ হে, মুই একঠে যাছুঁ।।

[প্রস্থান। কাঙ্গভাঙ্গার প্রবেশ

কাঙ্গভাঙ্গা ।। গুরুজীয়ানী, গুরুজীটা আছে, না নাই?

ঢেঙ্‌পাড়ী ।। তোর গুরুজী বাড়ীত্ নাই।

আয় বাপোই,

হামেরা চাহা-চুঁড়া খাই।। [এমন সমে অঝাটার প্রবেশ

অঝা ।। মামা, মামা, ঘরত্ আছিত্ না নাই?

ঢেঙপাড়ী ।। কহ দি' বন্দু কেমনটা হইল্!

ভাগিনা তো ধইল্।

যা, যা, ধানের পুড়াটাত সন্দায় অহ।

[কাঙ্গভাঙ্গা লুকাইল

অঝা ।। মামী, মামাটা তো ঘরত্ নাই,

তা হলে মোর আসনটা গেল্ যাই।

— ঘরত হুটা কাঁয় আও কাড়েচে?

ঢেঙপাড়ী ।। কাঁহ ন'হায় বা', কাউহাটা ঘর সন্দাইচে— তাতে আও কাড়েচুঁ। ভাগিনা, ব'স ব'স, আগা-

ঘরটাত্ ব'স। কহ্ দি' বা' কুন্ঠে যাবো?

অঝা ।। মামাটা কালি গেইছে মোর ঘর —

তোর বোলে হইচে জ্বর।

তাতে মামী আসিনু।

হুটে না বসুঁ মুই,

তোরে নগত্ বসিম।।

[জালুর প্রবেশ

জালু ।। হে ভাগিনা, আসিয়া পইচিত্!

কেতুখুণে আসিচিত্?

অঝা ।। কেত সাকালে আসিচু মামা!

নে মামা, তাড়াতাড়ি জগাড় কর।

চট্ করি' মুই যাম ঘর।

আজি মামা তাকত্ পইছে—

কেমন মামীটাক ঠেং-আওল জ্বর ধইছে।

তাড়াতাড়ি মোক জগাড় করি' দে—

পরীখাটা দেখিয়া নে।।

জালু ।। কি নাগে বা', কহ্ দি'?

অঝা ।। কিছু মোক না নাগে,

খালি দুত-কেলা আর একটা ঘান্টি।

তা না হোলে দেওটা তোর

হবা' না হয় শান্তি।

আর গুটিক দহি-চুঁড়া,

আর একটা ধানের পুড়া;

আজি হাতে জ্বরটার মুই

অঠায় দিম ধুরা।।

[জালু দেউনিয়া সপ জগাড় করি' দিলো। শামকুড়া অঝা পাক জুড়িলো

শামকুড়া ।। মামা, মামীটাক এইঠে ধরি' আন্।

জালু ।। আয় গে আয় পূজার গোড়—

জ্বরটা আজি খেদাউক তোর।।

ঢেঙপাড়ী ।। ছি ছি আই—

পুড়া-নাগা অঝা হামা' দেখি নাই।।

অঝা ।। মহ্ তো মামী ঠেং-আওলা জ্বর দেখুঁ নাই, তোরঠে দেখিনু।

[রুগী পূজায় আসিয়া খাড়া হইলো। ধানের পুরা আনা হইল। রঝা পাক জুড়িলো, হাতে মশাল নিয়া।

অঝা ।। মামা, যেলা মুই দমটা ছেড়িয়া দিম, সেলা তুই ঘান্টিটা দিয়া পুরাটাত্ কোপ দিস্।

।। ঝাড়ানি ।।

মামার ঘর ছাড়িয়া—

যারে জ্বর তুই দখিণক নাগিয়া।

এহে কালপীর, নরসিং, তমরা দুই ভাই,

দুত-কলা দিছুঁ মুই চিনি-মিঠাই।

দহি-চুঁড়া-পূজা-পানি ভইকণ কর্;

পূজাত নাম্ভিয়া আয় রে —

ঠেং-আওলা জ্বর।

কুন্ঠে নুকায় আছিত্ শালা পুড়ার ভিতর।

এহে ঢেঙ্পাড়ী মামী মোর

ঠেং-আওলা জ্বর—

ডাংঘায় ভাঙ্গিম আজি

জ্বরের কমর।।

[ডাং মারিলো

কাঙ্গভাঙ্গা ।। গুরুজী, মোক ছাড়ি' দাও—

ধরুঁ তমার পাও।

এইলা পাকত্ ফেলাইল মোক

গুরুজীয়ানী মাও।।

জালু ।। হা বা'রে কাঙ্গভাঙ্গা,

তুইহে মোক সাঁতেবা ধইচিত্!

এইলার বাদে মোক

গুরুদাই দিছিত্?

দোষ-গুনা তোর দিন মাপ:

মুই তো ন' হাওঁ গৌতম মুনি

দিম অবিশাপ।

মোর একটা কাথা শুন।

।। গান।।

কাকে কহি ভালো মন্দ

কারয় বিশাস নাই।

হিলা পাপের ভাগী তোর

কাঁয় হোবে রে ভাই।।

ওরে পুরাণতে আছে ভাই

গুরু-মাকে নিবা' নাই।

তোর মনত্ কি কাইগু-গিয়ান নাই?

জানিস না কি ইন্দ্র রাজার

কি হইচে সাদাই?

ওরে গুরু হইল নিদানের বন্দু,

পার করিবে ভোবোসিন্দু।

সেইটা কি তোর মনে নাই?

গুরুয়ানী মাওটা শালা

ত্রিজগতের রাই।।

জালু ।। ভাগিনা, দে শালাটাক ছাড়ি' দে —

চলিয়া যাউক ঘর।

আজি হাতে পালাইল্

তোর মামীর জ্বর।

এলা তো বা' যা ঘর।।

সংগ্রহসূত্র ঃ ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' (১৯৭৩) গ্রন্থ থেকে পালাটি সংগৃহীত।

পালাটিয়া ঃ খাস পাচালি

চিন্তাশোরী/চিন্তাসরী

চরিত্রলিপি

ফাকতাল	-	একটি যুবক/পেশা কৃষিকর্ম
ফাকতালের মা	-	ঐ মা
মিয়া সাহেব	-	একজন ফকির
চিন্তাসরি	-	বিধবা যুবতী
চিন্তার দাদা	-	ঐ দাদা

বন্ধানা

ওমা দেখ কলির ব্যেবহার

পাপে ডুবিল সংসার

ও মা জলপাইগুড়ি ডুবিল জলে

দেখিয়া মন কান্দে সভাকার

চিতান

ও মা পাহাড় ভাঙ্গি আসিল জল সংসার করে টলমল

ও মা জলের বেগে ভাঙ্গে গেল, এল গাড়ির লাইন

ও মা চিত্থা নদীর বান ভাঙ্গিয়া (ভাংগিয়া)

কার ভাসিল বুড়াবুড়ি

কার ভাসিল ছুয়া ও মা জলের বেগে ভাংগি গেল

এল গাড়ির লাইন।

১

ফাকতালের মা ও ফাকতালের পাঠ

ফাকতাল ঃ হাগে মা উত্তর পাসে হামার হুটা কিসের টিপি গে ওইটা মই কাটি ফেলে তাংকু গাড়ি দিম।

মা ঃ হে রা হুটা নাকাটিস ওইটে হাউ ঠাকুরটা আসে, হাউ ঠাকুরটা

ফাকতাল ঃ হা গে মা হুটা ঠাকুরটা পূজা করিলে কি হয়?

মা ঃ হারে বা হুটা ঠাকুরক যায় যেইটা মানে তারে সেইটা ফলে।

ফাকতাল ঃ মা পূজা করিতে কি কি নাগে গে।

মা : বা নাগে আর কি কলা আলয় চাউল খুই এইলা।

ফাকতাল : মা তুই ঠাকুরটা পরিসকার করেক মুই যাছু পূজার খরচ করিবা।

২

পূজা ফাকতাল

গান

ফাকতাল : ওরে হাউ ঠাকুর তোক ভক্তি করু
মনের আশা পুরাইস মোর
দুধে কলা আলয়ে খইয়ে
পূজা করিম তোর।

চিং : ওরে হাউ ঠাকুর
তোক ভক্তি কর
চিন্তাক যদি নিবা পারু
দে মোক বর
চিন্তা যোদি আসে মোরে ঘর

চিং : ওরে যদি বুদ্ধি খটে মোর
তাহলে তোর আছে জোর
মালা ভোক কল দিয়ারে ঠাকুর
পূজা করিম তোর।

৩

চিন্তাসরি : মোর স্বামীটাত মারা গেলেক গাভুর বয়সে
মুই এলা কি করিম যাও ওই স্বামীর কবরটাত
ওইটে কনেক কান্দিয়া দেহাটা জুড়াম।

ফাকতাল : আচ্ছা মুই যাওদি দেখু চিন্তাসরিটাক নিবা পারু কি না পারু। আজি ওর স্বামীর কবরটাত থাকিয়া রহিম ভূত সাজিয়া। চিন্তাসরিটা ত পতিদিন কান্দে। আসিয়া দেখুতো তাহ অক নিবা পারেছু না পারু।

চিন্তাসরি : এইটায় ত মোর স্বামীর কবর। এইঠে কনেক কান্দিয়া দেহাটা জুড়াও। এই স্বামী তুই মোক গভুর বয়সে আড়ি করিলো।

চিন্তাসরি : গান

চিতুন বয়সে মোক আড়ি কন্নোরে

ওকি হায়রে নারায়ণ।

চিং : দারুণ বিধিরে ওরে কি দোসে

মারিলো মোর স্বামীধন

ওরে ধিক ধিক নারী এ ছাড় জীবন।

চিং : দারুণ বিধিরে ওরে কি দোসে মারিলো স্বামীধন

ওরে স্বামীর শোগে মোর যাবে জীবন

ফাকতাল : ডাকেছিৎ কান্দেছিৎ কেনে খালি দেহ্াটাক ফুরালো একেলায় যদি অভা না পারিস তে ফাকতালটাক আনিয়া তুই ডাংগুয়া

চিন্তাসরি : হুই স্বামীটা ত মোর ঠিকে ভুত হইছে। অক যদি মুই না খেদাও তাহলে ত অত্তাচার করিবে।

৪

মিয়া সাহেব : ওই রাজ্যের শুক নাই আর শুক নাই আর

ভাইরে জীবন বাচায় ভার

ভাইরে কাউ না করিলো নুন তেল বোলে

পুরায় না জায় আর

এমা চাইটি ভিক্ষা দেও মা

চাইটি ভিক্ষা দেও।

চিন্তাসরি : হে ফকির তুই আসিল মোর বাড়ী ভিক্ষা করিবা এই সমে মোর দুঃখ দেখিয়া কাউয়া ছিটায় ছিটায় ভাত খায় না।

মিয়া সাহেব : এই মাই তোর আর দুঃখটি কিসের হে, মাই মোক কহ্দি তোর দুঃখটি কিসের।

চিন্তাসরি : দেখ ফকির ওযে মোর স্বামীটা যে মারা গেইছে এলা আর ভুত হইছে আক মুই খেদাও কেমন করি।

মিয়া সাহেব : এ মাই এইটার চিন্তা তোক ধরিছে, মাই তোর কুন চিন্তা নাই এমন হাংকার মাই মুই জারিম কুত্তি যাবে অয়।

চিন্তাসরি : ফকির তাহলে মোর একটা কথা শুন।

গান

কহিতে দুঃখের কথা ও মোর বুক ফাটিয়া যায়

ও মোর চোখের জল মোর পড়ে সদায়।

চিং : কি মোর কপালের লিখন
স্বামীর শোগে যাবে জীবন
মন মোর কান্দে সদায়।

চিং : কি মোর কপালের লিখন
স্বামীর শোগে যাবে জীবন
মন মোর কান্দে সদায়
ওরে স্বামী কি মোর পাপি ছিল
স্বর্গবাসে নাই গেল
ও মোর নাম ধরিয়া ডাকায়

পাঠ

ফকির মোর দুঃখের কাথা তুই শুনিলো।

মিয়া সাহেব : এহে মাই তোর কুন চিন্তা নাই। চল দি যাই কুনঠে তোর স্বামী ভূত হইছে চল।

(ভুত তাড়াইতে গেল)

মিয়া সাহেব : গান

মোর হাংকার রে শালার ভুত
তুই কৈলাসে যা।

চিং : মোর হাংকার শুনিয়ারে শালার ভুত
তুই নাই যাব ছাড়িয়া
হাত দুইখান বান্দিম তোর
চামড়ার দড়ি দিয়া।

চিং : এ মিঠু মিঠু মিঠু পাক
মুই যে কেমন ওঝা
শালার ভুত তুই চিনিবা নাই পারিস তাক
ঘাট্টা ধরিয়া শালার ভুত দেছু দুইটা পাক।

চিং : এ হে মাই চখুনা তার বড় বড়
দাতলা না হয় কম
অভুতটাক দেখিয়া মোর
মন্তরে হারাইল ফম

(ভুত তাড়ায় দিল)

ফাকতাল ঃ আচ্ছা মুই যাওদি কনেক। ওই চিন্তাসরির বাড়ী দেখুদি। চিন্তাসরিটাক নিবা পারছু না না পারু।

মিয়া সাহেব ঃ এই ভাই এত্তি শুনেকদি শুনেক। কহেক নারে। ভাই কবরটাত তুহে ছিলু না কিরে।

ফাকতাল ঃ ধোর ভাই মুই নাহাও।

মিয়া সাহেব ঃ এ ভাই তুই যে রাগ হছিত কিতায়। কবরত যে ছিল ঠিক এখেনে তোর মতন। হারে ভাই তুহে না কিরে ঠিকক্ কহনা।

ফাকতাল ঃ এ ভাই ফকির তোক আর মিছা কাথা কয়হা হবে কি ভাই। মুহে ছিনু ভুত সাজিয়া।

মিয়া সাহেব ঃ হারে ভাই কিতায় ছিলরে তুই। মক কহদি ভাংগিয়া।

ফাকতাল ঃ ফকির মুই যে কিতায় ছিনু শুনিবা চাহাচিৎ? তাহলে শুনেক ওই চিন্তাসরিটাক নিবার বাদে কহদি ভাই কেমন করি নিবা পারু।

মিয়া সাহেব ঃ কহদি ভাই তোর নামটা কি?

ফাকতাল ঃ মোর নামটা ফাকতাল।

মিয়া সাহেব ঃ ফাকতাল এই চিন্তাসরিটাক নিবার বাদে তুহে কবরটাত ভুত সাজিয়া ছিল ওইটাক মুই একটা মন্তরে আনি ফেলাম।

ফাকতাল ঃ মিয়া সাহেব-ঠিক আনিবা পারিবো তাহলে মোর একটা কাথা শুন।

গান

ও কিরে মিয়া সাহেব হাত ধরিয়া কহচু তোক
চিন্তাসরিটাক মিল করিয়া দে মোক।

চিং ঃ চিন্তসরিটার বাদে মোর পালাইছে পেটের ভোগ
আতি দিনে মন কান্দেছে কি আর কহিম তোক।
কি আর কহিব বাপ কহ মোক।

চিং ঃ চিন্তাসরিটার বাদেরে মিয়া সাহেব
ভাতে খাবার মনায়না
বিছানার থাকিয়া মোক
নিন্দে ধরে না।

(কথায়) মিয়া সাহেব তুই জোদি মোক ওই চিন্তাসরিটাক আনি দিবা পারিস তাহলে তোক এক্‌শ (১০০) টাকা দিম।

মিয়া সাহেব ঃ ফাকতাল টাকা শটি দেদিহেনে। তোক চিন্তাসরিট লাগিবে তো এহে মুই জাছু তুই টাকাটি দেদিহেনে।

ফাকতাল ঃ মিয়া সাহেব—ঠিক দিবো তো আনিয়া চিন্তাসরিক।

মিয়া সাহেব ঃ ঠিকে দিম আনিয়া। তুই টাকাশটি দেদি। মুই যাছু চিন্তার বাড়ী।

৬

মিয়া সাহেব ঃ চিন্তাসরি বাড়ীতে আছিনা।

চিন্তাসরি ঃ হই ফকির আজি আর আসিল কিতায়।

মিয়া সাহেব ঃ চিন্তাসরি আসিনু আর কেনে তোর বাড়ী। ওইটা ভুত না হয় মাই। ওই ফাকতালটা ছিল ওই ভাবে ভুত সাজিয়া তোকে নিবার বাদে।

চিন্তা ফাকতালট নিবা চাহচে তোক

তারে বাদে ১০০ টাকা দিছেরে মোক।

চিন্তাসরি ঃ হই মিয়াসাহেব হুটা আর কেমন কাম করিচিত তুই।

মিয়া সাহেব ঃ মাই হুটা বুদ্ধি মোরঠে আছে। তোর দেওরটা আছেনা। অয় তো বোবা। অক কহিস যে তুই যে ঘরটাত থাকিস ওইটা ঘরত অক থাকিবা আর তুই মোর নগত চলি যাবো তোর ভাইয়ের বাড়ী। তোক নিগায় থুম। আর কহিম ফাকতাল আতির ১২ টার সময় যাইস। মাই মুই তাহলে যাছু ফাকাতালের ঠে। মাই ভুল জেনে না হয়।

৭

মিয়া সাহেব ঃ ওই ফাকতাল এতি শুনেকদি মোর একটা কথা।

গান

ওরে নামটা তোর ফাকতাল ডাংগাত পাতাইছিত জাল

সাদ কিরে তোর বুদ্ধি চড়িবে আগে দেখি ঘামাইতে হবে।

চিং ঃ ওরে কোন বংশে তুই মাছ নাই মারিস

ডাংগাত পাতাইছিত্ জাল

আগে দেহা না নেটালে কেমনি খাবো শাল

ও তুই ডাংগাত পাতাইছিত জাল।

মিয়া সাহেব পাঠ

এই ফাকতাল কিছু আর টাকা পইসা দে। তোর আর কনু চিন্তা নাই। তামান ঠিক আছে। এ হে শুনেক দি মোরঠে। চিন্তাসরি মোক এখেনে কথা দিয়া দিছে উত্তর ঘরটাত চিন্তাসরি

থাকি রহিবে তুই আতির ১২ টার সময় যাইস চুপ করি জানিস ত কুকুর আছে। হাতখানা ধরিস তাহলে চলিয়া আসিবে। কিন্তু কথা কহিস না। নাহলে কিন্তু ঠেলা পাবো। মুই গেনু।

৮

মিয়া সাহেব ঃ মাই ফাকতালক কিন্তু কাথা ওইভাবে কহিচু ওয় মাই আজি আসিবে। অন্‌ক তুই চল মোর নগত তোর ভাইয়ের বাড়ী তোক থুইয়া কয়হা আসু।

(মিয়া চিন্তাকে নিয়া গেল)

৯

(ফাকতাল বোবাকে চিন্তাসরি মনে করি তার বাড়ী নিয়া গেল)

ফাকতাল ঃ মাগে মা একটা মুই কইনা আনিছু আজি আতিটা তোরে নগত থাকা। কালি সেলা একটা সেবা দেওয়া যাবে।

(বোবাকে খিদা লাগাইছে তার মা ভয় পায়)

মা ঃ হারে বাউ বাই হিটা আর কি আনিছিত বা।

ফাকতাল ঃ হাগে মা কি হইল গে তোর।

মা ঃ হারে বেটা তুই এইটা কি আনিছিত দেখছি। গংগাটাক আনিয়া মোর নগদ থাকালো, বেটা তুই মোর একটা কাথা শুনেক কি তোক আর বাড়ীত রহিবা দিবা নাহাও বেটা শুনেক দি।

মা ঃ গান

ভাগরে বেটা কলংকিয়া মারনে বিদেশ যায়া

বাচিয়া তুই আছিত রে কিতায়।

তোক ত আর দেখিবার না মনায়।

চিং ঃ ওরে চোখ থাকিতে আন্দেলা হোল

মাইয়াক ছাড়ি মদ্দক্ আনিলো

গংগাটাক আনিয়া তুই মোর নগদ থাকালো

তুইত মোক চমকালো।

পাঠ ঃ বেটা বাড়ী থিকে নিকালিয়া যা

ফাকতাল ঃ মা মুই যাছু চলিয়া ।

(বাড়ী থেকে বাহির হইয়া গেল)

হায় ভগবান মুই কি করিনু মনের দুঃখে একটা গান করু।

গান

ওরে আপন দোষে সবেতো হারানু হে হায় বিধি
দিনেতে মোর হইল আন্ধার আতি।

চিং : ফকির শালার বুদ্ধি ধরিনু
ধন মান সবে হারানু
মোর কি হবে গতি।

চিং : ওরে কুনঠে গেলে চিন্তাক পাম
দেখিয়া কনেক দেহাটা জুড়াম
এ জীবনে নাই মোর সুখ শান্তি।

পাঠ : যাওদি দেখু ফকিরটারে দেখা যদি হয়।

১০

মিয়া : মাই তুই চল মোর নগদ তোর আর ছাড়াছাড়ি নাই।

চিন্তাসরি : ফকির তুই মোক কি পাকত ফেলালো মোর একটা কথা শুনেকদি ফকির।

গান

নানান তালে আনিয়ারে তুই
মোক বিষম পাকত ফেলালো
তোর কি মনে ফকির এই ছিল

চিং : দেছু তোকে ধরম দাই
ওরে অবাগনির আর কেহ নাই।
মোক নিলে তোর লাগিবেরে ফকির
আল্লাজির দহাই।

চিং : ওরে পাও ধরিয়া কহচু তোকে/ছাড়িয়া দে মোকে/ও ভাই আমার কেহ নাই।

মিয়া : মাই ও কথা চলিবে নাই মোর একটা কথা শুনেক মাই

গান

ও মাই কান্দিলে রক্ষা করিবে কে
স্বামী বোলে মানেক মোকে
জীবন গেলে মাই ছাড়িবা নাহাও তোকে।

চিং : ও মাই গে হে তোক আনিনু মাই বড়য় গে আশে

জিয়া পত বাড়ী মাই নোগাম তোকে

দন জনে বেড়াম সুখে।

চিন্তাসরি ঃ ফকির তোর পাও ধরি কহচু তুই মোক ছাড়িয়া দে।

মিয়া ঃ মাই হুলা কাথা তোর চলিবে নাই।

চিন্তাসরি ঃ ফকির তাহলে তু মোর একটা কথা শুন।

গান

তুই মোক ছাইড়া দেরে ফকির ছাইড়া দে

মা জলনী কান্দিবেরে মোর বাদে

চিং ঃ তাহ যদি না হয়ে রে ফকির

গলার মালা ভিক্ষা লে

তাহ যদি না হয়ে রে ফকির

কানে সনা তাহ লে

তাহ যদি না হয়ে রে ফকির

হাতের চুড়ি তাহ লে।

ফকির ঃ মাই চল মোর নগত।

(ফাকতাল আসে)

ফাকতাল ঃ হারে ফকির তুই এইরকম মানিস ছা ফকির ছাড়ি দে চিন্তাসরিটাক মুই নিম।

মিয়া ঃ হুলা কাথা বলিবা না হয় মুই নিম।

(এখানে দুইজনে টানাটানি করিবে)

চিন্তাসরি ঃ গান

এ ভাই শুন মোর একটা কাথা

কেন বুঝনা মুই হনু একেলা নারী

তোমরা দুজনা।

চিং ঃ তোমরা করেন টানাটানি

মুই হনু একেলা নারী

ও ভাই প্রাণে সহেনা।

চিং ঃ ওরে শিমিলায় কি হয়রে চন্দন। পরনারী কি হয়রে আপন। ও ভাই তাহ কি জাননা।

চিন্তার পাঠ ঃ দেখ ভাই তম হলেন দুই জনে মুই হনু একেলায় কহদি মুই কারঠে জাম ভাই মোর একটা

তমা কাথা শুন যাহ্ জিতিবেন মুই তারঠে যাম কাথা আর কি এইটা ডেঘিত ডুব দেও দন জনে যায় বেসি রহিবেন মুই তার নগত জাম।

মিয়া ঃ ঠিক আছে মাই ওটায় হইল।

ফাকতাল ঃ ঠিক আছে যা কায় বেশি ডুবে থাকে।

(দুইজনে ডুব দিল)

ফাকতাল ঃ মাই চল জাই পালায়ে দন জনে। অয় হলেক মছলমান , তার সাথে তুই কেনে যাবো চল হামা পালায়।

(ফাকতাল ও চিন্তাসরি পালাইল)

মিয়া ঃ শালার ফাকতাল তোর মনত এত হারামি আছে আচ্ছা যাওদি দেখু কুনঠি গেইছেন তমা পালায়।

১১

(খোঁজ করিতে লাগিল এবং দেখিতে পাইল)

মিয়া ঃ এই ফাকতাল কুনঠে যাবেন পালায় তোমা।

(ওখানে দুইজনে টানাটানি চিন্তার দাদা আসে)

দাদা ঃ হাগে মাই তমা কিসের এত টানাটানি লাগাইছেন।

চিন্তাসরি ঃ দাদা দে, মুই হনু একেলায় ফাকতাল ভাই অহ চাহাচে নিবা মিয়াসাহেবটা অহ ভাই চাহচে নিবা মুই ত ভাই একেলায় দুইজনে করেছে টানাটানি।

দাদা ঃ এ ভাই মোর একটা কাথা শুন। দেখ লোক হইল একটা তমা দুইজনে কহদি কায় নিবেন।

ফাকতাল ঃ মুই কহচিত মুই নিম অয় কহচে মুই নিম।

দাদা ঃ একটা মোর একটা কাথা শুন

মিয়া ও ফাকতাল ঃ কহদি তোর কি কাথা আছে।

দাদা ঃ এহে মুই না তমার চখুলা বান্দি দেছু যায় ভাই মোর বহিনিক আগোত ধরিবেন তারে নগত যাবে মোর বহিনি ।

(চিন্তার দাদা চোখ বান্দে দিল এবং তারা পালায় গেল)

মিয়া ঃ এই ফাকতাল মুই ভাই আগত ধরিচু, মুই আগত ভাই নিম।

ফাকতাল ঃ এই মিয়াসাহেব মুই আগত ধরিচু মুই নিম।

(ওখানে দুজনে চোখ খুলে দিল দেখে চিন্তা নাই)

গান

তুই ত ফাকি মোক দিল একশ টাকা ফাকেতে খাল।

চিং ঃ তোর রে ফকির বুদ্ধি ভারি/গংগাটাক সাজায় দিল তুই চিন্তাসরি।

মিয়া ঃ গান

ভুত সাজিয়া ও তুই কবরত ছিল

ফকির মানষিটাক তুই কিতায় চমকাল।

চিং ঃ তাতে তোক ফাকি ত দিন/একশ টাকা ফাকতে খানু।

ফাকতাল ঃ গান

মোক যেমন মিয়া সাহেব দিলরে ফাকি

তার বাদে মাজানো তোক চিন্তাসরি।

মিয়া ঃ গান

মোক কেমন মাজান তুই চিন্তাসরি

দন জনে চল জাই এলা জিয়াপত বাড়ি।

চিং ঃ মোক মাজানো চিন্তাসরি

আয় দি কনেক পেংটা করি

ফাকতাল ঃ মিয়া সাহেব যা হমার ভাই হয়ে গেল এলা চল যাই নিজের বাড়ী। এইলা হামার কপাল্‌ত ছিল।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি ড. শিশির মজুমদারের
'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য' (১৯৮৬) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

পৈলসাঞ্জুর সংসার
বা
মেনকাশ্বরী পালা

খাস পাঁচাল ঃ

বন্দনা

গড়ান ঃ হে মা যুগের হাওয়া গেল্ বোদলিয়া

নূতন নূতন বহেছে বাতাস

ওরে কলি যুগের ভাব দেখিয়া—

নাগেছে হাতাস।।

চিতান ঃ হে মা হালুয়ালা করে মজুরী

মুজুদ্দারলায় হৈল্ ভিকারী

এই বার বুঝি যুগ পরিবর্তন মা

হালুয়া সাজিল বড় জোদ্দারলা।।

গড়ান ঃ হে মা লেখা পড়া শিখিয়া

ও বেকার বাবু— আছএ পড়িয়া ।।

আরতো চাকরীর আশা নাই রে ভাই

ও কোকেরা লাঙল ছাড়া গতি নাই।

প্রথম দৃশ্য

সাকালু ঃ বাউরে পৈলসাঞ্জু, কোঠে গেলরে বাউ।

[পৈলসাঞ্জুর প্রবেশ]

পৈলসাঞ্জু ঃ কেনে ডাকাছিতরে গাবুর মরার দাদা। তোর কি সময় অসময় নাই।

সাকালু ঃ (পৈলসাঞ্জুর কান ধরে) হারে তোর কি কাম কাজ নাই। সদায় সদায় বেড়ে আছিত? আরে গোরু বাছুর ছাড়িয়া তোর, কিসের বাদে তোর বেড়ানি?

পৈলসাঞ্জু ঃ এই মুই দারুন মারাতল চাটেবার পারো। আরো এক্কা দোকাও পারো।

সাকালু ঃ (রেগে গিয়ে পৈলসাঞ্জুকে ধরে) আরে বোকা তুই এত বড় চ্যাংড়াটা, তুই কাম কাজ কিছুই করিস না। তে একটা কাথা শুনেক।

[দুই ভাই মিলে গীত]

গড়ান ঃ ওরে বাপ মাও হামার গেইসে মরিয়া

দিন কাটাই হামেরা মুজুরি করিয়া

এই কি হামার ভাঞ্জের লেখা।

চিতান ঃ দুঃখের দুঃখে দুঃখী হামেরা

দিন কাটাই মুজুরি করিয়া

ও বাউরে-আগে পাঝে কায় আছে হামার কপালে।।

সাকালু ঃ এই শুনেক , হিমতন আর না কোরিস, গোরু বাছুর যা কিছু আছে তুই তামান দেখিবো, আর ভাত আন্দিবো।

পৈলসাঞ্জু ঃ মুই ভাই ভাত তাত আন্দির নাহ, মোর বাটারটা মুই ভাজিয়া খাম।

সাকালু ঃ (রেগে ঘার ধরে) এই তুই ভাতো যদি না আন্দিস আর গোরু বাছুর যদি না দেখিস, তাহলে তুই কি করিয়া খাবোরে?

পৈলসাঞ্জু ঃ দাদা মোর একটা কথা শুনেক —

(গীত)

গড়ান ঃ এলা দুঃখের কাথা ওরে দাদা

কছ খুলিয়া

মাইয়্যা মাইয়্যা গোন্ধাছে মোর দেহা

ভাত আন্দিবার যায়্যা।।

চিতান ঃ ও আগিনা ঘর ছান গোয়ালি

না মানজ মুই থালিখুরি

ও দাদা মাইয়্যা মাইয়্যা গোন্ধাছে দেহা

ভাত আন্দির যায়্যা।।

পৈলসাঞ্জু ঃ ও তুই বোধায় মোক নিবু?

সাকালু ঃ (ধাক্কা দিয়ে) তুই বাড়ি থেকে নিকিলেক। তোর হেটে কোন কিছু নাই, তুই খাবার পায়্যা ইতিরাইসিত। নিকিলেক নিকিলেক।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

আঙ্গাতি : মাগো মেনকাশ্বরী, তুই কোণ্ঠে গেলো, হিত্তি আইসেক।

[মেনকাশ্বরীর প্রবেশ]

মেনকাশ্বরী : কেনে ডাকাছিত মা?

[অধ্যক্ষ নাঠুয়ার প্রবেশ]

নাঠুয়া : বুড়ি বেটি, বুড়ি বেটি, বাড়িত আছেন না নাই বারে।

আঙ্গাতি : কায় হুটা? ও অধ্যক্ষ বাবু! বইস, বইস। আনত মাই বোরাটা।

নাঠুয়া : বুড়ি বেটি, হিকেনা আরো কায় বারে?

আঙ্গাতি : মোরে না এই কিনা বেটিবা? কি করিব আরি দুখাতি মান্‌সি মুই, মোর আগে পাছে কায় আছে বা?

নাঠুয়া : বুড়ি বেটি তোর কুন চিন্তা নাই, হামরালা আছিবারে অত চিন্তা কিসের। মাই গুয়া আছেতে কনেক আনগে। কি করিবো মোর এইটা এখেলে দারুণ নিশা। বুড়ি বেটি মুই আসিনু কেনে? তোমরা এইবার ১২ কেজি গম পাবেন। হের সেই জাগাত মুই ২৪ কেজি করিয়া দিনু। টোকন ধর। মাই তোর নামটা কি? ককেনে কনেক শুন।

মেনকাশ্বরী : মেনকাশ্বরী।

নাঠুয়া : ও মাই তোর নাম মেনকাশ্বরী, নাম কিনা তোর ভালই। বুড়ি বেটি, মুই যাও, দেরী না করো আর মাইটাক বিয়াও দিবেন নাকি?

আঙ্গাতি : ও ইলায়না কাথাবা, কি যে করো, মুই হচো বিধবা মান্‌সি, ছাওয়াক থুইয়া বেড়ানি নোরানি করিম তাহার বুদ্ধি নাই।

নাঠুয়া : আচ্ছা বুড়ি বেটি, মুই ব্যবস্থা করছ। বুড়ি বেটি মুই যাও। গেনুগে মাই। (প্রস্থান)

আঙ্গাতি : মাই তুই তাহলে বাড়িঘর ছাগল, গরু তামানলাক দেখিস্ আর চাইরটা ভাত আন্দিস; আগুন পানী সাবধান। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

নাঠুয়া : আঙ্গাতি বুড়িকতো এইবার ডবল জি.আর. দিনু। দিনুতো ঠিকেই, দেখা যাউক সঙ্গরাক আগত কও একটা বুদ্ধি করিবারে নাগিবে।

[চাক্কাউর প্রবেশ]

চাক্কাউ : সঙ্গরা! সঙ্গরা! বাড়িত আছেন না নাই।

নাঠুয়া : কায় সঙ্গরা, আইস। মুই তোমারে কথা চিন্তা করেছো। আচ্ছা ভাই আগত বইস; একটা আরো ঘটনা; আঙ্গাতি বুড়ির যে বেটিটা আছে দারুণ ঢকরে ভাই।

চাক্কাউ : কিতে নিবার চাছেন নাকি?

নাঠুয়া : নিবার আরো কি, বিয়াওয়ে করিম। উয়ায় যেহেতু আকয়ারী মান্‌সি উয়ারও মাথার জাবুরা ঘচুক। সুখে খাবে, সুখে রবে। মোর কি কুন অভাব আছে।

চাক্কাউ : সঙ্গরা, তোমরা মারি ফেলালেন। পাটির যে যুগ, আরো হইসে যুব সংগঠন। এইটা কি কুন দিন হয়। তোমার বয়সে আর কইনার বয়সে এইটা কি আর বনে। আজিকালি যে যুব চ্যাংড়ালা খাড়ায় ধরি ফেলাবে।

নাঠুয়া : ইয়ার উপায় কি সঙ্গরা। যদি ইয়ার একটা উপায় করিয়া দিবার পারেন তাহলে রে সঙ্গরা তোমারা একটা মোটা বক্‌সিস্ পাবেন।

চাক্কাউ : সঙ্গরা বুদ্ধি না মেলায় আছে। যদি মোর বুদ্ধি ধরেন হিটাক ঝুটা করিবার নাগে, তাহলে নেওয়া যাবে।

নাঠুয়া : কেমন আরো ঝুটারে সঙ্গরা? মোক ইটা ভাল করি বুঝি দেও।

চাক্কাউ : অনেকখান ভোল বুদ্ধি খাটেবার নাগে। আগত ইয়াক ঘজ্জেয়া থুইয়া বিয়াও দেই। আগত একটা সাদাসিদা চ্যাংড়া দেখ ওইটাক ঘজ্জেয়া থুইয়া বিয়াও দিম। হুটাতো কাম কাজ করিবার না হয়। তারপর হামরায় না হুটাক নিকিলি দিম।

নাঠুয়া : তারপর সেলা কি করিয়া সঙ্গরা? পারা যাবে তো? তোমরা যেইটাই করিবেন ওইটায় মুই রাজি। যাতে নেওয়া যায়।

চাক্কাউ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, মোর নাম চাক্কাউ, মুই কতজন কাক আঠারো চাকার রথ দেখাইছু হিটাতো ক্ষুদ্র, সেলা মোরটা হবে তো।

নাঠুয়া : হুটা তোমাক চিন্তা করিবা না নাগে। তোমরা আগত ভাই আঙ্গাতি বুড়িরটে যাও যে হামেরা একটা চ্যাংড়া মিলি ফেলাইসি। বিয়ার খরচ যা লাগিবে তামল্লায় হামরায় দিম।

চাক্কাউ : ঠিক আছে সংরা বুড়ির ষোল আনা দায়িত্ব মুই। (প্রস্থান)

নাঠুয়া : সাংরা তো গেল, মুইও যাও, মোক একটা চ্যাংড়া মিলিবার নাগিবে।

চতুর্থ দৃশ্য

পৈলসাঞ্জু : যাও মোরতো আগে পাছে কাহই নাই। দাদাতো মোক নিকিলি দিল। কোঠে যে যাও। না আলিপুর দুয়ার যাম। মোর বোলে বাপের গুরু আছে ঐঠেটায় যাম। হেঁ কত বড় ভেলা দুয়ার মোক কি খয়ায় নেয়।

নাঠুয়া : কায় হুটারে? বাউ তোর বাড়ি কোঠেরে? কোঠে থাকি আসিলো? তোর নাম কি?

পৈলসাঞ্জু : অত্তি আইসড়ে, তুই কি মোক নিবু।

নাঠুয়া : হোর হিটা ক্যামন কাথারে, এ বাউ শুন শুন। আরে তোর কুন ভয় নাই। আরে তোক তো

বোধায় ভোক নাগাইসে রে।

পৈলসাঞ্জু ঃ আরে ভোক নাগালে কি খাবো? আর না নাগালে কি করিবো। কনেক সারতো মুই আলিপুর দুয়ার যাম। মোর বোলে বাপের গুরু আছে, ওইঠে বোলে।

নাঠুয়া ঃ আরে যাবোতে যাবোনারে। আগত চাইরটা খাই, যাবোতে যাবোনা, তোরে তেনা মনে করেক আসি গেইছিত।

পৈলসাঞ্জু ঃ ভাই সত্যে সত্যে তুই মোক নিবার নাহইস তো।

নাঠুয়া ঃ আরে মুই তোক নান, তুইয়ে নিবো নাকি? মোরঠে একটা ভাল কইনা আছে। তোরতো বোধায় কাহয় নাইওরে। তোকে দিয়া বিয়াও দেও। খাবো দাবো আর কনেক আদেক কাম কাজ করিবো। আর দেহাটাও চিপি দিবে।

পৈলসাঞ্জু ঃ চিপি আরো কিরে। মোক তো নিবার নাহয়? মোর ভাল দেহাটা গোন্ধাছে আর ভাত আন্ধিবার নানায় তো!

নাঠুয়া ঃ আরে তুই আরো ক্যানে আন্দিবো ভাত। ওই জন্যে বিয়াও করা কাথা।

পৈলসাঞ্জু ঃ ভাই মোর না ভাত আন্দিতে আন্দিতে দেহাটা গোন্ধাছে মাইয়্যা মাইয়্যা।

নাঠুয়া ঃ আরে তুই পাগেলা না কিরে? হোল্দি দিলে আপনে গন্ধ সারিবে। চল কইনা দেখে আনো।

(উভয়ের প্রস্থান)

[আঙ্গাতি বুড়ি ও মেনকার প্রবেশ]

আঙ্গাতি ঃ মাইগে মাই, তুই বাড়িত নইস। মুই কনেক বেড়ে আইসো অধ্যক্ষর বাড়ি। কাপড়া বোলে বিলি দিবে, কনেক শুনি আইসো।

মেনকা ঃ মাগো মোরো নামটা দিস্।

[চাক্কাউর প্রবেশ]

চাক্কাউ ঃ বুড়িবেটি যাবার আর না নায়। সাংরা মোকে পাঠালেক। মাইটার বাদে সাংরা ঘজ্জেয়া ঠিক করিছে।

আঙ্গাতি ঃ হোর হিটা আরো ক্যামন কাথা, চ্যাংরাটার আছে কায় কায়?

চাক্কাউ ঃ হুলা চিন্তা তোমাক নানায় করিবার। সাংরা আরো মুই যেহেতু আছি, তোমার কুন চিন্তা নাই। বেটি দেওয়া কি ঠেলা। হামেরায় বুঝিসি, এই সুযোগ কি ছাড়া যায়?

আঙ্গাতি ঃ ক্যামন ভেলা চ্যাংড়া বা? আর ক্যামন বা কাজ করে ? আর কি ভেলা জাতি, জানা নাই শুনা নাই, নাকি ধক্কতে কছিত।

চাক্কাউ ঃ মারলেন বারে বুড়িবেটি, কত মান্সির উপকার করিনি। তোমরা হছেন আরি দুখাতি মান্সি। তোমারে না ভালের বাদে হামেরা চেষ্টা করিবার ধরছি। মান্সির যখন উপকার করিমতে,

ভাল করিনা করিম। তোমরা আর চিন্তা না করেন।

আঙ্গাতি : বিয়াওটা কি নগতে দিবার নাগিবেরে বা। মোর তো কিছুই নাই তোমরা তো তামানে জানেন।

চাক্কাউ : বুড়িবেটি তোমরা হুলা চিন্তা না করেন। হামেরা কাপড়চোপর খানদান যা লাগিবে তামানে দিম। মুই যাও চ্যাংড়াটাক আনিবার। (প্রস্থান)

আঙ্গাতি : কোঠে গেলো গে মাই, গাও মাথালা ধুইয়া আইসেক। মান্‌সি বোলে আসিবে দেখিবার। (উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

[আঙ্গাতির বাড়ি নাঠুয়া, চাক্কাউ ও পৈলসাঞ্জুর প্রবেশ]

চাক্কাউ : বুড়িবেটি, বুড়িবেটি, বাড়িত আছেন না নাই বারে। সারী শরজে কিছুই নাই বারে।

আঙ্গাতি : ও আসি পড়িছেন বা, বইসো, বইসো।

পৈলসাঞ্জু : কোঠে কইনারে? এইটায় নাকি?

নাঠুয়া : আরে চুপ করিন, আজিয়ে বিয়াও। বুড়িবেটি তাড়াতাড়ি যোগার কর। প্রথম লগ্নে বিয়াও সারিবার নাগিবে।

আঙ্গাতি : মাই মাই হিত্তি আইসেক, ভক্তি দেক, আর কি করিবো, যেইটায় কপালত আছে ওইটায় হবে মা।

চাক্কাউ : বুড়িবেটি তোমার এইটা মঙ্গল। এই সুযোগ কি আর যার তার ভাগ্যে হয়? বিবাহ বাসর। বিবাহ সম্পন্ন হল।

চাক্কাউ : বুড়িবেটি বিয়াও যখন হয়া গেলেক হামরা আর দেড়ি না করি।

নাঠুয়া : মাই দেখিস কনেক, স্বামীর মতন ধন নাই। এলা তোমরা সুখে খাও। আর কুন কিছু হলে হামরা না আছি।

পৈলসাঞ্জু : যাবার পারিবেন, অনেকটা বেলা আছে।

নাঠুয়া : আরে হামেরা তো যাম। কাজকাম গিলা ঠিকমত করিস। বুড়ি বেটি ইয়াক কনেক দেখেন। ইয়ায় হইছে চ্যাংড়া মানসি। কুন কিছু হলে হামাক খবর দেন।

(নাঠুয়া ও চাক্কাউর প্রস্থান)

পৈলসাঞ্জু : খাবার আনেক কেনেরে বুড়ি, ভোগ নাইগসে মোক।

আঙ্গাতি : তোমরা আরো ক্যামন বারে সমন গমন নাই।

মেনকা : মাগে ইয়ায় হচ্ছে নয়া মানসি, আস্তে আস্তে সমন ধরিবে।

পৈলসাঞ্জু : কিতে, কি, কি? কি কোনতে তুইও মানসি মুইও মানসি। তোরো চোখু মোরো চোখু।

আঙ্গাতি ঃ ইয়ায় আরো ক্যামন সাদাপাগলার জাত বা।

মেনকা ঃ ইয়ায় তোর শ্বাশুড়ি মাও, মুই তোর বনুস।

পৈলসাঞ্জু ঃ অঃ শ্বাশুড়ি মা, অঃ তুই মোর বনুস।

আঙ্গাতি ঃ জাংয়োই শুন, বাড়িঘর তামানে তোমার, মোর তিনকাল গেইছে এককালত পড়িছু। তে মুই এলা গুরুর হাল নিবার চাছ।

পৈলসাঞ্জু ঃ আবেয়া না তেহাতা মা। কনেক ছোট দেখি লেন যাতে না চাইঠায়।

আঙ্গাতি ঃ ইয়ায় ঠিক সাদাপাগেলার জাত। আগত কনেক অধ্যক্ষক যায়া কও। (প্রস্থান)

পৈলসাঞ্জু ঃ ও বোনুস, বুড়িটা কি ততকরা গরু আনিবার গেল বারে।

মেনকা ঃ গরু না হয়, গরু না হয়, গুরুর হাল নিবে। আইসেক চাইরট খাবার দেও।

(উভয়ের প্রস্থান)

[সাকালুর প্রবেশ]

সাকালু ঃ হায় ভগবান! এইভাবে আর কতদিন কাটাইম কাল। আগেপাছে তো মোর কাহয় নাই। একটা ভাই ছিল তাকোতো নিকিলি দিনু। কিন্তু কত হোলে তো ভাই, না বুঝিয়া না সুজিয়া ঘাড় ধরিয়া নিকিলিয়া দিনু। এলা যে মোর কি হোবে! এলায় যদি মোর দেহাটা পড়ে কায় যে এক গিলাস জল দিবে তারে মানসি নাই। না, মুই একবার ভাইটাক খোঁজ করো; যেমন করি হোক উয়াক আনিবারে নাগিবে, আনিবারে নাগিবে। (প্রস্থান)

[নাঠুয়া, চাক্কাউর প্রবেশ]

নাঠুয়া ঃ সাংরা, কাজটাতো করানি। এই কয়দিনের মধ্যে বোধায় একটা হোয়া তো লাগে।

চাক্কাউ ঃ হ্যাঁ, সাংরা, হোয়া তো লাগে। যেমন দেখিনু চ্যাংড়াটা, ইয়াক যে কুঠে পালেন।

নাঠুয়া ঃ (হাসিয়া) সেই জনে মিলাইছে।

[আঙ্গাতির প্রবেশ]

আঙ্গাতি ঃ আগত যাও পিণ্ডত পানী দিম।

চাক্কাউ ঃ কায়, বুড়িবেটি, আইস, আইস। বাড়ি হাতে কি আসিলেন, আছেন ভালে ভালে?

আঙ্গাতি ঃ (রেগে) ভালে তোমরা যা করলেন। মরা মান্‌সিক বাঁচাবেন।

নাঠুয়া ঃ কি হৈচে বুড়িবেটি, থামো থামো কোনেক ভাল করিয়া কও, কি হইসে?

আঙ্গাতি ঃ জাংওইটা যে আনিছেন মাছও না হয় মসংও না হয়, হিমন মান্‌সি মুই জীবনে দেখো নাই কোটেকার হিটা সাদাপাগলার জাত। মুই নিবার চাহাচু গুরুর হাল, মোক কছে আবেয়া তেহাতা নিবেন। আরো মোক কছে, এ শ্বাশুরী তোর চখু, মোর চখু; তোর হাত মোরে হাত। মাইটাক কছে, বোনুস,বোনুস। কাম কাজেতো না করে দিনটায় ঘরটাত।

চাক্কাউ ঃ উঃ শালা এত পাজি। ঠিক আছে, সংরা চল যাই। আরে মান্‌সি হাতিটাক মাতার বাঘটাক খপরাত ডুবাইছে, হিটাতো মান্‌সিটা। হিটাক হুচে ছাড়ি দিম— চল যাই।

নাঠুয়া ঃ চল বুড়ি বেটি। (সকলের প্রস্থান)

[পৈলসাঞ্জু ও মেনকাশ্বরীর প্রবেশ]

পৈলসাঞ্জু ঃ ও কইনা, ও বোনুস কোঠে গেল শ্বশুরী। গরু আনিবার গেল নাকি?

মেনকাশ্বরী ঃ গোরু না হয়, গোরু না হয়, গুরুর হাল। তার মানে বুড়িটা একটা সেবা করিবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নাঠুয়া ঃ কিরে পৈলসাঞ্জু কেমন আছিত ক?

পৈলসাঞ্জু ঃ দূরত নইসডে নিবো নাকি? কি বুড়ি গরু ধরি আসিলো?

চাক্কাউ ঃ (রেগে গিয়ে পৈলকে ধরে ও মারে) রেই শালা বোকা, তুই হামাক ছুন্নমত ফেলালো। কাজকামত বাদ দিয়া জাতপাগেলা সাজিলো, কি দেখেছেন সাংরা ধরো।

নাঠুয়া ঃ (মারতে মারেতে বের করে দিল) এই যা, আরে যা, যা। তোর আর এইঠে কোন স্থান নাই। যা, বিরা।

মেনকাশ্বরী ঃ দাদা তোমরা ইয়াক না মারেন। ইয়াক তোমরা ছাড়ি দেও।

চাক্কাউ ঃ না সাংরা ইয়ার কুন কথা শুনা যাবে না। ইয়াক নিকিলি দিবারে নাগিবে।

পৈলসাঞ্জু ঃ দাদা, মোর একটা কাথা শুনেক।

(গীত)

গড়ান ঃ ওরে না মারেন মোক ধরিয়া বান্ধিয়া
পাও ধরো তোর ও ভাই দেউনিয়া।

চিতান ঃ ও ডাকেয়া আনিয়া দিলেন বিয়াও
তোমরায় মোর বাপ মাও
ও ভাই দেউনিয়া বিনা দোষে
না দেন নিকিলিয়া।

[পৈলসাঞ্জুকে ধাক্কা দিয়া নিকাল দেছে]

নাঠুয়া ঃ যা, তুই বিরা। তোর হুলা কাথা না শুনি। তুই এলায় বিরা কি বিরা।

(মেনকা পৈলসাঞ্জুকে জাপটে ধরে গীত)

(গীত)

মেনকা ঃ স্বামীহে পতিরে ধন—

এমন করিয়া ছাড়িয়া না যান দূর দেশে,
(চিতান) তুই স্বামী মোর নয়নের ওরে নয়ন
স্বামী ধরো তোরে চরণ,
স্বামী ছাড়া এই অভাগীর না বাঁচিবে জীবন রে
ওরে স্বামীধন।
না যান ছাড়ি দূর দেশে।।
নারীর ধর্ম পতিরে সেবা
স্বামী শাস্ত্রের কথা, স্বামী বিনে এই অভাগীর
মিছা যোলো আনারে—ওরে স্বামী
না যান ছাড়িয়া দূর দেশে।

চাক্কাউ ঃ কিরে শুনি আছিত? যা, যা তুই বিরা। (পৈলসাঞ্জুর প্রস্থান)

নাঠুয়া ঃ মাই তুই উঠেক, কান্দাকাটা না করিস। বুড়িবেটি, তোমরাও চিন্তা না করেন; মান্‌সি কয়সা ভাতার অলির ভাতার আছে; আরি মান্‌সির খোদায় আছে। খোদা আর কায় হামারলায় না? সাংরা বুড়িটাক এইবার জি. আরটা ডবল দিবেন, আর ঘরটার ব্যবস্থা কর; মাই তুই চুপচাপ করি ন, তুই আর চিন্তা না করিস।

আঙ্গাতি ঃ চিন্তা আর কি করিম। তোমরায় যেহেতু হামার গ্রামের অধ্যক্ষ, এলা তোমরা যেইটায় করিবার করেন হামাক ওইটায় না করিবার নাগিবে।

চাক্কাউ ঃ বুড়িবেটি চিন্তা না করেন। কত ধনী মানষি আছে রূপ দেখি ইয়াক নিগাবে, হিটা তোমার ব্যবস্থা মুই করি দিম। আর তাহলে হামারা আজিকার মনে যাই। তোমরা আইস।

(সকলের প্রস্থান)

[সাকালুর প্রবেশ]

সাকালু ঃ এই ভাবে আর কতদিন ঘুরিম। বহু জাগা ঘুরিনু ভাইটার আর কুনঠে দেখা পানুনা। এইবার একটা মন করেছে, বাপের গুরু নাকি আলিপুর দুয়ারত আছে। এইবার ওইঠেটায় যাও। ভাইটাও তো সাদাপাগেলা, যে বাড়ি থাকি বিরায় নগদ কুন পাইসা কড়িও ছিল না। আর এত রাস্তা আসিবে যে উয়ায়, মোর মন তো বিশ্বাস হয় না। (প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

[দুই সঙ্গরার প্রবেশ]

চাক্কাউ ঃ সাংরা একটা বুদ্ধি, তোমরা যখন মাইয়া নিবেনকে। তাহলে একটা সেবা কর। তারপর

ইয়ার বুদ্ধি মোরঠে আছে। মোরো নাম চাক্কাউ।

নাঠুয়া : সেবা দিয়া কি হবে রে সাংরা; এইটা তোমরা যে কছেন। সেবা হবে তো পরে হিটা আগোত ক্যামনে আনিম?

চাক্কাউ : এইটায় তো সুযোগ সংরা, এইটায় তো বুদ্ধিমান লোকের কাজ। এইটার নাম হচে ঘাপচাট বুঝিসেন জিনিসটা তা নাহলে বকে-র-কেমন করিবেন। এই যে তোমরা একটু আগোতে পাছের জিনিসটা আগত আসিবে ক্যানে। এই সুযোগে কইনাটাক ধরি আসিম।

নাঠুয়া : ঠিক আছে সংরা, ঠিক আছে, ইয়াতে আর কত টাকা যাবে, কতয়বা খাবে। তবেরে সংরা তোমার বুদ্ধি ঠিক আছে।

চাক্কাউ : সংরারে এইটায় তো হছে টারিবাড়ি হাত করা যাতে হামার উপর কুন একটা ঝামেলা না পড়ে। যার জন্য টারিবাড়ি এই সুযোগে সমাজের দুই একজনক নিমন্ত্রণ করা।

[আঙ্গাতির প্রবেশ]

আঙ্গাতি : অধ্যক্ষবাবু বাড়ি আছেন না নাই বারে।

নাঠুয়া : কায় বারে? অ— বুড়িবেটি। আইস, বইস, বইস, পানসুপারি খাও।

চাক্কাউ : বুড়িবেটি তোমারে বাড়ি যাবারে চাছি। হঠাৎ করি সংরা একটা সেবা করিবে। তোমার মাইটাক আনিবার চাছি। বাড়িত কাজকামের মান্‌সি নাই। আসিলেন তে ভালে হইল। টুকনখান নিগাও, মাইটার বাদে কাপড় চোপর নিগাও। তোমার তো নিমন্ত্রণ থাকিল।

নাঠুয়া : বুড়িবেটি, মোর তো কাম করির মান্‌সি নাই। এইজন্য মাইটাক দুইদিন আগতে আনিবার নাগে। আর তোমরাও আইসো। বাড়িটাত আর কি আছে। এইঠে করিবেন— এইঠে খাবেন।

আঙ্গাতি : বারেহে হামেরাতো গরীব মান্‌সি নাই হামার সেইরকম কাপড় চোপড়, নাই কোনেক সাবান তেল; আর তোমার সাগাই সোদর আসিবে ভাল ভাল।

চাক্কাউ : তাতে কি বুড়িবেটি, সগায় মান্‌সি তোমারোতে দেহা কাটিলে অক্ত বিরাবে। তোমার কাপড় চোপড় তেল সাবান তামানে দেছি।

নাঠুয়া : বুড়িবেটি তোমরা দেরি না করেন, যাও, এই ব্যাগটাত তামানে আছে। ভাটিবেলাতে চলি আইস। হামরা কনেক খরচলা করি। [আঙ্গাতি ব্যাগ হাতে প্রস্থান করে]

চাক্কাউ : সাংরা, এইবার যাবে কোটে, মোর নাম চাক্কাউ। সাংরা, মোর ব্যবস্থাটা করেন।

নাঠুয়া : হুটার চিন্তা না করেন। চল আগতে খরচ করিবা যাই। (উভয়ের প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

[গুরগুঠু দেউনিয়ার প্রবেশ]

গুরগুঠু : দিনে দিনে দেশটা অধপতনে যাছে। কাক যে কায় ঠকেয়া খাছে। তেম্‌নি হইসে মান্‌সির

পাইসা। নিজ বিচারতো নাইকে। মরা মান্সিক মারেছে। ভালে না জানে লেখাপড়া সোগেলঠে খালি ঘাপচাট।

[পৈলসাঞ্জুর মনের দুঃখে কেঁদে প্রবেশ]

পৈলসাঞ্জু : ভগবান, ইয়ার বিচার তুই করিস আগেপাছে মোর কাহয় নাই। তোমরা কায়? মোক বাঁচাও তোমরায় মোর বাপ। [গুরগুঠুর পা ধরে]

গুরগুঠু : তুই কায়রে বাপই? কি হইসে তোর ভাল করিয়া ক। না কলে মুই কি করিয়া বুঝিম। উড়, উঠেক।

পৈলসাঞ্জু : মাইয়াটা মোর কাঢ়ি নিলেক মারি ডাঙ্গেয়া নিকিলিয়া দিলেক। মোক কনেক বাঁচাও। মোর কাহয় নাই।

গুরগুঠু : আরে বাপই কায় তোক মারলেক? আর কোঠে তোর মাইয়্যা? তোর বাড়ি কোঠে?

পৈলসাঞ্জু : বাড়িঘর তো মোর নাই। মনের দুঃখে বেড়াছ, মোক টানি নিগিয়া ঘরজেয়া থুলেক আঙ্গাতি বুড়ির বাড়িত, উমরায় থুইয়া উমুরায় মারেছে। মোক কনেক বাঁচাও।

গুরগুঠু : আরে আঙ্গাতি তো আরি মান্সি, আর ওইঠেকার দেউনিয়াতো চাক্কাউ। চাক্কাউয়ে বোধায় চক্রান্ত করিছে। ক্যানেনা ইমিরায় হছে নেতা। ইমারে হাতত ধনকুলা, ইমরা যেইটায় কয় ওইটায় মান্সী শুনে। ইমার ধর্ময় হচে এইটা। আচ্ছা ঠিক আছে, মোর একটা বুদ্ধি ধরিবো। যেমন দেও তেমন পূজা, যোদি ধরিস তাহলে মোর কাথামতন চলিবার নাগিবে।

পৈলসাঞ্জু : মোর আরো নিবার নাহন তো। ওইটায় মোর ভয়।

গুরগুঠু : আরে তুই পাগেলা নাকি? বাপ যখন সাজালো, মুই ভাল বুদ্ধি তোক দেছো। তুই বেটিছাওয়া সাজিয়া কোনেক বেড়া— আর কোনেক ওঝালি মোরঠে শিকেক।

পৈলসাঞ্জু : অ্যাঃ মাইয়্যা, তুই বায় ঠিক নিবো মোক, মোর মনটায় কছে। ভাত আন্ধিবার নানায়তো?

গুরগুঠু : আরে তুই ততকরায় পাগেলারে। হাতে হাতি দিয়া হাতি ধরিবার নাগে। মাইয়্যা সাজিলে মাইয়্যা পাবো। তুই সাজিপারি যা। আইসেক তোক মন্ত্র শিকাও। [উভয়ের প্রস্থান]

নবম দৃশ্য

[মেনকা, নাঠুয়া, চাক্কাউর প্রবেশ]

মেনকা : মুই আর নান। মেলা দিন হয়ে গেল। বুড়ি মাওটা বাড়িত আছে।

চাক্কাউ : বুড়িটার চিন্তা করিবার নানায়; তোর নিজের চিন্তাটা আগত করেক। সাংরা যে তোক নিবার চাছে। বুড়িতো সেদিন কয়ায় গেইসে।

মেনকা : দাদা, তোর দোহাই নাগে, তোর পাও ধরো, এইটা কাজ তোমরা না করেন।

চাক্কাউ : (হুমকি দিয়া) ধূর পাগিলী, এই রকম সুখ আর কোঠে পাবু? মোটা হাতে খাবো, এই বাড়ির

গিষ্থানি হবো, তোর রাজি হয়ায় ভাল।

মেনকা : দোহাই নাগে দাদা, তোর পাও ধরো। মুই আর এই কাজ করির পারিবার নাই।

নাঠুয়া : সাংরা আর কুনো কাথা নাই, বুড়ি তো হামাক কয়ায় দিছে। আর তোর উপায় নাই।

মেনকা : তাহলে মোক সাতদিন সময় দেও মোর একটা মনের কামনা আছে, মুই কোনেক বুজ। মুই আর কোঠে যাইম।

চাক্কাউ : সাংরারে ঠিক আছে। যাবে কোঠে সাতটা দিন দেখতে দেখতে না যাবে।

নাঠুয়া : ঠিক আছে সাংরা ঠিক আছে। [সকলের প্রস্থান]

দশম দৃশ্য

[সাকালুর প্রবেশ]

সাকালু : হায় ভগবান, এই ভাবে আর কতদূর রাস্তা হাঁটিম। বেলাও আর বেশি নাই। এলা যে কি করিম, কুনঠে যে যাইম। বেলা ডুবিলে হবে রাতি সঙ্গে নাই মোর সঙ্গের সাথী।

[বৌ বেশে পৈলসাঞ্জুর প্রবেশ। সাকালুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে]

পৈলসাঞ্জু : (গীত)

গড়ান : ছি ছি আই মুই লাজে মরিয়া যাও
বেটিছাওয়া সাজিয়া গে
ওগে আই মুই শরমে মরিয়া যাও।।

চিতান : সাজিয়া মুই ঢকের নারী
বেড়াছ মুই বাহার ধরি
ঝকলেয়া যাও;
বেটিছাওয়া সাজিয়া গে—
ওগে আই মুই
শরমে মরিয়া যাও।।

পৈলসাঞ্জু : কায় বারে? তোমরা কি চকু দেখেনা?

সাকালু : তোমরা কায় বারে? মুই না দেখ, না দেখ, তোমরাও কি না দেখেন?

পৈলসাঞ্জু : হুস্ করি কাথা কইছ বায়। মান্সি নাইতে চিনি ছাড়ি দিম। মোর বোল ভিটগুরু।

সাকালু : তাতে ভয় দেখাছিত, কত রাস্তা হাঁটি আসিনু। তোর মত বেটিছাওয়া মোর চকুত পল্লেক না। হায়রে ভগবান, তোর মত মাইয়্যা যদি মুই পানু হয়, তাহলে মুই বিল্ডং দিনু হয়।

পৈলসাঞ্জু : কিতে তুই মোক নিবু, মোর যখন কাহয় নাই? এই রকম যুবতী নারীটা, মুই কোঠে আরো যাইম।

সাকালু ঃ ওইলায় তো কাথা, মোর না কাহয় নাই। শুনেছ তোমারতো কাহয় নাই। ঠিকে আছে সৈষ্যা কুড়িয়ানা বেল করিবার নাগে।

পৈলসাঞ্জু ঃ (স্বগত) এইবার মাইয়্যা তোক ঠিসাইম। ইয়ায় তো মোর বড় ভাই। চলতেযাই আজি হাতে তুই মোর মুই তোর।

সাকালু ঃ যাসযে কোটে বেলাও তো নাই। তোর কি কুন জানাশুনা বাড়ি আছে?

পৈলসাঞ্জু ঃ হ্যাঁ, আছে। চল ওইঠেটায় যাম। [উভয়ের প্রস্থান]

একাদশ দৃশ্য

[আঙ্গাতির প্রবেশ]

আঙ্গাতি ঃ শুনেছ মাইটা নাকি কাচাল করেছে। কতয় কি বুজাছ, কথায় শুনেনা। কেমন করি যে কি করিম!

[সাকালু ও বৌ বেশী পৈলসাঞ্জুর প্রবেশ]

পৈলসাঞ্জু ঃ বাড়িত আছেন না নাই বারে। বাড়িত আছেন না নাই।

আঙ্গাতি ঃ কায় তোমরা? কোটে হাতে আসিলেন তোমরা?

সাকালু ঃ হামার কথা আর না কন, বুড়িবেটি হামেরা কোনেক আজি তোমারে বাড়িত নবার চাছি, হামাক কোনেক জাগা দেও। হামরা অনেক দূর থাকি আসিনি।

আঙ্গাতি ঃ মোর একনা ঘর বা, ঝাপচটিও মোর নাই। আরি দুখাতি মান্‌সি বহু কষ্টে দিন কাটেছ।

পৈলসাঞ্জু ঃ কি করিবো আইয়ে, কুন মতনে রাতিটা কাটিম। হামার কুন খাবার দাবার তোমাক করিবার না নায়। আর তোমার আছে কায় কায়?

আঙ্গাতি ঃ হুলা কাথা আর না কোহিস সে মা— আছে খালি একনায় মোর বেটি। উয়াকে নিয়ায় কোনেক পড়িছু জঞ্জালত। হিলা কাথা কি আর কোন?

পৈলসাঞ্জু ঃ কেমন আরো জঞ্জাল বুড়িবেটি? মাইটা কোঠেতে আছে কুন বাড়িত?

আঙ্গাতি ঃ হুলা কাথা আর না কইস, আর মা, একটা থুনু ঘজ্জেয়া পাবার বুদ্ধিতে হুটা আরো কায় হামার গ্রামের অধ্যক্ষ উনায় না আনি বিয়াও দিলেক এমন সাদাসিদা চ্যাংড়াটা মুই জীবনে দেখ নাই।

পৈলসাঞ্জু ঃ তারপর কি হইল মা। কও ক্যানে কনেক শুনো।

সাকালু ঃ চ্যাংড়াটা কোঠেতে বুড়িবেটি?

আঙ্গাতি ঃ চ্যাংড়াটাতে এলা কোঠে আছে বা, হামেরাতো কবারে না পারছি। হৈল আরো কেমন যেইদিন হাতে ওই ডাঙ্গেমারি নিকিলি দিলেক, ওইদিন থাকিবা আর কুন খোজে পাই নাই।

পৈলসাঞ্জু ঃ মাইটা কোঠেতে? আরো কি কোঠে দিবেন?

আঙ্গাতি ঃ দিম আরো কি দিয়ায় দিছি। ধরিয়া না গেইছে, হামারে না অধ্যক্ষ; মাইটায় কাথায় না শুনে। উয়ায় এক হাত হইতে দুইহাত হবারে না চায়। এইলা নিয়ায় না সমস্যা চলেছে।

পৈলসাঞ্জু ঃ বুড়িবেটি তাহলে একটা কাজ কর, মুই কনেক মিল করি দেও। মোক কত টাকা দিবে? মোক যদি হাজার টাকা দেয়, একদিনে না কাইত করি দিম।

আঙ্গাতি ঃ যদি তোমরা এইরকম কাজ করিয়া দিবার পারেন, টাকা পাইসর জন্যে ঠেকিবার না হয়। চলোতে না হয় যাই।

সাকালু ঃ বুড়িবেটি, না হয়তে মুইও যাও।

পৈলসাঞ্জু ঃ তোক নামায় যাবার। মুই একেলায় যাও, তোমরা এই বুড়িবেটির বাড়িটাত নও।

আঙ্গাতি ঃ চলগে মা যাই আতি হচে। [সকলের প্রস্থান]

দ্বাদশ দৃশ্য

[ওঝাকে নিয়ে আঙ্গাতির অধ্যক্ষের বাড়ি প্রবেশ]

আঙ্গাতি ঃ অধ্যক্ষ বাবু বাড়িত আছেন না নাই বারে।

নাঠুয়া ঃ কায়? বুড়িবেটি? আইস, আইস। বইস। নগত আরো কায়?

আঙ্গাতি ঃ ওই বাদে না আসিনু, মাইটা কোঠে গেইসে?

মেনকা ঃ বাড়ি থেকে আসিলো মা, ইমিরা আরো কায়?

নাঠুয়া ঃ আরে যা তুই কোনেক চা বানা। বুড়িবেটি কেনে আসিলেন?

আঙ্গাতি ঃ বাবারে আসিনি আরো কেনে, ইমিরায় বোলে মিলের কাজ করিবার পারে।

নাঠুয়া ঃ বেশ ভাল, যদি ইমিরায় মিল করিয়া হামাক দিবার পারে তাহলে মুই মন খুশি করিয়া একটা মোটা বক্সিস দিম।

পৈলসাঞ্জু ঃ এইগিলা কাজ করা খুব কঠিন কাজ। যায় তায় তো করিবারে না হয়। টাকা কিন্তু একহাজার নিম বায়। খরচ তো ইয়ার বেশি নাই। একজোড়া ধূপ, একটা কলা আর কোনেক চিনি। নিশারাতি করিবারে নাগে বায়। কুনো যেন সারা শব্দ থাকে না। হিটা ভোল শ্মাশানকালী টাকা আগোতে দেও। কালি সকালে ফলাফল পাবেন।

আঙ্গাতি ঃ মুই বায় যাও, বাড়িত একটা সোদর আছে। তোমরা কাজ করিয়া নেন।

নাঠুয়া ঃ নেও বায় টাকা পাইসা খরচ খরচান তামানে বুঝিয়া দিনু। এলা কাজটা কিরকম করেন, নাগে আরো কিছু দিম। [প্রস্থান]

মেনকা ঃ দিদি তুই কায়?

পৈলসাঞ্জু ঃ তুই কি মোক চিনিবু? হামেরা হচি দেশঘাটা মান্‌সি। তোকে না মিল করি দিবার আসিনু।

মেনকা ঃ দোহাই নাগে তোর দিদি, তোর পাও ধরো, হিটা কাম তুই না করিস।

পৈলসাঞ্জু ঃ তোর হুলা কাথা মুই না শুনো। টাকার কাম পাকা, যার টাকা খাম তার কাজ করিম।

মেনকা ঃ দোহাই নাগে দিদি, এইটা তুই মাফ দে।

পৈলসাঞ্জু ঃ পাগিলীটা এই গাবুর বয়সটা তোর কেমন করি কাটাবু? তোর আগের স্বামীটা কেমন করি ছাড়িল?

মেনকা ঃ দিদি, নারী হয়া কি তুই নারীর মর্ম বুঝিস না? বিয়ার স্বামীক কি ভুলা যায়?

পৈলসাঞ্জু ঃ মাই কাথাটা তো হয়— হয়। তাহলে তুই আগের স্বামীটাক্ কি চাছিত?

মেনকা ঃ হ্যাঁ দিদি, এলায় যদি উয়াক দেখা পাও তাহলে এলায় চলিয়া যাও।

পৈলসাঞ্জু ঃ তুই সত্যে সত্যে কি যাবু?

মেনকা ঃ হ্যাঁ দিদি সত্যে সত্যে যাম।

পৈলসাঞ্জু ঃ হের দেখেক চিনিতে মুই কায়। [কাপড় খুলে পরিচয় দিল এবং উভয়ের প্রস্থান]

[চাক্কাউ ও নাঠুয়ার প্রবেশ]

নাঠুয়া ঃ আচ্ছা হিটা ক্যামন বেপার? ঘরের দুয়ার ফাঁকা হয়া আছে। লোকজন কিছুই দেখ না। কিন্তু ইমিরা গেল কুঠে?

চাক্কাউ ঃ সাংরা, মোরটা কতদূর কি করিলেন?

নাঠুয়া ঃ সাংরা একটা ঘটনা। কালি বুড়িটা একটা কবিরাজ আনিছে, কবিরাজটাও বেটিছাওয়া, উয়ায় নাকি মিলের কাজ জানে। হর কবিরাজও নাই, কইনাও নাই। চল কোনেক বুড়ির বাড়ি যাই।

চাক্কাউ ঃ হিটা কেমন হইল সাংরা। কবিরাজটার বাড়ি কি তোমরা জানেন?

নাঠুয়া ঃ মুইতো না জানো সাংরা, বুড়িটায় জানে। চল কোনেক বুড়ির বাড়ি যাই।

[উভয়ের প্রস্থান]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[সাকালু ও বুড়ির প্রবেশ]

সাকালু ঃ বুড়িবেটি হামারটা কোটে গেল। আন, হামেরা এলা বাড়ি যাম।

[চাক্কাউ ও নাঠুয়ার প্রবেশ]

নাঠুয়া ঃ বুড়িবেটি তোমার বেটি কি বাড়ি আসিছে?

আঙ্গাতি ঃ হর হিটা আরো কেমন কাথা?

সাকালু ঃ বুড়িবেটি তাড়াতাড়ি আন আর দেড়ি করা না যায়।

চাক্কাউ ঃ বুড়িবেটি তোমার ব্যপারটা কি? কনেক খুলিয়া কও।

আঙ্গাতি ঃ ভাল করিবার বাদে আতিতে নিগিয়া থুনু, তোমরা আতিতে কি করলেন?

সাকালু ঃ হিলা কাথা মুই না শুনো, মোর মানসিক আনি দেও।

নাঠুয়া ঃ বুড়িবেটি তোমরা এলা বুজ, তোমরায় ওঝা নিগিয়া দিলেন। ওঝাও নাই, তোমার বেটিও নাই। তোমার বেটিক তোমরা খুজ। এলা হামেরা যাই।

সাকালু ঃ খবরদার মোর মাইয়্যাক আগত আনি দেও। বুড়িবেটি মোক কিন্তু মাইয়্যার বদল মাইয়্যা নাগিবে।

[নিরুপায় বুড়ি সাকালুক স্বামী বরণ করে, এমন সময় পৈলসাঞ্জু ও মেনকার প্রবেশ]

পৈলসাঞ্জু ঃ কায় দাদা হুমতন আরো কিরে? বুড়িটা মোর শাশুরী হয়।

সাকালু ঃ আরে হামারটা কোঠেতে?

পৈলসাঞ্জু ঃ তোরটতো? তোরটা আছে। তুই বিয়াও কতদিন করিলো। (নাঠুয়া ও চাক্কাউকে) হারে দাদার ঘর, কেমন আছেন? কেমন মাইয়্যাটা নিলেন তো? এইবার কি করিবেন?

নাঠুয়া ঃ বুড়িবেটি হামাক মাপ দেও।

নাঠুয়া ও চাক্কাউ ঃ (গীত)

গড়ান ঃ এলা আপোন আপোন সাবধান।
রাখ্ মান সন্মান্,
ওরে পরার নারী লোভ করিয়া হন অপমান।।

চিতান ঃ ওতোরা দেখরে
না বুঝি সাউকারি করে
মাপ নিল অধ্যক্ষ দুই পাও ধরে
ধর্ম বলতে একটা জিনিস আছে উপরে।
ওকি ও মরিবে— মরি মোর হায়রে হায়।।

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি ড. সুবোধ সেনের 'বাংলা লোকনাটকের উৎস কথা, সংজ্ঞা ও পরিচয়' (২০০৭) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

পালাটিয়া

দশ নম্বর আড়ি ঢেনা অধিকারী

চরিত্রগণ—

পুরুষ চরিত্র ঃ

জোতদার	-	লোভী জোতদার
মোড়ল	-	ঐ কর্মচারী
সিদা	-	জোতদারের ভাই
নেতা	-	জনৈক বৃদ্ধ
মানিক	-	জোতদারের ছেলে
গোসাই	-	নাল্টিয়া গোসাই

স্ত্রী চরিত্র ঃ

চঞ্চলা	-	জোতদারের স্ত্রী
বুড়ি	-	ময়নার মা
ময়না	-	বিধবা যুবতী
সাই	-	গোসাইয়ের স্ত্রী

বন্দনা

হাঁদি ঃ স্বাধীন হইল রে, সোনার বাংলা
মানুষক মানুষ চিনে না
এলা ধর্ম কর্ম হারায় ফেলালো
রাজনীতি ভাই আসিয়া।

চিং ঃ স্বাধীন পায়া দেশের নোকলা
মিছায় দিছে সনা রুপা
এলা বাপে বেটায় আলদায় খাচে রে
দেশটা স্বাধীন রে হয়া।

(জোতদারের প্রবেশ)

জোতদার ঃ মোড়ল— মোড়ল কিরে কুনঠে তুই।

(মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল ঃ মিঞা ও ভাই, কিতা ডাকালু রে?

জোতদার ঃ লোক কয়জন হামার রে।

মোড়ল ঃ লোক তুমরা দুইজন, হামরা দুইজন কয়জন জানিস না। আর তোর ছুয়াটা। ঐ সিদা ভাই।

(সিদার প্রবেশ)

সিদা ঃ ঐ কি তায় রে।

মোড়ল ঃ বড় ভাই ডাকাইল।

সিদা ঃ ঐ দা কিতায় ডাকালো।

জোতদার ঃ তোর ভৌজিক ডাকা।

সিদা ঃ ভৌজি, ও ভৌজি—

(চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা ঃ তোমা কি হামাক ডাকালেন?

জোতদার ঃ হ্যাঁ, ডাকানো। তোমা কাজকর্ম করেন। হামা গেনো জলপাইগুড়ি। (উভয়ের প্রস্থান)

সিদা ঃ ভৌজি হুমা তো চলি গেইল। হামার কি খাওয়া দাওয়া নাই।

চঞ্চলা ঃ তালে চা খা। (প্রস্থান)

(ময়না ও বুড়ির প্রবেশ)

বুড়ি ঃ নামটা ময়না, ভাতার তোর একটাও রয়না। এই বুড়িটার মাথাত রওয়া লাগে চড়িয়া। দ্যাখ, তুই কি করেক, করেক। কাম না করিলে ভাত নাই। (প্রস্থান)

ময়না ঃ মা তো গেল কাম করিবা। মুই যাও ছাগল নড়েবার নদীর ডাঙাত।

গান ঃ দারুন বিধিরে, আজি তোর কি মনে এই ছিল

ও হো সনার জাদুর জীবন ধরি নেগালো

ওরে এইনং কান্দন বিধি মোকে রে কান্দালো।

(জোতদার ও মোড়লের প্রবেশ)

মোড়ল ঃ কি রে দাদা।

জোতদার ঃ কি ভাই, হিত্তি কুতিরে। ঐ দ্যাখ কায় গান গাসে রে।

মোড়ল ঃ ইটা তো চেংরির গালা।

জোতদার ঃ ভাই দ্যাখ তো, কুন চেংরি গান গাসে।

(মোড়ল ময়নার কাছে গেল)

মোড়ল ঃ মাই তোর বাড়ি কুনঠে।

জোতদার ঃ মোর বাড়ি বেলাকোবাত।

মোড়ল ঃ তোর কায় কায় আছে।

ময়না ঃ মোর কাহ নাই। মাওটা আর মুই।

মোড়ল ঃ মাই, মোর একটা কাথা রাখিবো।

ময়না ঃ কি কাথা?

মোড়ল ঃ কাথা কি আর মাই। তোরও কাহ নাই, মোরও কাহ নাই। তোক মুই নিবার চাহছো। আরও তোক জোতদার যদি একবার দ্যাখে টানিয়া নেগাবে। উয়ার তো ছাওয়া পাওয়া আছে। তুই কারঠে যাবু।

ময়না ঃ তোকে নিম নে। তোর তো কাহ নাই। (মোড়ল ও ময়নার হাত মিলন হইল)

মোড়ল ঃ তুই রহিস, মুই দাদাক ডাকায় আনো। (জোতদারের কাছে গিয়ে) তোক যাবার কইল চেংরিটা। (ময়নাকে দেখে জোতদারের মন আকুল হয়ে উঠল)

জোতদার ঃ মোড়ল, তুই যদি ঐ চেংরিটাক নিয়া যাবার পারিস মোরঠে, তোর মাইনা বাড়ে দিম।

মোড়ল ঃ মাই, একটা কাথা।

ময়না ঃ কি কাথা।

মোড়ল ঃ তোক নিবার খিব পাগলা জোতদারটা। তুই কি নিবু।

ময়না ঃ তালে ওহো পাগলা, তোহও পাগলা। তো দেখ ভাই একটা মোর কাথা। পরীখ আছে যায় তোমরা ওই বাঁশানী তলার দিঘিটাত যায় ডুবিয়া অভা পাবেন বেশিক্ষন তাকে নিম।

(প্রস্থান)

(মোড়ল জোতদারের কাছে যায়)

মোড়ল ঃ জোতদার ওয়ায় নিবে। কিন্তুক একটা পরীখ দিল, ঐ বাঁশানীতলার দিঘিটাত ডুবিয়া অনেকক্ষন অভা খাবে। কিন্তুক আজি না হয়, কালি সাকাল দশটা। (উভয়ের প্রস্থান)

(নেতার বাড়িতে ময়নার প্রবেশ)

ময়না ঃ দাদু, ক দেখি কিতায় আসিনু তোর বাড়িত।

নেতা ঃ কিতায় আসিলু?

ময়না ঃ বড় বিপদে পড়ি আইচু।

নেতা ঃ কি বিপদ কহ?

ময়না ঃ দাদু দেখ, দুইজন মোক চাহেচে নেবা। তা একটা ভাই মুই বুদ্ধি করিচু। ঐ যে বাঁশানীর তলার দিঘিটা আছে না, তোর মাছ পোষার দিঘিটা। দুইজনাকে কহচু ডুবিবার। এইঠা বুদ্ধি ভাল না খারাপ।

নেতা ঃ মাই ভালোয় কাম করিছিত। কালি কুনবেলা আসিবে।

ময়না ঃ দাদু, সাকাল দশটা।

নেতা ঃ ঠিক আছে মুই কুনবেলা যাম, যাম। (উভয়ের প্রস্থান)

(মোড়ল ও জোতদারের প্রবেশ)

মোড়ল ঃ ভাবী, ভাবী বাড়িত আছেন না নাই।

চঞ্চলা ঃ সিদা কুনঠে।

(সিদার প্রবেশ)

জোতদার ঃ কিরে মানিক কুনঠে?

সিদা ঃ মানিকটা গেইছে পড়িবার।

জোতদার ঃ তোমরা বাড়ির কামতো কাহ্ করেন না। সিদা আজি তোমাক কামগিলা ভাগাভাগি করি দিম।

সিদা ঃ কি কামলা ভাগ করি দিবু, দে।

জোতদার ঃ আজি তকা মানিকক ইস্কুল লেগাবো আর আনিবো। তোর কাম এইটা থাকিল। কালি তকা এই কামঠা করবু। আর হামার আজিকার জলপাইগুড়ির কামটা হয় নাই, হবে কালি।

(প্রস্থান)

সিদা ঃ বাউ ইস্কুল যাবো তো খোরাক খাবার না হইস। এলাও সময় তোর হয় নাই।

চঞ্চলা ঃ আজি মুড়িলায় খায়া যাও। ভাত আন্ধিবার ফম নাই। (প্রস্থান)

মানিক ঃ (মুড়ি খেতে খেতে) কাকা মুই হাগিম।

সিদা ঃ যা হাগানে যা, হাগিয়া আয়। কিরে এলাও হয় নাই।

মানিক ঃ কাকা হইচে।

সিদা ঃ এই মুড়িলা খা।

মানিক ঃ কাকা, আরও হাগিম।

সিদা ঃ এলায় হাগিলো, আরও হাগিবো। তোর মাও কি খিলাইচে।

চঞ্চলা ঃ আরে সিদা কি হইল রে, কি হইল।

সিদা ঃ কি খিলাইচিস রে ছওয়াটাক?

চঞ্চলা ঃ কি খিলাইচু, খোকরা ভাত খাইচে।

সিদা ঃ ঐ তানে হাগেছে। ওষুধ আছে মোরঠে।

চঞ্চলা ঃ কি ওষুধ?

সিদা ঃ ধোকরা ছিনিয়া ছুবিয়া খোকরা ভাত দিয়া মাখিয়া খিলায় দে ছওয়াটাক।

চঞ্চলা ঃ ঐ সিদা, ঐলা তো গরুর খোরাক রে। (প্রস্থান)

জোতদার ঃ কিরে মোড়ল এলাও না আইসে রে।

মোড়ল ঃ অত চিন্তা কিতায়, আসিবে।

(ময়নার প্রবেশ)

মোড়ল ঃ ময়না, এলা না আসিলো গে, কয়টা বাজে।

ময়না ঃ ও হো হো মোর বাড়িত ত কামে নাই। আজি তমরা ধরিয়া নেগাবেন তা তো মোর সাজাপালা নাই।

জোতদার ঃ মাই দিঘিটাত কুন কারনে ডুবিমো।

ময়না ঃ কিতায় তোক কহে নাই মোড়ল।

জোতদার ঃ না, মোক তো কহে.নাই।

ময়না ঃ তহ নিবো, ওহ নিবো। তো মুই নিম কাক।

জোতদার ঃ কিরে মোড়ল, তোর মনত কি?

মোড়ল ঃ দ্যাখ ভাই, বাংলাদেশ তকা মুই ৭৩ সনে আসিনু ইণ্ডিয়া। ছোটো তকা তোর বাড়িত। নোকটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হয়া গেনু। কোনয় চিন্তা করলো নাই মোর।

জোতদার ঃ ওঃ যার জন্য তুই ওক চাইস নেবা।

মোড়ল ঃ হ্যাঁ, নে বড় ভাই তোর কত দম মোর কত দম।

জোতদার ঃ হয়া গেইছে। মোর নগত তুই পারিবো?

মোড়ল ঃ বাংলাদেশত মুই যেলা ৭২-এ ছিনু পদ্মা নদীটাত সাত দিন সাত আতি ডুবি ছিনু। তুই মোর নগত পারিবু।

জোতদার ঃ নে, হয়া যাক।

ময়না ঃ ওহেন আংসাগুত ডুবেন না। যেলা মুই কহিম ১-২-৩ সেলা দিবেন ডুব।

মোড়ল ঃ ওই ভাই, তোমরা কি রেডি।

উভয়ে ঃ নে - না, হ্যাঁ - হ্যাঁ।

ময়না ঃ এক-দুই—

(দুই বলতে দুজনে ডুব দেয়)

মোড়ল ঃ (জলের উপরে উঠে) ও ভাই এলাও উঠে নাই। (আরও ডুব দেয়)

জোতদার ঃ (জলের উপরে উঠে) মোড়ল এলাও উঠে নাই। (ডুব দেয়)

(এভাবে চলতে থাকে। দিঘির পাশ দিয়ে সিদা মানিককে নিয়ে স্কুলে যায়)

সিদা ঃ কি ব্যাপারটা ডুবেছে আর উঠেছে। কি হারায়চে রে ভাই। মোর কাথাটা কাহ না শুনায়।

(দুজনকে ডুবতে দেখে সেও ডুব দিল)

(নেতার প্রবেশ)

নেতা ঃ মাই, তুই ছওয়াটাক নিয়া চলি যা। (ময়নার প্রস্থান)

(নেতা মোড়ল ও সিদাকে ধরে ফেলল) তোমার ব্যাপারটা কি রে? মোর দিঘির মাছ কুনও বছরে পানু না। পত্তিবার মোর দিঘির মাছ চুরি করি খাচেন। (সিদাকে চড় দিল)

সিদা ঃ তুই কি রে?

নেতা ঃ মুই নেতা-নেতা।

সিদা ঃ তুই ন্যাতা-তুই খ্যাতা।

নেতা ঃ কি লোভীদা! তামুনঠে তোর লোভ। (প্রস্থান)

জোতদার ঃ কিসের লোভ?

নেতা ঃ মাছগিলা পত্তি বছর মোর মারি খাচেন। তোর লজ্জা নাগে না রে।

জোতদার ঃ কায় কচে?

নেতা ঃ তিনজন তোমরা ডুবিছেন দিঘিটাত। দিঘিটায় মোর ছোটো, মাছ থাকিবে কয়টা।

জোতদার ঃ মোক মাপ দে। আর মুই তোর দিঘিত কুনদিন আসিবার না হও। (প্রস্থান)

(সিদার প্রবেশ)

সিদা ঃ ভৌজি, ও ভৌজি।

চঞ্চলা ঃ কিরে সিদা, লোকটা আসলু তুই ভিজিয়া।

সিদা ঃ ভৌজি, ওইটা কাথা কহিস না। বাঁশানীর দিঘিটাত গেনু পিছলিয়া পড়নু, তায় সব গিলা ভিজিয়া গেলেক। মুই তো ভিজিছু ভিজিছু, দাদা আর মোড়ল ভিজিয়া হইচে হলুং ঝুলুং।

চঞ্চলা ঃ কি ব্যাপারটা!

(মোড়ল ও জোতদারের প্রবেশ)

মোড়ল ঃ হোই ভাবি, গুদুলিটা আনতো গে। মোর জার ধইচে।

চঞ্চলা ঃ ও হো হো গুদুলি।

সিদা ঃ ওই ভৌজি, গুদুলি বাদ দিয়া সিঞ্জার আরেয়া আর সালাইটা আনতো।

চঞ্চলা ঃ কি করিবো রে?

সিদা ঃ আজি ওক মুই ওর জারটা খেদায় দিম।

মোড়ল ঃ কেঙকো।

সিদা ঃ দে-দে-দে তোক জার ধইচে।

মোড়ল ঃ ওই আল্লা!

জোতদার ঃ চঞ্চলা এট্টা বেলা হইল সাতটা বাজে, মানিকটা কুনঠে।

চঞ্চলা ঃ ওই সিদা তুই তো ইস্কুল নেগানো, কোনঠে মানিক।

সিদা ঃ হ্যা মুই তো ওইঠে থুয়া আইচু। তুই দেখিস নাই মোড়ল দা।

মোড়ল ঃ হামা কিনা দেখিনু। তুই নেগাইছিস, তুই জানিস।

জোতদার ঃ ছওয়াটা কুনঠে গেইল। (রেগে গিয়ে) তুই বাড়ি তকা নিকলি যা। তোর মতন ভাই আর মোর দরকার নাই। যেইদিন মানিকক আনিবা পাবু, ওদিনা বাড়ি আসিবু।

সিদা ঃ দাদা, তালে মোর একটা কাথা শুন—

দাদারে তুই মোর দাদা, মারিস না

ওগে বুড়া বাপ মোর

প্রাণেরে বাজিবে না। (প্রস্থান)

(গোসাই-এর প্রবেশ)

গোসাই ঃ হরিবোল, হরিবোল। বাবারে মোক তো কাহ চেনেন না। মোর নামবা নাল্টিয়া গোসাই। মোর কাহয় নাই। খালি আছে একখান সাই। সাই, ও সাই।

(সাই-এর প্রবেশ)

সাই ঃ কি ঠাকুর, ডাকালেন কি তায়?

গোসাই ঃ দ্যাখ তুই বাড়িত রইস, মুই যাও শিষ্যর বাড়িত।

সাই ঃ যাও। (প্রস্থান)

(সিদার প্রবেশ)

সিদা ঃ এলা কেংকরে যাম। এং করে মুই যদি বেড়াও কাজ কাম কাহো মোক দিবা না হয়। তা এবারে মুই গোসাই হোম। যাও মুই গুরুর বাড়ি।

(রাস্তায় দুজনের দেখা) হা, হামার গুরুটা আইচ্চে নাকি তা।

গোসাই ঃ কি বা সিদা, কায় বারে?

সিদা ঃ মুই গুরু।

গোসাই ঃ তুই গুরু তো মুই কি?

সিদা ঃ বা ওইটা না হয় বারে। ঠাকুর যাবেন কুনঠে।

গোসাই ঃ তোমার উদি।

সিদা ঃ মহ তোমাতি।

গোসাই ঃ চল, হামার উত্তি।

(গোসাই-এর বাড়িতে প্রবেশ)

গোসাই : ও সাই, দ্যাখ তো আইচ্চে কায়?

সাই : বা বার বছরে আসিলো বারে।

সিদা : মাতাজি, নোকটা নড়ুবার পারু না।

সাই : কেনন বা, তোমরা কি নোকটা মোটা নড়িবার পারেন না।

গোসাই : কি তায় কি মনে করিয়া আসিলেন।

সিদা : মুই বা বড় মন করি আসিনু। বাড়িত মোক অভায় মনায় না।

গোসাই : তা বা এলা কি হবেন।

সিদা : অধিকারী হোম।

গোসাই : অধিকারী হবু তো মন্ত্র টন্ত্র নে।

(মন্ত্রপ্রদান)

সিদা : (গান) ও ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী

ও গো ঝোলা মালা নিয়া

ও মুই সাজিনু অধিকারী

ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী।

এই আসরে আছেন যত কুল দশ জন

তোমারটে ভিক্ষা নিয়া মুই দিম গুরুর দক্ষিনা।

গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু বন্ধু ভাই

গুরু ছাড়া ভবের হাটে আর কেহ নাই

ভিক্ষা দাও গো নগরবাসী। (প্রস্থান)

(নেতার প্রবেশ)

নেতা : ময়না-ময়না।

বুড়ি : কিতায় আসলো বা?

নেতা : দ্যাখ বা, তোর বেটি যে ঘটনা ঘটাইচে, পোছেক দি তোর বেটিক।

বুড়ি : ময়না কি হইচে বা ঘটনাটা। এই ছোয়াটা কায়?

ময়না : ছোয়াটা দিছে মোক দাদু। দাদু তুই তো বেহায় করিস নাই। ছোয়াটা পালু কুনঠে।

নেতা : পাগলি, ছওয়াটা হইচে লোভী জোতদারের। যেনং লোভী সেনং ফল। পুত্রহারা শোক বুঝুক কেনে।

ময়না : দাদু, মুই তো হনু আড়ি মানসি। মাও আড়ি। ছওয়াটা তোরঠে ওহক।

নেতা : মাই তোমার বাড়িত ভেল দিন তকা আসচু যাছু একটা খারাপ লক্ষণ দ্যাকেচু। দোনোমায় বেটি তায় কোনকোয় বনেন না। তা ভাল একটা ঢেনা অধিকারীক দিয়া বাড়িটার সেবা দেও।

বুড়ি : বা ঢেনা অধিকারীটা পামো কুনঠে।

নেতা : বা খুঁজিলে খোদার নাগাল পাওয়া যায়। (প্রস্থান)

(ঢেনা অধিকারীর প্রবেশ)

অধিকারী : প্রথম সেবাখান পানু মুই প্রতাপদার ওটি। আর দুই নম্বর সেবাখান দিম রনেনদার হুত্তি।

(বুড়ি ও ময়নার প্রবেশ)

ময়না : তুই যা দক্ষিনপাখে, মুই যাও উত্তর পাখে। তুই পালে আনিস, আর মুই পালে আনিম অধিকারীক। (পথে ময়নার সাথে দেখা অধিকারীর) এটা তো বোষ্টমও হবা পারে। নাকি অধিকারী।

অধিকারী : (ধাক্কা লাগল) এটা কেনং চেংরি রে, তোর চখু নাই।

ময়না : তুই কেনং ঠাকুর রে, আখ-পাছ তোর নাই। আচ্ছা তোমরা বোষ্টম না অধিকারী, না আর কুন ঠাকুর। মেলা ঢং দ্যাখেছ।

অধিকারী : কি ঢংটা ! তোর কি? তুই কবার কায়। মুই ঠাকুরে না বোষ্টমে তুই কবার কায়।

ময়না : না, ঠাকুর। হামা খিবে বিপদত পড়িছি।

অধিকারী : হুটা কুন বিপদ।

ময়না : বা, হামার নাগে ঢেনা অধিকারী।

অধিকারী : বেহা হইলে ওইটা অধিকারী দিয়া কি সেবা হবা না হয়!

ময়না : না হয় ঠাকুর। হামার ঢেনা অধিকারী নাগে।

অধিকারী : মুই তো বেহা করু নাই। তো মুই কি অধিকারী নাহ।

ময়না : ঠাকুর তোমায় হামার অধিকারী। চল বাড়িত। (প্রণাম করল) (প্রস্থান)

(বুড়ির প্রবেশ)

বুড়ি : অধিকারী তো পাও নাই, কীত্তনের দল দিয়া সারি দিম। হামার বেটিটা তো নাই। কীত্তন শুরু কর।

(অধিকারী ও ময়নার প্রবেশ)

ময়না : হামার বাড়িত কিসের গণ্ডোগোল!

অধিকারী : মাই কুনো বিয়াও-টিয়াও নাগাইছেন নাকি!

ময়না ঃ মা, ইলা কি?

বুড়ি ঃ কীত্তন।

ময়না ঃ সেবা নাই দিতে কীত্তন!

বুড়ি ঃ অধিকারী কুনঠে পাবু। মুই পাও নাই বাদে কীত্তনের দল আনিচু। হুটা কুন ফটকচোখা ঠাকুর।

অধিকারী ঃ কী মাই, মুই গেনু বাড়ি।

ময়না ঃ ঠাকুর বস দি।

অধিকারী ঃ বুড়ির বেটি শুন দি উত্তরের স্রোতের জল, গঙ্গার জল, বাচ্ছি গোরুর লোদী, আরিয়া গোরুর গোবর, তুলসীর পাত, দুরবার বন, আর একটা পাথর, সনা-উপার জলটা গিলাসত করি আনো।

ময়না ঃ ঠাকুর সনা ত নাই। খালি কানেরটা আর গালার মালাটা উপার।

বুড়ি ঃ ময়না তুই গালার মালাখান গিলাসত করি আন।

ময়না ঃ এইলা কুনঠে দিমো ঠাকুর।

অধিকারী ঃ হ্যা, মোর মাথাত দেও।

ময়না ঃ (ময়না অধিকারীর মাথায় মালাটা দিল)

অধিকারী ঃ কি মাই, ইটা কি কাম করলু!

(নেতার প্রবেশ)

নেতা ঃ ময়না-ময়না কি হইল, কিসের এমুন গণ্ডোগল।

ময়না ঃ দ্যাখেক দাদু, ঠাকুরটার কাথা। ওহে দিবার কোল মাথাত। গিলাসটা কি মাথাত ওহে। গালাত পড়ি গেইছে।

নেতা ঃ ওই ঠাকুর তোর এত গরম। তুই ত ভাল করি কবার তো পারিস ঠাকুরের ওটি দেও। তোর কুন দরকার মাথাত কবার। এলা তোক ময়নাক বিয়াও করির নাগবে।

ময়না ঃ (গান) তুই মোর ঠাকুর, ঠাকুর রে নয়জন।

স্বয়ামি মোর গেইসে মরিয়া

আর থুইসু মুই একটা ডাঙ্গুয়া

সেও ডাঙ্গুয়া মোর গেলরে মরিয়া

তুই মোর ঠাকুর ঠাকুর গো

ওরে হিয়া না হয় গুয়াপান কাটিয়া মুই তোক দেখাম

দিনে রাইতে মন কান্দেসে জানে ভগবান।

আজি লবীন বয়সে ঠাকুর হলো

ও কি খালো আর কি দেখিলো

আশা তৃষ্ণা করিল বার যাই

লবীন বয়সে ঠাকুর হলে মনটা নরম চাই ।

চিতান ঃ তুই মোর ঠাকুর ঠাকুর গো

মুই হনু অভাগী নারী

তুইও যাবো ঠাকুর হামার বাড়ি

বাড়ি যায়া ওরে ঠাকুর করিব সেবা। (প্রস্থান)

(জোতদার ও মোড়লের প্রবেশ)

চঞ্চলা ঃ ছওয়াটার খোঁজ কি করিস না । (ক্রন্দন)

জোতদার ঃ মোর আর উপায় নাই ।

মোড়ল ঃ কিসের তায় উপায় নাই। ইজাহার দেও। আর বাউটার ফটোক নিয়া টিভি সেন্টারত যাও।

জোতদার ঃ চল, জলপইগুড়ি যাই ইজাহার দিবার। (প্রস্থান)

(গোসাই-এর প্রবেশ)

গোসাই ঃ সাই, ঘেগো মেগো আনতো গে।

অধিকারী ঃ মা, তোমহা কুনঠে যাবেন। মোর নগত চল গুরুর বাড়ি।

(গুরুর বাড়িতে প্রবেশ) ঠাকুরবা তোমার তানে তামান পানু। মোরঠে এখান শুনো কাথা।

গোসাই ঃ কহ কহ।

অধিকারী ঃ (গান) গুরু বিনে ভব নদী কায় করাবে পার

মন কহচে যাবোরে ঐ পার ।

চিতান ঃ হিন্দুস্থান আর পাকিস্থান

মধ্যেতে হইল বর্ডারখান,

বিনা পাসপোর্টে মন

হওয়া না যায় রে পার

মন কহচে যাবো রে ঐ পার।

(নেতার প্রবেশ)

নেতা ঃ ছওয়াটাক এই গুরুর বাড়িত থোম। ছওয়াটাক ধরি বেড়াম কুনঠে চেনা লোকটা।

অধিকারী ঃ হ্যা, ওই নেতা শালা, তুই ওক পালু কুনঠে রে।

নেতা ঃ তোমরা দিঘিটাত যে ডুবিলেন, ছওয়াটার কাহ খোঁজ করিচেন। হ্যা ছওয়াটাক মুই নেগাছ।

ছওয়াটাক আজি তোকে দিয়া যাসু। (প্রস্থান)

(চঞ্চলার পাগলিনীবেশে প্রবেশ)

চঞ্চলা ঃ (গান) বাছারে সোনা তোর মাক গেলোরে ছাড়িয়া
কান্দিয়া মরিম রে যাদু তোর শোকে ।

চিতান ঃ বাছা মায়ের সনে নাই হইল দেখা
কুনঠে গেলো বাছা পাষান হয়া
ওই বাছারে তোর শোকে মুই মরিম রে।

চঞ্চলা ঃ ঠাকুর। (প্রনাম করল)

গোসাই ঃ তমরা এইলন কেঙকরে আইচ্চেন বারে।

চঞ্চলা ঃ ঠাকুর মনের দুখে তমারঠে আসলন বা, তামান ফেলানু হারেয়া।

অধিকারী ঃ ওই ভৌজি, তুই এঙকরিয়া কিতায় আউলঝাউল করিয়া।

চঞ্চলা ঃ ভাই দ্যাখেক, তামানলায় ফেলানু হারেয়া। তোকও হারানু, ছওয়াটাকও হারানো, তোর দাদাকো হারাইচু।

অধিকারী ঃ ভৌজি চিন্তা করিস না, ঠাকুরের কৃপায় তামান আনলু মুই জড়েয়া।

মানিক ঃ মা - মা।

চঞ্চলা ঃ বাউ ওটা কোন চেংরি।

অধিকারী ঃ ওকে করছু মুই বেহা।

চঞ্চলা ঃ ভালয় হইচে। চল যাই বাড়ি এলা সগায় মিলিয়া । (প্রস্থান)

(জোতদার ও মোড়লের প্রবেশ)

জোতদার ঃ মোড়ল, দুয়ারলা বন্ধ কিতায়?

মোড়ল ঃ কাহয় নাই।

জোতদার ঃ হে-বাড়ি হো-বাড়ি খুঁজি দেখ।

মোড়ল ঃ কাহোর উত্তি নাই।

(এই কাথা শুনিয়া জোতদার কান্দিতে কান্দিতে বাড়ি তকা যায় নিকলিয়া)

(রাস্তায় সগার নগত দেখা হয়)

জোতদার ঃ বাউ পালু কেঙকরি এক।

অধিকারী ঃ দ্যাখ দা, যার তানে আন্ধিনু ভাত ওয় ওহিল পরবাস। আর নিন্দের ছওয়াটা উঠিয়া ঘাকাত ঘাকাত ।

সংগ্রহসূত্র ঃ ভবতোষ রায় (৬২), বেল্লাকোবা,
জলপাইগুড়ি, তাং-২৫.০৮.১০।

পালাটিয়া

অতি চালাকের গালাত দড়ি

চরিত্র–

পুরুষ ঃ-	লোভী -	গ্রামের প্রধান	মহিলা ঃ-	মধুভাষি -	গ্রাম্য বিধবা
	সাদাসিদা -	মধুভাষির দেওর		শিক্ষাবালা -	প্রধানের মেয়ে
	চোকিদার -	প্রধানের কর্মচারী			
	গাঠিনাগা -	মধুভাষির দাদা			
	মুহুরি -	কোর্টের কর্মচারি			

বন্দনা

ওরে বন্দু বাঞ্ছা কল্পতরু ত্রিজগতের পরম গুরু
গুরু বিনে আরত কাহয় নাই-আ-হাই
কর্ম্ম দোষে রে-হে
জীব করে আসি যাই।

চিং - ওরে সত্য ত্রেতা দাপর কলি
চারি যুগত গেল চলি মোর কলি
কাল আসিয়া ঠেকিল ভাই— আহাই
এ কলিতে রে দেখ রং তামসা ভাই —।

চিং - ওরে তুইরে কলি শয়তানের গড়া
কার কুঠে মিলাছিত জড়া-হা জড়া
তোক ছাড়া জীবের শান্তি নাই-আহাই
যায় নাই বুঝেন রে-হে
তায় চিন্তা করিবেন ভাই।

(লোভী প্রধান ও চোকিদারের প্রবেশ)

লোভী ঃ দশঠাকুরলা মুই হনু এই গ্রামের প্রধান। মোর নাম বা লোভী চন্দ্র রায়। এই অঞ্চলত মোক ডেকায় লোভী প্রধান করি। দেখং তো বায় মোর চোকিদারটা কুনঠে গেইল। আরে চোকিদার।

চোকিদার ঃ হুজুর, মুই এইঠে।

লোভী ঃ যা মোর অঞ্চলের চোকিদারি টেক্সের খাতাখান আনতো।

চোকিদার ঃ হুজুর, মোরঠে না খাতাখান। এই নেও। (খাতা দিল)

লোভী ঃ দেখুং তো এই বচ্ছর কায় কায় খাজনা নাই দেয়। (খাতা দেখে) ঐ নদীর পারের মধুভাষি বর্মন। উনায় এলাও খাজনা জমা নাই করে। চোকিদার তুই যায়া খবরটা দিছিস।

চোকিদার ঃ মুই তো সেদিনে খবর দিনু।

লোভী ঃ যা তো তুই, এইবার উনায় খাজনা না দিলে ধরি আনিবো।

চোকিদার ঃ আচ্ছা যাছো হুজুর। (উভয়ের প্রস্থান)

(মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ দশঠাকুরলা তোমরা মোর প্রণাম নে। মুই হনু আড়ি মানসি। মোর নাম হইল মধুভাষি বর্মন। মোর এই বাড়িত মুই আর ছোট দেওর থাকং। ঐ বাউ সাদাসিদা, কুনঠে গেলু তুই। খানিক এদি আয়।

সাদাসিদা ঃ কি কচিস বৌদি। মোক ডাকালো কেনে তায়।

মধুভাষি ঃ তুই ওঠে কি করিবা ধচ্চিস। গরুলাক খানিক ছেয়াত নড়ে দে।

সদাসিদা ঃ নইস, এলায় যাছো গরুবাড়ি। (প্রস্থান)

(মধুভাষির বাড়ি)

(এমুন সমায় চোকিদারের প্রবেশ)

চোকিদার ঃ হা গে ভাউজি, বাড়িত আছিস না নাই।

মধুভাষি ঃ কায় রে বা, ভাউজি ভাউজি করি ডাকাছিস।

চোকিদার ঃ মুই চোকিদার।

মধুভাষি ঃ তুই আরো আজি আসিলু। মোরঠে তোর আরো কুন দরকার।

চোকিদার ঃ বা, তুই কি কছিস ভাউজি। তামান কাথা তুই কি ভুলি গেলু, না ভুলি যাবার ভান করির ধচ্ছিস।

মধুভাষি ঃ সচায় মোর ফমে নাই রে চোকিদারদা।

চোকিদার ঃ তোরঠে মুই বাকি খাজনার টাকাপাইসা নিবার আসিনু। তোর তামান খাজনালা আজি শোধ করি দে। মোট খাজনা তোর বাকি চাইর হাজার টাকা।

মধুভাষি ঃ চোকিদারদা মোরঠে তো এতলা পাইসা নাই। মুই গরীব মানষি, মুই কোটে থাকি দিম।

চোকিদার ঃ মুই কোনো কাথা শুনিবা না হও। মোক মালিকের হুকুম পালিবার নাগিবে।

মধুভাষি ঃ দয়া কর মোক তোমা। (কান্দন)

চোকিদার ঃ একখান উপায় আছে ভাউজি। যুদি তোমা রাজী হন।

মধুভাষি ঃ কি উপায় কন চোকিদার। (সাদাসিদা নুকিয়া তামান দেখেছে)

চোকিদার ঃ মুই তোমাক নিবার চাং, তোমা যুদি রাজী হন তাইলে আর বাকী খাজনা দিবার নাইগবে না।

মধুভাষি ঃ তৎকরায় তায়।

চোকিদার ঃ হয়, হয়। আজি মোরঠে পাঁচশো টাকা আছে, নে তুই। ঠিক আছে ভাউজি। এই রবিবার বেলা দশটার সময় মুই আসিম। তুই রেডি হয়া থাকবু। (প্রস্থান)

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ বৌদি, বৌদি।

মধুভাষি ঃ কি হইল রে।

সাদাসিদা ঃ তুই মানষিটা ফির কেমুন? চোকিদারটা আসি কইল আর তুই রাজী হয়া গেলু।

মধুভাষি ঃ ভাই, তুই তো সবে জানিস। মুই এলা কি করিম। চোকিদারী টেক্স দিবার মতন পাইসা তো মোরঠে নাই।

সাদাসিদা ঃ বৌদি মুই তো সবে জানু। দেখু মুই কুনো বেবস্থা করির পারু না পারু। তুই বাড়িটাত খানিক সাবধানে থাকিবু। ঐ প্রধান আর চোকিদার দুইটা বোল ভাল মানষি না হয়।

মধুভাষি ঃ চল, তোক খরাক দেংছে। (উভয়ের প্রস্থান)

(অঞ্চল অফিস)

(প্রধানের প্রবেশ)

প্রধান ঃ চোকিদারোক যে মধুভাষির বাড়ি পাঠেয়া দিনু কৈ এলাও তো ফিরিয়া আসিল না।

(চোকিদারের প্রবেশ)

চোকিদার ঃ হুজুর।

প্রধান ঃ কি রে চোকিদার কতখনে তোক পাঠানু মধুভাষির বাড়ি। এলাসেনে তুই আসিলু। মধুভাষি খাজনার পাইসালা দিলেক।

চোকিদার ঃ না দেয় হুজুর।

প্রধান ঃ কেনে?

চোকিদার ঃ উয়ারঠে বোলে এলা পাইসাকড়ি নাই। গরীব মানষি, ছাড়ি দেন হুজুর।

প্রধান ঃ উনার বাকী খাজনালা কিতায় তুই দিবু। যত্তসব, যা তোক দিয়া এইলা কাম হবে না। মোকে যাওয়ার নাগিবে। (উভয়ের প্রস্থান)

(মধুভাষির বাড়ি)

(প্রধানের প্রবেশ)

প্রধান ঃ মধুভাষি বাড়িত আছেন বাহে।

(মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ কায় ডেকাছেন? ও প্রধানদা তোমা, আইস, আইস বইস।

প্রধান ঃ না না মুই এইঠে বসিবার আইসো নাই।

মধুভাষি ঃ খানিক তায় গুয়াপান খাও।

প্রধান ঃ দ্যাখেক মুই তোর ফাউকসালি কাথা না শুনো। বাকী খাজনার টাকালা কুনবেলা দিবু।

মধুভাষি ঃ প্রধানদা, মুই কোনঠে থাকি পাইসা দিম। মোরঠে তো এতলা পাইসা নাই। তোমরা মোক কনেক দয়া কর। মোক এইবেলা মাফ করি দেও।

প্রধান ঃ ঠিক আছে এমুন করি যেনং কবার ধচ্চিস, নে, এইবার তোর খাজনা মাফ। কিন্তুক মোর একখান শর্ত আছে।

মধুভাষি ঃ কেমুন শর্ত?

প্রধান ঃ ভালেদিন থাকি তোক দ্যাখেচু, তুই বড়ো দুখি মানষি। মুই-ও ভাই একেলা মানষি। তো মুই তোক নিবার চাছু। তুই মোরঠে আসিলে সুখত নবু। এলা তুই যদি রাজী থাকিস তাইলে তোর খাজনা মাফ করি দিম।

মধুভাষি ঃ তোমা এই গ্রামের মাথা। (এইবারো সাদাসিদা নুকিয়া তামানে দেখেছে) তোমাক আর কি কইম।

প্রধান ঃ ঠিক আছে মধুভাষি এই ধর হাজার টাকা। এই টাকা দিয়া ভাল দেখি কাপোর চোপর কিনিস। আর এই রবিবার ঠিক বেলা দশটার সমায় মুই আসিয়া তোক ধরি যাইম। আচ্ছা মুই এলা যাছো। (প্রস্থান)

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ হা গে বৌদি তুই কেমুন মানষিটা রে। পরধানটাকও তুই কাথা দিলু।

মধুভাষি ঃ ভাই সাদাসিদা, মুই আর কি করিম ক তো। মুই একঝন অবলা নারী। মোর কি এইলার নগত লড়িবার ক্ষমতা আছে।

সাদাসিদা ঃ যা হওয়ার হয়া গেইছে। এলা এই দুইঝনের হাত থাকি কি করি বাঁচিবু সেইটা চিন্তা করেক।

মধুভাষি ঃ তা মুই এলা কি করু।

সাদাসিদা ঃ মোরঠে একখান বুদ্ধি আছে। এলা কি করিবু শুন।

মধুভাষি ঃ কি বুদ্ধি আছে ক।

সাদাসিদা ঃ মুই বাড়িত নোম, আর তুই তোর দাদা গাঠিনাগার বাড়িত সাগাই খাবার যা। আর দাদার নগত খানিক পরামর্শ করিস।

মধুভাষি ঃ ঠিক আছে তায়, মুই এলায় যাম দাদাঘরের বাড়ি। (উভয়ের প্রস্থান)

(গাঠিনাগার বাড়ি)

মধুভাষি ঃ দাদা-গে, ও-দাদা, বাড়িত আছিস না নাই।

(গাঠিনাগার প্রবেশ)

গাঠিনাগা ঃ কি হইল রে, তুই আরো কুনবেলা আসিলু।

মধুভাষি ঃ (গান)

ক্যানে যে আসিনু রে দাদা— শুনেক ভাই।

মোর কপালোত সুখ শান্তি নাই।।

চিতান- গাবুরতে আড়ি হয়া, সগায় মোক চাহেছে নিবার।

শুনেক ভাই, মোর কপালোত সুখ শান্তি নাই।।

চিতান- হামার অঞ্চলের প্রধান চোকিদার

দুই জনে চাহেছে নিবার।

শুনেক ভাই মোর কপালোত সুখ শান্তি নাই।।

(কথায়) দাদা শুনলো তো, মোক খানিক বুদ্ধি দে। ঐ প্রধান আর চোকিদারটাক কি করি শাস্তি দেওয়া যায়।

গাঠিনাগা ঃ তোর তামান কাথালায় মুই শুনিনো, বেপারখান মুই খানিক বোঝো। তুই আজি বাড়ি যা। চিন্তা না করিস, এলাও তোর দাদা বাঁচি আছে। মুই কালি তোর ওঠে যাইম।

মধুভাষি ঃ ঠিক আছে দা এলায় মুই যাছো। (উভয়ের প্রস্থান)

(মধুভাষির বাড়ি)

(সাদাসিদা ও মধুভাষির প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ হ্যা বৌদি, তুই আরো তৎকরায় চলি আসিলু। দাদার নগত দেখা করিস নাই।

মধুভাষি ঃ না হয় দেখা করিসুং। দাদা মোক বাড়ি পাঠে দিল। কালি সাকালে বোলে হামার এইঠে আসিবে। তুই খোরাক খাচিস।

সাদাসিদা ঃ হ্যা সাকালে আন্দিচু। (উভয়ের প্রস্থান)

(গাঠিনাগার প্রবেশ)

গাঠিনাগা ঃ মধুভাষি, ও মধুভাষি বাড়িত আছিস।

(মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ কায়, দা আসিলো। আসিলো আইসেক বইস, বইস।

গাঠিনাগা ঃ আর দেরী না করো, সাদাসিদাটা কোনঠে, উনাক ডাকাও।

মধুভাষি ঃ ঐ সাদাসিদা, তুই আরো কুনঠে গেলু।

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ বৌদি তুই মোক ডেকালু।

মধুভাষি ঃ হ্যা, মোর দাদা আসিচে, তোক ডেকের ধচ্চে।

সাদাসিদা ঃ দা, কুনবেলা আসিলো।

গাঠিনাগা ঃ ভালেক্ষন হইল আসিয়া। শুন সাদাসিদা তোর নগদ খানিক আলাপ আছে।

সাদাসিদা ঃ ক দা, মুই তোরে জন্যে বাচ্চে আছো।

গাঠিনাগা ঃ তামান ঘটনালা তোর বৌদি মোক কইছে। তায় মুই একখান বুদ্ধি করিচু।

সাদাসিদা ঃ কি বুদ্ধি দা।

গাঠিনাগা ঃ তুই বাড়িত মাইয়া সাজি থাকিবু। আর তোর বৌদি বাড়িত নুকি নবে, ঠিক আছে।

সাদাসিদা ঃ পরধান আর চোকিদারটাক এইঢক করি জব্দ করা খাবে। ঠিক আছে দা মুই রাজি। কি বৌদি তুই কি কইস।

মধুভাষি ঃ তোমরা যেইটা ভাল বোঝেন সেইটায় করো। (সকলের প্রস্থান)

(মধুভাষির বাড়ি)

(সাদাসিদা মাইয়া সাজিয়া বাচ্চে আছে)

(চোকিদারের প্রবেশ)

চোকিদার ঃ মাই বাড়িত আছিস?

সাদাসিদা ঃ হ্যা দাদা মুই তোরে না বাচ্চে আছো।

চোকিদার ঃ মাই তুই কি রেডি, চল আর দেরী না করিস।

(এমুন সমায় পরধানের প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ চোকিদারদা হর দ্যাখেক পরধানটা বাড়িত ঢুকেছে, তুই এলা কি করিবু।

চোকিদার ঃ মাই-মুই এলা কি করিম? তুই মোক খানিক নুকি থো।

(সাদাসিদা চোকিদারক ছাগলের খপরার ভিতর ঢুকি থোয়।)

প্রধান ঃ মধুভাষি, তুই রেডি।

সাদাসিদা ঃ হ্যা পরধানদা মুই না রেডি।

প্রধান ঃ চল তায় আর দেরী না করিস।

সাদাসিদা ঃ দা মোর একখান কাথা আছে।

প্রধান ঃ কি কাথা?

সাদাসিদা ঃ মুই মোর পাটা ছাগলটা নগত নিয়া যাবার চাছো।

প্রধান ঃ হিটা আরো কওয়া নাগে। তোর যেইটা মনত চায় নিয়া চল।

সাদাসিদা ঃ (কিছুদুর যায়া) দাদা যাবার তো চাছি তে মোর একটা কাথা শুনেক।

(গান) আজি কলঙ্ক ভাসালো, সংসারোতে রে প্রধান দাদা।

চিতাদ ঃ আজি মধুভাষির ঢক দেখিয়া দিলো হাজার টাকা

ওরে মধুভাষি না হয় হিটা মধু হোলেক ভাষা।

প্রধান ঃ কি কবার ধচ্চিস মধুভাষি!

সাদাসিদা ঃ দাদা মুই পাঠাছাগলটা আন।

(প্রস্থান)

(বাড়ি যায়া ছাগলের খপড়া থাকি চোকিদারক বাকরায়)

চোকিদার ঃ মাই প্রধানদাটা কি চলি গেইছে।

সাদাসিদা ঃ না হয় বায়রাত তোর বাদে বসি আছে। আয় বায়রাত আয়। দাদা মোর একটা কাথা শুনেক।

চোকিদার ঃ ক, মাই ক।

(গান) আজি কলঙ্ক ভাসালো সংসারোতে রে চৌকিদার দাদা

চিতান ঃ আজি মধুভাষির ঢক দেখিয়া দিলো পাঁচশ টাকা।

ওরে মধুভাষি না হয় হিটা মধু হোলেক ভাষা।

চোকিদার ঃ কি কবার চাছিস মাই।

সাদাসিদা ঃ হর পরধানদা চোকিদারও না আসিচে মোক নিবার। মুই এলা কারঠে যাইম।

প্রধান ঃ কি এমুন সাহস চোকিদারের, তোক নিবা চাছে।

চোকিদার ঃ হুজুর মুই বোল উয়াক নিম। তোমার তো মেলা পাইসা, তোমরা অন্যঠে চেংরি দ্যাখেন।

প্রধান ঃ না, না হবা না হয়। মুই ইনাক হাজার টাকা দিছু। ইয়াক মুই নিম।

চোকিদার ঃ মুইও দিছু ইনাক পাঁচশ টাকা, আজি মুই-এ ইয়াক নিম।

(দোনোজনে মধুভাষি সাজি রওয়া সাদাসিদাক ধরি টানাটানি করির যায়া সাদাসিদার কাপড় খুলি গেইল)

প্রধান ঃ আরে হিটা আরো কায়? মধুভাষি ফির কোটে।

চোকিদার ঃ হেটা তো মধুভাষি না হয়।

প্রধান ঃ কায়রে তুই মাইয়া সাজিছিস?

চোকিদার ঃ হুজুর হিটা না সাদাসিদা!

প্রধান ঃ মধুভাষি কোনঠে গেইল। মোকে ঠকাইল। উনার এমুন সাহস।

সাদাসিদা ঃ কি পরধানদা, চোকিদারদা কাক খুজির ধচ্ছিস। তোমার দোনোঝনকার মতলবখান মুই বুঝিসু। মুই এলায় যায়া সগাকে কয়া দিম। (যাবার চায়)

চোকিদার ঃ আরে চেংরা কোনঠে যাছিস তুই? দ্যাখেক তুই মোর বেটার নাখান। হিটা কাম কি ভাল?

প্রধান ঃ শোনেক বাউ তুই আরো হিলা কি কবার ধচ্ছিস। যেলা হইচে তুই ওলা ভুলি যা।

সাদাসিদা ঃ পরধানদা তামান ঘটনালা মুই কি করি ভুলিম, না না মুই যাংছে।

প্রধান ঃ আরে বাউ ভুলিবো ভুলিবো। নে এক হাজার টাকা তোক মুই দিম।

চোকিদার ঃ নে, নে, মুইও দুইশ টাকা দিম।

সাদাসিদা ঃ হবা না হয় মোক দুই হাজার টাকা দেওয়া নাগিবে।

প্রধান ঃ নে ভাই নে, মনত কিছু না নিস।

সাদাসিদা ঃ ঠিক আছে যা, এই বেলা তোমাক ছাড়ি দিনু। (প্রস্থান)

প্রধান ঃ চোকিদার মোর তো মনটা কছে সাদাসিদা এইঢক করি মানিবে না। উয়াক খানিক টাইট দিবার নাইগবে।

চোকিদার ঃ হুজুর, তায় কি করিবেন?

প্রধান ঃ মোর কতলা পাইসা নাই ফাকতে নিয়া নিলেক। একখান বুদ্ধি বার করির নাইগবে।

চোকিদার ঃ কি বুদ্ধি হুজুর?

প্রধান ঃ (কতখন ভাবিয়া) যা হাট-বাজারত ঢোল পিটি দেক— যায় বত্তা ঘোড়া এক কেজি পাল্লা দিয়া ওজন করিবার পারিবে তাক মুই অদ্ধেক সম্পত্তি আর মোর বেটিক দিয়া বিয়াও দিম। আর না পাইলে উয়ার যা সম্পত্তি থাইকবে তামান মোর নামে লেখি দেওয়া খাবে।

(প্রস্থান)

(চোকিদার সেই নাখান ঢোল পিটি দিল)

চোকিদার ঃ শোনেন, শোনেন, শোনেন— হামার এই অঞ্চলত যায় একখান বত্তা ঘোড়া এক কেজি পাল্লা দিয়া ওজন করিবার পারিবে তাক প্রধানের অদ্ধেক সম্পত্তি আর বেটিক দিয়া বিয়াও দেওয়া হবে। আর না পারিলে উয়ার যা সম্পদ থাকিবে তামান প্রধানের নামে লেখি দিবার নাইগবে। (প্রস্থান)

(মধুভাষির বাড়ি)

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ বৌদি মোক হাটের ব্যাগখান দে, আর হাট থাকি কি কি আনির নাগিবে কয়া দে।

(মধুভাষি হাটের ব্যাগ আর পাইসা নিয়া প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ এই নে বাউ, এই ব্যাগ আর পাইসা। ত্যাল, নুন, হলদি, জিরা আনিবু। তামান পাইসালায় আরো খরচ না করিস।

সাদাসিদা ঃ ঠিক আছে, চিন্তা না করিস, তায় মুই হাট যাছো। (উভয়ের প্রস্থান)

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ কায় রে ধম্মদা, ওদি আরো কুনঠে যাবার ধচ্চিস।

ধর্ম ঃ আরে সাদাসিদা ওদি পরধানের চোকিদারটা কি বোলে ঘষনা করিবা ধরিচে।

সাদাসিদা ঃ হয় নাকি, চল দেখি কি ঘষণা করিবা ধইচ্চে।

(উভয়ে ঘোষণা শুনে)

ধর্ম ঃ হর দ্যাখেক, কায় যাবে ঐ বত্তা ঘোড়াটাক ওজন করিবার!

সাদাসিদা ঃ হে দা তুই বাড়ি যা, মুই যাছো আগোত ঘোড়াটাক ওজন দিয়া আইসো। (প্রস্থান)

(প্রধানের বাড়ি)

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ হ্যা এইটায় তো পরধানের বাড়ি।

চোকিদার ঃ কায়রে সাদাসিদা না।

সাদাসিদা ঃ হ্যা মুই।

চোকিদার ঃ তুই আরো এঠে কেনে?

সাদাসিদা ঃ কোনঠে তমার বত্তা ঘোড়া, আনি দে মুই মাপো।

চোকিদার ঃ তুই ঘোড়া মাপিবু। নইস পরধানক খবর দেছো।

সাদাসিদা ঃ হ্যা হ্যা যা ডেকা সগাকে। (উভয়ের প্রস্থান)

(চোকিদার ও প্রধানের প্রবেশ)

চোকিদার ঃ হুজুর হামার বুদ্ধিখান কামত নাগিছে। সাদাসিদাটা চলি আইসছে।

প্রধান ঃ সচায়, কোনঠে সাদাসিদা।

চোকিদার ঃ বায়রাত খারা হয়া আছে।

প্রধান ঃ যা উয়াক ড্যাকে আনেক।

চোকিদার ঃ হই সাদাসিদা, ভিতরাত আয়। পরধানদা ড্যাকাছে।

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ পরধানদা কোনঠে তোর ঘোড়া দেখু।

প্রধান ঃ আরে হোবে হোবে, তামানলায় হোবে। তার আগত তোক মোর নগত নেখাপড়া করিবার নাগিবে।

সাদাসিদা ঃ প্রধানদাটার আরো এলা কেমুন কাথা। একখান ঘোড়া মাপিবার বাদে মোক বোলে আরও নেকাপড়া শিখির নাগবে। দা মুই ওলা পাইম না। এলা কদ্দিনে মুই নেখাপড়া শিখিম, আর কদ্দিনে মুই তোর ঘোড়া মাপিম। ওলা হবার না হয়।

চোকিদার ঃ আরে সাদাসিদা হুজুর তোক ঐনাখান নেখাপড়ার কাথা কয় নাই।

সাদাসিদা ঃ ও তো কেমুন নেখাপড়া।

প্রধান ঃ ঐ যে তুই বত্তা ঘোড়া মাপির পাইলে মোর অদ্ধেক সম্পত্তি আর মোর বেটিক পাবো, আর না পাইলে তোর তামান সম্পত্তিলা মোক দিবো, ঐলায় নেখাপড়া।

সাদাসিদা ঃ দা, মোর তো জমিজমা নাই, মুই আরো তোক কি দিম।

প্রধান ঃ কেনে তোর বৌদি তো আছে। বৌদিক নেখি দিস।

সাদাসিদা ঃ তায় ঠিক আছে বৌদিক নেখি নেন।

প্রধান ঃ চোকিদার, যা মুহুরীক ডেকা।

চোকিদার ঃ মুহুরীদা তোক হুজুর ডেকাছে।

(মুহুরীর প্রবেশ)

মুহুরী ঃ প্রধানদা মোক ডেকাইলেন।

প্রধান ঃ মুহুরী মোর কাগজখান রেডি করিছিত।

মুহুরী ঃ হ্যা প্রধানদা, মোরঠে কাগজখান।

প্রধান ঃ নে সাদাসিদা, এইঠে টিপছাপ দে।

সাদাসিদা ঃ দে কোটে টিপছাপ দেওয়া খাবে। (টিপছাপ দেয়)

প্রধান ঃ সাদাসিদা তুই কিন্তুক স্টেম্পের উপর তোর বৌদিক নেখি দিলু, পরে কাথার খেলাপ করিবো না।

সাদাসিদা ঃ ঠিক আছে মুই রাজী।

(ওজন করিবার তানে প্রস্তুত। কিন্তুক ওজন করিবার পারিল না।)

প্রধান ঃ কি সাদাসিদা, তুই তো ওজন করির পালু না। এলা তো তোর বৌদিক মুই নিম।

সাদাসিদা ঃ এলা কাথা যখন দিসু, তো নিবেন।

প্রধান ঃ শোন মুই কালি সাকালে তোর বাড়ি যাইম মধুভাষিক আনিবার। (উভয়ের প্রস্থান)

(প্রধানের বেটি শিক্ষাবালার প্রবেশ)

শিক্ষাবালা ঃ আজি মুই নদীর পাড়ত যাইম। আর পথমত যায় মোর চখুত পরিবে তাকে মুই মালাচন্দন করিম।

(ঐ পথে সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ মাই তুই কায়, এঠে কি করিস।

শিক্ষাবালা ঃ (সাদাসিদাক মালাচন্দন দান) তোমরা আজি থাকি মোর সোয়ামী হলেন।

সাদাসিদা ঃ মাই তুই হিঁটা কি করিলু! তুই ফির কায়?

শিক্ষাবালা ঃ মুই প্রধানের বেটি। মোক তোমা গ্রহণ করেন।

সাদাসিদা ঃ এলা আর কি করিম, চল, মোর নগত মোর বাড়ি চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(মধুভাষির বাড়ি)

(সাদাসিদার বউ নিয়া প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ বৌদি দ্যাখেক কাক নিয়া আসিচু।

(মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ কায় গে?

সাদাসিদা ঃ মুই, বিয়াও করি নয়া কইনা আনিচুং।

মধুভাষি ঃ তুই আরো তৎকরায় কইনা কোটে পালু।

সাদাসিদা ঃ ঐ পরধানটার কইনা।

মধুভাষি ঃ কি কলু! রইস খানিক চাইলোন বাতিখান আনো। (শিক্ষাবালাক বরণ) আইসেক মাই, হামার গরীবের ঘর। সাদাসিদা যা এলা কইনাটাক ঘরত নিগা। (সকলের প্রস্থান)

(সাদাসিদা ও মধুভাষির প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ বৌদি একখান বুদ্ধি করা নাগে। আজি পরধানটা তোক নিগিবার আসিবে।

মধুভাষি ঃ কি কলু! এলা মুই তায় কি করিম।

সাদাসিদা ঃ তুই একখান কাম করেক। তুই তোর দাদার বাড়ি যা কেনে বুদ্ধি নিবার।

মধুভাষি ঃ ঠিকে কছিস, তায় মুই আর দেরী না করো, মুই যাছো। (প্রস্থান)

(মধুভাষির দাদার বাড়িত প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ দাদাগে কোটে গেলু তৎকরায় আয়।

(গাঠিনাগার প্রবেশ)

গাঠিনাগা ঃ তোর আরো কি হইল, এত সাকালত মোর এইঠে।

মধুভাষি ঃ আর না কইস দা, সাদাসিদাটা পরধানের কইনাটাক বিয়াও করি আনিচে।

গাঠিনাগা ঃ তো কি হইচে।

মধুভাষি ঃ আর কবা ধচ্চে মোক বোলে আজি পরধানটা নিগিবার আসিবে।

গাঠিনাগা ঃ পরধানটার এমুন সাহস। চলতো আজি উনাক ছাড়িম না। (উভয়ের প্রস্থান)

(গাঠিনাগা আর মধুভাষির প্রবেশ)

মধুভাষি ঃ ঐ সাদাসিদা এদি আইসেক তো।

(সাদাসিদার প্রবেশ)

সাদাসিদা ঃ কি হইল বৌদি? ও দা তমহাও আসিচেন।

গাঠিনাগা ঃ শোনেক সাদাসিদা, পরধানটা তো আসিবে। সেলা আসিলে কি করিবু। মোরঠে একখান বুদ্ধি আছে।

সাদাসিদা ঃ কি বুদ্ধি দা?

গাঠিনাগা ঃ পরধানের বেটিক দিয়ায় প্রধানক জব্দ করির নাইগবে।

(এমুন সময় প্রধান ও চোকিদারের প্রবেশ)

প্রধান ঃ কোনঠে রে সাদাসিদা, কোটে গেলু?

সাদাসিদা ঃ আরে দা, আইসেন আইসেন। বৌ কোনঠে আছিস গে চা-চো আনেক।

(চায়ের থালা নিয়া শিক্ষাবালার প্রবেশ)

প্রধান ঃ (শিক্ষাবালাক দেখিয়া হতবাক) মাই তুই এইটে কি করি আসিলু!

সাদাসিদা ঃ দা, হিটা তোর বেটি না হয়, হিটা মোর বৌ।

প্রধান ঃ তুই চুপ করি ন। মাই তোর কপালত সেন্দুর কেনে? কায় তোর এমুন সর্বনাশ করিল। তুই মোক উনার নামটা খালি ক।

সাদাসিদা ঃ আরে মুই কবা ধরচু না উনায় মোর মাইয়া।

প্রধান ঃ দ্যাখ সাদাসিদা তুই মোর বেটিক কি করি বিয়াও করালু। কোনবেলা করিলু।

গাঠিনাগা ঃ আরে পরধানদা সাদাসিদাটা ঠিকে কচে রে। আজি সাকালে উনায় তোর বেটিক বিয়াও করাইছে।

প্রধান ঃ না, না, মুই এই বিয়াও মানিম না। মাই তুই এলায় বাড়ি চল। (হাত ধরি টানে)

শিক্ষাবালা ঃ তা হয় না বা, মুই উয়াক মোর সোয়ামী বুলি মানিচু। মুই এটি থাকি কোনোটেও যাবা না হও।

প্রধান ঃ সাদাসিদা তুই আজি ঠকেয়া মোর বেটিক নিলু। তোক মুই ছাড়িম না। (ডাঙেবার যায়)

শিক্ষাবালা ঃ বাবা, উনায় তোক ঠকায় নাই। ঠকাচিস তো তুই।

প্রধান ঃ বেটি তুই কি কলু!

শিক্ষাবালা ঃ মুই তামান জানো বাবা। তুই বত্তা ঘোড়া ওজন করিবার নামে উনাক ঠকেয়া উয়ার বৌদিক নেখি নিচিস।

প্রধান ঃ শিক্ষাবালা!

শিক্ষাবালা ঃ তোর চরিত্রখান এমুন জানিয়া আজি তোর পতি মোর ঘৃণা ধরেচে। কেমুন বাপ তুই, বেটির বিয়াও না দিয়া, বেটির বয়সি মাইয়ার নগত এমুন করেছিস। আজি তোক আর বাপ কবার মন না চাছে।

প্রধান ঃ মাই, তুই আজি মোক কি কাথা কলু। ছোট থাকি তোক সুখে রাখি মানষি করিনু। তার আজি এই পতিদান দিলু। মুই জানো মোর ভুল হইচে। তুই মোক ক্ষমা করি দে মাও।

শিক্ষাবালা ঃ মোরঠে ক্ষমা চায়া লাভ নাই বাবা। ক্ষমা যুদি চাইস ইমারটে চা।

প্রধান ঃ জামাই, বৌদি তোমা মোক ক্ষমা কর। (ঠ্যাং ধরির চায়)

সাদাসিদা ঃ আরে কি করেন। তোমরা মোর বোলে শ্বশুর, ঠ্যাং ধরি পাপের ভাগী করির ধচ্চেন।

মধুভাষি ঃ আজি থাকি তোমা সৎ পথে চলেন।

প্রধান ঃ মাই তুই মোর একখানসার বেটি। তোর বিয়াওখান মুই ধুমধাম করি দিবার চাছো। চল বাড়ি চল। জামাই তোমা আজি বরযাত্রী নিয়া যান। চোকিদার কোটে গেলু চল বাড়ি যায়া বিয়ার যোগারযন্তর করি। (প্রস্থান)

সংগ্রহসূত্র ঃ সনাতন রায় (৫৮), বোলবাড়ি পল্লীনাট্য
সংস্থা, জলপাইগুড়ি, তাং ০৪.১১.২০১০।

কুশান

অশ্বমেধ যজ্ঞ

গানের চরিত্র

পুরুষগণ।	বিশ্বামিত্র মুনী	-	শ্রীরামের গুরু
	বাল্মীকি মুনী	-	শ্রীলব কুশের গুরু
	রাম	-	অযোধ্যার রাজা এবং
	লক্ষ্মণ	-	শ্রীদশরথের পুত্র,
	ভরত	-	এক অংশই চারি অংশ
	শত্রুঘ্ন	-	ও চারি অংশ
	লব	-	রাম-পুত্র
	কুশ	-	ঐ
	হনুমান	-	ঐ সেনাপতি
	জাম্বুবান	-	ঐ ঐ
	বানরগণ	-	ঐ
	সুমন্ত	-	ঐ সারথি
	শিব	-	কৈলাশপতি
স্ত্রীগণ —	শ্রীমতি সীতা	-	রামপত্নী
	পার্ব্বতী	-	শিব পত্নী
	নিকসা সুন্দরী	-	রাবণ মাতা

(বন্দনা)

এইস ওগো প্রভু এইস আমার স্থানে
অধমক তরাইতে প্রভু আইলেন ত আপনে।।
আমার আসর ছেইরে গো রাম
অন্যের আসরে যাবো।
দহাই লাগে বিশ্বামিত্রর কৌশল্যার মণ্ড খাবো।।
আমি অতি মূঢ় মতী, না জানি সাধন।

আপনার কর গান জগত পালন।।

পুষ্প রথে রাম চন্দ্র করাইছে গমন।।

অধমের আসরে এই যে দরশন

আসরে আসিয়া বসিল দিন দয়াল হরি,

বানর ভালুক তারা বসিল সারি সারি।

বানরগণ বইসে গেল ভাঙ্গে বৃক্ষ ডাল

শ্রীরাম লক্ষণ বইসে গেল বিছিয়া ব্যাঘ্রছাল।।

নল নিল বইসে গেল পর্ব্বতের চূড়া,

মধ্যস্থলে বসিল বীর জম্বুবান বুড়া।

(ডুলালী)

প্রথমে অযোধ্যা বন্দ, নন্দী নামে গ্রাম

ভক্তি করি বন্দ, প্রভু দুর্ব্বাদল শ্যাম।।

নমঃ বন্দ নমঃ বন্দ বাল্মীক মুনীর চরণ,

যাহা হইতে হইল সাত কাণ্ড রামায়ণ।।

গোপী কুলের মধ্যে বন্দ বীর, নাম হনুমান,

যাহার দর্পে লংকা পুরী হইল কম্পবান।।

একশত বানর বন্দ, গলে ফুলমালা,

দধি মুখে বন্দে গাবো সুগ্রীব রাজার শালা রাজার শালা।

ভাগরতি গঙ্গা বন্দ, ভার্গের সীমা নাই,

যাহার গর্ভে জন্ম হইল রামচন্দ্র গোসাঞী।।

শ্রীরামের পিতা বন্দ, দশরথ রাজন,

কৈকেয়ী সুমিত্রা বন্দ কৌশলার চরণ ।

বন্দিবো বন্দিবো রামের নীলকান্তির তনু,

দুর্জয় দক্ষিণ বন্দ রামের বাও দিগের ধনু।।

শ্রীরামের গুরু বন্দ বিশ্বামীত্র মুনী।।

যাহার স্থানে অস্ত্র শিক্ষা দেব চক্রপানী।

নব কুশর গুরু বন্দ বাল্মীক মহামুনী,

"মা" জানকি বন্দে গাবো শ্রীরামের ঘোরনী,

মিথিলাতে বন্দে গাবো জনক রাজন।
ভক্তি করে বন্দে গাবো ঠাকুর লক্ষণ।।
পূর্ব্বের রাজা বন্দে গাবো ভানু ভাসাংকর।
উত্তরে কালিকা বন্দ দক্ষিণে সাগর।।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাবো আশী হাজার পীর,
যাহার কলেমাতে ভাই পাথর হইল চীর।।
আদি গুরু বন্দে গাবো দীক্ষা গুরুর পাও,
হস্ত ধরে যে গুরু শিকালে ডাইন আর বাও।।
মায়ের দুধ স্তন বন্দ অমূল্য ভাণ্ডার,
গয়াতে পীণ্ড দিলে ভাই সুজা না যায় ধার।।
ছোট বড় গুনীক বন্দ তোমরা ধরমের ভাই,
তমার চরণে আমার অধম দেন ঠাঁই।।
একে একে বন্দিলে হবে অনেকক্ষণ,
প্রণাম করে বন্দে গাবো দশ মুনীর চরণ।।
রাম তোর চরণের নমস্কার,
রামে বর্ম্ম রামে বর্ম্ম রামের বানী,
ব্রহ্মায় নাহি পায় রামের নাম,
ধ্যানে নাহি পায় মুনী।।
রাম নামটি বড় ধন শিবে যে নাম জপে
মুনী ঋষি সেই নাম না পায় ধ্যানে।।
কে জানে কে জানে রামের মহিমা জানে কে,
মুখের প্রেমে বনের বানর বন্দি হইয়াছে।।
রাম নাম বিনেরে গোবিন্দ নাম বিনে
বিফলে মানুষ্য জনম যায় দিনে দিনে।।
রাম নামটি লইলে ভাই যমের দায় তরি।
রঘুনাথের পিতে একবার বল হরি হরি।।
চৌদিকে বেড়িয়া উদায় হইল মুনী।।
প্রত্যেক কালে আসিলেন মহা বশিষ্ঠ মুনী।

মুনীকে দেখিয়া রাম আনন্দিত মন।
বসিতে আসন দিল উত্তম সিংহাসন।।
রাম বলে মুনী গোসাঞি শুনহ বচন।
আজিকার রাত্রিতে প্রভু পাইয়াছি স্বপন।।
পিতার স্কন্ধে নীজ করে দ্বিজেন নন্দন।
মুনী বলে শুন রাম কমল লোচন।।
শুন কই তোমার পিতার বিবরণ।
অন্ধক মুনীর পুত্র গিয়াছিল জল ভরিবার।
দশরথ গিয়াছিল মৃগ শীকার করিবার।।
অকুলে ভরে জল বুক বুক শুনি।
দশরথ জ্ঞান করে প্রিয়সী হরীনী।।
শব্দ রথ বাণ জুড়ে দশরথ।
মরিল মুনীর পুত্র সেই অস্ত্রাঘাতে।।
ব্রহ্মহত্যা পাপ করে ছিল দশরথে।
মরিল মুনীর পুত্র সেই অস্ত্রাঘাতে।।
রাম বলে মুনী গোঁসাই শুনহ বচন।
পিতার ব্রহ্ম হত্যা পাপ কিসে পাব পরিত্রাণ।
মুনী বলে শুন রাম কমল লোচন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ একটি কর আরম্ভন।।
দান দক্ষিণা আদি করহ বিস্তর।
যজ্ঞ কুণ্ড নির্মাণ একটি করহ সত্তর।।
এই কথা শুনিয়া রাম আনন্দিত মন।
লক্ষণকে ডাকিয়া কথা করিলেন বচন।
রাম বলে অশ্বমেধ করিলাম সার।
অশ্বমেধ যজ্ঞ সম ফল নাহি আর।।
এত যদি কহিলেন কমল লোচন।।
শুনিয়া হরিষ হইল ভরত লক্ষ্মণ।।
রাম যজ্ঞ করিবেন ধর্ম্ম হরষিতে।

ডাক দিয়া বিশ্বকর্মা আনহ ত্বরিতে।।
এই বইলে লক্ষ্মণ বীর কইরছে গমন।
বিশ্বকর্মার তরে যাইয়া দিল দরশণ।।
লক্ষ্মণ বলে বিশ্বকর্মা কর অবধান।
শ্রীরামের যজ্ঞ কুণ্ড করহ নির্ম্মাণ।।
চইলে গেল বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার বচনে।
ভরত লক্ষ্মণ দুই ভাই আছে যে স্থানে।।
এই বইলে বিশ্বকর্মা কইরাছে গমন।
অযোধ্যা ভুবনে যাইয়া দিল দরশণ।।
বিশ্বকর্মাকে দেইখে হরষিত ভাই চারিজন।
বসিতে আসন দিল উত্তম সিংহাসন।।
রাম বলে বিশ্বকর্মা শুনহ বচন।
শীঘ্র কইরে যজ্ঞ কুণ্ড করহ নির্মাণ।।
নানান অস্ত্র আনি দিল বিশ্বকর্মার স্থান।
যজ্ঞ কুণ্ড বিশ্বকর্মা করেন নির্ম্মাণ।
দিন মানী মুনী কান্দি পবন বিস্তর।
একে একে বান্দিল তিন কোটি ঘর।।
করিলে ছয় যোজন যজ্ঞের মেখনা ঘর।
দধি দুগ্ধ ঘৃতে করিল সরোবর।।
সনার প্রাচীর ঘর সূন্যের কুয়ারি।
কুম্ভ নীটে শালা বাচন্ধ থুম্ভ সারি সারি।।
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মুনী।
অশ্ববার গর বাচধ মুকুতার গাথুনী।।
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা।
কর্ম আদি করিয়া যতেক আছে প্রজা।।
এক মানে পুরীটা করিল নির্মাণ।
চইলে গেল বিশ্বকর্মা আপন নিজ স্থান।।
রাম বলে শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।

দেশে দেশে দেও তুমি যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।।

লক্ষ্মণ বলে প্রভু মম নিবেদন।

বীর মধ্যে বীর আছে পবন নন্দন।।

তাহার দ্বারায় দেও তুমি যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।

হনু হনু বইলে ডাকে কমল লোচন।

কোদেলি থাকিয়া হনুর নরিল আসন।।

আসিয়া বন্দিল হনু প্রভুর চরণ।।

হনু বলে ওগো প্রভু মম নিবেদন।

আমাকে ডাকো প্রভু কিসের কারণ।।

রাম বলে শুন এই হইতে বাপু পবন নন্দন।

দেশে দেশে দেও তুমি যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রণ লইয়া চলে পবন নন্দন।

নারী গণের তরে যাইয়া দিল দরশণ।।

হনু বলে হে নারীগণ শুন আমার বচন।

শ্রীরাম চন্দ্র যজ্ঞ করিবে, নেও নিমন্ত্রণ।।

এই বলিয়া হনুমান করিল গমন।

দেশে দেশে নিমন্ত্রণ করে যত মুনীগণ।।

ভটচার্য্য হস্ত দীর্ঘ আইল শীঘ্র করি।

আইল দুর্ব্বাশা মুনী বড় ত্রেনধ মতি।।

বিশ্বশ্রবা আইলেন মানহ আপনি।

পৃথিবীর মুনী আইল অদম্য কাহিনী।।

যত যত মুনী আইল নাম নাহি জানি।

আইলেন আদি কবি বাল্মীকি আপনি।।

দেশে দেশে চইলে গেল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল যত বানরগণ।।

সুরস্রত আইলেন মন্ত্রী জাম্বুবান।

নল নীল আসিলেন আপনি হনুমান।।

সাগরে পার গেল এহি নিমন্ত্রণ।

তিন কোটি জ্ঞাতিসহ আইল বিভীষণ।।
দেশে দেশে চইলে গেল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া আসে যত রাজগণ।।
মিথিলা হইতে আসে জনক রাজন।
মুহারাজার শালা আইল আর দেশ কাশী।।
নেপালের রাজা আইলো নাম পাধ্যায় নাম।
বিহারের রাজ আইল সীতা ঘিরিধাম।।
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অযুত।
শ্রীরামের দারে এইসে হইল মজুত।।
যত যত রাজা আছে ভারত ভিতর।
রাম চক্রবর্তী যেন সবার উপর।
যত যত রাজা আছে ভারত ভিতরে
রামের অজ্ঞাতে তারা দাস পদ খাটে।।
স্বর্গ লোক মর্ত্তলোক আইল পাতাল।
নরলোক দেবলোক হইল মিসল।।
নৃত্যগীত মঙ্গল যেন নানা বাদ্য শুনি।
অখিল হইল যে রামজয় ধ্বনী।
রাম বলে শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
শীঘ্র করি যজ্ঞের অশ্ব আন এহিক্ষণ।।
এই বলে লক্ষ্মণ বীর করিল গমন।
বরুণের দেশে যাইয়া দিল দরশণ।
লক্ষ্মণ বলে বরুণ বেটা শুনরে বচন।
ধবল বর্ণের অশ্ব দেও যজ্ঞের কারণ।।
তুরঙ্গ পবনে হে লক্ষ্মণ ত্বরিত।
আনিল যজ্ঞের অশ্ব দেখিতে সুশোভিত।।
শ্বেত বর্ণ অশ্বের ধবল বর্ণ চারি খুর।
নানান অলংকারে সনার কেজুর।।
লেজ শোভা ধরে যেন কপালে চামর।

কপালে চামর তার অতি সবাকর।।
গোলায় এই লোমা তার মুকুতার ঝাঁড়া।
অঙ্গী হইতে জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা।।
নানা সুবর্ণ ধরে নানা জাতি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতী।।
রাম বলে শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
জয়পত্র দেও তার কপালে লেখন।।
রাজা দশরথের উৎপত্তি সূর্য্য বংশে।
তিনি সত্য পালিয়া গেল স্বর্গ বাসে।।
তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতর।
অযোধ্যায় রাজা করে ভাই চারি সহোদর।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করে আরম্ভন।।
যে বীরের.বেটা বীর হবে।
এই ঘোড়াটা বনধন দিবে।।
তাহার সনে করিয়া রণ।
পিছে যজ্ঞ করিব সমার্পণ।।
রাম বলে শুন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ।
জয় পত্র দেও অশ্বের কপালে বনধন।।
দুই অক্ষৌহিনী সৈন্য করিয়া সাজন।
ঘোড়ার পশ্চাতে শত্রুঘ্ন বীর করিয়া দেও পণ।।
ঘোড়ার প্রহরি রইল বীর শত্রুঘ্ন।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়াটা করিতে ভ্রমন।
রাম বলে শুনহ শত্রুঘ্ন ভাই।।
যজ্ঞপূর্ণ কালে যেন ঘোড়াটা পাই।।
যজ্ঞস্থানে রামচন্দ্র বসিল মুনীবেশে।
ছাড়িয়া দিলেন ঘোরাটা ভ্রমে দেশে।
পূর্বদিকে গেল ঘোড়াটা বহুদূর পথ।

নদনদী এরাইল উঠিল পর্বত।
সেই পর্বতের নাম বিরুপাক্ষহিনী।
মহাবল সেই রাজা পর্বত নামধারী।।
রাজগড়, অগ্নি জ্বলে চারিভিতে।
ঘোড়াগণ এই লঙ্ঘিয়া উঠিল গগনেতে।।
এই গড় মধ্যে প্রবেশিল বীর শত্রুঘ্নু।
শত্রুঘ্নু সহিতে রাজার বাজে মহারণ।।
রামের সমান শত্রুঘ্নু বীর অবতার।
একবানে যত সৈন্য করিল সংহার।।
বান্ধিয়া পাঠাইল তার বীর শত্রুগণ।
রাম দরশণে তার বন্ধন বিমোচন।।
পূর্বদিকে জয় করি আইল শত্রুঘ্ন।
উত্তর দিকেতে ঘোড়া করিল গমন।।
ঘোড়া গেল হিমালয় পর্বতের পার।
সেই দেশের রাজার নাম বিক্রময়।।
বিশাল ঘোড়া দেইখে রাজার ধরিতে গেল সাধ।
শত্রুঘ্নের সহিতে রাজার নাগিল বিবাদ।
জয় পত্র আছে ঘোড়ার কপালে লেখন।
তাহা দেখে ডইরে যত রাজগণ।।
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই।
পরাজয় মানিলেন শত্রুঘ্নের ঠাঁই।।
উত্তরদিকে জয় করি আইল শত্রুঘ্ন।
পশ্চিম দিকেতে ঘোড়া করিল গমণ।।
একদিকে ঘোড়াটা নাজায় দুইও বার।
পশ্চিমে গেল ঘোড়া সিন্ধু নদীর পার।।
সকল যে বেধ ঘোড়া চারি দিকে ঘিরে।
কুলপুয়া যে শত্রুঘ্ন ধনুক বান জুড়ে।।
রামের সমান শত্রুঘ্ন বীর অবতার।

একে বানে যত সৈন্য করিল সংহার।।
বান্ধিয়া পাঠাইল তার বীর শত্রুঘ্ন।
রাম দরশণে তার বন্ধন বিমোচন।।
পশ্চিম দিকেতে জয় করি আইল শত্রুঘ্ন।
দক্ষিণ দিকেতে ঘোড়া করিল গমন।
প্রায় যজ্ঞ সমার্পণ হবে সেই দিনে।
দেবের নিরবন্ধ ঘোড়া গেল সে দক্ষিণে।।
তুরঙ্গ পবনে ঘোড়া করিল গমন।
উপস্থিত হইল গিয়া বাল্মীকির তপোবন।।
যে দিনা যে হবে তাহা মুনী সব জানে।
ডাক দিয়া দুই ভাই লব কুশকে আনে।।
শুন শুন লব কুশ শুনহ বিশেষ।
তপস্যা করিতে যাব চিত্রকোটির দেশ।।
তথায় বিলম্ব আমার হবে বহুত ক্ষণ।
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুইও জন।।
কার সনে না করিও বাদ বিসম্বাদ।
না জানিয়া দুই ভাইর ঘটিবে প্রমাদ।।
সব শিষ্য লইয়া মুনী গেল পরবাসে।
দুই ভাই প্রণাম করিছে করপুটে।।
বৃক্ষতলে বইসে দুই ভাই নানা খেলা খেলে।
মৃগ পক্ষি সব বিন্ধে বইসে বৃক্ষতলে।।
এমন বানের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে।
কেবা শিখাইল বান কোথা হইতে আনে।।
নদ নদী বিন্ধে আরো বিন্ধে পর্ব্বত।
এক্ষ দিনে যায় বান ছয় মাসের পথ।।
অষ্ট চক্র বান একটা ভ্রমে দেশে।
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমেষে।
তবে বৃক্ষতলে বইসে দুই ভাই নানা খেলা খেলে।

হেন কালে ঘোড়া গেল সেই বৃক্ষের তলে।।

ঘোড়া দেইখে হরষিত ভাই দুইও জন।

জয়পত্র দেখিল ঘোড়ার কপালে লিখন।।

জয়পত্র দেইখে দুই ভাই কোপে জ্বলে।

জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্দে বৃক্ষমূলে।।

লব বলে অরে কুশ শুনরে বচন।

পইড়ে দেখ কি অশ্বের কপালে লিখন।।

(এখন কি প্রকারে)।

(জয় পত্র লেখা দেখিয়া)

জয় পত্র পড়িয়া দুই ভাই কোপে জ্বলে।

বৃক্ষতলে ঘোড়া আবার বান্ধে ভালমতো।।

(ধুত্তের কথা)

তখন শত্রুঘ্নের আগে ধুত্ত বলে বার বার।

মহারাজ ঘোড়া বন্দি হইয়াছে তোমার।।

শুনো শুনো ওগো প্রভু মম নিবেদন।

দক্ষিণ দিকেতে ঘোড়া হইয়াছে বন্ধন।।

ধুত্তের মুখে শুনে এতেক বচন।

তাহা শুনে শত্রুঘ্ন বীর কি বলে বচন।।

এতেক চিন্তনে বীর শত্রুঘন।

না জানি কোন রাজার সঙ্গে এবার মুহারণ।।

এই বলিয়া শত্রুঘ্ন ভাবিছে বিষাদ।

না জানি কোন রাজার সনে হইবে বিবাদ।

শত্রুঘ্ন বলে হে ধুত্ত শুনহ বচন।

চল চল ঘোড়ার উদ্দেশ্যে করিব গমন।

(শত্রুঘ্নের যুদ্ধে গমন)

দুই অক্ষৌহিনী সৈন্য হইল সাজন।

তপবন বলিয়া সৈন্য করিল গমন।।

ধীরে ধীরে সৈন্যগণ করিছে গমন।

ভাগ্যরতীর কুলে যাইয়া দিল দরশণ।।
কতেক দূর যায় সৈন্য কতেক ভূবন।
উপনীত হইল গিয়া বাল্মীকির তপোবন।।

(শত্রুঘ্নের কথা)

শত্রুঘ্ন বলে ওরে ছাইলা শুনরে বচন।
কোন বেটা আমার ঘোড়া কইরাছে বন্ধন।।
কোন বেটা কইয়াছে মরিবার সাত।
স্ববংশে মরিবে বেটা শ্রীরামের সঙ্গে বাদ।।
এতেক বড়াই করে বীর শত্রুঘ্ন।
তাহা শুনি লব কুশ কি বলে বচন।।

(লব কুশের কথা।)

রে ছাইলা আমার জন্ম সূর্য্যবংশে।
চারি ভাই থাকি আমি অযোধ্যার দেশে।।
দশরথের পুত্র আমরা ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।।
স্বয়াং বিষ্টু রঘুনাথ ত্রিলোক বিজয়।
রামের বিক্রম কথা শুন কিছু কই।।
মরিল রামের বানে লংকার রাবণ।
মরিল আমার বানে দুর্জ্জয় লবন।
জৈষ্ঠ ভাই ভাই লক্ষ্মণ আমার রণেতে পণ্ডিত।
তাহার বানে মরিল রতিকা ইন্দ্রজিত্।।
এসব মারিলাম বীর ত্রিভুনজিনে।
আর কোন বীর জুঝে আমার সম্ভাষণে।।
এতেক বড়াই করেছে বীর শত্রুঘন।
তাহা শুনে লব কুশ করিছে গর্জন।।

(লব কুশের কথা)

শুন শুন বৃদ্ধ বেটা আমার বচন।
আমার স্থানে আসিয়া দর্প কি কারণ।

তোমরা হলেন চারি ভাই আমরা দুই ভাই।

আজি ঘোড়া লইয়া যাও বীর বলি তাই।

কেনবা মরিতে আইল আমার নিকটে।

কেমনে পাইবে ঘোড়া পড়িছ সংকটে।।

ছাইলার মুখে শুনিয়া এতেক বচন।

তাহা শুনি শত্রুঘ্ন কি বলে বচন।।

(শত্রুঘ্নের কথা)

(ধলানী)।

রে ছাইলা তোমাক দেখি নিতান্ত বালক।

তোমাদের সনে যুদ্ধে করিলে হাসিবেক লোক।।

আমার সৈন্যের সনে যদি জয় হও রণে।

তবে যুদ্ধের জগ্যা হও আমার সম্ভাসনে।।

(তখন লব কুশ কি বলিতেছে)

শিশুক দেখিয়া বেটা তুচ্ছ কর জ্ঞান।

কেমন যে পুরুষের বেটা বুঝিব এখন।।

সতীর পুত্র হই যদি, মুনীর থাকে বর।

এখানে মারিয়া তোক পাঠাব যম ঘর।।

(ধূয়া)

দেখ দেখিহে খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে।

গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে।।

খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে রে।

বাজিয়া গেল রণ ঃ আরে।

ওকি দেখহে প্রথমেতে করে যুদ্ধ মুখে গালাগালি।

ওকি দেখহে দ্বিতীয়তে করে যুদ্ধ বাহু ঠেলাঠেলি।

ওকি দেখ হে তৃতীয়াতে করে যুদ্ধ বাণ বরিলন।

ওকি দেখহে পৃথিবীতে মহাশব্দ বানের গর্জন।।

ওকি দেখহে কুশের প্রধান বান বেড়াপাক নাম।

ওকি দেখহে সেই বান ধনুকেতে করিল সন্ধান।।

ওকি দেখহে মুহাপাশ বাণ তখন লবের মনে পড়ে।
সন্ধান করিয়া বাণ ধনুকেতে জুড়ে।।
ওকি দেখহে মুহাপাশ বান যেন যায় নানা ছন্দে।
ওকি দেখহে হস্তে গলে শত্রুঘ্নের অবশেষে বান্দে।।
ওকি দেখহে গলায় লাগিল ফাঁস মৃত্যু দরশণ।
ওকি দেখহে মুহাপাশ বানেতে পড়িল শত্রুঘ্নন।।
ওকি দেখহে অদ্ভুত আশ্চর্য্য জীবের জন্ম যাবে সুখে।
ওকি দেখহে শত্রুঘ্ন রনে পাইল হরিবল মুখে ।। ২।।
শত্রুঘ্ন পড়িয়া রহে বনের ভিতর।
মহানন্দে দুই ভাই চইলে গেল ঘর।।
মিষ্ট অন্ন আদি দুই ভাই করিল ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্কে দুই ভাই করিল শয়ণ।।
দুই ছেইলা লইয়া সীতা রহিল সন্তোষে।
শত্রুঘ্নের বার্ত্তা লইয়া ধুত্ত গেল দেশে।।
পাত্র মিত্র সহ রাম আছে যেন স্থানে।
সাতজন যাইয়া বার্ত্তা কহে কেহ সেই স্থানে।
সাতজন বার্ত্তা কহে উর্দ্ধ সাহসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে প্রভু বাল্মীকির দেশতে।
দক্ষিণ দিগেতে প্রভু বড়ই সংকট।
কোন বীর হবে গিয়া তাহার নিকট
দুই ছাউল নর নহে প্রভু বিষ্ণু অবতার।
তোমার যতেক সৈন্য প্রভু কইরাছে সংহার।।
শুন শুন ওগো প্রভু মম নিবেদন।
সৈন্যগণ সহিতে পড়িত তোমার শত্রুঘ্ন।।
তখন এই বইলে শ্রীরাম চন্দ্র কইরাছে রোদন।
ভরত লক্ষ্মণ দেয় প্রবোধ বচন।।
শুন শুন ওগো প্রভু মম নিবেদন।
পূর্ব কথা আজ আমার হইল স্মরণ।

পুন্ন মাস যখন হে মা জানকি গর্ভবতী।
হেন কালে বনে তারে দিলেন রঘুপতি।।
শুন শুন ওগো প্রভু মম নিবেদন।
তখনে জানিয়াছি হবে বিধির বিরম্বন।।
দেবতাগণ জানেন সীতার নাহি পাপ।
বিনা দোষে বনে দিয়াছেন তারে পাই তাপ।।
আজ যদি শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই।
দুই শিশুকে ধরিবারে আমরা দুই ভাই যাই।।
এত যদি কহিলেন ভরত লক্ষ্মণ।
দোহে আজ্ঞা দিলেন শ্রীরাম তখন।।
যাও ভাই কল্যাণ করিলাম ত্রিলোচন।
সাবধানে দুই ভ্রাতা কর গিয়া রণ।।
শত্রুঘ্নের শোক আমার সান্ধাইল বুকে।
আগে পাই শোক আমি মরি সেই দুঃখে।।
তখন বিদায় হইল ভরত লক্ষ্মণ।
চারি অক্ষহিনী সৈন্য হইল সাজন।
মুখ্য সেনাপতি গিয়া চড়িলেন রথে।
হস্তির স্কন্ধে যেন লক্ষ্মণ মুহারথে।।
হস্তী ঘোড়া কটক চলিল অবশেষে।
উপস্থিত হইল গিয়া বাল্মিকীর দেশে।।
শৃগাল কুকুর দেখে শকুনি গৃধিনী।
কটকের মাংস লইয়া করে টানাটানি।।
রনস্থলে গেলেন শ্রীভরত লক্ষ্মণ
ধনুক হস্তে পড়িয়া আছে শত্রুঘন।
শত্রুঘ্নক কোলে কইরে দুই ভাই কাঁদে।
প্রাণ হারাইল ভাই শিশুর বিরধে।।
তখন চারিদিকে রামের সেনা রহে সাবধানে।
কটকের মহারোল সীতা দেবী শুনে।।

(সীতার কথা)

সীতা বলে লব কুশ শুনরে বচন।
তপবনে মহাশব্দ শুনি কি কারণ।।
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।
না জানি কি দুই ভাইর ঘটিছে প্রমাদ।।
অভাগির পুত্র তোরা নির্ধনীর ধন।
নন্দের নন্দন তোরা মায়ের জীবণ।।
তোমার সহিত যেবা আসিয়া করে রণ।
দেশতে বাহুরিয়া না যাবে একজন।
অবাদ্য সতীর বাক্য নহে অন্যমত।
যারে যেই বাক্য দেয় ফলে সেইমত।।
মা সীতার মুখে শুনি এতেক বচন।
তাহা শুনি লব কুশ কি বলে বচন।।
শুন শুন মা জননী আমার বচন।
মৃগয়া করিতে রাজা আইল কুন জন।
আমাক দুই ভাইকে রাখিয়া মুনী গেল কোন দেশে।
না জানি কোন রাজা আসিয়াছে অশেষে বিশেষে।।
তাহার সহিত কত আইল সামান্যে সৈন্য।
কটকের মুহারোল তুমি কেন চিন্ত।
চিন্ত না মা চিন্ত না ঃ
তখন এতেক বিপদ সীতা কিছু নাহি জানে।।
মিথ্যা কয় মায়ের প্রবোধ দেয় অশেষে বিশেষে।।
প্রবাদ তখন বাক্যের ছলে।
তূন পূর্ণ বান লইল ধনুক লইল হাতে।।
যুঝিবারে দুই ভাই যায় সমরেতে।
দুইভাই গেল যথা ভরত লক্ষ্মণ।
তৃন জ্ঞান করে দেখে যত সৈন্যগণ।।
মনোহর দুই ভাই দূর্বা দল শ্যাম।

সকল কটক বলে আইল দুই রাম।।
রাম যদি রনস্থলে আসিত এহিক্ষণ।
তিন রামে এক ঠাঁই হইত মিলন।
রামের তেজ রামের বল রামের ধনুক বান।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান।।
এক রাম জিনিতে না পারে ত্রিভুবন।
দুই রাম ইহারে জিনিবে কোন জন।।
লব কুশক দেখে সেনার কুপিল অন্তর।
গরুড় হইয়া যেন ভুজঙ্গের ডর।।
ভরত লক্ষ্মণ বলে দোহে বিশ্বময়।
কে তোমরা দুই ভাই দেহ পরিচয়।।
ভরত লক্ষ্মণের মুখে শুনি এতেক বচন।
তাহা শুনি লব কুশ কি বলে বচন।।
আমার জাতি কুল চাইস বেটা তোমার কি বিচার।।
বারশত শিষ্য পড়ি বাল্মিকীর ঠাঁই।
তাহার শিষ্য আমরা জমজ দুই ভাই।
সবশিষ্য লইয়া মুনী গেল পরবাসে।
আমাক দুই ভাইকে রাখিয়া মুনী গেল দেশে।।
তখন লব কুশের কথা শুনি দুই মুখে তর্জন গর্জন।
(অরণ্যে তরস তখন ভরত লক্ষ্মণ বলিতেছে)
রে ছেইলা চারি ভাই আমরা সকলের জেষ্ঠ রাম।
আমরা ভরত লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্নে মারিয়া কি রাখিবে জীবন।।
যায় দেখ দেখ দেখি খুড়ায় ভাতিজায় গালাগালি কেহ নাহি চিনে।
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে চারি জনে।।

(ভরত লক্ষ্মণ ও লবকুশের যুদ্ধারম্ভ।)

ভরত ডাকিয়া কয় শুন সৈন্যগণ।
দুই ভাগ হইয়া যুঝ যত সৈন্যগণ।
দুই অক্ষৌহিনী যুঝ আমার ভরতের কাছে।

দুই অক্ষৌহিনী জুঝ লক্ষ্মণের কাছে।
ভরতে কুশতে যেন বাজে মুহারণ।
মহাযুদ্ধ বাধে লব সহিতে লক্ষ্মণ।।
পৃথিবী হইল দেখ অন্ধকারময়
পলাইল সকল সৈন্য গনিয়া সংশয়।।
পলাইল সকল সৈন্য নাহিক দোষর।
পলাইল সবে, মাত্র যুঝে লক্ষ্মণ একেশ্বর।।
অগ্নি অস্ত্র বান জুড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
বরুন অস্ত্র দিয়া দুই ভাই করে নিবারণ।
লক্ষ্মণের বাণ শিক্ষা বড় চমৎকার।
পলাইল সকল সৈন্য আইল পূর্ণঘর।।
এই বইলে লব বীর ভাবে মনে মন।
কোন বাণে বৃদ্ধ বেটার বধিব জীবন।।
পশুপাত বাণ যেন লবর মনে পরে।
তূণ হইতে লইয়া বাণ ধনুকেতে জুরে।।
পশুপাত বাণ জুড়ে সীতার নন্দন।
পশুপত বাণে বিন্ধে পড়িল লক্ষ্মণ।।
অদ্ভুত আশ্চর্য্য জীবের জন্ম যাবে সুখে।
লক্ষ্মণ বীর বাণে পড়িল হরিবল মুখে।।
লক্ষ্মণ জিনিয়া যায় কুশের উদ্দেশ্যে।
মুহাযুদ্ধ বাজে ভরত আর কুশে।।
কুশের স্থানে লব-লবর নাহি করে দেখা।
লুকাইয়া দেখে লব কুশের অস্ত্রশিক্ষা।।
সুমিত্রাক মারিয়া কুশের করিয়াছে আশ।
ভরত সহিতে মুহাযুদ্ধ করে না করে তরাস।।
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।
কার কাটে হস্ত পদ কার কাটে কান।।
একঠাঁই মুণ্ড পড়ে স্কন্ধ এক ঠাঁই।

ভরতের সৈন্য পড়ে লেখাজখা নাই।।
ভরত বলে আরে কুশ কেন কর রণ।
দেশেতে চলিয়া যাউক অষ্ট জন।।
ইহা শুনি কুশবীর বলেন উত্তর।
ক্ষত্রিয় হইয়া বেটা কেন হইলি কাতর ।
শুন শুন ওরে বেটা আমার বচন।
কেমনে যাইবে দেশে এই অষ্টজন।
সাতজন যাউক দেশে রামের গোচর।
বার্ত্তা পাইয়া রাম যে আশুক সত্তর।।
নতুবা পলাইয়া গেলে থাকিবে অপযশ।
যুঝিয়া মরিলে হয় অনন্ত পুরুষ।
ভরত বলে আরে কুশ ইহা মিথ্যা নয়।
রামের তেজ বল দেখি তাইত মনে হয়।।
কুশ বলে হে ভরত, রাম নিয়ে কত গর্ব কর।
যদ্যাপি রাম আজি কি করিবে মোর।।
রাম নদী হেন তোর কোটি কোটি আসে।
একজন বাহুরিয়া না যাইবে দেশে।।
ভরত বলেন কুশ আর না করিও যারী।
বারংবার রাম নিন্দা সহিতে না পারি।।
এ প্রতিজ্ঞা করিলেম আজ শুনরে বচন।
এই বাণ বৃথা গেল না করিব রণ।।
সব-বাণ বৃথা গেলে রাবণ চিন্তিত।
ভরত গন্ধর্ব অস্ত্র ছাড়িল ত্বরিত।
গন্ধর্বের বিক্রম দেখি কুশের মনে ডর।
অক্ষয়জীত বাণ কুশ এড়িল সত্বর।।
কুশের বাণ শিক্ষা বড়ই চমৎকার।
দেখিয়া যমের চিত্তে নাগে ভয়ংকর।।
ঐসিক বাণ জুড়ে সীতার নন্দন।

পৃথিবীতে মুহাশব্দ বাণের গর্জ্জন।।
ঐসিক বাণ যেন বায়ু বেগে যায়।
ফুটিয়া পড়িল বান ভরতের গায়।।
অদ্ভুত আশ্চার্য্য জীবের জন্ম যাবে সুখে।
ভরত বীর রণে পইল হরি হরি বল মুখে।।
ভরত কটক সহ পড়িলেন বাণে।
ধাইয়া গেল দুই ভাই মায়ের বিদ্যমানে।।
রক্তে রাঁঙ্গা দুই ভাই করে কুলাকুলি।।
জলে যুদ্ধের রক্ত ফেলাইল পাথুলী।।
সংগ্রামের অস্ত্র থুইল গাছের কোটরে।
শূন্য হস্তে গেল দুই ভাই মায়ের গোচরে।।
কোন চিন্তা নাই মাগো তোমার আর্শিবাদে।
মিষ্ট অনুসাদি দুই ভাই করিল ভজন।।
বিচিত্র পাংলখে দুই ভাই করিল শয়ন।
মরন হরিষের ঘরে রহে দুই ভাই।
সাত জন বার্ত্তা লইয়া গেল শ্রীরামের ঠাঁই।।
সাতজন বার্ত্তা কহে উর্দ্ধশ্বাসে।
দুই শিশু যুদ্ধ করে বাল্মীকির দেশে।।
দুই ভাই নর নহে বিষ্টু অবতার।
তোমার যতেক সৈন্য কইরাছে সংহার।।
আপনি শ্রীরাম প্রভু তুমি জুঝ তার সনে।
জিনীতে না পারিবে রণে হেন লয় মনে।।
শুনিয়া মূর্চ্ছিত রাম কমল লোচন।
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন।।
(নাছারী।। —)
ওকিরে ওরে কান্দিতে লাগিল রাম ওরে ভাইয়ের কারণ।
আমায় ছাড়িয়া কোথায় গেল তিন জন।।
ও কিরে শত্রুঘ্ন মোর প্রাণের দোষর।

তাহার তুল্য ভাই নাই পৃথিবীর ভিতর।।
ও কিরে লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাই ত্রিভূবনে।
ওরে ভাই মরিল আমার ছাওয়ালের রণে।।
নতশিরে রাম কইরাছে ক্রন্দন।
সুগ্রীব প্রভৃতি দেয় নানা প্রবোধ বচন।।
আপুনি শ্রীরাম প্রভু তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া বিচার কর যে হয় উচিত।।
ক্রন্দন সম্বর প্রভু স্থির কর মতি।
দুই শিশুক ধরি গিয়া চল শীঘ্রগতি।।
শ্রীরামের সেনাঠাট কটক অপার।
দেখিয়া যমের চিত্তে লাগে চমৎকার।।
সুগ্রীব অঙ্গদ সাজে লয় কপিগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে সুসেন নন্দন।।
কটকের পদভরে কাঁপিল মেদেনী।
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।।
(শ্রীরামের যুদ্ধে গমন ও যাত্রা)
কটক হইল পার নদ নদী নীরে।
জল শুকাইল তার কটকের পদ ভারে।।
জল সুকাইল মাটি হইল গুড়া গুলা।
গগন মণ্ডলে উঠিল কটকের ধুলা।।
সমরে গেলেন রাম কমল লোচন।।
ভরত লক্ষ্মণ পড়িয়াছে শত্রুঘ্নন।
আরে পড়িয়াছে ঠাট।
ছয় অক্ষৌহিনী দেখিয়া উগ্রি হইল।
রাম রঘুমনি লব কুশ দুই জনে করে অনুমান।
সৈন্য লইয়া আইল বেটা রাম সংগ্রামে পণ্ডিত রাম।
বিখ্যাত শ্রীরাম ইহাকে মারি তবে থাকে নাম।
এই যুক্তি দুই ভাই করে কানাকানি।

হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী।। —

(সীতার কথা)

জানকী বলেন কিবা কহ দুই ভাই।
কটকের মুহারোল শুনিতে যে পাই।।
কার সনে করিয়াছ বাদ বিসম্বাদ।।
না জানি দুই ভাইয়ের ঘটিছে প্রমাদ।।
উভয়ের করে সীতা নীতি সাবধান।
শত শত আশির্বাদ করেন কল্যাণ।।
কায় মনে বাক্যে যদি আমি হই সতী।
তোমার রণে কার নাই অব্যাহুতি।।
তোমাদের সনে যেবা আসিয়া করে রণ।
বাহুরিয়া একজন না যাবে দেশতে কখন।।
অবাধ্য সতীর বাক্য নহে অন্য মত।
যারে যা বলে তারে বলে সেইমত।।
এতেক বলিয়া চইলে গেল ঘর।
চরণ বন্দিয়া লইল দুই সহোদর।।
রামের সহিতে যুদ্ধ করে এই মন।
সেই মন ব্যাখ্যা করিলেন দুইজন।।
তূন পূর্ণ বাণ লইল ধনুক লইল হাতে।
যুঝিবারে দুই ভাই যায় আনন্দিতে।
সেই স্থানে শ্রীরাম তথায় গেল দুই জন।
তিন রাম এক ঠাঁই মিলিল দেখে সর্বজন।।
এই দুইয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নেস্তার।
প্রাণ লয়ে দেশের প্রতি কর অগ্রসর।।
এই যুক্তি শ্রীরামের বলে সেনপতি।
হেন কালে নিবেদন সুমন্ত সারথী।।
পঞ্চমাস যখন জানকি গর্ভবতী।
হেনকালে তাহারে বর্জিল রঘুপতি।।

রাখিলাম তাহায় এই বনবাসে।
আমি লক্ষ্মণ দোহে চইলে গেলাম দেশে।
রঘুনাথ দেখ বন,
সীতার এই দুই পুত্র হেন লয় মন।।
দুই সহোদর বুঝি একাকার
পরিচয় লয় প্রভু তমার কুমার
সুমন্ত্রের কথা শুনি রাম বিশ্বময়।।
উভয় গিয়া রাম দেন পরিচয়।
রাজা দশরথের তনয় আমি রাম।
তোমরা আমার মত রূপধর শ্যাম।।
তেজ ধর আমার আমার ধনুক বান।
পরাক্রম আমারি, নহে অন্য জ্ঞান।।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি আমারি সমান।
অতএব কহি আমি বল বিবরণ।।
তেইসে কারণে আমি পরিচয় চাই।
বিনয় করিয়া বলি তোমাদের ঠাঁই।।
পরিচয় দাও কিবা আমার নন্দন।
এমন হইলে আমি না করিব রণ।।
আজি যাইয়া জিজ্ঞাসিব জননীর ঠাঁই।
কার পুত্র আমরা জনক দুই ভাই।
উভয় যুক্তি করে কেহ নাহি শুনে।।
ডাকিয়া শ্রীরামে কয় তর্জ্জনে গর্জ্জনে।।

(লব কুশের কথা)

এতদিনে আমাদের সনে দরশন।
পরিচয় দিলে হবে কুন প্রয়োজন।।
পুত্র হয়ে পিতৃসনে কেবা করে রণ।
আমাম দোহাকে দেখি সেনার কম্পীত অন্তরে।
পরিচয় সে কারণে চাইলবারে বারে।।

তোমারে কহি শুন অবোধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম।।
দুই ভাই চতুর না জানে পিতৃনাম।
ভরাইয়া কপটে বুঝিল শ্রীরাম।।
পরিচয় না দিল হইল গালাগালি।
সর্ব সৈন্য বেড়িয়া কুশক মহাবলী।।
শ্রীরাম বলে না দিল পরিচয়।
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিও ভয়।।
হস্তি ঘোড়া চালাইয়া দিল প্রথমের রণে।
বিপক্ষ মরুক ঘোড়া-হস্তির চাপনে।।
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা।
চালায় প্রথমের রণের হস্তি আর ঘড়া।।
অনেক মাহুত ধায় শিশুক ধরিবারে।
দুই জনে দুই ভীতে ধনুকবাণ করে।।
লব বলে কুশ ভাই যুক্তি করি সার।
রামের সৈন্য কাটিয়া করিব চুরমার।।
দুই জনে কুপিয়া ধনুক বাণ জুড়ে।
হস্তি ঘোড়া কাটিয়া বাণ গগনেতে উড়ে।।
লব এড়িল বাণ নামেতে মাহুতি।
একে বানে কাটিয়া পারিল কোটি হাতি।।
কুশ এড়িল বাণ নামেতে মাহুতি।
একবাণে কাটিয়া পারিল কোটি হাতি।।
কুশ এড়িল বাণ নামেতে অশ্রুকণা।
কাটিয়া পারিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা।।
চারি ভীতে সৈন্য ঝুঝে লব কুশ মাঝে।
নানান অস্ত্র লইয়া উভয় সাজে।
সৈন্য দেইখে লব কুশ ভাবিল অন্তরে।
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তরে।।

এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে আইল রাম।
ইহাকে মারিতে পারি তবে থাকে নাম।।
সতীর পুত্র হই যদি মুনীর থাকে বর।
এখনি মারিয়া পাঠাব যমের ঘর।।
মুনীর আশির্বাদে হয় সর্বত্র কল্যাণ।
সন্ধান করিয়া লব কুশ এড়ে বাণ।।
অষ্ট চক্র বাণ লব করিল সন্ধান।
ত্রিভুবনে যুঝে যদি নাহি ধরে টান।
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম।।
বেড়াপাক বাণ কুশ করিল সন্ধান।
হেন বাণ লব কুশ জুড়িল ধনুকে।।
সন্ধান করিল বাণ উঠে অন্তরীক্ষে।
সিংহের গর্জনে বাণ তারা যেন ছুটে।।
অক্ষৌহিনী সেনা দুই শিশু কাটে।
এক বাণে বিন্ধে রাক্ষস বানর যত পড়ে।।
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে।
লব কুশের বাণ শিক্ষা বড়ই চমৎকার।।
রাক্ষস বানর ভালুক পরিল অপার।
পরে রণে আইলেন সুগ্রীব বানর।।
দ্বাদশ যোজন পাথর আসে সত্তর।
ক্রোধ ভরে পর্বত আছারে দুই হাতে।।
ইচ্ছা করে মারে লব কুশের শিরেতে।
বাণে কাটে লব কুশ করিল খান খান।।
একে বাণে সুগ্রীবের লইল পরাণ।
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে।
হনুমান মুর্চ্ছিত হইল সমরে।।
দেখিয়া অপর বানর ত্রাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর।
বেড়া পাক কুশ করিল সন্ধান।

বেড়া পাক বাণেতে সবার লইল পরাণ।।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল লব কুশ হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামের বলে অবশেষে।।
রণে ভঙ্গ দিল তোমার সেনাপতি।
হেন ঠাট কেন রাম তোমার সহিতে।।
পাইয়া লজ্জা শ্রীরাম কহেন উত্তর।
যায় যাউক ঠাট আমি আছি একেশ্বর।।
আমি আছি একাকি তোমরা দুই জন।
এক্কে বাণে তমায় পাঠাব যমের ভুবন।।
তিন জনে এত যদি হইল বলাচার।
শেষকালে সেনাপতি আইল পুনর্বার।।
বাসুকি তক্ষক যেন গর্জ্জন।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন।।
পড়ি সকল সৈন্য নাহিক দোষর।
পড়িলো সোরে, মাত্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর।।
চিন্তা গনিলেন রাম হইয়া উদাস।
ডাক দিয়া লব কুশ করে উপহাস।।
সর্ব লোক বলে তমায় ধার্ম্মিক শ্রীরাম।
অলক্ষিত মত তুমি করিলেন সংগ্রাম।।
দুই জনের প্রতি যদি তিন জন রোষে।
ধর্ম নাশ হয় তার আপনার দোষে।।
হস্তি ঠাট কটকের নাহি সংখ্যা।
সতীর পুত্র মোরা তেই পাই রক্ষা।।
কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লজ্জিত।
তোমরা যে কিছু বল নহেত উচিত।।
পৃথিবী মণ্ডলে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
নাজানি কতেক ঠাট আমার সঙ্গতি।।
আমারে জিনিতে কহে নাহি ত্রিভুবনে।

পুত্র বিনা আমাকে কেহ নাহি জিনে।।
আমার স্থানে আছে পরাজয়।
পিতারে জিনিবে পুত্র শাস্ত্র বিধানে কয়।।
আমার আকৃতি দেখি তোমরা দুইজন।
মম পুত্র হও যদি না করিব রণ।
পরিচয় দেও কিবা আমারে নন্দন।।
লব কুশ বলে শুন তোমরা দুইজন।
রাবণ দুর্জ্জয় বীর ছিল লংকা দেশে।
আমার সহিত রণে মরিল সবংশে।
শুনিয়া রামের কথা দুই ভাই হাসে।
ডাক দিয়া শ্রীরামের কহিছে অবশেষে।।

(লব কুশের কথা)

শুন শুন তোমারে বলি অবধ শ্রীরাম।
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম।।
পুত্র পুত্র বলিয়া চাহিল পরিচয়।
হেন বুঝি সমর করিতে হয় ভয়।।
কথায় শুনিয়াছ তুমি পিতায় পুত্রে রণ।
আপনার পুত্র বলিয়া ভাব মনে মন।। —

(নাছারী)

হরি রতি ক্ষুন্ন মন, দেখিয়া আচম্বিত রণ,
কাঁদে প্রভু শিরে হস্ত দিয়া।
ভ্রাতৃ মিত্র ধ্বংশ, পরাভব রঘুবংশ,
শোকানলে হইল অশ্রুপাত।।
দেব যদি হয় রাম সিদ্ধি নহে মনস্কাম,
যজ্ঞ হইল সংহারের কারণ।
তখনি জানিয়াছি মন জিনিতে না পারি রণ,
যখনি পড়িল শত্রুঘন।।
সুদিন কুদিন এই, বিধাতার সৃষ্টি এই,

এরে শিবির হনুমানে।

হেন কুলে জন্মিয়া, না করিনু বংশের ক্রিয়া,

জিনে মোর মুনীর তনয়।।

মরিল যে তিন ভাই, মিত্র বর্গ কেহ নাই,

সে সবার আনিলাম রণে।

মরিল যাহার পতি, অনাথ হইল সতী,

অকীর্ত্তি রহিল ত্রিভুবনে।।

হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ নাহি রইল,

পৃথিবী পরিল অপযশে।

মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে,

শত্রুঘন না আসিবে পুরি।

অযোধ্যা কিস্কিন্ধ্যা লংকা, হইল জীবন শংকা,

পতিহিনা হইল সর্ব নারী।।

এই থাকিল দুঃখ, না দেখি বধুর মুখ,

মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য।

চারি ভ্রাতা এক মাসে , মরিলাম এক দেশে,

প্রতি কুল বিধির এ কাজ।।

জ্যোতিশ্বর দুই জন , করি আইল রণ,

পূর্ব বইরি করিতে সাধান।

কিংবা দুশন খর, আইল হইয়া নর,

পূর্ব বইরিতে সংহার।।

আজি দুই শিশুক মারি, কিংবা আপনি মরি,

তবে ক্ষত্রি ধর্ম রক্ষা পাই।

আজি দুই শিশুক মারি, সে রক্তে তর্পণ করি,

তবে আমি রঘুবংশ হই।।

যুঝিব বালকের সনে, এই দাঁড়াইনু রণে,

নাহি দেখি গতি ইহা বই।

এতেক ভাবিয়া মনে, শ্রীরাম চলেন রণে,

জীবনেতে হইয়া হুতাশ।।

শ্রীরামের সহিত লব কুশের যুদ্ধারম্ভ

কুশ বলে লব তুমি মম জ্যেষ্ঠ ভাই।
হাসিয়া চলিল রাম মশার ঠাঁই।।
একেবারে দুই ভ্রাতা করিব সংগ্রাম।
চল ঝাট মারি গিয়া আমরা শ্রীরাম।।
কুশ হইতে অস্ত্র শিক্ষা লব ভাল ধরে।
এড়িয়া চিকর বাণ চৌদিক আলো করে।।
পরের বাণেতে ব্যাথা শ্রীরামের বাণ।
আকাশতে অগ্নি জ্বলে পর্বত প্রমাণ।।
লবের বাণেতে অন্ধকার ঘুচে সন্‌ধান করিয়া গেল।
শ্রীরামের কাছে একে বারে দুই ভ্রাতা পারিল সন্‌ধান।।
বানের প্রতাপ শুনি পাছু হন রাম।।
ক্ষণে রাম অগ্রে হন ক্ষনে দুই ভাই।
বানের ঠন ঠুনী লেখা জখা নাই।।
হইল রামের ক্লান্ত দুই জন।
সংকাসিত লব কুশ ভাবে মনে মন।।
যে অস্ত্র জুড়েন রাম করিয়া শৃংখলা।
সে সব হয় কুশের পুষ্পমালা।।
একেবারে দুই ভ্রাতা করিল সন্ধান।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পরিল শ্রীরাম।।
পূর্বের নির্ব্বন্ধ আছে ব্রহ্মশাপ।
সমরে পুত্রের সনে হারিবেক বাপ।।
লব এড়িল বাণ নামে অস্ত্র কলা।
ধনুক বাণ সহিতে বান্ধিলেন গলা।।
কুশ বাণ এড়িলেন অক্ষয় জিত নাম।
বুকেতে বসিল বান পরিল শ্রীরাম।।
করেন ছটপট রাম, তখন প্রাণ আছে।

ধায়া গেল দুই ভাই শ্রীরামের কাছে।।
নরিতে না পারে বাণে হইয়া অচৈতন।
লব কুশ কারি লইল গায়ের আভরণ।।
সত্ত্বরে দুই ভ্রাতা চইলে গেল ঘর।
কান্দিয়া মা জনকীর অন্তর কাতর।।
হনুমান জাম্বুবান দুর্জ্জয় শরীর।
দ্বারেতে না সন্ধাই তারে থুইল বাহির।।
দেখিয়া মা জানকি দেবী হইল উত্তরিল।
দুই ভ্রাতা লইল মায়ের পদধুলী।।
দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্যমান।
যুদ্ধের কথা কহিতে লাগিল মায়ের স্থান।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
সবার সহিত করিলাম মুহারণ।।
বহু অক্ষৌহিনী সেনা ভ্রাতা চারিজন।
বাহুরিয়া কেহ দেশতে না করিল গমন।
এসে ছিল যত সৈন্য কেহ আর নাই।।
কহি সে অপূর্ব কথা শুন মাতা তাই।
দুর্জ্জয় দুইটা জন্তুর এনেছি বান্ধিয়া।।
দ্বারেতে না আইসে মা দেখ বাহির হইয়া।
ধনুক বাণ আনিয়াছি যুদ্ধের সাজন।।
এই দেখ আনিয়াছি মা রামের আভরণ।
দেখিয়া জানকী দেবী অন্তর কাতর।
শিরে করি কড়াঘাত করেন রোদন।।

(সীতার কথা)

হায় হায় কি করিলি ওরে লব কুশ।
পিতৃহত্যা করিয়া কি রাখিলি পৌরুষ।।
কোন খানে মারিলি সে কমল লোচন।
চল ঝাট পরি গিয়া প্রভুর চরণ।।

কেমনে দেখিব গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেমনে দেখিব গিয়া ভরত শত্রুঘন।।
ধায়া যায় সীতা দেবী কেশ নাহি বান্ধে।
তার পাছে দুই ভ্রাতা শিরে হাত কান্দে।।
সীতা আসি বাহিরে দেখে বিদ্ধমান।
হস্ত পদ বাধা হনুমান জাম্বুবান।।
জানকি বলে লব-করিলি কি কর্ম।
তোমরা বিদ্যা শিখিয়া না রাখিলি জাতি ধর্ম।।
বানর হইয়া গেল সাগরের পার।
হনুমান পুত্র মোরে কইরাছে উদ্ধার।।
তাহারে করিলি বদ্ধ অবোধ বালক।
শুনিলে এসব কথা কি কহিবে লোক।
পিতা পিতৃর তোরা বধিলে জীবন।
বিষ পান করি আমি প্রাণ ত্যাজিব এখন।।
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাৎ।
কলংক না লুকাইবে হইবে বিখ্যাত।
কোথায় মারিলে তারে ঝাট চল দেখি।
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি।।
লব কুশ শ্রীঘ্র এই সে ঘুচাও বন্ধন।
হনুমান জাম্বুমান করহ মোচন।।
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা শিশু দুইয় জন।
খসাইয়া দিল উভয়ের হস্তের বন্ধন।।
উঠিয়া বসিল হনুমান জাম্বুমান।
কহিলেন সীতাদেবী তারে বিদ্যমান।।
একেকথা হনুমান করহ পালন।
কার ঠাই না বলিও এসব বচন।।
তোমার মায়ের পুত্র হই দুই ভাই।
না চিনে কইরাছে রণ দোষ দেহ নাই।।

শ্রীরামের উদ্দেশ্যে চল তিনজন।
উপস্থিত হইল গিয়া যথায় হইলেন রণ।।
কাতর হইয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের চরণ ধরি কহেন তখন।।

(সীতা দেবীর নাছারী)

হায়রে কান্দে জানকি সীতা, জনকের এ দুহিতা,
নয়ন জলে তিতিল বসন।
হায় আউলাইয়ে মায়ের বিনী বইসে কান্দে পাগলিনী,
ভূমে পরি হইল অচৈতন।।
হায়রে এমন বিধি নির্দয় হইল, জন্ম হইতে সুখ না হইল,
দুঃখে দুঃখে গেল চিরদিন।
হায়রে রামের চরণ ধরি, সীতা যায় গড়াগড়ি,
ধুলায় রহু হইল ছিরগিন।।
হায়রে আছিল রঘুবংশ, সকলি হইল ধ্বংষ
আমি নারী আছি কি কারণ।।
হায়রে অগ্নিতে ত্যাজিব দেহ, কাহারে কবির সহ,
দুঃখ সুখ করি নিবারণ।

হইয়া তোমার পুত্র মারিল তোমারে,
এক মনে যদি ফিরে আমার কর্ম ফলে।।
শিরে হস্ত লব-কুশ করিছে ক্রন্দন।
মায়ের চরণ ধরি বলিছে বচন।।
ক্ষমা কর জননী গো না কর ক্রন্দন।
মা তব দোষে আমরা তিন জন।।
মুনী না বলিল মা শ্রীরাম মম পিতা।
আপনার দোষে এত পাইলাম ব্যাথা।।
পিতৃবধ করিয়া পাইল বড় লাজ।
অগ্নিতে পড়িয়া আজি হইব সংহার।।
এ মহা পাপেতে আর নাহিক নেস্তার।

সীতা বলে আমি অগ্নি করিব প্রবেশ।
যাহা ইচ্ছা তাহা করিব অবশেষে।।
তিন জন গেল জমুনার ধারে।
তিন কুণ্ড কাটিলেন দুই সহোদরে।।
তাহাতে কাষ্ট সমান গগন জ্বলিয়া উঠিলো।
অগ্নি গগন মন্‌ডল অগ্নি দক্ষে প্রদক্ষিণ করিল।।
তিন জন চিত্রকুট পর্বতে বাল্মীকির তপোবন হয়।
রক্তে অর্পণ মুনী লেও রক্ত ময়।
ছয় মাসের পথ মুনী আইল চক্ষুর নিমেষে।
তিন জন দেখে অগ্নির মধ্যেতে।।
অগ্নিতে পরিয়া আজি হইব সংহার।
অগ্নি কুণ্ডু জালাইয়াছে মুহামুনী দেখে।।
হেন কালে আইল মুনী সীতার সন্মুখে।
শৃগালি দেখে শৃগালের রোল।।
কল কল ধ্বনী আর জলের হিল্লোল।
দেখিয়া প্রতি জিজ্ঞাসেন মুনী।।
বিপদ পরিল কেন বল দেখি শুনি।
জানকি বলেন প্রভু না জানি কারণ।।
লব কুশ তমার করিল মহারণ।
পরিল তাহাতে রাঘব ভাই চারি জন।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘন।
কেমনে কহিব কথা মুখে নাহি আসে।।
পিতৃবধ করিল তোমার লব কুশে।
এতদিন ভাল ছিল তোমার প্রসাদে।।
ধনুক বিদ্যা শিক্ষাই পরিল প্রমাদে।
তুমিত শিখাইলে মুনী নানা অস্ত্র শিক্ষা।।
ত্রিভুবনে যুঝে যদি নাহি পায় রক্ষা।
আপনি শ্রী রঘুনাথ ত্রিভুবনে জিনে।।

শিশু হইয়া তাহারে জিনে দুই জনে।

রঘুনাথ বিনা মোর নাহিক জীবন।।

অনলে প্রবেশ করি এই তিন জন।

বাল্মীকি মুনী বলে মা প্রাণ ত্যাগ কর নাই।

এখনি বাঁচাইয়া রাখিব রাঘব চারি ভাই।।

এমন সে হরির লীলা কে বুঝিতে পারে।

মুনী কুমণ্ডলুর জলে বাঁচাইল সকলে গেল ঘরে।।

এমন যে হরির মহিমা কেহ বুঝিতে নারি।

পিতা পুত্রে মিলন হইল একবার।।

বদন ভরে সকলে বল হরিহরি।।

(যবনিকা)

সংগ্রহসূত্র ঃ উক্ত পালাটি শ্রী ফনীগোপাল পালের গবেষণা অভিসন্দর্ভ 'উত্তর বাঙ্লার লোকসাহিত্য' (১৯৮১) ২য় খণ্ড (নির্বাচিত সংকলন) থেকে সংগৃহীত।

কুশান

লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালা

রাম বন্দনা ঃ গান/১

ওহো রে ভরসা হে কৈরাছি হে রাম
তোমার চরণ দুইখানি।
রাম ভাব রাম চিন্ত রাম কর সার।
ভেবে দেখ রাম নাম বিনে গতি নাইরে আর।।
এমন রাম নামের গুণ কি দিব তুলনা।
পদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা।।
রাম নাম লৈয়া যেবা পন্থ বইয়া যায়।
ধনুর্বাণ লইয়া রাম তার পিছে পিছে ধায়।।
এমন রামের গুণ কি বর্ণিতে পারি।
হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি হরি।।
রাম নামের মাহাত্ম এখন ছাড়ান দিয়ে যাই।
গাইব লক্ষ্মণের শক্তিশেল নিবেদন জানাই।।

১। মূল ঃ ইন্দ্রজিৎ পরে রণে প্রভাত সময়।
ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়।।
গগনে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
বসিয়া মন্ত্রণা করে যত নিশাচর।।
স্থানে স্থানে বসি যুক্তি করিছে রাক্ষস।
কহিতে রাবণ আগে না করে সাহস।।
পাত্র-মিত্র সকলেতে মন্ত্রণা করিয়া।
ভগ্নদূত এক জন দিল পাঠাইয়া।।

[রাবণের প্রবেশ]

২। রাবণ ঃ নর বানরের হাতে বীরশূন্য হলো লঙ্কাপুরী
বীরবাহু পুত্র মোর হল নিহত।

[চিন্তা করতে লাগল]

[ভগ্নদূতের প্রবেশ ও গীত/২]

বাপরে বাপ, কি হলো বাপ
কোথায় গিয়ে প্রাণ জুড়াই।
দুই বেটা জুটিল আসি
মজাইল লঙ্কা আসি
ঐ বেটা প্রাণে মরুক, আমি যেন সুখে থাকি।

৩। রাবণ ঃ বল, বল দূত, রণের কিবা সংবাদ?

৪। দূত ঃ আমি করি যোড় হাত।
রণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ।।
লঙ্কাপুরী বীর শূন্য হইল এত দিনে।
ইন্দ্রজিত পড়ে আজি লক্ষ্মণের বাণে।। [প্রস্থান]

৫। রাবণ ঃ ওঃ পুত্র, মেঘনাদ!
[মূর্চ্ছা গেলেন]

৬। মূল ঃ দূত মুখে শুনি ইন্দ্রজিতের মরণ।
সিংহাসন হাতে পড়ে রাজা দশানন।।
উচ্চ স্বরে ডেকে বলে কোথায় ইন্দ্রজিৎ।
আছাড় খাইয়া পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত।।
অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন।
চেতন পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন।।

৭। রাবণ ঃ ওঃ! পুত্র মেঘনাদ।
রাক্ষস কুলের চূড়া পুত্র ইন্দ্রজিৎ।
প্রাণ হারাইলে নর বানরের হাতে।।
আমার সর্বস্ব তুমি লঙ্কা অধিকারী।
পিতা দশানন তোর মাতা মন্দোদরী।।
পর্বত কন্দর কাঁপে দেখে তোর বান।
এক বাণে ইন্দ্রবেটা না সহিলে টান।।
ত্রিভুবনে যোদ্ধা নাই তোমার সমান।
মনুষ্যের বাণে পুত্র হারাইলে প্রাণ।।
কুম্ভকর্ণ পুত্রশোক রহিয়াছে বুকে।

লঙ্কার রাবণ মরি তোমা পুত্রশোকে।।
ভাই নহে চণ্ডাল পাপিষ্ঠ বিভীষণ।
যজ্ঞ ভঙ্গ করি তোমার বধিল জীবন।।
যদি প্রাণ বাঁচে রাম তপস্বীর রণে।
আগে আমি কাটিব চণ্ডাল বিভীষণে।। [প্রস্থান]

৮। মূল ঃ কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা অধিকারী।
ইন্দ্রজিৎ মইল বার্তা পায় মন্দোদরী।।
আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
উচ্চ স্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী।।
চেতনা পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত।।
ওরে বাপ মেঘনাদ রে ....ওরে মেঘনাদ
আমি নানা উপহারে পূজিয়াছি মহেশ্বরে
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।

[মন্দোদরীর প্রবেশ]

৯। মন্দোদরী ঃ মেঘনাদ! মেঘনাদ!
(মূর্চ্ছা)

১০। মূল ঃ চেতনা পাইয়া বলে রানী কোথা ইন্দ্রজিৎ।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত।।

১১। মন্দোদরী ঃ হে মহেশ্বর, আজি তুমি করিলে পুত্রহীনা।
আমি নানা উপাচারে পূজিয়াছি মহেশ্বরে
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছুদিন ছিনু সুখে এখন পড়িনু দুঃখে
হেন পুত্র পরে রণ স্থলে।।
কি মোর বসতি বাস এ জীবনে মিথ্যা আশ
কি করিবে ছত্র, রাজদণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ বীর আছে যত যত
তোমা বিনা সব লণ্ড ভণ্ড।

হয় পুত্র মেঘনাদ আজি কেন পরমাদ

আজি যে মরিল লঙ্কাপুরী।।

১২। রাবণ ঃ রোদন সম্বর রানী মন্দোদরী।

সীতা লাগি মজিল কনক লঙ্কাপুরী।

আজি সীতা কাটিয়া ঘুচাইব সব বৈরী।।

মায়া সীতা কেটে ছিল পুত্র ইন্দ্রজিৎ।

সাক্ষাতে কাটিয়া সীতা ঘুচাইব ভীত।। [প্রস্থান]

১৩। মন্দোদরী ঃ স্বামী চলে গেল সীতারে বধিতে

না-না আমি তা করতে দেব না। [প্রস্থান]

১৪। মূল ঃ হাতে করি লয় রাবণ খড়গ এক ধারা।

কুড়ি চক্ষু হইল যেন আকাশের তারা।।

খড়গ হাতে ধায় রাজা অশোকের বনে।

কার সাধ্য প্রবোধিয়া ফিরায় রাবণে।।

মনেতে বিচার করে রানী মন্দোদরী।

সর্বনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী।।

তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে।

রমনী বধের পাপে পরকাল যাবে।।

খড়গ হাতে ধায় রাবণ অশোকের বন।

রাবণে দেখিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।।

* * * * *

[অশোক কানন ঃ সীতার প্রবেশ]

১৫। সীতা ঃ ঐ, ঐ, আসিতেছে দশানন আমারে কাটিতে।

রঘুনাথ, রঘুনাথ, রক্ষা কর অভাগী সীতারে।।

গীত /৩

ও প্রভু রঘুনাথ হে

কোথা প্রভু রঘুনাথ তুমি হে অনাথের নাথ

ও প্রভু রঘুনাথ হে।।

দেবর লক্ষ্মণ কোথা, না শুনিনু তার কথা,

প্রভু প্রাণ যায় আজি রাক্ষসের হাতে

ও প্রভু রঘুনাথ হে।।

[রাবণের প্রবেশ]

১৬। রাবণ ঃ হা-হা-হা রঘুনাথ!

আসিবে না এই রঘুনাথ অশোকের বনে।

মায়া সীতা কেটেছিল পুত্র ইন্দ্রজিতে।

মরে পুত্র ইন্দ্রজিৎ তোমার জন্যেতে।।

তোকে আনি সর্বনাশ হল লঙ্কাপুরে।

ঘুচাব সকল শোক কাটিয়া তোমারে।।

[খড়গ তুলিল]

[পাগলিনী বেশে মন্দোদরী প্রবেশ করে ও রাবণকে জড়াইয়া ধরিল]

১৭। মন্দোদরী ঃ হে লঙ্কেশ্বর, করি যোড় হাত।

পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ।।

বিশ্বশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত।

তোমার এ নারী বধ না হয় উচিৎ।।

একে একে মজেছে কনক লঙ্কাপুরী।

পাপেতে মজনা তাহে বধ করে নারী।।

[রাবণকে নিয়ে প্রস্থান—পরে সীতার প্রস্থান]

* * * *

১৮। মূল ঃ শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ।

বসিলে সোয়াস্তি নাই করিলে শয়ণ।।

ইন্দ্রজিৎ শোক তবু নহে পাশরণ।

আপনি সাজিল রাজা করিবারে রণ।।

পদ্ম কোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর।

সাজিল রাবণের সাথে করিতে সমর।।

সিংহনাদ ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ।

ভঙ্গ দিয়া পালায় যতেক কপিগণ।।

গয় গবাক্ষে বিন্ধিল দশ দশ বাণে।

দুই শত বাণ বিন্ধে বীর হনুমানে।।

[হনুমানের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধাবস্থায় প্রবেশ, যুদ্ধ ও হনুমানের রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান]

১৯। রাবণ ঃ সারথী, পশুর সঙ্গে যুদ্ধ নাহি প্রয়োজন।
রথ লহ রাম আর লক্ষ্মণের কাছে।
সে উভয়ে মারিয়া বানর মারি পিছে। [প্রস্থান]

* * * *

২০। মূল ঃ রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথী সত্বর।
চালাইয়া নিল রথ রামের গোচর।।
রথখানি আসে যেন বিদ্যুৎ চমকে।
লক্ষ লক্ষ স্বর্ণঘন্টা বাজে চারি দিকে।।
রথ শব্দে বানর পালায় লাখে লাখে।
পার্বতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।।
ধনু হাতে গেল রাবণ রামের সম্মুখে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম দশানন দেখে।।
[রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও হনুমানের প্রবেশ]

২১। রাম ঃ মিত্র বিভীষণ!
আজিকার রণ কৌশল কি করিছে রাবণ?

২২। বিভীষণ ঃ শুন ওহে মিত্রবর,
দশানন আসিতেছে করিতে সমর।

২৩। রাম ঃ দশানন! শুন মিত্র বিভীষণ, শুন বৎস হনুমান,
ওরে অনুজ লক্ষ্মণ, আজিকার রণে সবাই হও সাবধান।
[রাবণের প্রবেশ]

২৪। রাবণ ঃ ঐ ঐ দক্ষিণে অক্ষয় তূণ বামেতে কোদণ্ড।
বিষ্ণু অবতার রাম সুবাহু প্রচণ্ড।।
সুন্দর নাসিকা রামের চৌরস কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল।।
সুন্দর ধনুক বাণ বিচিত্র গঠন।
শ্রীরামের অঙ্গে যেন দেখি ত্রিভুবন।।

যদি রামের হাতে হয়ত মরণ।

একান্ত বৈকুণ্ঠ যাব না যায় খণ্ডন।।

না-না বিরস হইয়া কেন হইব বিমুখ।

রামের সম্মুখ যাব পাতিয়া ধনুক।।

হে জটাধারী রাম, মরণের জন্য প্রস্তুত হও।

(ধনুকে গুণ দিল)

[রামের সঙ্গে যুদ্ধ ও রামের মুর্চ্ছা]

২৫। লক্ষ্মণ ঃ ওরে দশানন!

আমি তোরে পাঠাইব শমন ভবন।

(যুদ্ধ)

২৬। রাবণ ঃ ও, তুমি লক্ষ্মণ!

মোর রথের সারথীর মুণ্ড করিলে ছেদন?

তোর সাথে বিভীষণ কুলাঙ্গার?

গদা ঘাতে মারিলে মোর রথের অষ্ট ঘোড়া?

[রাবণ ধনুকে টঙ্কার দিয়া বিভীষণের প্রতি]

এবার তুই নিজে রক্ষা হ,

বংশ নাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ।

মারিয়া পারিব আজি রাখে কোন জন।।

২৭। বিভীষণ ঃ ঠাকুর লক্ষ্মণ, তুমি আমায় বাঁচাও।

২৮। লক্ষ্মণ ঃ ভয় নাই, ভয় নাই বিভীষণ।

রাবণের শেল কাটি করিনু খান খান।।

২৯। রাবণ ঃ কি! তোর বাণে বিভীষণ বাঁচে এই বার।

তোরে মারিলে দেখি কে রক্ষে এবার।।

এখনি মারিব তোরে ভণ্ড লক্ষ্মণ তপস্বী।

মৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী।।

মা বাপেরে মনে কর বন্ধু যতজন।

মৈলে কারো সঙ্গে আর না হবে দর্শন।।

রাম সুগ্রীবের ঠাঁই মাগহ মেলানি।

দিয়াছ অনেক যুক্তি করি কানা কানি।।

[ধনুকে বাণ জুড়িল ও অট্টহাস্য হাসিল]

শক্তি- শক্তি-শক্তি ....

[শক্তির প্রবেশ। রাবণের প্রস্থান]

(শেলের সম্মুখে রামের স্তুতি)

৩০। রাম ঃ দেব মূর্তি শেল তুমি দেব অধিষ্ঠান।

এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণ দান।।

ফিরে যাও শেল তুমি রাবণের হাতে।

ভাই দান আমি মাগি তোমার সাক্ষাতে।।

আপনি শমন মূর্তিমান শেল তব মুখে।

লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে।।

৩১। শক্তি ঃ রাম চন্দ্র কেন করিছ স্তবন।

লক্ষ্মণে ছাড়িয়া নাহি মারি অন্যজন।।

থাকি আমি যার কাছে তার আজ্ঞাকারী।

যার কাছে থাকি আমি তার হিত করি।।

[বায়ুবেগে লক্ষ্মণের বুকে পড়িল ও শক্তির প্রস্থান]

৩২। রাম ঃ ওরে বৎস হনুমান, উপারিয়া শেলপাট কর খান খান।

৩৩। হনুমান ঃ প্রভু, আপনার আদেশ শিরধার্য।

[হনুমান শেল ধরি টানাটানি করে ও বিফল হয়]

প্রভু শক্তিতে নারিনু, সব ব্যর্থ হইল মোর।

৩৪। মূল ঃ শেল টানিতে বানরগণ না করে সাহস।

যার টানে মরিবেন তার অপযশ।।

দিলেন ধনুক বাণ সুগ্রীবের করে।

টানিলেন রঘুনাথ শেল পাট ধরে।।

বিশ্বম্ভর মূর্তি ধরি শেলে দিল টান।

উপরিয়া শেল পাট করে খান খান।।

৩৫। রাম ঃ ওহে মিত্র বিভীষণ!

এই ধনুর্বাণ তোমার করে করিনু অর্পণ।

ওরে তোরা সবাই মিলে জয়ধ্বনি দাও।

[রাম শেল উপড়িয়া লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলো]

ওরে অনুজ লক্ষ্মণ! একবার তুই আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ।

গীত/৪

ও-ও- মোর গুণের ভাইরে, ভাই লক্ষ্মণরে!

কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।

মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী।।

এনেছি সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের নিধি।

আসিয়া সাগর পারে বাম হৈল বিধি।।

কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস।

সীতা উদ্ধারিতে আজি হৈল সর্বনাশ।।

এনেছি সুমিত্রা মায়ের অঞ্চলের ধন।

কি বলিয়া নিবারিব মায়ের ক্রন্দন।।

পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।

বিধি বাদী হইল এই তাহে সর্বনাশ।।

[সুষেনের প্রবেশ]

৩৬। সুষেন ঃ প্রভু, করি নিবেদন।

না কান্দ না কান্দ প্রভু পাইবে লক্ষ্মণ।।

৩৭। রাম ঃ সুষেন, আমি যোড় হাত করি।

লক্ষ্মণ বাঁচাও আগে শোক পরিহরি।।

আমার লক্ষ্মণ বিনা আর নাহি গতি।

জিয়াও লক্ষ্মণে যদি তবে অব্য হতি।।

৩৮। সুষেন ঃ প্রভু না হও কাতর।

বাঁচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।।

হস্ত পদে রক্ত আছে প্রসন্ন বদন।

নাসিকায় শ্বাস বহে প্রফুল্ল লোচন।।

হেন জন নাহি মরে জানি মম জ্ঞানে।

ঔষধ আনিতে পাঠাও বীর হনুমানে।।

ঔষধ আনিতে যাক বীর পবন নন্দন।
ঔষধ আনিতে যাক গিরি গন্ধমাদন।।
গিরি গন্ধমাদন সে সর্বলোক জানি।
তাহাতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী।।
নয় শৃঙ্গ ধরে তার অদ্ভুত নির্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গেতে তার মহাদেবের স্থান।।
আর শৃঙ্গে উদয় করে শশধর।
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্বের ঘর।।
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিয়াল।
আর শৃঙ্গে সিংহ আছে ব্যঘ্র পালে পাল।।
আর শৃঙ্গে আছে তার খরতর নদী।
নদীর দুকুলে আছে বিস্তর ঔষধী।।
নীলবর্ণ ফল-মূল পিঙ্গল বর্ণ পাতা।
রক্ত বর্ণ ডাটা তার স্বর্ণবর্ণ লতা।।
আনহ ঔষধ হেন বিশল্যকরণী।
রাত্রি মধ্যে আনহ ঔষধ যাবৎ আছে প্রাণী।।
রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচব সহজে।
রজনী প্রভাতে প্রাণ যাবে সূর্য তেজে।।
বিলম্ব না কর বীর যাও এই ক্ষণ।
তোমার প্রসাদে জীবে ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
আছয়ে গন্ধর্বসব মায়ার নিদান।
সময়েতে হনুমান হইও সাবধান।।
ত্রিশ কোটি গন্ধর্ব যে হাহা-হুহু আছে।
বাদ বিসম্বাদ তার সঙ্গে কর পাছে।।

৩৯। রাম ঃ সুষেন, পথ আঠার বৎসর।
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রির ভিতর।।
কেন বা সুষেন বৈদ্য আমারে প্রবোধে।
আজি লক্ষ্মণ মরিলে কি করিবে ঔষধে।।

৪০। হনুমান ঃ প্রভু, করি নিবেদন।

রাত্রিতে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ।

মনে কিছু রঘুনাথ না করেন বিস্ময়।

ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়।।

প্রভু, প্রণাম চরণে, যাই গিরি গন্ধমাদনে।

গেলাম তথায় আমি ঔষধ কারণে।।

[সকলের প্রস্থান]

* * * *

৪১। মূল ঃ শ্রীরাম সুগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি।

ঔষধ আনিতে বীর করিল উঠানি।।

উভ লেজ করিয়া সারিল দুই কান।

এক লম্ফে আকাশে উঠিল হনুমান।।

মহাশব্দে চলিল শূন্যতে দিয়া ভর।

লাঙ্গুলের টানে উড়ে বৃক্ষ ও পাথর।।

দশ যোজন হইল বীর আড়ে পরিসর।

বিশ যোজন দীর্ঘেতে হইল কলেবর।।

লেজ কৈল দীর্ঘাকার যোজন পঞ্চাশ।

উঠিবা মাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ।।

মহাশব্দ করি যায় শুনিতে গভীর।

দেখিয়া মনেতে প্রীতি পান রঘুবীর।।

দুর্জ্জয় শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষ্যে।

লঙ্কার ভিতর থাকি দশানন দেখে।।

* * * *

[চিন্তিত রাবণ বসিয়া আছে]

৪২। রাবণ ঃ হু, এটা কিসের শব্দ?

ও, ঘরপোড়া বেটা যায় গিরি গন্ধমাদনে।

বিশল্যকরণী আছে গন্ধ মাদনেতে।।

কোনমতে নাহি দিব লক্ষ্মণে বাঁচাতে।

তবে কারে পাঠাইব গন্ধমাদনেতে।।

ও, হয়েছে স্মরণ!

ওহে, মাতুল কালনেমী।

(কালনেমীর প্রবেশ)

৪৩। কালনেমী ঃ ওহে ভাগ্নে রাবণ,

এত রাত্রে ডাক কিসের কারণ?

৪৪। রাবণ ঃ ওহে মাতুল কালনেমী!

লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি।।

চিরদিন করি মামা ভরসা তোমার।

আজি কিছু তুমি মোর কর উপকার।।

আজি রণে লক্ষ্মণ পড়েছে শক্তি শেলে।

মরিবে তপস্বী বেটা রাত্রি পোহালে।।

বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে।

ঘর পোড়া গেল সেই ঔষধ আনিতে।।

গন্ধমাদনে গিয়া করহ উপায়।

যেমতে বানর বেটা ঔষধ না পায়।।

মায়ার প্রবন্ধে এস হনুমান মেরে।

লঙ্কার অৰ্দ্ধেক ভাগ দিব যে তোমারে।।

৪৫। কালনেমী ঃ বাবাজী, মনে করি ভয়।

বড় দুষ্ট সে বানর না জানি কি হয়।।

বানর প্রধান বেটা বুদ্ধিতে যে শঠ।

কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট।।

৪৬। রাবণ ঃ মামা, ভয় কেন তারে।

যুক্তি করি যাও যাতে চিনিতে না পারে।।

৪৭। কালনেমি ঃ বাপুহে, যত বল মিছে।

কারো যুক্তি না খাটিবে ঘরপোড়ার কাছে।।

৪৭। রাবণ ঃ মামা, কেন হও চিন্তিত।

হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত।।

গন্ধমাদনের সন্ধি আমি ভাল জানি।
গন্ধকালী নামে এক আছে কুম্ভিরিণী।।
সরোবরের পাড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে।
প্রকাণ্ড শরীর তার মুখ বিপরীতে।।
সুরাসুর শংকা করে দেখে কুম্ভিরিণী।
সেই ভয়ে কেহ্ নাহি ছোঁয় তার পানি।।
সহজে বানর জাতি বীর হনুমান।
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান।।
উহার আগে যাও তপস্বীর বেশে।
আদর গৌরব করি তুষিতে হরিষে।।
মায়াতে আশ্রয় করি রেখ ফুল ফুল।
কলসী ভরিয়া রেখ সুবাসিত জল।।
স্নান হেতু পাঠাইবে সেই সরোবর।।
অল্প বুদ্ধি হনুমান পশু মধ্যে গণি।
সরোবরে গেলে ধরে খাবে কুম্ভিরিনী।।
রাম তবে মরিবেক লক্ষ্মণের শোকে।
পালাবে সুগ্রীব বেটা পড়িয়া বিপাকে।।
মায়াতে বধিয়া তারে এস মম আগে।
লঙ্কাপুরী লইব দোহে অর্দ্ধভাগে।।

৪৯। কালনেমী ঃ কি বলিস রাবণ!
ঘর পোড়ার কাছে গেলে অবশ্য মরণ।।
পূর্বে ঘর পোড়া তোকে মারিলেক চাপড়।
রথ হইতে পড়িয়া করিলি ধরফর।।
সেই দিন আমি হলে যেতাম যম ঘর।
ভাগ্যে তুই এসেছিলি লঙ্কার ভিতর।।
প্রাণ হারাইতে পাঠাও হনুমান আগে।
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অর্দ্ধভাগে।।

৫০। রাবণ ঃ কি? তুমি আমায় উপদেশ দিতে চাও।

আমার হাতেই তবে যমপুরী যাও।।

[অস্ত্র তুলিল]

৫১। কালনেমী ঃ আহা-হা, কর কি কর কি রাবণ।

তুমি মার, সে মারুক অবশ্য মরণ।।

বাপুহে, আমি যাচ্ছি গিরি গন্ধমাদন।। [প্রস্থান]

* * * *

৫২। মূল ঃ চলিল সে কালনেমী রাবণ আদেশে।

গন্ধমাদনে গেল তপস্বীর বেশে।।

পবন গমনে চলে বীর হনুমান।

কালনেমী উপনীত তার আগুয়ান।।

মায়া স্থান সৃজিল মধুর ফুল ফল।

কলসী ভরিয়া রাখে সুবাসিত জল।।

জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান।

হাতে করে জপমালা করিতেছে ধ্যান।।

[তপস্বীর বেশে কালনেমীর প্রবেশ]

৫৩। কালনেমী ঃ হা-হা-হা, ঘর পোড়া বেটা আর

আমাকে চিনতে পারবে না।

ধরিয়াছি আমি তপস্বীর বেশ

ঐ তো ঘরপোড়া বেটা আসিতেছে।

[হনুমানের প্রবেশ]

এস বাবা এস, বড় পরিশ্রম হয়েছে, বস বাবা বস।

এসেছ অতিথি আজ বড়ই মঙ্গল।

স্নান করে এসে কিছু খাও ফল জল।।

৫৪। হনুমান ঃ গোঁসাই না জান কারণ।

কোন সুখে খাব আমি নাহি লয় মন।।

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্যবংশে।

সত্যপালি দুই পুত্রে দিল বনবাসে।।

জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ।

পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন।।
দোসর লক্ষ্মণ-বীর সীতা তো সুন্দরী।
শূন্য ঘর পেয়ে রাবণ সীতা কৈল চুরি।।
বানর সহায়ে রাম বান্দিল সাগর
কটক সমেত গেল লঙ্কার ভিতর।।
সীতা লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ।
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষ্মণ।।
ঠাকুর লক্ষ্মণ পড়ে রাবণের শেলে।
প্রাণদান পাবেন ঔষধ নিয়ে গেলে।।
ফল-জল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি।
ঔষধ চিনিয়া দাও বিশল্যকরণী।।

৫৫। কালনেমী ঃ ও তোর ছাওয়ালীয়া মতি।
ভোকে শোকে কেমনে এ কুলাবে আরতি।।
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবাসী।
সব তপ নষ্ট হয় কিসের তপস্বী।।
ঐ দেখ সরোবর তপের প্রভাবে।
উলিয়া করহ স্নান ঘুচুক বিষাদে।।
পান যদি করহ ঐ এক অঞ্জলি পানি।
এক বছর ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই না জানি।।

৫৬। হনুমান ঃ আচ্ছা গোঁসাই, আমি সরোবরে চললাম। [প্রস্থান]

৫৭। কালনেমী ঃ হা-হা-হা, এইবার বেটাকে কুমিরে খাবে।

[হনুর প্রবেশ]

৫৮। হনুমান ঃ ঐ তো সরোবর। স্নান সেরে এখনই যাব গোঁসাইর আশ্রমে।
(পুকুরে ঝাঁপ দিল— কুমির কামড়ে ধরে, কুমীর সহ পুনঃ প্রবেশ)
কি! কুম্ভিরিণী তুই! দাঁড়া তবে!
তোকে নখে ধরে দ্বিখণ্ডিত করবো। কে তুই?

৬৯। গন্ধকালী ঃ দেব কন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী।
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্য কেলী।।

কুবের নিবাসে যাই নৃত্যগীত রঙ্গে।
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ মুনি অঙ্গে।।
মুনির অঙ্গ ক্রোধ, শাপ দিল মুনি।
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুম্ভিরিণী।।
লক্ষ লক্ষ প্রাণী মেরে করিবেক পাপ।
হনুমান হতে তোর মুক্ত হবে শাপ।।
হইবেন নারায়ণ রাম অবতার।
তার সেবকের হাতে তোমার নিস্তার।।
চিরজীবী হয়ে সাধ শ্রীরামের কাজ।
তোমার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ।।
আর এক কথা বলি শুন হনুমান।
ভণ্ড তপস্বীর হতে হইও সাবধান।। [প্রস্থান]

৬০। হনুমান ঃ বেটা ভণ্ড তপস্বী। আজি আমি তোকে করিব সংহার। [প্রস্থান]

* * * * *

[কালনেমীর প্রবেশ]

৬১। কালনেমী ঃ হা-হা-হা, বেটা ঘর পোড়াকে কুম্ভিরিণী খেয়ে ফেলেছে।
এখন যাই আমি লঙ্কার ভিতর।
অর্দ্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্ত্বর।।
দড়ি ধরি লব ভাগ উত্তর দক্ষিণ।
পূর্ব দিকে লব ভাগ না যাব পশ্চিম।।
পশ্চিম সাগরে যদি বাঁধ ভেঙ্গে যায়।
পশ্চিমে রাবণে দিব ভাগে যত হয়।।
অশ্ব হস্তী সৈন্য রথ ভাণ্ডারের ধন।
সকল অর্দ্ধেক বুঝি লইব এখন।।
রানীগণ আছে যত স্বর্গ বিদ্যাধরী।
তার অর্দ্ধ লব যেই ভাগে মন্দোদরী।।
[দূরে হনুমানকে দেখে]
এই হয়েছে ! সব মায়া ব্যর্থ হল মোর!

[হনুর প্রবেশ]

এস বাবা এস, বড় কষ্ট হয়েছে তোমার। এই নাও ফল জল।

৬২। হনুমান : রেখে দে তোর ফল জল!

রাবণের কার্য সাধ তপস্বীর বেশে।

মম হস্তে পড়ি আজি যাবি যম পাশে।।

তোর ফল ফুল বেটা টেনে ফেলে দূর।

মোর ঠাঁই আজি তোর মায়া হবে চূর।।

[তপস্বীবেশী কালনেমীর প্রস্থান, রাক্ষসবেশী কালনেমীর প্রবেশ]

যুদ্ধে কালনেমী নিহত।

এই বেটার মুণ্ড ফেলাব রাবণ সম্মুখে।

* * * * *

(লঙ্কার রাজসভায় পাত্রমিত্রসহ রাবণের প্রবেশ। এই সময়ে কালনেমীর মুণ্ড রাবণের সম্মুখে পতিত হল।)

৬৩। রাবণ : একি ! কিসের শব্দ?

দেখ দেখ পাত্র-মিত্রগণ!

কি পড়ে সম্মুখে?

৬৪। পাত্রমিত্রগণ : মহারাজ, এ যে কালনেমীর ছিন্ন মুণ্ড!

৬৫। রাবণ : কি! ঘরপোড়া বেটার কাছে

কালনেমীর সব মায়া চূর্ণ?

এখন কি করব আমি?

হা-হা হয়েছে স্মরণ

ভাস্কর! ভাস্কর!

[সূর্য্যদেবের প্রবেশ]

৬৬। সূর্য্য : কেন লঙ্কেশ্বর, কিবা প্রয়োজন মোর?

৬৭। রাবণ : শুনহে ভাস্কর, উদয় হও গিয়া গিরির উপর।

তোমার উদয় হলে মরিবে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যাজিবে জীবন।।

৬৮। সূর্য্য : দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে।

এখন উদয় বল হইব কেমনে?

৬৯। রাবণ ঃ তাতে ক্ষতি কি তোমার!

ও, মনে বুঝি শক্তিহীন চিন্তহ আমায়!

বল, উদয় হইবে কিনা পর্বত উপরে?

৭০। সূর্য্য ঃ হে লঙ্কেশ্বর , তব আদেশ পালন করিতে।

উদয় হইতে যাই উদয় পর্বতে।। [সকলের প্রস্থান]

* * * *

[হনুমানের প্রবেশ]

৭১। হনুমান ঃ ওকি! পূর্ব দিকে কিসের আলো?

দিবাকর বুঝি উদয় গিরিতে?

[রথসহ সূর্য্যের প্রবেশ]

কে, কে তুমি? ছাড়িব না পথ।

৭২। সূর্য্য ঃ সারথি, রথ রাখ গগন মণ্ডলে।

বানরে পোড়াইয়া পড়িব ভূতলে।।

৭৩। হনুমান ঃ কোন মহাশয় কিবা নাম ধর।

স্বরূপ করিয়া কহ আমার গোচর।।

৭৪। সূর্য্য ঃ আমি সূর্য্য, ছেড়ে দাও পথ।

উদয় হইতে যাই উদয় পর্বত।।

রজনী প্রভাত হলে মরিবে লক্ষ্মণ।

উদয় হইতে মোরে পাঠায় রাবণ।।

ঔষধ আনিতে গেছে পবন কুমারে।

মারিব লক্ষ্মণে, হনু না আসিতে ফিরে।।

৭৫। হনুমান ঃ হে দেব, কর অবধান।

পবন পুত্র আমি নাম হনুমান।।

ঔষধ আনিতে আমি আইনু শিখরে।

এই নিবেদন করি তোমার গোচরে।।

প্রাণ দান যতক্ষণ না পায় লক্ষ্মণ।

তাব্য উদয় গিরি না কর গমন।।

৭৬। সূর্য্য ঃ কেবা শুনে তোমার বচন।
না পারি রাবণ আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন।।

৭৭। হনুমান ঃ তুমি দেবের প্রধান।
সদয় হইয়া রাখ লক্ষ্মণের প্রাণ।।

৭৮। সূর্য্য ঃ রাবণের আজ্ঞা যদি না করি পালন।
কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেন রাবণ।।
শ্রীরামের অনুরোধে যদি ফিরে যাই।
রাবণের কোপে বল কিসে রক্ষা পাই।।

৭৯। হনুমান ঃ আছে উপায় ইহার।
নিকটেতে এসো বলি কর্ণেতে তোমার।।
তব নাম ভানু মম নাম হনুমান।
নামে নামে মিলিয়াছে দুজনে সমান।।
খণ্ডিবে তোমার দোষ বানরের কাছে।
সাধিবে রামের কার্য যুক্তি হেন আছে।
দুই দিক রক্ষা পাবে সুমন্ত্রণা বলি।
হনু ভানু দুই জনে করিব মিতালী।।
[দুইজনে কোলাকুলি করে। সূর্য্যকে হনুমান কক্ষতলে পুরিল।]

*   *   *   *

(হনুমানের প্রবেশ, সঙ্গে গন্ধর্ব)

৮০। হনুমান ঃ আমি করি নিবেদন।
শক্তি শেলে পড়ে আছে ঠাকুর লক্ষ্মণ।।
ফিরি যাব লঙ্কায় থাকিতে রজনী।
ঔষধ চিনিয়ে দাও বিশল্যকরণী।।

৮১। গন্ধর্ব ঃ কি বলে বানর।
কাহার নফর বেটা কাহার কিঙ্কর।।
হা-হা- হু-হু রাজা এইমাত্র জানি।
কোথাকার রামচন্দ্র কখনো না জানি।।
আসিয়া বানর বেটা কোন কার্যে ফিরে।

চুলেতে ধরিয়া সবাই আছড়াও তারে।।

[সকলের সঙ্গে হনুর যুদ্ধ ও সকলের পলায়ন]

৮২। হনুমান ঃ ঔষধ না পারি চিনিয়া লইতে।

লইয়া যাব আমি পর্বত সহিতে।।

[পর্বত তুলে মাথায় লইল]

মারিলাম কালনেমী মায়ার পুতলী।

কুম্ভিরিণী মারি মুক্ত কৈনু গন্ধকালী।।

তিন কোটি গন্ধর্বরে মারিনু সকল।

রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল।।

জয় রাম..... জয় রাম...... জয় রাম!

* * * * *

(ভরত ও শত্রুঘ্নের বাটুল হস্তে প্রবেশ)

৮৩। শত্রুঘ্ন ঃ দাদা, এই নন্দীগ্রাম আকস্মাৎ কেন অন্ধকার ময়!

রামের পাদুকা লঙ্ঘে নাহি করে ভয়।।

৮৪। ভরত ঃ ওরে, ওরে শত্রুঘ্ন, কেন কর ভয়।

যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর গন্ধর্ব যদি হয়।।

বাটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি।

রামের পাদুকা যেবা লঙ্ঘে তারে মারি।।

(বাটুল মারিলেন)

(হনুমান ঃ রাম জয়! রাম জয়!)

৮৫। ভরত ঃ কে তুমি কপি, থাক কোন স্থান।

স্মরিলে রামের নাম কি জান সন্ধান।।

কোথা হইতে আইলে হে কহ বিবরণ।

কোথা আছে রাম সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ।।

৮৬। হনুমান ঃ শুন ওহে ভরত শত্রুঘ্ন।

কহি রাম সীতার বিবরণ।।

বাসা করে ছিল রাম পঞ্চবটী বন।

সূর্পনখার নাক কাটেন লক্ষ্মণ।।

রাবণের ভগ্নী সূপর্নখা সেই যে রাক্ষসী।
যুদ্ধ কৈল চোদ্দ হাজার নিশাচর আসি।।
সবারে মারেন রাম দণ্ডক কাননে।
যোগী বেশে সীতা হরি নিলেক রাবণে।।
সুগ্রীবের সাথে রাম করিয়া মিত্রতা।
বালি মারি সুগ্রীবকে দিলে দণ্ডছাতা।।
বানর লইয়া রাম বান্ধিল সাগর।
মিলাইল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর।।
রাক্ষসে বানরে যুদ্ধ হইল অপার।
তিন মাস রাত্রি দিন যুদ্ধ অনিবার।।
কুপিয়া রাবণ রাজা প্রবেশিল রণে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণে।।
লক্ষ্মণে করিয়া কোলে রাম করেন ক্রন্দন।
আমারে পাঠিয়ে দেন ঔষধ কারণ।।
ঔষধ চিনিতে নাহি পারি কোন মতে।
উপারিয়া লইয়া যাই পর্বত সহিতে।।
আমি গেলে লক্ষ্মণের বাঁচিবেক প্রাণ।
তোমার বাটুলে মোর হারাইল জ্ঞান।।
তুমি নিলে রাজ্য রাবণ নিল নারী।
লক্ষ্মণ ত্যাজিবে প্রাণ পোহালে শর্বরী।।
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার।
সহজেতে না হবে সীতার উদ্ধার।।
লক্ষ্মণের শোকে রাম প্রবেশিবে বনে।
নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগ কর দুইজনে।।

৮৭। ভরত ঃ শুন শুন ওরে বীর হনুমান।
পর্বত লইয়া তুমি করহ গমন।।
তোমার সঙ্গেতে আমি যাব লঙ্কাপুরে।
থাকুক শত্রুঘ্ন ভাই অযোধ্যা নগরে।।

৮৮। হনুমান : তুমি যাবে কিবা মতে।
শীরামের আজ্ঞা নাই তোমা সঙ্গে নিতে।।

৮৯। ভরত : তবে ওহে মারুতি।
পর্বত লইয়া তুমি যাও শীঘ্রগতি।।

৯০। হনুমান : গিরি নারিতে না পারি।
চলহীন হইয়াছি বল কিবা করি।।
যোজনেক উচ্চে যদি পার তুলে দিতে।
তবে আমি পারিব এ পর্বত লয়ে যেতে।।

৯১। ভরত : ওরে বাছা পবন কুমার।
পর্বত সহিতে ওঠ বাণেতে আমার।।

৯২। হনুমান : জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়। (সকলের প্রস্থান)

* * * *

[রাম লক্ষ্মণকে কোলে নিয়ে সকলের সঙ্গে প্রবেশ করে]

[হনুর প্রবেশ]

৯৩। হনুমান : জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়।
প্রভু ঔষধ চিনিতে না পারি কোন মতে।
এ কারণে আনিলাম পর্বত সমেতে।।

৯৪। রামচন্দ্র : পবন কুমার,
ত্রিভুবনে অসাধ্য কোন কর্ম তোমার।
সুষেন শীঘ্র ঔষধ চিনে নাও।

৯৫। সুষেন : যাই প্রভু, ঔষধ আনছি।

৯৬। মূল : লক্ষ্মণে ঔষধ দেন সুষেন সুধীর।
ঔষধ খেয়ে জীয়ে উঠেন লক্ষ্মণ বীর।।
আনন্দের কোলাহল রামের সেনা দলে।
রাম জয় রাম জয় ধ্বনি চারিদিকে বলে।।
শুনিয়া সে জয়ধ্বনি রাবণ চিন্তিত।
গাহিলাম সবিশেষ লক্ষ্মণের শক্তিশেল গীত।।

সংগ্রহসূত্র : উক্ত পালাটি ড. দিগ্বিজয় দে সরকারের
'কোচবিহারের লোকনাটক' (১৯৯৭) গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

কুশান

দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র

স্তোত্রপাঠ

মূল ঃ রামং লক্ষ্মণং পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিম সুন্দরম্।
কাকুস্থং করুণাময়ং গুণনিধিম্ বিপ্রপ্রিয়ম ধার্মিকং।।
রাজেন্দ্র সত্য সুন্দরম্ দশরথ তনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্তিম্
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল তিলকং রাঘবং রাবণাবিম্।।
দক্ষিণে লক্ষ্মণধন্বি বসত জানকী শুভা
পুরত মারুতি যস্য তং নমামি রঘুওমম্
রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে
রঘুনাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ নমঃ।।

বন্দনা

মূল ঃ ও এসো হে প্রভু মোর নীলদ বরণ রাম
এই আসরে এসো প্রভু মোর ভগবান প্রভু গো।।
ও দয়াল রাম আইসো তোমার ভক্ত হনুমান সঙ্গে নিয়া
তুমি মন্ত্র, তুমি যন্ত্র, তুমি আমার তাল রঘুনাথ হে।

ভাংতি ঃ আ-হা-হা....

মূল ঃ রামনাথ প্রভুনাথ রাজীবলোচন।
দয়া কর রঘুনাথ প্রভু বন্দিলাম চরণ।।
তব নাম স্মরণ করি প্রভু ব্যানা লইলাম হাতে।
দয়া করো দয়াময় প্রভু অধম জনাতে।।
অধম বলিয়া যদি দয়া না করিবে।
পতিত-পাবন নাম কোনে গুণে ধরিবে।।

দোয়ার ঃ আচ্ছা বলিবেন মোর ভাইয়া ধন রে—

মূল ঃ নম নম বন্দি আমি বাল্মীকি চরণ।
শোলকে সিদ্ধান্তে মুনি রচিলেক রামায়ণ, প্রভু গো—

দোয়ার ঃ আচ্ছা বলিবেন....

মূল ঃ রামের যে পিতা বন্দং দশরথ রাজা।

রামের যে মাতা বন্দং রানী কৌশল্যা প্রভু গো—

দোয়ার ঃ আচ্ছা বলিবেন—

মূল ঃ রামের যে গুরু বন্দং বিশ্বামিত্র মুনি।

তার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করিলেন রঘুমণি- প্রভু গো—

দোয়ার ঃ আচ্ছা বলিবেন।

মূল ঃ (ভাংতি) নম নম বন্দি আমি বাল্মীকি চরণ।

শোলকে সিদ্ধান্তে মুনি রচিলেন রামায়ণ।।

খোসা ঃ ভব নদীটার ভাই কিনার পাওয়া ভার।

ওরে হরির নাম লইয়া দাঁড়াইলাম সভায়

কেবল হরি ভরসা তোমার।।

হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলে

নামিলাম আমি অগম জলে

ভবপারে দয়াময় তুমি কাণ্ডারী

তোমার অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হবে

হরি আমি যদি মরি।।

দোয়ার ঃ আচ্ছা গুরু তোমরা যে হরিনাম নিবার ধরচেন, আর হরির চরণ ভরসা করিবার ধরচেন, তোমার ঐ হরির মাহাত্ম্য কাথা খানিক শোনান দেখি।

মূল ঃ হরির কথা শুনবে, তাহলে শোন—

সত্য যুগে ছিলেন হরি নরসিংহ অবতার।

হিরণ্যকশিপু রাজকে করিলেন সংহার।।

ত্রেতা যুগে ছিলেন হরি শ্রীরাম অবতার।

শমন দমন রাজা করিলেন সংহার।।

দ্বাপর যুগে ছিলেন হরি শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

মথুরায় কংসরাজ করিলেন সংহার।।

কলিযুগে হইলেন প্রভু চৈতন্য অবতার।

ঘরে ঘরে হরির নাম করিলেন প্রচার।।

ভাংতি ঃ সত্য যুগে ছিলেন হরি—

দোয়ার ঃ তারপরে কি হৈল মাও?

মূল ঃ তাহলে শোন বাবা—

রাম ভজ রাম চিন্ত রাম কর ওরে সার।
রাম বিনে এ জগতে গতি নাইরে আর।।
রাম নাম লইয়া যেবা পন্থ লইয়া যায়।
ধনুর্বান হাতে লইয়া রাম পিছে পিছে ধায়।।

ভাংতি ঃ হায় হায় রে—

রাম ভজ রাম চিন্ত রাম কর ওরে সার।
রাম বিনে এ জগতে গতি নাইরে আর।।

মূল ঃ আচ্ছা বাবা, এই আসরে আজ আমরা কি গান করব?

দোয়ার ঃ তোমরায় সেনে জানেন গুরু।

মূল ঃ বাবারে, এ আসরে আজকে আমরা কুশান গান করব।

দোয়ার ঃ কুশান গান কাক্ কয় গুরু? কেনে ইয়ার নাম কুশান গান হৈল?

মূল ঃ বাবা তুমি এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাও। তাহলে শোন —

লব নিল তালযন্ত্র কুশ নিল ওরে বেনা
দুই ভাই চলিয়া গেল অযোধ্যা বুলিয়া।।

শোনো বাবা, অযোধ্যায় রাজসভার লব তালযন্ত্র আর কুশ বেনার সাহায্যে এই গান গাইয়াছিল বলিয়া কুশের নাম অনুসারে, এ এলাকার মানুষ এ রামায়ণ গানের নাম দিয়েছে কুশান।

দোয়ার ঃ ও, এলা সেনে বুঝিলুং। অযোধ্যার রাজসভাত লব তালযন্ত্র আর কুশ বেনা নিয়া এই গান গাইচে বুলিয়া এই গানের নাম হৈচে কুশান। তার পাছত কি হৈল মাও?

মূল ঃ আদি কাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।

অযোধ্যা কাণ্ডেতে রাম ত্যাজে রাজ্য ভার।।
অরণ্য কাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিস্কিন্দা কাণ্ডেতে হৈল সুগ্রীব মিলন।।

ভাংতি ঃ আদি কাণ্ডে.........

সুন্দরা কাণ্ডেতে হৈল সাগর বন্ধন।
লঙ্কা কাণ্ডে রাম রাবণের হৈল মহারণ।।
উত্তরা কাণ্ডেতে হয় কাণ্ডেরি শেষ

সীতা দেবী করিলেন পাতাল প্রবেশ।।

এই সপ্তকাণ্ড সুধাভাণ্ড রামায়ণ।

কৃত্তিবাস করিলেন গান সমাপন।।

খোসা ঃ আমার মন কান্দেরে আমার প্রাণ কান্দেরে

আজ বুঝি ভাব উদয় হল রে।।

কোথায় রইল শ্রীদাস সুদাম

কোথায় রইল দাদা বলাই

আজ বুঝি ভাব উদয় হল রে।।

মূল ঃ আচ্ছা বাবা আমরা এখানে কি করতে এসেছি?

দোয়ারী ঃ কেনে, এটি না আমরা গান করির আসচি।

মূল ঃ গান তো আমরা অনেক করলাম, কিন্তু এ আসরে আমরা কোন পালা করিব?

দোয়ারী ঃ তোমরায় কন গুরু।

মূল ঃ বাবারে, আজ আমরা এই আসরে —দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র পালা করিব।

দোয়ার ঃ আচ্ছা গুরু কন তো ঐ হরিশ্চন্দ্রটা কায়?

মূল ঃ হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।

হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে।।

পর-বধূ হরি, হরিবীজ রাজ্য করে।

তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে।।

তাহলে বুঝলে বাবা, সূর্য্য বংশ কূলতিলক হরিবীজের পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র। তিনি ছিলেন অযোধ্যার নরপতি। বিশ্বামিত্র মুনিকে তিনি সসাগরা পৃথিবী দান করেছিলেন। নিজ ভার্য্যা এবং আত্ম বিক্রয় করে দানের দক্ষিণা দিয়ে তিনি দানবীর হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

দোয়ারী ঃ তারপরে কি হৈল?

মূল ঃ তাহলে শোন।

খোসা ঃ দারুণ বিধাতা ও মোর বিধাতা

ও মোর দারুণ বিধাতারে —

চটকা ঃ একদিন সভাতে বসিল সুরপতি

পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী।।

নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।

একবার করিলেক তারা তাল-ভঙ্গ।।
দেখিয়া করিল কোপ দেব-পুরন্দর।
অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর।।

খোসা ঃ আমার মন কান্দেরে ভাই নিতাই।
আমার প্রাণ কান্দেরে ভাই নিতাই।।
আজ বুঝি ভাব উদয় হৈল তাই।
কোথায় রইল শ্রীদাস সুদাম
কোথাই রইল দাদা বলাই।
আজ বুঝি ভাব উদয় হৈল তাই।।

ধূর ঃ হায় হায় রে —
(অভিশপ্তা কন্যাগণ যখন মর্তে চলিয়া গেল বিশ্বামিত্র তপোবনে উপনীত হৈল)
নিত্য যে রূপসীরা পুস্প করে আহরন
ডাল ভাঙে ফুল তোলে কে করে বারন।।
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে
ডালভাঙা গাছ সব দেখিল নয়নে।।
এমন করিয়া ডাল ভাঙে যেই জনে
আসিলে পড়িবে কাল লতার বন্ধনে।।

প্রথম দৃশ্য

(তপোবন)

(বিশ্বামিত্র ও কপিঞ্জনের প্রবেশ)

মূল ঃ এত বলি শাপ যদি দিল মুনিবরে
প্রভাতে আসিল যবে পুস্প তুলিবারে।।
যে কালে কন্যারা আসি ডালে ভর দিল
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল।।
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোধন
অনেক প্রকারে তাদের করিল ভৎসন।।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পঞ্চকন্যার নৃত্য করিতে করিতে পুষ্পচয়ন)

গান ঃ চলো হে সখি সগায় মিলি ফুল তুলিবার যাই

ফুল তুলিবার যাই হে সখি

ফুল তুলিবার যাই

ফুলের মালা গালাত দিয়া

বন্ধুক সাজাই।।

(পুষ্পচয়ন করিতে করিতে লতাপাশে আবদ্ধ)

১ম (কন্যা) ঃ এই তো আমরা ফুল বাগানোত আসছি। নেও এলা সগায় মিলি মনের আনন্দে ফুল তুলি।

২য় ,, ঃ হায় সখি, আজি আমার এমন দশা হৈল ক্যানে? লতাত ক্যানে হাত আটকি গেইল?

৩য় ,, ঃ বুঝিচুং সখি, দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপত আজি আমার এই দোশা হৈচে।

৪র্থ ,, ঃ হ্যাঁ সখি, মোর মনোত পড়িল — রাজা হরিশ্চন্দ্র আসিয়া আমাক পরশ করিলে আমরা গুলা মুক্তি পামু।

৫ম ,, ঃ তাহৈলে সখি, আমরা সগায় মিলি রাজা হরিশ্চন্দ্রক ডেকাই।

সকলে ঃ কোথায় রাজা হরিশচন্দ্র (৩)।

১ম ,, ঃ তোমরা একবার আসিয়া আমাক গুলাক মুক্ত করি দিয়া যাও।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কায় ডেকায়? কায় ডেকায়, মোক রাজা হরিশচন্দ্র, রাজা হরিশ্চন্দ্র বুলিয়া। এই বনত তন্ন তন্ন করি মুই খুঁজির ধরচুং শিকার। আচমকা, কানত আসি পড়িল মোর নারী কণ্ঠস্বর। সেই স্বর লক্ষ করি এটি ছুটি আসিলুং। একি! কায় মাও তোমরা? তোমারলার এমন দোশা কেনে?

১মা ,, ঃ আমরা স্বর্গের অপ্সরী। দেবরাজ ইন্দ্রের অভিশাপে আমার গুলার আজি এই দশা।

২য়া ,, ঃ দেবরাজ ইন্দ্র কইচে যেদিন রাজা হরিশ্চন্দ্র আসিয়া আমাক গুলাক পরশ করিবে, সেদিন আমরা গুলা মুক্তি পামু।

৩য়া ,, ঃ তোমরায় কি রাজা হরিশ্চন্দ্র?

হরিশ্চন্দ্র ঃ হ্যাঁ মাও, মুই রাজা হরিশ্চন্দ্র।

৪র্থ ,, ঃ তা হৈলে তোমরা আমাক পরশ করি মুক্ত দেও রাজা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ যদি মোর পরশে তোমরা গুলা মুক্তি পান তাহৈলে এলায় মুই তোমাক গুলাক পরশ করি মুক্ত করি দেং। (পরশ)

কন্যাগণ ঃ মহারাজ, তোমরা আমার গুলার প্রণাম নেও, আর আমাক ফিরি যাবার অনুমতি দাও।

হরিশ্চন্দ্র ঃ হ্যাঁ মাও, তোমরা আইসো।

কন্যাগণ ঃ জয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের জয়। (সকলের প্রস্থান)

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুইও আর দেরী না করং। শিকার আর না করিয়া সৈন্নসামন্তলাক নিয়া নিজ রাজ্য বুলিয়া ফিরিয়া যাং। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মূল ঃ প্রাতঃকালে আইলেন, গাধির নন্দন।

ঃ না দেখিয়া কন্যাগণে ক্ষুন্ন হৈল মন।।

(বিশ্বামিত্রসহ শিষ্যের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্রঃ চল্ কপিঞ্জন তপোবনোত দেখিয়া আসি কায় কায় বন্দী হয়া আছে। (পদচারণা) এলা কপিঞ্জন কাংয়োয় তো নাই। কোটে গেইলেক মোর বন্দিনী পঞ্চকইনা। কার এমুন সাহস হৈচে,মোর বন্দিনীলাক মুক্ত করি দিচে।

কপিঞ্জন ঃ সচায় তো গুরু, এমুন কাম কায় করির সাহস পাইল।

বিশ্বামিত্রঃ কপিঞ্জন, মুই ধ্যান করিয়া দেখং কায় এই বন্দিনী পঞ্চ কইনাক মুক্ত করি দিছে। (ধ্যান) হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র! হরিশ্চন্দ্র!

কপিঞ্জন ঃ কোন হরিশচন্দ্র গুরু?

বিশ্বামিত্রঃ অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র মোর বন্দিনীলাক মুক্ত করি দিছে। মুই এলায় অযোধ্যা যাইম। রাজা হরিশ্চন্দ্রক পুছিম, কেনে উয়ায় মোর বন্দিনী পঞ্চকইনাক মুক্ত করিল? আর শোন মুই যদ্দিন ফিরিয়া না আইসোং তদ্দিন তুই এই তপোবন দেখাশুনা করিস। (প্রস্থান)

কপিঞ্জন ঃ আইসো গুরু। হুঁ হুঁ আজি আমার গুরুর চণ্ডালী দেও খরাইচে। অযোধ্যা যায়া আজি কিবা করে! আর কি করে করুক, ঐ যে কাথায় কয় না— যায় যেমন ঝাল খায় তায় তেমন মজা বোঝে। মুই এলা যাং খায়া দায়া নিন পারং যায়া। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

খোসা ঃ পিতৃবাক্য কভু মিথ্যা নয়।

যার আছে রে ভক্তি

তাহার মুক্তি সত্যি সত্যি হয়।।

(আর) দাতা কর্ণ ছিল দানীরে বড়—

তায় সে জানে দানের মর্মরে—

মনরে দুঃখে কষ্টে তার দিন যায়।।

ও যার—

ধূর ঃ ক্রোধ করি বিশ্বামিত্র চলিল সত্ত্বর

উত্তরিলা গিয়া রাজার গোচর।।

(চটকা) মুনিরে দেখিয়া রাজা করিল অভ্যর্থন।

আসুন বলিয়া দিল বসিতে আসন।।

ও হায়রে আসুন বলিয়া দিল বসিতে আসন—

(হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ)

হরিশ্চন্দ্র ঃ বাবা, তোমরা মোক স্বর্গ থাকি আশুর্বাদ করো বাবা। তোর এই রাজ সিংহাসনের অমর্যাদা যেন কোনদিনও মুই না করং।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্রঃ হরিশ্চন্দ্র—

হরিশ্চন্দ্র ঃ আইসো মুনিবর। আসন গ্রহণ করো।

বিশ্বামিত্রঃ না রাজা হরিশ্চন্দ্র, মুই আসন গ্রহণ করিবার বাদে আইসোং নাই। তোরটে শুনির আসচুং কোন সাহসে তুই মোর বন্দিনী পঞ্চকন্যাক মুক্ত করি দিছিস্?

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, মুক্তিদান বড় দান মনোতে ভাবিয়া পঞ্চকইনাক দিছুং মুই মুক্ত করিয়া।

বিশ্বামিত্রঃ দান! কত বড় দানী তুই? দে তো দেখি তুই মোক দান।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, তোমরা মোরটে যা চাবেন, এলায় মুই সেই দান দিম।

বিশ্বামিত্রঃ তাহেলে মোর আগত সত্য কর রাজা। মুই যা চাইম, সেইটায় দান করিব।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি।

তোমার সত্য না পালিলে প্রাণ ফাটি মরি।।

বিশ্বামিত্রঃ হাঃ - হাঃ - হাঃ। দান যদি করিবু রাজা, কর তায় অযোধ্যা সহ সসাগরা পৃথিবী দান।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ঠিক আছে মুনিবর, ধর এই অযোধ্যার রাজমুকুট। আজি থাকি অযোধ্যাসহ সসাগরা পৃথিবীর রাজা তোমরায়।

বিশ্বামিত্রঃ হরিশ্চন্দ্র, দান তো দানিলো রাজা, এলা তোর দানে দক্ষিনা দে।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তায় হবে মুনিবর, দানের দক্ষিনা বাদে মুই তোমাক সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিম্। এই কায় আছেন? ভাণ্ডার থাকি মোক সাত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা আনি দেও।

বিশ্বামিত্রঃ হরিশ্চন্দ্র, গোটায় পৃথিবী দান করিলু মোক। এলা কুন ধন আনিয়ার আদেশ করিস ভাণ্ডারীক। অযোধ্যার রাজকোষ এলা মোর অধিকারে।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ছচায় তো, মোর নিজের বলতে তো এলা আর কিছুই নাই। মুনিবর, তোমরা মোক সাত দিন সময় দেও, সাত দিনের ভিতিরাত মুই মোর দানের দক্ষিনা দিম।

বিশ্বামিত্রঃ বেশ, তাই হউক? হরিশ্চন্দ্র, এলা তুই তোর রাজবেশ মাইয়া ছাওয়ার ধরিয়া পৃথিবীর বায়রা চলি যা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, পৃথিবী ছাড়িয়া এলা মুই কোটে যাইম?

বিশ্বামিত্রঃ শোনেক হরিশ্চন্দ্র - শাস্ত্রে কয়—

পৃথিবীর বায়রাত আছে বারানসী

বারানসী যায়া তুই হ কাশীবাসী।।

মুই এলা যাং। সাত দিনের দিন কাশী যায়া মুই তোর নগত দক্ষিনার বাদে দেখা করিম।

(প্রস্থান)

হরিশ্চন্দ্র ঃ ভালে হৈল। রাজ্যখান বিশ্বামিত্র মুনিক দিয়া মুই খিব শান্তি পালুং। কোটে শৈব্যা? শৈব্যা, শৈব্যা—

(শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা ঃ ক্যানে মহারাজ ? ক্যানে ডেকাইলেন? কন প্রভু তোমার কি হইচে?

শৈব্যা ঃ মহারাজ, মহারাজ, আজি তোমার মুখখান এত মলিন দেখং কেনে মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ না শৈব্যা, আজি মোর খিপ আনন্দের দিন। সসাগরা পৃথিবী আজি মুই বিশ্বামিত্র মুনিক দান করিচুং।

শৈব্যা ঃ মহারাজ ! এইটা তোমরা কি করিলেন মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দুঃখ করিস না শৈব্যা। এমুন দান করিবার ভাগ্য কারও কোনদিন হয় নাই, মোর তো হইলেক। চল আর দেরী না করিয়া বেটা রুহিতাশ্বের হাত ধরিয়া আমরা বারানসী যাত্রা করি।

(রুহিদাসের প্রবেশ)

রুহিদাস ঃ বাবা বাবা, আমরা এলা এই অযোধ্যার রাজবাড়ি ছাড়িয়া চলি যামু বাবা?

হরিশ্চন্দ্র ঃ হ্যাঁ বাবা, শৈব্যা আর দেরী করা না যায়। এলায় আমরা বারানসী বুলিয়া যাত্রা করি।

শৈব্যা ঃ চলো মহারাজ। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

ধূর ঃ বিশ্বামিত্রের বাক্যমত সূর্য্য বংশধন।

দারা পুত্র সহ কাশী করিল গমন।।

শৈব্যার সহিত রাজা করিল মন্ত্রনা।

কি দিয়া শুধিব আমি ব্রাহ্মণের দেনা।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ শৈব্যা, সাতদিনের আজি শ্যাষ দিন। এলায় মুনি বিশ্বামিত্র আসিবে দানের দক্ষিনার বাদে। ইংয়ার কি কোন উপায় করা যায় শৈব্যা?

শৈব্যা ঃ একটা উপায় আছে প্রভু। মোক তোমরা দাসীর হাটত ব্যাচেয়া যা পাবেন তাক দিয়া দানের দক্ষিনা শোধ করেন।

হরিশ্চন্দ্র ঃ না, না, এইটা হবার পায় না শৈব্যা।

শৈব্যা ঃ কেনে হয় না প্রভু। দানের দক্ষিনা দিবার না পাইলে তোমার যে সইত্যভঙ্গ হোবে, সেইটা মুই কুনদিন হবার দিম না।

হরিশ্চন্দ্র ঃ না, শৈব্যা না, ইংয়ার চায়া মোর মরনও ভাল। মুই পাইম না তোক ব্যাচেয়া দানের দক্ষিনা দিবার। তুই আর মোক এই কাথা কইস না শৈব্যা।

শৈব্যা ঃ তোমরা যদি বাঁচিয়া থাকেন, তা হইলে তোমরা কামাই করিয়া মোক ফিরা কিনিয়া আনিবার পাবেন। কিন্তুক তোমরা না থাকিলে আর কিছু করিবারে উপায় থাকিবে না মহারাজ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তায় শৈব্যা, তোর কাতায় থাকুক। এলা এইটা ছাড়া তো মুই আর কুনো রাস্তা দেখির ধরচুং না। বাবা বিশ্বনাথ, তোমরা কুনো দোষ নেন না বাবা। মোক তোমরা ক্ষমা করেন।

মূল ঃ স্ত্রী নিয়া যায় রাজা হাটের ভিতিরা।
দাসী কায় কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে।।
এক বিপ্র ছিল হাটে পণ্ডিত সুজন।
তার একখান দাসীর ছিল প্রয়োজন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দাসী চাই দাসী —
দাসী কায় কিনিবেন?
(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ ঃ কায়রে তুই? কায় তুই দাসী বেচাবো? মোর একখান দাসীর দরকার। কোটে তোর দাসী।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এই যে ব্রাহ্মণ, ইংয়াকে মুই বেচাইম।

ব্রাহ্মণ ঃ (শৈব্যাকে দেখিয়া) ঠিক আছে, বাবা ঠিক আছে। ইংয়াকে দিয়া মোর কাজ চলিবে। তায় বাবা এই দাসীর বাদে মোক কত মূল্য দেওয়া নাগিবে?

হরিশ্চন্দ্র ঃ মিথ্যা কইম না ব্রাহ্মণ। মোর দানের দক্ষিনা দিবার বাদে সাত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দরকার।

ব্রাহ্মণ ঃ মোরটে তো সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা নাই বাপু। মুই তোক চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিবার পাইম। যদি তুই এই চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রায় তোর দাসীক বেচাইস তায় নে, আর না হৈলে মুই রাস্তা দেখং।

শৈব্যা ঃ হ্যাঁ প্রভু, একখান দাসীক ব্যাচেয়া তোমরা ইংয়ার বেশি স্বর্ণমুদ্রা পাবেন না। তোমরা রাজী হয়া যাও।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুই তো আর কুনো উপায় দেখির পাবার ধরচুং না শৈব্যা। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেও ব্রাহ্মণ তোমার কাথা থাউক।

ব্রাহ্মণ ঃ নে এই থইলাত চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। তায় এলা আমরা যাই। নে মাও চল, চল।

শৈব্যা ঃ চল ঠাকুর।

রুহিদাস ঃ তুই মোক ছাড়িয়া কোটে যাবার ধরছিস্ মা?

শৈব্যা ঃ বাবা, মুই এই ব্রাহ্মণের নগত চলিয়া যাইম বাবা। তুই তোর বাবার নগত থাকিস মানিক।

রুহিদাস ঃ না, মা, তোক ছাড়িয়া মুই একদণ্ড ও রবার পাইম না মা।

ব্রাহ্মণ ঃ হবে না, হবে না, বাপই। মুই কিনচুং একজনক। দুই জনের মুই ভাত কাপড় দিবার পাইম না।

শৈব্যা ঃ ঠাকুর, তোমরা মোক খানিক দয়া করেন ঠাকুর। ছাওয়াটার বাদে তোমাক কুনো খোরাক দিবার হবে না। মোক যে চাইরটা খাবার দিবেন, সেইটায় আমরা মায় ছাওয়ায় ভাগ করিয়া খামু।

ব্রাহ্মণ ঃ তাহৈলে মোর কোন আপত্তি নাই। চলরে বাপই চল।

শৈব্যা ঃ বিদায় স্বামী, তোমরা মোক খুশী মনে বিদায় দেও। চল ঠাকুর।

(ব্রাহ্মণ, রুহিদাসসহ শৈব্যার প্রস্থান)

হরিশ্চন্দ্র ঃ (কেঁদে কেঁদে) মুই এলা যাং। এই চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দানের দক্ষিনার কিছু শোধ করোং যায়া। (বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্র ঃ হরিশ্চন্দ্র, সাতদিনের আজি শ্যাষ দিন। দানের দক্ষিনা এলায় তুই শোধ কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, নিজের ভার্যাক ব্যাচেয়া মুই চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাচুং। এলা এইটাই নেও প্রভু।

বিশ্বামিত্র ঃ না হরিশ্চন্দ্র। সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রার এক রতিও মুই কম নিম না।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তায় মোক আর খানিক সময় দেও, প্রভু। মুই নিজে বেচি হয়া বাকী স্বর্ণমুদ্রা পূরণ করিম। এই, কায় আছেন দাস লাগিবে দাস-দাস লাগিবে দাস।

(কালু ডোমের প্রবেশ)

কালুডোম ঃ কৌন নফর বিক্রি করিবেক রে? নফরের দরকার আছে।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুই নিজে বিক্রি হইম সর্দার।

কালুডোম ঃ তু তো আচ্ছা জোয়ান মরদ আছিস রে। তোকে দিয়া হামার কাম আচ্ছা চলবো তো বোল, তোকে কেত মূল্য দিতে হোবে?

হরিশ্চন্দ্র ঃ মাত্র তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা সর্দার।

কালুডোমঃ ঠিক আছে, ঠিক আছে। লে এই থলিয়া মে ৩ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। (থলিদান) লে অভি চল্ হামার সাথ।

বিশ্বামিত্রঃ হরিশ্চন্দ্র—

হরিশ্চন্দ্র ঃ খানিক দেরী কর সর্দার। মুনিবর এই ধর মোর দানের দক্ষিনা সাত কোটি স্বর্ণমুদ্রা। আর কন আজি হাতে মুই ঋনমুক্ত।

বিশ্বামিত্রঃ হ্যাঁ, আজি হাতে তুই ঋন মুক্ত। (প্রস্থান)

কালুডোমঃ তুহার কি নাম আছে রে?

হরিশ্চন্দ্র ঃ সগায় মোক হরিশচন্দ্র বুলি ডেকায় সর্দার।

কালুডোমঃ ওরে বাব্বা, এডা বড়া নাম হামার বাবা, দাদাও বোলতে পারবেনা। হামি তোকে হাড়িয়া বোলে ডাকবে। আর শুন্, তোর কাম হোবে গঙ্গা মাইজীকে তীরমে শুয়ার চড়ানো অর সৌর কি মূর্দা পোড়ানো। পারবে না এ কাম কোরতে?

হরিশ্চন্দ্র ঃ হ্যাঁ পাইম সর্দার।

কালুডোমঃ তা হোলে চল্। হামার অনেক কাম আছে, আর তোকেও কাম বুঝিয়ে দিতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

মূল ঃ হে-ই ব্যাঘারু শ্যাকারু তোমরা উদি কোটে যান।

দোয়ারি ঃ হে দা আমরা গিরির বাড়ি যাবার ধচ্চি।

মূল ঃ ইমরা দোনো ভাই বিয়াও-বাদা নাই করে। বাপ-মাও কায়োয় নাই, জমি জোত নাই। খালি আছে একখান গাই, একখান গুয়ার গছ, আর একখান দাগিলা। একদিন উমার দোনো ভাইয়ের কেচাল লাগিল। ছোট ভাই শ্যাকারু কয় মুই ব্যাগল হোম। দাদার নগত রোম না। সেলা গিরির ওটি বিচার বসিল।

ছুকরী ঃ গিরিদা, মুই ব্যাগল খাবার চাং। তোরঠে আসিলুং তুই এলা বিচার কর।

মূল ঃ কি হে ব্যাঘারু তোর ভাই না ব্যাগল খাবার চাবার ধরচে। তুই কি কইস?

দোয়ারী ঃ মুই আর কি কইম। তোমরা যেনং ভাল বোঝেন ঐটায় করেন।

মূল ঃ কি হে শ্যাকারু তুই ফির কোনো কবু?

ছুকরী ঃ হু মোর ভাগ মোক নাগিবে।

মূল ঃ এলা তোমার সহায় সম্পত্তি কইতে তো ঐ একখান গাই, একখান দাগিলা আর একখান গুয়ার গছ। তা ঐলায় তো তোমাক দোনোজনকে ভাগ করি নেওয়া খাবে।

দোয়ারী ঃ হয় নিম। দেউনিয়া সউগলাই দুইভাগ হবে কিতায়?

মূল ঃ হ্যা ঐ গছটার দুইভাগ, গাইটার দুইভাগ, আর ঐ পুরান দাগিলাখান তো ভাগ করা না যায়, ছিড়িলে তোমরা কায়োয় পিন্দিবার পাবেন না। তায় দাগিলাখানক এবেলা ওবেলা করি তোমরা দোনোজনে পিন্দিবার পান।

ছুকরী ঃ মুই তায় গছটার আগিলাখান, গাইটার পাছিলাখান আর দাগিলাখান রাতিত নিম।

মূল ঃ কি ব্যাঘারু, তুই কি রাজি আছিস।

দোয়ারী ঃ হ্যা দেউনিয়া, ও হোবে ভালা।

মূল ঃ ঠিক আছে তায় ঐটায় কাথা রইল। (সকলের প্রস্থান)

(মূল ও দোয়ারীর প্রবেশ)

মূল ঃ এলা ব্যাঘারু দ্যাখে গুয়ার গছের গোটায়খান গুয়া, গাইটার গোটায়খান দুধ শ্যাকারু নেয়। আর রাতিত দাগিলাখান ওড়ে। এদি ব্যাঘারু জারত ঠকঠকেয়া কাঁপে।

দোয়ারী ঃ আর ওদি ব্যাঘারু গুয়ার গছের গোড়ত জল দেয়, সার দেয়, গাইটাক ঘাস খোয়ায়, আর দাগিলাখান দিনাত ওড়ে।

মূল ঃ টারির মানষিলা ব্যাঘারুর দুঙ্ক দেখিয়া আর রবার না পায়া মেলা বুদ্ধি দেয়।

দোয়ারী ঃ ও তো কেমুন বুদ্ধি দিল।

মূল ঃ টারির আবো আসি উয়াক কয় তুই তোর ভাগেরখান থাকি মেলা কিছু করির পাবু। তুই খানিক ভাও করি চলেক।

দোয়ারী ঃ এদি ব্যাঘারু তো ভাবিয়া কুনো দিশা না পায়। আবো তুই এ একখান বুদ্ধি দে।

মূল ঃ শোনেক ব্যাঘারু, কালি সাকালে উঠিয়া তুই তোর ভাগের গুয়াগছের গোড়খান কাটির ধরিবো, গাইটাক আর ঘাস খোয়াবু না। আর দাগিলাখান বেলা থাকিতে ভিজি থুবু। এইলা কয়া আবো চলি গেইল।

দোয়ারী ঃ তা সেলা ব্যাঘারু কি করিল।

মূল ঃ সাকালে উঠিয়া আবো যেইলা কইছে সেইলায় করির ধরিল। এদি শ্যাকারু নিন হাতে উঠিয়া দেখিল ব্যাঘুরু গুয়ার গছখান কাটির ধরিছে। (দোয়ারী দা নিয়ে গাছ কাটিতে বসে)

ছুকরী ঃ হে দা তুই এইলা কি করির ধচ্চিস। গছখান কাটিস কেনে।

দোয়ারী ঃ হোই শ্যাকারু মোর ভাগেরখান মুই কি করং না করং তোর কি?

ছুকরী ঃ না না, মুই তোক গছ কাটির দিম না। (দা কেড়ে নেয়)

মূল ঃ গোয়ালিঘরত যায়া দ্যাখে গাইটার কেনেবা দুদ শুকি গেইছে।

ছুকরী ঃ হে দা গাইটাক ঘাস খোয়াইস নাই। কেনেবা দুদ দিবার ধচ্চে না।

দোয়ারী ঃ ভাইরে মোর ভাগেরখান মুই খোয়াইম কি না খোয়াইম তোর কি?

মূল ঃ সেলা শ্যাকারু আর কুনো কাথা না কয়া বাজার যায়। বাজার হাতে আসিয়া খোয়া দোয়া করিয়া রাতিত শুবার আসি দেখে দাগিলাখান ভিজা চপচপা।

ছুকরী ঃ দাদারে তুই এখান কি করলু। এলা এই জারত মুই কি করি রইম। তুই দাগিলাখান কেনে ভিজাচিস।

দোয়ারী ঃ ওবেলা মুই মোর ভাগের দাগিলাখান উড়িম না ভিজাম তোক কি কয়া বেড়াইম।

ছুকরী ঃ না, না, এইলা হবার পারে না। মুই এলায় যাম গিরিরটে, উমরায় আসি বিচার করিবে।

মূল ঃ কি হোল রে ব্যাঘারু শ্যাকারু? আরো কি হইল তোমার।

ছুকরী ঃ দেউনিয়া মোর দাদা আজি আমার গুয়ার গছটা কাটির ধরিচে। গাইটাক কালি থাকি কোনোয় খোয়ায় নাই। আজি আরো মোর ভাগের দাগিলাখান ভিজি থুইছে। আরো কইলে কয় মোর ভাগেরখান মুই কি করিম না করিম তোক কি পুছিয়া করিম। তোমরায় এলা বিচার করেন।

মূল ঃ হয় নাকি ব্যাঘারু। কাথাটা সচায়।

দোয়ারী ঃ হু দেউনিয়া, কাথাটা সচায়।

মূল ঃ দ্যাখেক শ্যাকারু মোর তো এইটে কিছু কওয়ার নাই। তোমরায় এইঢক করি জিনিসলা ভাগ করি নিছেন। এলা এইলা তোমরাই বোঝেন। মুই গেনু। (প্রস্থান)

ছুকরী ঃ দা, মোর ভুল হয়া গেইচে। মোক মাপ করি দে।

দোয়ারী ঃ শ্যাকারুরে মোর ভাই, তোক মুই মাপ না করে রবার পাম।

সপ্তম দৃশ্য

ধূর ঃ শৈব্যা রহিলেন তথা ব্রাহ্মণ আগারে
এক সের তণ্ডুল দেয় ব্রাহ্মণ তাহারে।।
বিপ্র বলে শোন শৈব্যা আমার বচন
খাইল তোমার ভাগ তোমার নন্দন।।
কালি হৈতে আমি করিব দেবার্চন
তব পুত্র পুষ্প হেতু পাঠাইব বন।।
আজ্ঞা পাইয়া রুহিদাস করিল গমন
ডাল ভাঙে ফুল তোলে কে করে বারণ।।
ডাল ভাঙা দেখিয়া মুনি কুপিল মনে মনে।
এমন কুকর্ম করে কোন জনে।।
ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন
পুষ্প হেতু আইসে হরিশ্চন্দ্রের নন্দন।।

ব্রাহ্মণের ঘরে মা জননী চণ্ডালের ঘরে বাপ
কালি যদি আইসে তবে বুকে দংশিবেক সাপ।।
(রুহিদাসের পুস্পচয়ন ও সর্পদংশন)

রুহি : উঃ, মাগো, মোর বুকোত কিসে ঠোকাইল্? উঃ, কি জ্বালা। বিষের জ্বালা আর মুই সহ্য করির পাবার ধরচুং না। মা, তুই কোটে আছিস মা, তুই তাড়াতাড়ি আইসেক। মাগো — (মৃত্যুবরণ)

শৈব্যা : রুহিত, রুহিত। কোটে বাবা তুই রুহিত। (ফুলবাগানে প্রবেশ) তুই এটি থাকিয়া আছিস্ কেনে বাবা? কেনে তুই কাতা কবার ধরছিস্ না? কাথা ক বাবা কাথা ক। এলা! তোর বুকোত এটা কিসের দাগ? হায় ভগবান এটা না সাপে ঠোকার দাগ। এলা মোর কপালোত কি হৈল বা।

গান : ও বাছা মোর রুহিদাস রে
গেলুরে গেলুরে বাছা গেলুরে ছাড়িয়া
যাবার কালে গেলু বাছা বুকত শ্যাল দিয়া।।
ছোট হাতে পুষিলুং বাছা দুদো ভাত দিয়া
যাবার সময় গেলু বাছা বুকত শ্যাল দিয়া।।
এক পাঞ্জার ভিজালুং বাছা গুয়ে আর মুতে
আর এক পাঞ্জার ভিজালুং বাছা
মাঘ মাসিয়া শীতে রে।।
মাছে চেনে জান জেওয়ারী পঙ্খী চেনে ভাল
মায়ে সে জানে পুতের বেদন
যায় বা বুকে শ্যাল রে।।

শৈব্যা : ভগবান, আজি এলা মুই কি করং? বাবা বিশ্বনাথ, তুই মোক শক্তি দে বাবা, শক্তি দে। যাং এলা মুই মোর সোনা মানিকের একটা গতি করং যায়া। (রুহিতাশ্বকে লইয়া প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

ধূর : হায় হায় রে —
এদিক দেখ শৈব্যা রানী কোনবা কর্ম্ম করে
মৃত পুত্র লইয়া যায় বারানসী ঘাটে।
কতেকদূর যাইতে শৈব্যা কতকদূর গেল
বারানসীর ঘাটে গিয়া উপনীত হৈল।।

শৈব্যা : একে তো আন্ধারী রাইত। মুই কিছুই দেখির পাবার ধরচুং না। এইটায় বুঝি শ্মশান ঘাট হবে?

হরিশ্চন্দ্র ঃ কায় তোমরা ? এত রাতি এইটে কেনে আসিচেন ? ওঃ, তোমার কোলাত মরা ছাওয়া ! দাহন করিবার আসছেন ?

শৈব্যা ঃ চুপ্। কথা কবেন না, মোর ছাওয়াটা নিন গেইচে। নিন হাতে উঠিলে মাও মাও করিয়া মোরটে খাবার চায়া জ্বালাতন করিবে।

হরি ঃ হ্যাঁ নারী, তোর ছাওয়াটা জন্মের মত নিন গেইচে। এ নিন আর কোনদিন ভাঙিবে না। এই নিনত তুইও একদিন পড়িবো। আর মুই ঐ নিন যাওয়া মানষীগুলার মাথা ফাটেয়া দেং। এই নিন মোরও একদিন পাড়িবার নাগিবে। এলা তোর ঐ নিন যাওয়া ছাওয়াটাক মোর কোলাত তুলিয়া দে; আর ঐ ঘাটের কড়ি পঞ্চাশ কাহন গনিয়া দিয়া কান্দিতে কান্দিতে বাড়ী চলি যা।

শৈব্যা ঃ মোক খানিক দয়া কর চণ্ডাল। মোরটে এক কানা কড়িও নাই চণ্ডাল। মোক তোমরা খানিক দয়া কর। মোক খানিক দয়া করো।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দয়া ! না না নারী, মুই তোক দয়া করির পাইম না। হ্যাঁ, দয়া একদিন মুই করিচুং, ঐ দয়া কাংও কোনদিন করে নাই। মানষিক দয়া করিয়া আজি মুই ঘাটের চণ্ডাল।

শৈব্যা ঃ চণ্ডাল, তোমরা মোর ছাওয়াটাক দয়া করিয়া দাহন কর চণ্ডাল। তার বদলে মুই মোর কাপড়ের অর্দ্ধেক তোমাক ছিড়িয়া দিম।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এইটা হয় না নারী, পঞ্চাশ কাহনের কম এক কানাকড়িও মুই নিবার পাইম না। এইটা মোর মালিকের হুকুম।

শৈব্যা ঃ ওঃ প্রভু রাজা হরিশ্চন্দ্র, তোমরা আজি কোটে আছেন ? দেখিয়া যাও আজি তোমার রানী শৈব্যার কি কোপাল।

গান ঃ ও প্রভু মোর কি হৈল কপালে
কোটে আছেন প্রভু হরিশ্চন্দ্র দেখা দেও আসিয়া
আসিয়া যে দেখ মোরা তোর নন্দন।।
অযোধ্যায় ছিলুং মুই রাজার রানী
মোরে দেখি ঠাট্টা করে ঘাটের পাটনী।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ (স্বাগত) কায় ইংয়ায় ? মোর পরিচয় তো কাংয়োয় জানে না। ইংয়ায় জানলেক কেমন করিয়া ? তা হৈলে ইংয়ায় কি শৈব্যা ? আর ইংয়ার কোলার ছাওয়াটা মোর আদরের বেটা রুহিদাস ? আকাশ তুই ধর্ম নে, কর্ম নে, ইহকাল নে, পরকাল নে। তুই মোক এক ঝলক আলো দে। মুই একবার ভাল করিয়া দেখিয়া নেং ইংয়ায় কায় ? (আলোর ঝলকানি) শৈব্যা ! শৈব্যা !

শৈব্যা ঃ হায় হায় মোর কপালোত আজি এই আছিলো ? আজি ঘাটের চণ্ডাল মোর রূপতে মজিল ?

হরি ঃ না না শৈব্যা। মুই তোর রূপ দেখিয়া মজোং নাই। সোমদত্ত রাজার কন্যা তুই, তোর নাম শৈব্যা। তোক মুই বিয়াও করিচুং। তোর আর মোর পুত্রের নাম রুহিদাস। বিশ্বামিত্র মুনিক মুই সসাগরা পৃথিবী দান করিচুং।

শৈব্যা ঃ মহারাজ, মহারাজ এলা আমার কি দশা হবে প্রভু।

হরিশচন্দ্র ঃ দুঃখ করিস্ না শৈব্যা। রাজ্য গেইচে, পুত্র গেইল আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি হবে। আয় আমার সোনা মানিকোক চিতাত তুলিয়া দিয়া আমরাও চিতাত আগুনোত ঝাঁপ দিমু।

ধূর ঃ তখন চন্দন কাষ্ঠে সাজাইল চিতা।
মধ্যেতে রাখিল পুত্র পাশে পিতামাতা।।
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিলেন চিতাতে
হেন কালে ধর্মরাজ আসিল সাক্ষাতে।।

হাঁক (ধূর)ঃ দিয়া ধন রে ক্যানে কাড়িয়া নিলে রে
মায়ের কোলা করিয়া খালি, দিয়া ধন রে।।
তখন চন্দন কাষ্ঠের সাজাইয়া চিতা
মইধ্যতে রাখিল পুত্র পাশে পিতামাতা।।

হরিশচন্দ্র ঃ শৈব্যা, চিতা সাজা হয়া গেইল।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশচন্দ্র, মিছায় রাজ্যশাসন করিয়া মোর জনম কাটিয়া গেইল। সংসার মায়াত পড়িয়া জপঃ তপ সউগ নষ্ট হয়া গেইল। তুই তোর রাজ্য ফিরিয়া নে হরিশচন্দ্র।

হরি ঃ মুনিবর, রাজ্য নিয়া মোর কি লাভ হবে? আমার পুত্র আমাক ছাড়িয়া চলি গেইচে। কার জন্যে বাদে রাইজ্য আর সিংহাসন ফিরিয়া নিম মুনিবর?

বিশ্বামিত্রঃ চিন্তা করিস না হরিশচন্দ্র। এলায় মুই তোমার পুত্রক বাঁচেয়া দেং। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।

রুহিদাস ঃ মা, মা, বাবা বাবা।

বিশ্বামিত্রঃ হরিশচন্দ্র, তুই এলা তোর মাইয়া ছাওয়াক নিয়া অযোধ্যা যায়া আগের নাখান রাজ্য শাসন কর। আর মুই তপস্যা করিবার বাদে চলি যাং।

হরিশচন্দ্র ঃ না মুনিবর, মোর আর রাজ্যের প্রতি কুনো মোহ নাই। আর মোর অযোধ্যাও ফিরিয়া যাবার মন নাই।

(ধর্ম ও ইন্দ্রের প্রবেশ)

ধর্ম ঃ না হরিশচন্দ্র, তুই অমত করিস্ না। তোর রাজ্য তুই ফিরিয়া নে?

হরিশচন্দ্র ঃ তোমরা কায়?

ধর্ম ঃ মুই কালুডোমের ছদ্মবেশধারী ধর্মরাজ। তুই কত বড় সত্যবাদী তাক পরীক্ষা করিবার বাদে মুই পৃথিবীত আসিচুং।

ইন্দ্র ঃ হরিশ্চন্দ্র মুই দেবরাজ ইন্দ্র। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরি মুই শৈব্যাক কিনিচুং। চান্দের কলঙ্ক আছে, কিন্তু মাও শৈব্যার কোন কলঙ্ক নাই। তুই তোর মাইয়া ছাওয়াক নিয়া অযোধ্যা ফিরিয়া যায়া সুখে শান্তিত রাইজ্য শাসন কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ঠিক আছে মুনিবর, তোমার আদেশ মুই মাথা পাতি নিলুং। তোমরা সগায় মোক আশুর্বাদ করো।

সংগ্রহসূত্র ঃ সবিতা দাস (৫৬) ভাটিবাড়ি,
জলপাইগুড়ি, তাং-১৭.০৫. ২০০৯।

কুশান

হরিশচন্দ্রের দান

বন্দনা

মূল ঃ আঃ হা হা- আ হা হা- আ হা হা- এ হে হে হে
আইসেক মাও মোর সরস্বতী।
ওহো রে মাও মোর সভার ভিতর
প্রথমে বন্দনা করি কৈলাস ভবন।
তারপরে বন্দনা করি শিবেরো চরণ।
শিবের ঘরনি বন্দং মাও ভগবতী।
তাহার দুই কন্যা বন্দং রে লক্ষ্মী-সরস্বতী।
ওহে রে মাও মোর লক্ষ্মী আরো সরস্বতী।
আইসেক মাও মোর সরেস্বতী রথে করিয়া ভর ।
জৈ যোগাড়ে নামিয়া আইসেক মা মোর সভার ভিতর ।।
মোর সভা ছাড়িয়া যদি মা অইন্যে সভা যাবু ।
আর কিছু কিরা না দেং মা ধর্মের মাথা খাবু ।।

ভাংতি ঃ আইসেক মা মোর সরস্বতী মা
মোক যদি লজ্জা দিস মা ভরা সভার মাঝে ।
তুইও একদিন লজ্জা পাবু মা দেবসভার মাঝে ।।
তুই বলিস ছাড় ছাড়, মুই না ছাড়িম ।
বাজন নুপুর হয়া চরণে বাধিম ।।
আইসেক মা মোর সরেস্বতী মা।
এ হে হে হে —

মূল ঃ আদি কাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার ।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যাজে রাজ্যভার ।।
অরন্য কাণ্ডতে সীতা হরিল রাবন ।
কিস্কিন্ধায় বালিবধ সুগ্রীবের মিলন ।।
সুন্দরকাণ্ডেতে হৈল সাগর বন্ধন ।

লঙ্কাকাণ্ডে উভয়পক্ষে বাজিল মহারন ।।

উত্তরকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ ।

সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ ।।

এতক্ষনে কাণ্ডের কথা হইল সমাপন ।

কুশান গানের কাথা করিব আরম্ভন ।।

ভাংতি ঃ এ হে হে হে - ও হো হো

মূল ঃ বন্দনা গানের কথা রইল ভালে ভালে

পালাগান প্রকাশিত করিব এখনে

কি করিবে বিশ্বামিত্র মুনি কুন সে কর্ম্ম করে

ভাংতি ঃ হায় রে—

মূল ঃ হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে ।

হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যা নগরে ।।

পর বধু হরি, হরিবীজ রাজ্য করে ।

তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ।।

একদিন সভাতে বসিল সুরপতি ।

পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী ।।

নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ ।

একবার করিলেক তারা তালভঙ্গ ।।

দেখিয়া করিল কোপ দেব-পুরন্দর ।

অভিশাপ দিল পঞ্চ কন্যার উপর ।।

ভাংতি ঃ হায় হায় রে—

প্রথম দৃশ্য

নর্তকীগণঃ সখি সখি, চল আমরা মুনির তপোবনত ফুল তুলির যাই। দেখ দেখ কি সুন্দর করিয়া ফুল ফুটিছে। নেও সগায় মিলি ফুল তুলি।

(নর্তকীগণ ফুল তুলিয়া প্রস্থান করিল)

বিশ্বামিত্রঃ কায় আসিয়া মোর বাগানত ফুল তুলিছে।আর মোর ফুলের ডালগুলাও ভাঙ্গিয়া ফেলাইছে। মুই খানেক ধ্যান করিয়া দেখং কায় ভাঙ্গিছে মোর ফুলের ডাল। (ধ্যান করে) ওঃ স্বর্গের নর্তকী, যায় যায় মোর বাগানের ফুলের ডাল ভাঙ্গিছেন তাক তাক মুই অভিশাপ দিলুং তোমরা লতা পাতাত বন্দি হন ।

সখিগণ ঃ সখি, সখি আজি যাবেন না। (ফুল তুলির আসিল)

১ম সখি ঃ সখি, সখি আজি আমরা সগায় লতাপাতাত ক্যানে বন্দী হইলোং ।

২য় সখি ঃ সখি, সখি আজি আমার কপালোত কি হবে উপায় ।

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্রঃ হু, তোমরায় ভাঙিছেন মোর ফুলের ডাল। কন, কন তোমরা ক্যানে মোর ফুলের বাগানত ঢুকিছেন, ফুলের ডাল ভাইংছেন। আজি থাকো এলা তোমরা লতাপাতাত বন্দী হয়া। হা-হা-হা—

৩য় সখি ঃ মুনিবর তোমরা আমাক মুক্তি দেও। যান না মুনিবর। কয়া যাও আমরা কি কেমন করি মুক্তি পামো ।

বিশ্বামিত্রঃ তোমার মুক্তির একখান উপায় আছে। হরিশ্চন্দ্র রাজা যেলা শিকার করির আসিবে, উয়ার পরশনে সেলা তোমার মুক্তি হবে।

সখিগণ ঃ কোটে রাজা হরিশ্চন্দ্র, কোটে রাজা হরিশ্চন্দ্র। একবার আসিয়া আমার বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর।

গান ঃ ওহো মুনিবর ক্ষমা কর মোরে ।

মুনি ঃ না, না । তোমারলার ক্ষমা হবে না ।

সখিদের গান ঃ হস্ত ধরং পায় পড়ং মুনিবর মিনতি চরনে
দয়া করে ক্ষমা কর অবলা জনারে
ওহো মুনিবর ক্ষমা কর মোরে ।

মুনি ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ । তোমাক বন্দি করি যেমন রাখিচুং, মুক্তির পথও রাখিচুং। এলা রাজা হরিশ্চন্দ্র তোমাক মুক্তি দিবে। (প্রস্থান)

সখিগণ ঃ (চিৎকার) কোটে রাজা হরিশ্চন্দ্র (দুইবার)। একবার আসিয়া আমার বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিশ্চন্দ্র ঃ কোটে আছেন সইন্য-সামন্ত, দেওয়ান-কোতোয়াল হাতি ঘোড়া সাজান আজি মুই শিকার করির যাইম।

সখিগণ ঃ কোটে আছেন রাজা হরিশ্চন্দ্র। একবার আসিয়া আমাক মুক্ত কর। রাজা হরিশ্চন্দ্র ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দেওয়ান— কোতয়াল! কায় মোর নাম ধরি ডেকাইল। চল চল দেওয়ান কোতয়াল খানিক দেখি আসি ।

সখিগণ ঃ কোটে আছেন রাজা হরিশ্চন্দ্র (দুইবার)। একবার আসিয়া আমার বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কায়, কায় তোমরা ?

সখিগণ ঃ আমরা স্বর্গের নর্তকী। তোমরা আমার বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর। তোমরা ছুইলে আমরা বন্ধন জ্বালা মুক্ত হমু।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তায় নেও মুই তোমাক ছুলুং, আজি থাকি তোমরা মুক্ত। কোটে দেওয়ান কোতয়াল সব কিছু সাজান আমরা এলা রাইজ্য ফিরি যামো । (প্রস্থান)

(তপোবনে মুনির প্রবেশ)

মূল ঃ প্রাতঃকালে আইলেন গাধির নন্দন ।
না দেখিয়া কন্যাগনে ক্ষুন্ন হৈল মন ।।

মুনি ঃ কায়— কায় আসিয়া মুক্তি দিলেক। (ধ্যান করিয়া) হু এ্যালা সেনে মুই বুঝিবার পালুং রাজা হরিশ্চন্দ্র আসিয়া নর্তকীলাক মুক্তি দিছে। আজি মুই যাইম রাজা হরিশ্চন্দ্রক দেখিম উমায় কতযোকন দানী ।

তৃতীয় দৃশ্য

মূল ঃ অতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি চলিল সত্ত্বর।
উত্তরিলা গিয়া শীঘ্র রাজার গোচর।।
মুনিরে দেখিয়া রাজা কৈল অভ্যর্থন।
আসুন আসুন বলিয়া দিল বসিতে আসন।।

মুনি ঃ কোটে— কোটে রাজা হরিশ্চন্দ্র ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, মুনিবর আসিলেন মোর রাজবাড়ি। মোর এই জীবন ধন্য হয়া গেল।

মুনি ঃ মুই এইটে তোর নগত গল্প করির আইসোং নাই।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তোমরা মোক কি কবার চান।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র মুই শুনিচুং তুই বোলে দানীরাজা। মুই যে দান চাইম সেই দান তুই দিবার পাবু তো?

হরিশ্চন্দ্র ঃ কন কন মুনিবর, তোমরা মোরটে কি দান চান।

বিশ্বামিত্রঃ মুই দান চাওয়ার আগত তোক প্রতিজ্ঞা করা খাবে। মুই যে দান চাইম সেই দানে দেওয়া খাবে।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তোমরা যে দান চান মুই সেই দানে দিম।

বিশ্বামিত্রঃ তার আগত সত্য করা খাইবে।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি।

তোমার কথা লঙ্ঘন করিলে প্রাণে ফাটি মরি ।।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র গোটায় রাইজ্য মোক দেওয়া খাবে ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ঠিক আছে মুনিবর, আজি থাকি মোর গোটায় রাইজ্য তোমাক দান করিলুং।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র তুই মোক দান দিলু, এই দানের তো দক্ষিণা দিলু না ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মা দেওয়ান, তুই রাজভাণ্ডার থাকিয়া দানের দক্ষিণা আনি দেক ।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র! এই রাইজ্য, রাজসিংহাসন, রাজকোষ সবলায় না এলা মোর। কোটে থাকি দিবু দানের দক্ষিণা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এলা মুই কোটে থাকি দানের দক্ষিণা দিম মুনিবর?

বিশ্বামিত্রঃ মুই তোর কোন কাথা শুনিবার চাং না, তুই এই রাজ্য থাকি চলি যা।

চতুর্থ দৃশ্য

মূল ঃ বিশ্বামিত্রের বাক্যমত সূর্যবংশ ধন।

দারা পুত্র সহ কাশী করিল গমন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ শৈব্যা মোর তো এলা কিছুই নাই, কি দিয়া মুই মুনিবরক দানের দক্ষিণা দিম।

শৈব্যা ঃ স্বামী দাসীর হাটত মোক তোমরা ব্যাচে দেন। ফির ঐ টাকা দিয়া তোমরা মুনি দক্ষিণা দেন।

হরিশ্চন্দ্র ঃ না, শৈব্যা না, মুই এইটা করির পাম না।

শৈব্যা ঃ এইটা ছাড়া যে আর কুন রাস্তা খোলা নাই প্রভু।

মূল ঃ স্ত্রী লইয়া যায় রাজা হাটের ভিতরে।

দাসী কে কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে ।।

এক বিপ্র ছিল হাটে পণ্ডিত সুজন ।

তার একটি দাসীর ছিল প্রয়োজন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মাইয়াক বেচি চাইর কোটি স্বর্ণমুদ্রা পালুং। মুনিবর তোমরা এইলা গ্রহণ করেন।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা, চাইর কোটি তো দিলু। আরো তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা যে বাকি আছে।

খোসা ঃ ও মোর কালারে কালা

ও পারে কালা বান্দিলুং বাড়ি

কলা গাড়িলুং কালা সারি সারি

কলা বাগিচায় ঘিরিয়া নিল মোর বাড়ি।

আগদুয়ারী কালা কুকুর ভোকে

মন কয় মোর যেন বন্ধু আইসে

দেখং বন্ধু মোর কার বা বাড়িত বইসে ।
ও মোর কালারে কালা
যেদিন যাইম মুই বাপের বাড়ি
মইষা গাড়ি কিংবা গরুর গাড়ি
ভাই বোন মোর কান্দি রবে মোর সারি সারি
কুনদিন ফিরিয়া আসিম বা মুই বাপের বাড়ি
ও মোর কালারে কালা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ অ্যালা মুই নিজে বেচি হয়া তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা মুনিক দিম। কায় নফর কিনিবে?

কালুডোম ঃ মোর একখান নফরের দরকা। কোটে নফর?

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুই-এ নফর। তোমরা মোক কিনিবেন কি?

কালুডোমঃ চেহারাখান না বেশ ভালয় দেখির ধরচুং, তা কত দাম দেওয়া খাবে তোমাক ?

হরিশ্চন্দ্র ঃ মোক তোমরা তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিবেন।

কালুডোমঃ তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা! হাসালেন বায়। ঠিক আছে, মোরও তো একটা নফরের খুবে দরকার। নে তিন কোটি স্বর্ণমুদ্রা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ আজি মুই নিজে বেচি হয়া ঋন দিলুং মুই শোধ করিয়া।

বিশ্বামিত্রঃ ঠিক আছে রাজা, আজি হাতে তুই মুক্ত।

হরিশ্চন্দ্র ঃ আজি থাকি মুই নিজে চণ্ডাল ব্যাশ ধরিয়া চণ্ডালের কাম বেড়াইম করিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রাক্ষ্মণ ঃ রুহিত-রুহিত।

রুহিদাস ঃ ঠাকুর বাবা, কেনে ডেকান মোক।

ব্রাক্ষ্মণ ঃ মুই পূজা করিম, বাগান থাকি ফুল তুলি আন।

খোসা ঃ বাপ কি এবার মঙ্গা গেলো রে
আশ্বিন কার্তিক মাস
চোতুর্দিকে হাহাকার ঘরে ঘরে উপাস ।
আইলের কচু খুড়িয়া খাইলেক কলার মুড়ার উষা
ভাইরে এইবার মরনদোশা
প্যাটের ভোকে বুড়ি সরি রে, হইলো সর্বনাশ ভাইরে
বাপকি এইবার মঙ্গা গেইল রে।

রুহিদাস ঃ বাঃ ফুলবাগানোত ভাল ভাল ফুল ফুটি আছে। মুই ফুল তুলি নিয়া যাইম।

(ফুল তুলিয়া প্রস্থান)

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্রঃ আরো কায় মোর বাগানত ঢুকি ডালপালা ভাঙিছে, আরও দেখং কায় বা সগলায় ফুল তুলি নিয়া গেইসে। আজি মোর হাতত রক্ষা নাই। কালি যায় ফুল তুলিবার আসিবে তাক সাপে দংশন করিবে ।

(ফুল তুলির যায়া রুহিদাসক সাপে কামড়ায়)

রুহিদাস ঃ আঃ মা—

গান ঃ কোটে আছিস মা জননী দেখা দেও আসি
সাপের বিষে মাও মোর প্রানো যায় চলিয়া ।
কোটে আছিস মাগো দেখ আসিয়া মা ।
আঃ মুই যে বিষের জ্বালা সহ্য করির পাং না । আঃ আঃ (মৃত্যু)

ব্রাক্ষ্মণ ঃ শৈব্যা, তোর ব্যাটাটা কুন বেলায় সেই ফুল তুলির গেইসে এলাও কোনো পাত্তা নাই। দ্যাখেক দেখি রাস্তাত কোন ছাওয়ার নাগাল পায়া খেল খেলিবার ধচ্চে।

শৈব্যা ঃ রন ঠাকুর, মুই এলায় দেখি আইসোং।

ব্রাক্ষ্মণ ঃ যা যা, পচ করি দেখি আয়।

(শৈব্যার বাগানে প্রবেশ)

শৈব্যা ঃ রুহিদাস— রুহিদাস, তুই কোটে বাবা? (দেখির পায়া) এটে কেনে এমন করি পড়িয়া আছিস বাবা। বাবা রুহিদাস। (কান্দন)

ব্রাক্ষ্মণ ঃ কি হইচে তোর ছাওয়াটার? আরে ইনাক তো সাপে কামড়াইছে। ছাওয়াটাছো কত্তনে মরি গেইছে। শৈব্যা এটে বসি থাকি আর কি হবে তুই ইয়াক শ্মশানোত নিয়া যা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(রুহিদাসক নিয়া শৈব্যার শ্মশানোত প্রবেশ)

শৈব্যা ঃ কায় আছেন তোমরা শ্মশানোত ?

হরিশ্চন্দ্র ঃ কায়, কায় ডেকায়? আজি ক্যানে শ্মশানোত শোনং বেটিছাওয়ার কান্দন, কায়— কায় তোমরা?

শৈব্যা ঃ মুই। মোর কাহোয় নাই, মুই খিব বিপদত পড়িচুং মোর ছাওয়াটা সাপের কামড়ে মরি গেইছে। তোমরা এই ছাওয়াটাক দাহন কর ।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তা মাও, তোমার ছাওয়াক দাহন করিলে কড়ি লাগিবে। কড়ি না দিলে মুই দাহন করির পাইম না।

শৈব্যা ঃ মোরটে তো কড়ি নাই। তোমরা দয়া করিয়া মোর ছাওয়াটাক দাহন কর।

হরিশ্চন্দ্রঃ কড়ি ছাড়া মুই দাহন করির পাইম না ।

শৈব্যা ঃ ও ভগবান মুই এলা কোটে যাম, কারটে যাম। স্বামী দেখ তোর ছাওয়া আজি শ্মশানোত। তুই কোটে রাজা হরিশ্চন্দ্র ? (কান্দন)

হরিশ্চন্দ্র ঃ হরিশ্চন্দ্র! তোমরা কায়? তার আগত কন তোমার পরিচয়।

শৈব্যা ঃ মুই অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্রের রানি। মোর নাম শৈব্যা আর মোর এই বেটার নাম রুহিদা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ শৈব্যা, তুই মোক চিনিবার পাইস নাই। ভাল করি দ্যাখেক মুই রাজা হরিশ্চন্দ্র।

শৈব্যা ঃ স্বামী ! (কান্দন)

হরিশ্চন্দ্র ঃ চল শৈব্যা, আমরা আজি কুল্লায় হারাইচি, আমার মানিক রুহিদাসও আমাক ছাড়ি গেইছে । আমরাও এই চিতাত আজি মরিম, চল।

শৈব্যা ঃ চল স্বামী, তায় হবে। (রুহিদাসক চিতাত তুলি দেয়)

(বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র। রুহিদাসক আর ছোবা দিস না। মুই উয়ার জীবন দান করিম।

(রুহিদাসের জীবন দান)

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, তোমাক মুই কি কয়া ধন্যবাদ জানাং । এলা মোর আর কিছু কুনো দুঃখ কষ্ট রইল না গুরুদেব। তোমরা আমাক আশির্বাদ করো ।

বিশ্বামিত্রঃ রাজা হরিশ্চন্দ্র তোর দানে মুই সন্তুষ্ট। তোর রাইজ্যপাট সউগে তোক ফিরি দিলুং । আর আজ থাকি তুই হলু মহাদানী রাজা হরিশ্চন্দ্র ।

সংগ্রহসূত্র ঃ বাঁশী গিদাল (৫৬), শালবাড়ি,
কোচবিহার, তাং-০৮.০৪.২০০৯।

কুশান

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার শ্মশান মিলন

বন্দনা

মূল ঃ আঃ হা হা আ হা হা আ হা হা এ হে হে হে

আইসেক মাও মোর সরেস্বতী মা।

আইসেক মাও মোর সরেস্বতী রথে করিয়া ভর।

জৈ যোগাড়ে নামিয়া আইসেক মা মোর সভার ভিতর।।

মোর সভা ছাড়িয়া যদি মা অইন্যের সভা যাবু।

আর কিছু কিরা নাদোং ধর্মের মাথা খাবু।।

ভাংতি ঃ হে মা সরেস্বতী তোক স্মরণ করং মা

তুই একবার অধম সন্তানোক কৃপা কর মা।।

তুই ছাড়া মোর কোন উপায় নাই।

আইসেক মা মোর সরেস্বতী মা

মোক যদি লজ্জা দিস মা ভরা সভার মাঝে

তুইও একদিন লজ্জা পাবু মা দেবসভার মাঝে।

তুই বলিস ছাড় ছাড়, মুই না ছাড়িম

বাজন নুপুর হয়া চরণে বাধিম

আইসেক মা মোর সরেস্বতী মা। এ হে হে হে —

নারায়ন বন্দনা

নমঃ নমঃ নারায়ন হে নমঃ শিরমনি

রামের গুরুর চরণ বন্দি বিশ্বামিত্র মুনি

নমঃ নমঃ নারায়ন হে নমঃ শিরমনি

তোর যন্ত্র তোর তাল উপলক্ষ্য মুই। (তাল রাখিল)

(ছুকরী নাচছে, নাচার পরে ধুয়া বন্দনা গান)

গান ঃ ও ভাইরে উত্তর বাংলার মানষি আমরা

গাই কুশান গান।

মানষি কয় আমাক উত্তর দেশি

ব্যবসা হইলেক আমার হালকৃষি,

দেশি ভাষাত কথা কই রাজবংশী জাতি

ঐ ও ভাইরে উত্তর ....কুশান গান।

হিন্দু মুসলমান আমরা ভাইরে ভাই

কুশান গানত ব্যানা বাজাই

ভুলত্রুটি মাপ করিবেন নমস্কার জানাই।

ঐ-ও ভাইরে ....গাই কুশান গান।

(মূল) ঃ ও হো আরে ও আরে ও হো আরে ও হো

(চারযুগ বন্দনা)

সইত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি বন্দং চারি যুগ

চারি যুগত দয়াল হরি ধরে নানা রূপ (২)

ও হায়রে ধরে নানা রূপ।

ভাংতি ঃ বাবারে সইত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চাইর যুগ করিছে চরাচরি

সইত্য যুগে প্রভু আমার কোন অবতার হইছে।

দোয়ারী ঃ কোন অবতার হইচে গুরুদেব।

ধুয়া ঃ সত্যযুগে হইলেন প্রভু নরসিংহ অবতার।

হিরন্নকশুপ দৈত্য করিল সংহার।।

ওহো ....

হারীতের পুত্র হরিবীজ নাম ধরে।

তার পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে।।

পর বধু হরিবীজ সেও রাজ্য করে।

বসতি করিল গিয়া অযোধ্যা নগরে।।

গান-নাচারী ঃ সোমদত্ত রাজকন্যা তার নাম শৈব্যা।

বিবাহ করিল হরিশ্চন্দ্র অতি ভব্যা।।

সুন্দরি পাইয়া রাজা আনন্দে উল্লাস।

তাহার হইল পুত্র নাম রুহিদাস।।

সুখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহিপতি।

ইন্দ্ররে লইহয়া কিছু শুনহ সম্প্রতি।।

(হাক দিয়া ভাংতি পরে ছড়াগান ও ব্যাখ্যা)

মূল ঃ বাবারে একদিন দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে ডেকে বলছে কোথায় নারদ ? নারদ কোথায়?

নারদ ঃ কেন, দেবরাজ, কিসের জন্য আমাকে সংবাদ করেছেন?

ইন্দ্র ঃ দেখ নারদ, অনেকদিন যাবৎ ইন্দ্রপুরীতে কোন আনন্দ উৎসব হয় না। তাই আমি বসন্ত উৎসবের আয়োজন করতে চাই, তাতে তোমার অভিমত।

নারদ ঃ একশ ভাগ।

ইন্দ্র ঃ তাহলে তুমি যাও, সমস্ত দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে এস এবং নৃত্য-গীতের জন্য স্বর্গের অপ্সরীদের সংবাদ দাও।

নারদ ঃ ঠিক আছে দেবরাজ, আমি এখুনি রওনা দিচ্ছি।

মূল ঃ একদিন সভাতে বসিল সুরপতি।
পঞ্চকন্যা নৃত্য করে প্রথম যুবতী।।
নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ।
একবার করিলেক তারা তালভঙ্গ।।
(অপ্সরাগণের নৃত্যগীত ও তালভঙ্গ)

ইন্দ্র ঃ একি একি করিলেন কন্যাগণ।
দেব সমাজে মোরে করিলে অপমান।।
আমি তোমাদেরকে অভিশাপ দিলাম —
যৌবনগর্বিতা তোরা হয়েছিস মনে।
বন্দি হয়ে থাক গিয়া বিশ্বামিত্রের তপোবনে।

কন্যাগণ ঃ চরণে ধরিয়া কন্যা করিছে ক্রন্দন।
কতদিনে হবে মোদের শাপ বিমোচন।।

ইন্দ্র ঃ বন্দিরূপে থাক তপোবনে।
মুক্ত হবে হরিশ্চন্দ্রের পরশনে।।

খোসা ঃ ও একবার আসিয়া
সোনার চান মোর যাও দেখিয়া রে
আইলোত ফোটে আলকাশিয়া দোলাত ফোটে হোলা।
ওরে বাপ মাও ব্যাচেয়া খাইচে সোয়ামী পাগেলা রে
ও একবার ....দেখিয়ারে

লোকে যেমন ময়না পোষে পিনজিরায় ভরিয়া
ও কি ওরে ঐ মতন মোর নারীর যৌবন রাখিচুং বান্ধিয়ারে
ও একবার ....দেখিয়ারে।

ধুয়া ঃ অভিশাপ পাইয়া কন্যাগণ করিল গমন।
মুনির তপোবনে গিয়া হইল দরশন।।
নিত্য সে রূপসী পুষ্প করে আহরন।
ডাল ভাঙ্গে পুষ্প তোলে কে করে বারণ।।
পুষ্প তুলিয়া কন্যা যায় নিজ ঘরে।
প্রভাতে আসে মুনি পুষ্প দেখিবারে।।
শিষ্যসহ বিশ্বামিত্র ঘুরিয়া তপোবনে।
ডালভাঙ্গা গাছ সব দেখিল নয়নে।।
এমন করিয়া গাছ ভাঙ্গে যেই জন।
আসিলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন।।
(হাক দিয়ে ভাংতি)

ধুয়া ঃ অভিশাপ দিয়া মুনি যায় নিজ ঘরে।
প্রভাতে কন্যা আইল পুষ্প তুলিবারে।।
যেই কালে কন্যা আসি ডালে ভর দিল।
অমনি লতার বন্ধন হাতেতে লাগিল।।
প্রভাতে আসি বিশ্বামিত্র তপোবনে।
কন্যা দেখি ভাবিতে লাগিল রুষ্ট মনে।।
অনেক প্রকারে মুনি করিল ভৎসন।
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন।।
এদিকার কথা রইল ভালে ভালে
হরিশ্চন্দ্র শিকারের কথা শুনি যাও সকলে।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কোথায় দেওয়ান, দেওয়ান কোথায়?

দেওয়ান ঃ কেন মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র ঃ দেওয়ান আমার মনে বড় সাধ হয়েছে মৃগয়ায় যাত্রা করব। তাই তুমি হস্তি-ঘোড়া সৈন্য সামন্ত সাজন কর। আগামী কল্য আমি মৃগয়ায় যাত্রা করব।

দেওয়ান ঃ ঠিক আছে মহারাজ, আমি তাই করছি। (রাজার মৃগয়ায় যাত্রা)

খোসা ঃ বাওই ঝাকে উড়ায় ঝাকে পড়ে আর তো বাওই ফেরে না।
বাওই পাখির মন তো পাইলাম না বিধাতারে।

মূল ঃ যাত্রা করি রাজার কুমার বাড়েয়া দিল পাও।
মাথার উপর কাল জিঠি করে পঞ্চরাও।।
তারপরে আগেয়া দেখে ভিখারিও নাওয়া।
শুকনা ডালে মরা কাষ্ঠে পড়িয়া কান্দে কাওয়া।।
তারপরে আগেয়া দেখে তেলির কাঁধে ভার।
সামনে একটা মৃতার বাড়ি কান্দাকাটি সার।।
অমঙ্গল না বুঝি রাজা করিল গমন।
বিধাতার নিরবন্ধ রাজার হইল অঘটন।।
ক্লান্ত মনে নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ।
না পাইয়া মৃগ রাজার বিচলিত মন।।
মৃগ না পাইয়া রাজা বইসে তরুতলে।
কন্যা ডাকে উচ্চস্বরে হরিশ্চন্দ্র বলে।।

কন্যাগণ ঃ কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র? একবার এসে বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দেওয়ান, দেওয়ান কোথায়?

দেওয়ান ঃ কেন মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র ঃ মনে হয়, কোন না কোন রমনী বিপদে পড়েছে। কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে।

দেওয়ান ঃ কিছু না হয় মহারাজ, খঞ্জনা পাখি আছে না ঐলা পাখি কয়— ফটিক জল, ফটিক জল।

হবিশ্চন্দ্র ঃ না দেওয়ান তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কন্যাগণ ঃ কোথায় রাজা হরিশচন্দ্র? একবার এসে বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দেওয়ান, সমস্ত তপোবন তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ কোথাও কোন রমনী বিপদে পড়েছে কিনা।

দেওয়ান ঃ নাই মহারাজ কিছুই নাই।

হরিশ্চন্দ্র ঃ দেওয়ান তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি নিজেই যাব। (কন্যাগণকে দেখিয়া) একি একি দেওয়ান, দেখতে পারছো কিভাবে কন্যাগণ লতাপাশে বন্দি হয়ে আছে।

দেওয়ান ঃ কই মহারাজ, আমি তো কিছুই দেখতে পারছি না।

হরিশ্চন্দ্র ঃ আমার আঙ্গুলের মাথায় দেখ।

দেওয়ান ঃ আঙ্গুলের মাথায় কন্যা থাকে, কই কোথায়।

হরিশ্চন্দ্র ঃ আঙ্গুলের সোজা দেখ।

দেওয়ান ঃ আচ্ছা মহারাজ, এই আঙ্গুলটার নাম কি?

হরিশ্চন্দ্র ঃ এইটার নাম ঠ্যাটা। বন্ধু-বান্ধব ভাগি-গুষ্টিকে দেখেয়া দেয় খাটা।

দেওয়ান ঃ বড়টার নাম কি?

হরিশ্চন্দ্র ঃ এইটার নাম ওর। এই আঙ্গুলে চুলকাইলে যত পাপের গোড়।

দেওয়ান ঃ তারপরেরটা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এইটার নাম মান। বিয়া করিবার সময় ইয়ার আগে পায় দান।

দেওয়ান ঃ ছোট আঙ্গুলটার নাম কি?

হরিশ্চন্দ্র ঃ এইটার নাম কোর। হিসাব করিবার সময় এইটায় হইলেক গোড়।

দেওয়ান ঃ এই মোটা আঙ্গুলটার নাম কি?

হরিশ্চন্দ্র ঃ এইটার নাম হেলা দেওয়ান। ভাত শাক খাওয়ার সময় ইয়ায় আগে মারে ঠেলা। দেওয়ান দেখ কন্যাগণ কিভাবে আর্তনাদ করছে।

কন্যাগণ ঃ কোথায় রাজা হরিশ্চন্দ্র বন্ধন জ্বালা মুক্ত কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ আমি তোমাদের বন্ধন মুক্ত করে দিচ্ছি মা। (স্পর্শমাত্র বন্ধনমুক্ত) একি একি স্পর্শমাত্র কন্যাগণ যেন কোথায় লুকিয়ে গেল। দেওয়ান, এখানে মনে হয় আর থাকা সম্ভব নয়। দেরি হলে বিপদ হতে পারে। চল দেওয়ান আমরা স্বরাজ্যে গমন করি।

ধুয়া ঃ আশ্চর্য্য দেখিয়া হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
সৈন্যসেনা লইয়া রাজা করিল গমন।।
গমন করিল রাজা কি বলিব তারে।
উপনীত হইল গিয়া অযোধ্যা নগরে।।
প্রাতঃকালে আইলেন গাধীর নন্দন।
কন্যা না দেখিয়া মুনির ক্ষুন্ন হইল মন।।
ধ্যান করি জানিলেন গাধীর নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র ছাড়াইয়া দিল কন্যাগণ।।
অতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া মুনি রাজার গোচর।।

মুনিরে দেখিয়া রাজা করে অভ্যার্থন।

মুনি ঃ শোন রাজা— আমি যে বান্ধিনু কন্যা ছাড় কি কারন।

সর্বনাশ হইবে তোমার সংশয় জীবন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মিথ্যা কথা বলব না প্রভু। আমি তাদের মুক্তি দিয়েছি। দান পূণ্য করি আপনি যে ব্রাহ্মণ।

আপনি আসন গ্রহণ করুণ।

কন্যা মোরে করিল আমন্ত্রণ।

মিথ্যা না বলিব প্রভু করেছি মোচন।।

দানপূণ্য করি প্রভু তুমি যে ব্রাহ্মণ।

আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ।।

মুনি ঃ দান! কি দান করেছ কারে দেখি তোমার মন।

আমাকে কিছু দান করতো রাজন।

হরিশ্চন্দ্রঃ যাহা চাবেন তাই দিব মুনিবর।

মুনি ঃ শোন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।

আগেতে হও তুমি সত্যে বন্ধন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য আন।

এই সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রান।।

মুনি ঃ দান করবে বলে যদি ভেবে থাকো তাহলে পৃথিবী আমাকে দান কর।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ঠিক আছে মুনিবর।

দক্ষিণ হাতে দিলাম তিন তোলা মাটি।।

মুনি ঃ রাজ যে দান দিলে তা গ্রহণ করলাম। কিন্তু দানের দক্ষিণা কই।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর চিন্তা করেন না।

দানের দক্ষিনা দিব সাতকোটি সোনা।।

মুনি ঃ বিলম্বের নাহিক প্রয়োজন।

সাত কোটি কাঞ্চন কর সমার্পন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কোথায় ভাণ্ডারি?

ভাণ্ডারি ঃ কেন মহারাজ?

হরিশ্চন্দ্র ঃ স্বর্ণ ভাণ্ডার থেকে সাতকোটি কাঞ্চন নিয়ে এস।

মুনি ঃ শোন রাজা সসাগর পৃথিবী দান করিলে আমারে।

ভাণ্ডারী কাহার ধন দিবে কো তোমারে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনির বাক্যে রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।

কর্ম্মদোষে করিলাম নিজ সর্বনাশ।।

ভাণ্ডারী ঃ হে মুনিবর করি জোড় পানি।

হরিশ্চন্দ্র ভুপে দিতে বাটি একখানি।।

মুনি ঃ সূচগ্র খননে যত উঠে বসুমতী।

বিশ্বামিত্র নাহি দেয় এই মোর নীতি।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর, আমি যে নিরাশ্রয়।

মুনি ঃ তুমি আর শৈব্যা, পুত্র রুহিদাস।

তিনজনে যাও করিতে কাশিবাস।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ঠিক আছে মুনিবর তাই হবে। আমরা এখুনি কাশি চলে যাব।

মুনি ঃ শোন হরিশচন্দ্র যশোধন। সাত দিন পরে আমার দানের দক্ষিণা সাতকোটি সোনা দিয়ে যাবে।

খোসা ঃ আই মুই সতিন দেখিয়া বসিলুং কাইং

দিন মনে না পরে রে হাতের গাইন।

একদিন যদি মরা কামাই করে

তিনদিন থাকে মরা বসিয়া

সকালে উঠিয়া আই মোর ঢাং-এর ধুরধুরি

বাসিয়া বিছিনাত কয় মোক দেখাবার করি।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কোথায় শৈব্যা, কোথায় বাবা রুহিত?

শৈব্যা ঃ কেন প্রভু? একি আজ তোমার চোখে জল কেন দেখছি, প্রভু। কোন অমঙ্গল হয়েছে নাকি।

হরিশ্চন্দ্র ঃ সত্যে করিয়া বন্ধন।

সসাগরা পৃথিবী নিল গাধীর নন্দন।

শৈব্যা ঃ কি সর্বনাশ করেছেন প্রভু। কিন্তু এই অযোধ্যায় কি মোদের ঠাঁই হবে না।

হরিশ্চন্দ্র ঃ না, শৈব্যা না। এই অযোধ্যায় যে মোদের থাকার অধিকার নেই। আমি যে সমস্ত রাজ্য ব্রাহ্মণকে দান করেছি।

শৈব্যা ঃ কিন্তু এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াব প্রভু।

হরিশ্চন্দ্র ঃ তুমি, আমি, পুত্র রুহিদাস।

তিনজন করিতে হইবে কাশিবাস।।

চল, শৈব্যা আর দেরি নয় এই মুহূর্তে আমরা রওনা দেই। (প্রস্থান)

খোসা ঃ দিন চারিক প্রান পতিধন ভাত রান্ধিয়া খান
দাদা আসছে নাইয়োর নিবার নাইয়োর যাবার চাং
বহুদিনে আসছে দাদা যদি বা না যাং গোসা হয়য়া
যাবে দাদা কাথাটা কেমন করিয়া কং। (দুইবার)
গ্যাল্লেস করি আধ বোতল তেল মাথাত দিলুং ঢালি
আয়না দেখি সিতা পারিলুং খোপা বান্ধিলুং তুলি।
স্নো পাউডার দিলুং কত মুখত লাগাইয়া
কাম সিন্দুরের ফোটা দিলুং কপালোত ন্যালভ্যাল করিয়া।
গোড়া ঐ দিন চারিক ....কেমন করিয়া কং
হাটিও যাং ফিরিও চাং পাচ ফিরি দ্যাখোং
মাথার ঘোমটা ফেলেয়া দাদাক ইশারা করি কং
বাড়ি হইতে আইসোং দাদা হাটেক ধীরে ধীরে
গুয়াপানের টোপলাখুনা ছাড়িচুং বিছানার উপরে।
গোড়া ঐ দিন চারিক ....যাবার চাং
আধ ঘাটাত খুইয়া দাদাক দৌড়ি গেলুং বাড়ি
বাড়ি যায়া দ্যাখোং স্বামীধন বিছানাত আছে পড়ি।
বগোলত বসিয়া এলা কং ধীরে ধীরে
দুই-চারদিন ও স্বামীধন থাকেন বোল কোনরকমে
গোড়া ঐ দিন চারিক ....কেমন করিয়া কং।)

ধুয়া ঃ বিধাতারে, সাত দিনের পথ রাজা বহিয়া চলিল।
পথ আগুলিয়া রাজা কহিতে লাগিল।।

মুনি ঃ কোথায় যাও হরিশ্চন্দ্র যশোধন।
দিয়া যাও মোরে সাত কোটি কাঞ্চন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর একটু অপেক্ষা করুন। এখনি আমি আপনার ঋন শোধ করে দিব। বল শৈব্যা, কিভাবে আমি ব্রাহ্মণের ঋন থেকে মুক্তি পেতে পারি।

শৈব্যা ঃ শোন শোন প্রভু নিবেদি তোমারে।
আমারে বিক্রি কর হাটের মাঝারে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কি বলছ শৈব্যা, তোমায় বিক্রি করব। তোমায় বিক্রি করে কোন প্রাণে বেঁচে থাকব।

শৈব্যা ঃ তাছাড়া যে কোন উপায় নেই প্রভু।

ধুয়া ঃ বিধাতারে, স্ত্রী নিয়া চলে রাজা হাটের ভিতর।

দাসি কে কিনিবে বলি ডাকে উচ্চস্বরে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ওগো নগরবাসীগণ।

কারো আছে কি দাসীর প্রয়োজন।।

ব্রাহ্মণ ঃ ওহে পুরুষ রতন।

দাসীর মূল্য নিবে কতেক কাঞ্চন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ নাহি জানি মিথ্যা প্রবঞ্চনা।

দাসীর মূল্য চাই চার কোটি সোনা।।

ব্রাহ্মণ ঃ শোন তবে পুরুষ রতন।

দাসীর মূল্য ধর চার কোটি কাঞ্চন।।

ধুয়া ঃ বিধাতারে, দাসি লইয়া যায় বিপ্র আপনার বাস।

মায়ের আচল ধরি কান্দে রুহিদাস।।

অঞ্চল ধরিয়া পুত্র যায় গড়াগড়ি।

ছাড় ছাড় বলিয়া বিপ্র দেখাইলেন বাড়ি।।

(রুহিতনকে প্রহার করে)

রুহিতনের গান ঃ মেরো না, মেরো না ঠাকুর ও গো ধরি তব পায়।

ব্রাহ্মণ ঃ এই তোর নাম কি? তোর বাবার নাম কি?

রুহিতন ঃ আমি রাজার নন্দন, শোন হে ব্রাহ্মণ

এই যে আমার মা, পিতা মম হরিশ্চন্দ্র, অযোধ্যায় ধাম

রুহিদাস মম নাম।

আমি রাজার ....এই যে আমার মা।

শৈব্যা ঃ গোসাই, বিনা পণে আপনি আমার পুত্রকে নিন।

ব্রাহ্মণ ঃ শোন দাসী দুইজনের জন্য এত তণ্ডুল আমি কোথায় পাব।

শৈব্যা ঃ আমাকে যে অন্ন দিবেন তার অর্ধেক দিব আমার বালকে।

মূল ঃ দাসী নিয়া যায় বিপ্র আপনার স্থানে।

স্বর্ণ নিয়া গেল রাজা মুনি বিদ্যমানে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর এই ধরুন দানের দক্ষিণা।

মুনি ঃ হরিশ্চন্দ্র! সাতকোটি সোনার এক রতিও আমি কম নিব না।

ধুয়া ঃ বিধাতারে, একথা শুনিয়া মহাপ্রমাদ ভাবিল।
শিরে হাত দিয়া রাজা হাটি চলি গেল।।
হাটখানি বৈসে বারাণসির গোচরে।
তৃণ গলে বান্দি গেল হাটের ভিতরে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ সামান্য বিলম্ব করেন মুনিবর। ওগো হাটের নগরবাসী কারও কি নফরের প্রয়োজন আছে।

কালুহাড়ি ঃ আমার আছে নফরের প্রয়োজন। তোমার মূল্য নিবে কতেক কাঞ্চন।

হরিশ্চন্দ্র ঃ জানি না মিথ্যা প্রবঞ্চনা, আমার মূল্য নিব তিন কোটি সোনা।

কালুহাড়ি ঃ এই ধর তোমার তিন কোটি সোনা।

হরিশ্চন্দ্র ঃ ওগো একটু অপেক্ষা করুণ। আমি ঋণ দায়গ্রস্থ। ঋণ দায় থেকে মুক্ত হয়ে আসি।

মূল ঃ সাত কোটি সোনা দিল মুনির গোচরে।
দান পেয়ে গেল মুনি অযোধ্যা নগরে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ মুনিবর এই ধরুন আপনার দানের দক্ষিণা, আমায় ঋণ থেকে মুক্তি দিন।

মুনি ঃ যাও হরিশ্চন্দ্র, আজ থেকে তুমি ঋণ দায় মুক্ত। (প্রস্থান)

কালুহাড়ি ঃ ওহে পুরুষরতন কি নাম তোমার, তুমি কার নন্দন।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কেউ হরিশ্চন্দ্র, আবার কেউ ডাকে হরি, কেউ ডাকে হরে।

কালুহাড়ি ঃ আজ থেকে তোমার নাম হইল হরিদাস। হরিদাস শোন বারানসীর তীরে শুকরগুলো রাখবে আর বারানসীর তীরে যত মরা দাহ করা হবে, প্রতিটি মরার পঞ্চাশ কাহন করে নিবে।

ধুয়া ঃ হায়রে বুঝিয়া কর্তব্য কর্ম হাড়ি গেল ঘরে।
ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শুকরে।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ শোন শুকরগণ, মম বাক্য করিবে পালন
দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে।
তোমাদের মলমুত্র মুছিব কি করে।।
এক সত্য পালিবে সকল শুকরে।
মলমুত্র পরিত্যাগ করিও অন্তরে।।

ধুয়া ঃ উভ ঝুটি চুল বান্দে রাজা উচ্চ করে।
বারাণসীর তীরে নিত্য দৌড়াদৌড়ি করে।।

রাজাবেশ রাজদণ্ড সবে দূরে গেল।
পাটনির বেশ রাজা তখনি পড়িল।।
এদিককার কথা রইলেক ভালে ভালে।
শৈব্যা রুহিতের কাহিনী শুনে নেও সকলে।।

খোসা ঃ হাতত কাটারি মুখত পান
যায় যায় কইনাটা গঙ্গায় সিনান
যায় যায় কইনাটা যায় যায় সিনান করিবারে
হরিনল কানাইয়ারে।
যেলা কইনাটা সিনান করে
হরিনল কানাইয়া ঘোড়াটা বান্ধে রে
ঘোড়াটা বান্ধিল বটবৃক্ষের তলে
হরিনল কানাইয়ারে।
ও হরিনল কানাইয়ারে
কয়া পাঠান বাপ-মার আগে মুই তো চলি যাং রাজার ঘরত রে।
ঘোড়ায় না চড়িয়া মারিল চাবুকের বারি
হরিনল কানাইয়ারে।

ব্রাহ্মণ ঃ শোন দাসী, এক সের তণ্ডুল তিন বারে তিন পোয়া খায় তোমার পুত্র। কাল থেকে বাগানে পুষ্প তুলতে যাক পুত্র তোমার। বাড়াইয়া দিব তণ্ডুল কিছু আর।

শৈব্যা ঃ ঠিক আছে প্রভু।

রুহিদাস ঃ মা, মা আমি মুনির তপোবনে পুষ্প তুলতে যাব।

শৈব্যা ঃ তাড়াতাড়ি চলে আসিস বাছা।

ধুয়া ঃ স্বর্ণ সাজি লইল হাতে স্বর্ণের আকুড়ি।
বিশ্বামিত্রের তপোবনে যায় গড়াগড়ি।।
ডাল ভাঙ্গি ফুল তোলে আপনার মনে।
একদিন এল মুনি বন ভ্রমণে।।

বিশ্বামিত্র ঃ একি একি কেবা মম তপোবন করিছে ছারখার। ধ্যান করিয়া জানিব এখন। (ধ্যান করে) হু হয়েছে স্মরন। পুষ্প আহরণে আসে হরিশ্চন্দ্র নন্দন। দানিব অভিশাপ—
বিপ্রের ঘরে জননী, হাড়ির ঘরে বাপ।

কল্য আসিলে তার বুকে মারিবে সাপ।।

ধুয়া ঃ বিধাতারে, এত বলি অভিশাপ দিল তপোধন।

রাত্রিকালে হেথা শৈব্যা দেখিছে স্বপন।।

প্রাতঃকালে প্রকাশিত সূর্যের কিরণ।

পুষ্প তুলিতে রুহিত করিল গমন।।

রুহিত ঃ মা, আজকে আমি পুষ্প তুলতে যাব। আমায় স্বর্ণসাজি দাও।

শৈব্যা ঃ তুই আজ পুষ্প তুলতে যাসনে বাবা। রাত্রে যে আজ আমি কুস্বপন দেখেছি।

রুহিত ঃ মা, পুষ্প তুলতে না গেলে যে ব্রাহ্মণ তোমায় অধিক অন্ন দিবে না। ব্রাহ্মণ যে কটু কথা বলবে। না আমি কোন বাধাই মানব না। (পুষ্প তুলিতে গমন)

খোসা ঃ ওরে চিকন কালা ছাড়িয়া দে মোর শাড়ির আচল যায় বেলা।

ছাড়িয়া দে মোর শাড়ির কানিরে কালা, ঝারিয়া বান্ধুং মাথার চুল।

তুই কালা মোর মারিলু রে জাতি কুল

গোড়া ঐ ওরে চিকন ....যায় বেলা।

জলভরা কলসি কাঁখে রে কালা গগনে দুপুর বেলা

ছাড়িয়া দে মোর শাড়ির আঁচল যায় বেলা। (দুইবার)

ধুয়া ঃ বিধাতারে, না মানিল শিশুপুত্র মায়ের বচন।

কুসুম তুলিতে যায় রাজার নন্দন।।

নানা জাতি পুষ্প তোলে যাহা লয় মন।

শ্রীফলে ছিল সর্প করিল দংশন।।

রুহিত ঃ মা, মাগো (চিৎকার করিয়া) প্রাণ যায় মা — আমায় দেখে যাও — আমায় একটু জল দাও মা, মা— আঃ। (মৃত্যু)

ব্রাহ্মণ ঃ দাসী, দাসী কই তোমার পুত্র কোথায়। কতখনে হবে আমার দেবপূজা।

শৈব্যা ঃ ব্রাহ্মণ করি নিবেদন।

দেখিয়া আসি কোথায় আমার নন্দন।।

(ডাকিতে ডাকিতে তপোবনে প্রবেশ) বাবারে রুহিত, রুহিত কোথায় আছিস একবার সাড়া দে বাবা। রুহিত- রুহিত (দেখিয়া) ঐ তো পুত্র মোর বৃক্ষতলে ঘুমিয়ে পড়েছে। (গায়ে নাড়া দিয়া) রুহিত রুহিত-কথা বল বাবা। কথা বলছিস না কেন বাবা। রুহিত রুহিত— একি রুহিত কথা বলছে না কেন তবে কি গত রাত্রের স্বপ্ন সত্য হল। রুহিত-রুহিত। (কান্না)

গান ঃ বাছাধন ধনরে মা বলিয়া একবার ডাকো

একা মায়ের একা পুত্র বাছা আর তো কেহ ওরে নাই।
তুই বাছা চলিয়া গেইলে রে মা বলিবার কেহ নাই।
বাছাধন ধনরে মা বলিয়া একবার ডাকো। (দুইবার)

ধুয়া ঃ পুত্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন।
ক্রন্দন শুনিয়া তবে কহিছে ব্রাহ্মণ।।

ব্রাহ্মণ ঃ মরা কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন।
মরিলে অবশ্য জন্ম জন্মিলে মরণ।।
মরা নিয়া যাহ তুমি বারানসীর তীরে।
কাষ্ঠ চিতা করি অগ্নি জ্বাল ধীরে ধীরে।।
(পুত্র কোলে কাঁদিতে কাঁদিতে বারানসীর তীরে শৈব্যার গমন)

ধুয়া ঃ বিধাতারে, মরা লইয়া গেল শৈব্যা বারানসীর বাস।
হাতেতে মুদ্‌গর লইয়া আসে হরিদাস।।
হরিদাস বলে আমি মরা দাহ করি।
মরা প্রতি পঞ্চাশ কাহন দিতে হবে কড়ি।।

হরিশচন্দ্র ঃ এত রাত্রে কে কাঁদে, না জানি কোন রমনীর কপাল ভেঙেছে। হায়রে বিধাতা, হায়রে নিষ্ঠুর ভগবান, কেনই বা জন্ম দিয়েছিস? কেনই মায়ের কোল শূন্য করে দিলি? যাই একটু এগিয়ে দেখি। (দেখিয়া) কেবা, কেবা তুমি রমনী— পুত্র কোলে করিছ ক্রন্দন।
মম বাক্য করহ শ্রবণ।।
আমি মরা দাহ করি।
মরা প্রতি পঞ্চাশ কাহন দিতে হবে কড়ি।।

শেব্যা ঃ শোন শোন, ওহে ঘাটের পাটনি।
চিরিয়া নেও মোর বস্ত্রের অর্ধখানি।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ চিরিয়া লইব বস্ত্র তোমার।
অন্যের ঘাটেতে লইয়া পোড়াও কুমার।।

শৈব্যা ঃ (কাঁদতে কাঁদতে) কোথায় প্রভু হরিশ্চন্দ্র রহিলে কোথায়। আসিয়া যে দ্যাখো প্রভু আপন তনয়।

হরিশ্চন্দ্র ঃ কে, কেবা তুমি রমনী আমার নাম ধরে ডাকছো। আমি রাজা হরিশ্চন্দ্র।
প্রিয়ে বলি তব ঠাঁই।
পাসরিলে সকলি কিছুই মনে নাই।।
সোমদত্ত রাজকন্যা শৈব্যা তব নাম।

তোমারে বিবাহ প্রিয়া আমি করিলাম।।

রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন।

মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন।।

শৈব্যা : প্রভু, স্বামী আপনি।

হরিশ্চন্দ্র : দাও শৈব্যা, দাও রুহিতকে আমার কোলে দাও।

ধুনা : পুত্র কোলে লইয়া রাজা করিছে ক্রন্দন।

কোথা চলে গেলে বাপু রুহিত নন্দন।।

গায়া : দিয়া ধন রে কেন হরিয়া নিল রে

মায়ের কোল খালি করিয়া রে। দিয়া ধন রে।

ডাল ভাঙ্গি জমিনে পড়ে সেও না নেয় জোড়া।

জন্মিয়া মরে পুত্র মায়ের কপাল পোড়া।

দিয়া ধন রে কেন হরিয়া নিল রে মায়ের কোল খালি করিয়া রে।

দিয়া ধন রে।

ধর্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ

অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যাজিব জীবন। দিয়া ধন রে।

ধুয়া : চন্দন কাষ্ঠেতে অগ্নি জ্বালাইল চিতা।

মাঝখানে নিজ পুত্র পাশে মাতা পিতা।।

যেইও কালে অগ্নি দিবেন চিতাতে।

হেনকালে ধর্মরাজ কহেন সাক্ষাতে।।

হরিশ্চন্দ্র : শৈব্যা একমাত্র পুত্র রুহিদাসকে যখন হারিয়ে ফেলেছি তখন আমাদের দুজনার জীবন রেখেই বা কি লাভ। অগ্নি চিতা প্রজ্জ্বলিত করে এক চিতায় আমাদের প্রাণ বিসর্জন দিব।

(চিতায় আগুন জ্বালাইল। রুহিতকে চিতায় তুলে দিবে এমন সময় ধর্মরাজ সাক্ষাতে বলছে)

ধর্মরাজ : অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যাজিবে জীবন।

জিয়াইয়া দিব আমি তোমার নন্দন।।

ধুয়া : হস্তপদ বুলাইল বালকের গায়।

বিষজ্বালা দুরে গেল চক্ষু মেলি চায়।।

কালুহাড়ি : শোন হে রাজন। তোমায় আমায় স্বর্ণদায় ঘুচিল এখন।

ব্রাহ্মণ : শোন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।

তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চন।।

হরিশ্চন্দ্র : গোসাই গো করি নিবেদন।

ব্রহ্মস্য লইব বল কিসের কারণ।।

ধুয়া ঃ রানীর হাতে যে কঙ্কন ছিল।

তাহা দিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল।।

বিশ্বামিত্র ঃ শোন হরিশ্চন্দ্র যশোধন।

নিজ রাজ্যে রাজা করহ গমন।।

হরিশ্চন্দ্র ঃ গোসাই করি নিবেদন।

কেমন করিলা রাজ্য কহ তপোধন।।

বিশ্বামিত্র ঃ সেকথায় নাহি প্রয়োজন।

স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজ্যে করহ গমন।।

ধুয়া ঃ প্রসন্ন মানস মুনি প্রফুল্ল বদন।

স্ত্রী পুত্র লইয়া রাজার শ্মশানে মিলন।।

হরি বল রাম বল বল মুকুন্দ মুরারি।

পালাগান হইল শেষ বল হরি হরি।।

হরি হরি বল ভাইরে আইসা বারে বার।

আর কি ভরসা কর ভবে আসিবার।।

রাম বল কৃষ্ণ বল বল রাধা কান্তেশ্বরী।

বদন ভরিয়া সবাই বল হরি হরি।।

সংগ্রহসূত্র ঃ একেশ্বর মান্তা (৬৫), কাঁঠালগুড়ি,

রসিকবিল, কোচবিহার, তাং-২৫.০৫.২০০১।

লোকনাটকে দোয়ারী চরিত্র

লোকনাটকে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র

লোকনাটকে ছুকরী নৃত্য

লোকনাটকে পুরুষের নারীবেশে অভিনয়

লোকনাটকে মঞ্চসজ্জা

লোকনাটকে গ্রীনরুম বিশিষ্ট আসরসজ্জা

লোকনাটকে সাধারণ চরিত্র

লোকনাটকে পুলিশ চরিত্র (আধুনিক পোশাক পরিহিত)

লোকনাটকে ডাকাত চরিত্র (আধুনিক পোশাক পরিহিত)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ ঃ

আসগর সৈকত সম্পাদিত	ঃ	বাংলার লোকসংস্কৃতি যাত্রাশিল্প, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল২০০২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা - ১০০০।
ইসলাম, মযহারুল	ঃ	'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন', ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ওয়াহাব, আবদুল	ঃ	বাংলার লোকবাদ্য, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০৬, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
খাঁ চৌধুরী, আমানতউল্লা আহমদ	ঃ	কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কোচবিহার স্টেট প্রেসে মুদ্রিত, রাজশক-৪২৬।
খাঁ, ড. কৃষ্ণা	ঃ	'বাংলার লোকসাহিত্য ঃ মূলপাঠ নির্ণয়', ২০০৪, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯, ।
ঘোষ, অজিতকুমার	ঃ	'নাটকের কথা', পঞ্চম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ২০০৬, সাহিত্যলোক, কোলকাতা - ৬।
	ঃ	'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা।
ঘোষ, প্রদ্যোত	ঃ	'লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা পুনর্বিচার', প্রথম প্রকাশ নববর্ষ ১৪১০, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯।
চক্রবর্তী, বরুণকুমার	ঃ	'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস', প্রথম সংস্করণ ১৯৭৭, পঞ্চম সংস্করণ ২০০৮, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯।
	ঃ	'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে', প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, বুক ট্রাস্ট।
	ঃ	বাঙলার লোকক্রীড়া, পুস্তক বিপণি, ২০০১, কোলকাতা-০৯।
চক্রবর্তী, বরুণকুমার ও বন্দোপাধ্যায়, সুমহান সম্পাদিত	ঃ	'লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান', প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ২০০৯, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার, কলকাতা - ৯।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার সম্পাদিত : 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০২, অপর্ণা বুক ডিসস্ট্রিবিউটার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর, ২০০৭, কলকাতা -৯।

চট্টোপাধ্যায়, তুষার : 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান', প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৩৯২, তৃতীয় সংস্করণ মাঘ ১৪০৮, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা -৭৩।

: 'লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা', বৈশাখ ১৪০৮, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা -৭৩।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতি কুমার : সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৬, চতুর্থ প্রকাশ ২০০৩, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, কলকাতা - ২৯।

চৌধুরী, কমল সংকলিত ও সম্পাদিত : দার্জিলিঙের ইতিহাস, প্রথম দে'জ সংস্করণ জানুয়ারী ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩।

চৌধুরী, দুলাল (সম্পাদনা) : 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, আকাদেমি অব্ ফোকলোর, কোলকাতা ।

চৌধুরী, সুবোধ : 'ডোমনি', জানুয়ারী ১৯৯৯, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা - ৬৮।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ : 'বাংলার ব্রত', প্রথম প্রকাশ ১৩৫০, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১২, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ। সংখ্যা ৪, বিশ্বভারতী।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : 'লোকসাহিত্য', প্রথম প্রকাশ ১৩৯৯, বিশ্বভারতী।

দাশ, ড. নির্মল : 'উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ', প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, সাহিত্য বিহার, কোলকাতা।

: লোকভাষা থেকে ভাষালোক, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩।

দাস, ধ্রুব : 'ভারতের মহিলা লোকনাট্য', ২০০১,পুস্তক বিপণি, কোলকাতা -৯ ।

: 'ভারতের লোকনাট্য', প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, প্রতিভাস।

দে, ড. আশিসকুমার, মিত্র, ড. সনৎকুমার, সম্পাদিত : লোকভাষা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪০০, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯।

দে সরকার, দিগ্বিজয় : 'কোচবিহারের লোকনাটক', অনিমা প্রকাশনী, ১৯৯৭, কোলকাতা -৯।

নাথ, ড. সঞ্জীব : 'বাংলার লোকনাট্য স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য', অপর্ণা বুক ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কোলকাতা - ৯, ২০০৩।

পাল, অনিমেষকান্তি : 'লোকসংস্কৃতি', প্রথম সংস্করণ - ১৯৯০, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬, প্রজ্ঞা বিকাশ, কোলকাতা -৯।

পাল, শ্রীফণীগোপাল : 'উত্তর বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮১, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

পাল, ড. ফণী : গম্ভীরার কবি-শিল্পীদের জীবন কথা ও সংগীত সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ ১৫ আগস্ট, ২০১২, বলাকা, এ.ডি. ৩৭১ রবীন্দ্রপল্লি, কৃষ্ণপুর, কলকাতা-১০১।

পালিত, হরিদাস : 'আদ্যের গম্ভীরা', প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৩, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বর্মণ, সত্যেন্দ্রনাথ : উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কথ্যভাষা ঃ ইতিবৃত্ত, সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ, ১৯৮৩, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্মা, সুখবিলাস : 'জাগগান', প্রথম প্রকাশ ১৯৭৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯।

বসাক, ড. শীলা : 'বাংলার ব্রত পার্বণ', প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ০৯।

বসু, নগেন্দ্রনাথ : বিশ্বকোষ, নবম ভাগ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮।

ভকত, দ্বিজেন্দ্রনাথ : 'কুশান গান,' ধুবুরী শাখা সাহিত্য, অসম সাহিত্য সভা, ২০০১।

ভট্টাচার্য, আশুতোষ : 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ১৯৮২, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৫, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী - ১১০০১৬।

: 'বাংলার লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ১৯৫৪, এ মুখার্জী কোং প্রাঃ লিঃ, কোলকাতা।

: 'বাংলার লোকসাহিত্য', তৃতীয় খণ্ড ঃ গীতি ও নাট্য, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কোলকাতা, ১৯৬৫।

	ঃ	'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খন্ড, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড।
	ঃ	'বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৪, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
ভট্টাচার্য, গৌরীশঙ্কর	ঃ	'বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা', প্রথম প্রকাশ ১৯৭২, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৪০৭, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা-৭।
ভট্টাচার্য, মলয়শঙ্কর সম্পাদনা	ঃ	'গৌড়ের ইতিহাস'-রজনীকান্ত চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩।
ভৌমিক, দেবাশীষ	ঃ	উপভাষা ঃ মিশ্রণ ও বিলুপ্তি উত্তর দিনাজপুর জেলা, প্রথম প্রকাশ ৬ নভেম্বর ২০০৮, অর্পিতা প্রকাশনী, ১ কে. রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২।
ভৌমিক, ড. নির্মলেন্দু	ঃ	'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫।
ভৌমিক, নির্মলেন্দু	ঃ	'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩।
মজুমদার, মানস	ঃ	'লোক ঐতিহ্যের দর্পণে', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩, কোলকাতা - ৭৩।
	ঃ	'লোক-সাহিত্য পাঠ', দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯, কোলকাতা -৭৩।
মজুমদার, শিশির	ঃ	'উত্তরবঙ্গের লোকনাট্য, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬।
	ঃ	'লোকনাট্য-নাটক কথা', দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, কলকাতা- ৭৩।
মিত্র, শ্রী সনৎকুমার	ঃ	'লোকসংস্কৃতি চর্চার মেথডলজি, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ০৯।
মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত)	ঃ	'বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ', প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা -৯।
	ঃ	'বাংলা লোকভাষা বিজ্ঞান', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ২০০১, কোলকাতা - ৩৪।
মুখোপাধ্যায়, ড. দুর্গাশঙ্কর	ঃ	'নাট্যতত্ত্ব বিচার', প্রথম করুণা সংস্করণ ২০০৩, তৃতীয় মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০১০, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯।

রায়, ছন্দা ও রায়, বিশ্বনাথ : 'বাংলা লোকনাট্য নাটক ও রঙ্গমঞ্চ', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত প্রকাশিত, ২০০৬।

রায়, ড. গিরিজাশঙ্কর : 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭০, দ্বিতীয় প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ ১৯৯৯, এন. এল পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, আসাম।

রায়, পুষ্পজিৎ : গম্ভীরা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রায়, ধনঞ্জয় : খন, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০০৯, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

রায়, নীহাররঞ্জন : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৪১৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩।

রায়চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র : পশ্চিম দিনাজপুর জেলার উপভাষা, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৫, নির্মল মুদ্রণ।

শ', ড. রামেশ্বর : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা, তৃতীয় সংস্করণ ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯।

সরকার, পবিত্র : 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', প্রথম প্রকাশ - ১৯৯১, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, চিরায়ত প্রকাশক, কোলকাতা - ৭৩।

সিদ্দিকী, ড. আশ্‌রাফ : 'লোক-সাহিত্য', প্রথম খন্ড, গতিধারা প্রথম প্রকাশ আগষ্ট ২০০৮, গতিধারা, ৩৮/২ ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

সিদ্দিকী, ড. আশরাফ : ' লোকসাহিত্য' (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৬৩, পুনর্মুদ্রণ মে ২০০৮, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ।

সেনগুপ্ত, পল্লব : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, কোলকাতা - ৯।

সেন, ড. সুবোধ : 'উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রথম প্রকাশ, ২০০২।

: 'বাংলা লোকনাটকের উৎসকথা সংজ্ঞা ও পরিচয়', ভাস্বতী প্রকাশন, কোলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৪০, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯।

সেন, সুকুমার সম্পাদিত ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত, চৈতন্যচরিতামৃত লঘু সংস্করণ, ১৯৬৩, সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী।

হালদার, গোপাল ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৬, চতুর্থ সংস্করণ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, মুক্তধারা, ২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

ইংরেজি গ্রন্থ ঃ

Bhattacharya, Asutosh ঃ 'Folklore of Bengal', National Book Trust, India, 1978.

Barma, Sukhbilas ঃ 'Indian Folk Music Bhawaiya :Ethnomusicological Study, Global Vision Publishing house, New Delhi-02, India, 2004.

Chatterji, Sunitikumar ঃ 'Kirata-Jana-Kriti, First Published in 1951, Second reprint 2007, The Asiatic Society, 161 Park Street, Calcutta.

ঃ 'The Orgin and Development of the Bengali Language', Rupa & Co., Calcutta - 1926.

District Census ঃ Census 1971, Coochbehar District, Handbook Directorate of census operation West Bengal, Bidhan Press, Kolkata -6. ১৬

Frazer Sir James Jarj ঃ 'The Golden Bough', Vol-1, Part -I, Third edition 1911, Reprinted 1955, Macmillan & Co. Ltd., London, New York.

Hunter, W.W. ঃ 'A Statistical Account of Bengal', Vol-X, First Published 1877, D.K. publishing house, Delhi - 110035.

Malley LSSO ঃ 'Bengal District Gazetters Darjeeling', First Published 1907, Logos press 4788-90/23, Ansari Road Darya Ganj, New Delhi - 10002.

Sanyal, Charuchandra ঃ 'The Rajbansis of North Bengal', First Published in 1965, reprint in 2002, The Asiatic Society, Kolkata - 16.

The New Encyclopaedia ঃ Vol- 7, 15th edition, Founded 1768, Britanica William Benton Publisher 1943-1973.

বাংলা পত্র-পত্রিকা ঃ

উত্তরবঙ্গ লোকযান সংবাদ ঃ লোকনাট্য সংখ্যা - ১, ১৩৯১, সম্পাদক শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ।

ঃ লোকনাট্য সংখ্যা - ২, ১৩৯২, সম্পাদক শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ।

ঃ লোকনাট্য সংখ্যা - ৩, ১৩৯৫, সম্পাদক শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ।

ঃ লোকনাট্য সংখ্যা - ৪, ১৩৯৬, সম্পাদক শিশির মজুমদার, রায়গঞ্জ।

একটি সমুদ্রপাখি বিহান ঃ Vol - 5, No. 1, 2002 এবং Vol - 6, No. 1, 2003, সম্পাদনা জগন্নাথ ঘোষ।

কিরাত ভূমি ঃ তুলসী লাহিড়ী স্মরণ সংখ্যা, জলপাইগুড়ি, ১৯৯৮।

গননাট্য ঃ সম্পাদক - শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯২।

গম্ভীরা পত্রিকা ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, আষাঢ় ১৩২২।

চতুষ্কোণ ঃ বিশেষ নাটক সংখ্যা, সম্পাদক - শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, কোলকাতা, বৈশাখ, ১৩৮৩।

নকশিকাঁথা ঃ ডা. প্রভাত ঘোষ সম্পাদিত, মাঘ ১৪১৬-আষাঢ় ১৪১৭, কলকাতা।

মধুপর্ণী ঃ উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, ১৩৮৪।

ঃ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, ১৯৯৬।

ঃ জলপাইগুড়ি সংখ্যা, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, ১৯৮৭।

ঃ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, ১৯৯৬।

ঃ মালদহ জেলা সংখ্যা, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য, বালুরঘাট, ১৩৯২।

লোকসংস্কৃতি গবেষণা	ঃ	গ্রামীণ নাটক ঃ আলোচনা ও সংগ্রহ বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক সনৎকুমার মিত্র, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪০৩, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ।
লোকশ্রুতি	ঃ	২য় ও ৩য় সংখ্যা, ১৯৮৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।
	ঃ	সংকলন সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৬, সম্পাদক-সন্তোষ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।
	ঃ	ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।
	ঃ	সপ্তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ।
	ঃ	প্রবন্ধ সংকলন, সম্পাদনা - মিহির ভট্টাচার্য, ১৯৯৯, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
স্মরণিকা	ঃ	লোকসংস্কৃতি উৎসব, ১৯৮৩, উদ্যোক্তা, উত্তরবঙ্গ লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র।
স্মারক পুস্তিকা	ঃ	আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতি, ১৯৯৫।

নির্ঘন্ট

অ

অঙ্কিয়া নাট - ৯০, ৯১

অতি চালাকের গালাত দড়ি - ৮৯

অন্যব্রত - ১৬

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ১৬, ১৭, ১৯

অশাস্তোরী - ৭৯

অশ্বমেধ যজ্ঞ - ৯১

আ

আমরুল বাদশার পালা -১৯

আর্য্য চৌধুরী - ৬৪

আলকাপ - ১৫, ৩১, ৩৯, ৪০, ৪১, ৫৯

আলঙ্গীর বাদশা - ১৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য - ১৩, ১৮, ২১, ৩২, ৩৭, ৪৪, ৪৬, ৫১, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ১০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় - ৩৮

আসাম বুরুঞ্জি - ৪

আহারা - ৩৮, ৬০, ৬২

আঁড় বাঁশী - ২৯

উ

উঠানী - ২৩

উধব- ৪৮, ৯৯

এ

এইচ. এ. বার্ণওয়েল - ৬৪

ঐ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ - ৩

ও

ওসিয়া - ৩৭, ৯৯, ১০৯

ওস্তাদ - ৩২

ক

কপ্যা/সঙাল - ৪০

কবিগান - ৪০

করিম বাদশা - ৫২

কলসী/ টেমকীর গান - ৭৭, ৭৯

কাঙ্গভাঙ্গা-ঢেঙ্‌পাড়ীর পালা - ৮৫

কাতিপূজা - ১৫, ১৭, ২০

কানাই ধামালি - ৩০

কাপ - ৩৯, ৪০, ৪১

কামেই মোর অধিকার - ৭৭

কামদেবতা/কামঠাকুর - ২৮, ২৯

কামলিঙ্গ - ২৯

কারেন্টসরী - ৭৩

কাড়া-নাকাড়া - ৪৯, ৫০

কেচ্ছাধর্মী/কিচ্ছাবন্দী গান - ৭৯, ৮৪, ৮৫

কুঞ্জ পালা - ৪৯, ৭৯

কুশান - ১৩, ১৫, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫১, ৬০, ৮৯, ৯১, ৯৮, ১০২, ১২১, ১২৩, ১২৪

কুশীলব - ৩২, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪০, ১০৯

কেউটিয়া আবন - ৪৭,৪৮

কেচ্ছা/কিচ্ছা - ৪৩, ৬৩, ৭২, ৭৮, ৮৪

কেলাচাও - ৭৭

কৈবর্ত - ৪৭

কৌম সমাজ - ৭৪

ক্যাঙবাজানী দল - ২৯

খ

খন - ১৫, ৩১, ৩৬, ৩৭, ৫৯, ৬০, ৬৯, ৭০, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৮৫, ৯১, ১০৯, ১১৭, ১২৪, ১২৫

খলিফা - ৪১, ৬৩

খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ - ১৮, ২৭

খাতা হুলি - ৮৪, ৮৫

খাস পাঁচাল - ১৫, ৩৩, ৮৫

খিসা খন - ১৫, ৩৭, ৭২, ৭৩

খেচেরী - ২২

খেমটা - ৪০
খেলটুক - ৩৫
খোট্রা - ৪২
খোল - ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪৫, ৪৬, ৫২,১১১
খোশোমামি-ডেবরা - ৭০, ৭২
খোসা গান - ১৮, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৫
খ্যামটালী দল - ২৯
গ
গমীরা - ১৫, ৩১, ৩৫, ৩৬
গম্ভীরা - ১৫, ৩১, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫৯, ৬০, ৯৯, ১০৮, ১০৯, ১১৬, ১২৪, ১২৬
গিরথানী - ২২
গিল্টিমিএগ্রা ভেজালশ্বরী - ৩৩, ৮৫
গ্রিনরুম - ৩৭, ৪৫, ১০৭, ১০৮
গীদাল - ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৮৪, ৯৮, ১০০, ১০৯
গীদালি - ১৭, ১৮, ২০
গীয়ারসন - ৪১, ১১৮
গুঞ্জরাবিবি ও সাত সতীন - ৫২
গোপাল দাস -১১১
গোপীনাথ - ৬৪
গোবিন্দলাল শেঠ - ৬৪
গোষ্ঠ - ৭০, ৭২
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য - ১৩
ঘ
ঘট ভরা - ৩৮, ৬০
ঘরজেয়া/ঘজ্জেয়া - ৮৪, ৮৫, ৮৮
ঘরবৈঠানী - ২৩
চ
চকচুন্দি/চোকচুন্দি - ৩৫, ৭১, ৭২
চাইলোন - ২০
চামর - ২৭, ৪৬
চারইয়ারী - ৩৮, ৩৯
চাঁচোর - ৪১
চিতানি - ৩৮
চিত্তাশ্বরী পালা - ৮৬
চুমানী - ২২
চোরচুন্নি - ১৫ ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৮, ৫৯
ছ
ছড়াদার - ৯৮
ছুকরী - ১৯, ৩২, ৪৬, ৫২, ৯৯, ১০০
ছোকরা - ৪১, ৪৩, ৬২, ৯৮
ছোট তামাসা - ৩৮, ৬০
জ
জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর - ৬
জহুত - ১৯
জাগ গান - ২৪, ২৮, ২৯, ৩০
জাগানী - ২২, ২৩
জ্ঞানবালা ও পটপটি গোঁসাই - ৩৩
জিতাষ্টমী/জিতুয়া অষ্টমী - ৪৭, ৭৭, ৭৯
জুড়ি - ৫১
জেমস জর্জ ফ্রেজার - ২৫
ঝ
ঝাঁকসু - ৪১
ঝিল্লি - ৫০
ড
ড. অজিতকুমার ঘোষ - ১২, ৯৮
ড. গিরিজাশঙ্কর রায় - ১৯, ২১
ড. চারুচন্দ্র সান্যাল - ২১, ২৫, ৮২
ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় - ১২
ড. দুলাল চৌধুরী - ২৪
ড. নির্মল দাশ - ১১৪, ১১৬
ড. নীহাররঞ্জন রায় - ৩, ৮
ড. প্রদ্যোত ঘোষ - ৬৩
ড. শিশির মজুমদার - ৭৩
ডাক - ৫০
ডাকালী ডাংগা - ৩০
ডা. ক্যাম্বেল - ৫
ডাঙ্গুয়া প্রথা - ৮৫, ৮৬, ৮৭
ডুগি/ডুগি তবলা - ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪৯, ১১০, ১১১

ডুয়েট - ৩৮, ৩৯
ডোমনী - ১৫, ৩১, ৪১, ৪২, ৪৩
ঢ
ঢাকের গান - ৮৩, ৮৪
ঢাকোশোরী - ৭৩
ঢুলকি - ৪৯
ঢুলুয়া - ২৯
ঢেঁকিমঙ্গল - ৬০
ত
তাম্রলিপ্ত -৩
তিনবিঘা - ৬
তিস্তাবুড়ি - ২১
তেভাগা - ৬, ৭৪
থ
থাপুরি - ২২
থারো হুলি - ৭৯
দ
দনুজমর্দন দেব - ৫
দর্জেলামা - ৫
দশ নম্বর আড়ি ঢেনা অধিকারী - ৮৭
দানবীর রাজা হরিশ্চন্দ্র - ৪৬, ৯৩
দীনেশচন্দ্র সরকার - ৪
দুর্গাবলী - ৬৯
দেউসি/দেউড়ি - ৩৫
দেউনিয়া - ৮৫
দেহর - ২৩
দোতরা - ১৩, ১৫, ৫১, ৫২, ১১০
দোহার - ১৮, ৩২, ৪৬, ৫০
দোয়ার - ১৯
দোয়ারী - ৪৬, ৫২, ৮৪, ৯১, ৯৮, ৯৯, ১০৯
ধ
ধর্মী রাজার পালা - ১৯
ধাম - ৩১, ৩২, ৮৪
ধুয়া - ৩৬, ৩৮, ৪৭
ধ্রুব দাস - ১৪
ধোকরা - ২৬
ন
নটুয়া - ১৩, ১৫, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৬০, ৭১, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৯৯, ১০২, ১১০, ১১৯, ১২৩, ১২৪, ১২৫
নয়নশোরী - ৩৭
নাচারি/লাচারি - ৪৩,৪৬
নামানী - ২২, ২৩
নাহিড়ী - ১০৯
নির্মলেন্দু ভৌমিক - ১৩, ১৭, ২১, ২৩, ২৬, ২৭, ৩২, ৩৩, ৪৭, ৮৩, ৯০, ১২০
নিরু - ৬৪
নীলধ্বজ - ৪
প
পঞ্চরস অপেরা - ৪১
পড়ুয়া - ৭৮
পাটপালা - ৮৪, ৮৫
পাথারিয়া - ২২, ২৩
পালাটিয়া - ১৫, ৩১, ৫৯, ৬০, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১০৯, ১২০, ১২৪
পুষ্পজিৎ রায় - ৬২, ৬৯
পূজা ওচানি - ১৮
পৈলসাঞ্জুর সংসার - ৮৮
ফ
ফকির - ১৯
ফাকরি - ৪৮, ৪৯, ৭৯, ৮০
ফাত্রা - ১০৯
ফ্যাসা - ৪৪, ৪৫, ৯০, ৯১, ৯৩
ফুলবাড়ানি - ১৮
ফুলভাঙা - ৬০
ব
বতেয়া - ৪৮, ৫০, ৯৯, ১০৯, ১১০
বরুণকুমার চক্রবর্তী - ১২, ১৩
বর্মোশোরী - ৩৭, ৭২

বসানী - ২২
বড় তামাসা - ৩৮, ৬০, ৬২
বালাবতী - ২০
বাঁশপূজা - ২৮
বিরোক/বিরোথ - ৪৯, ৭৯
বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী - ৫২
বিষহরি/বিষহরা - ১০, ১৩, ৪৪, ৪৬; ১০২
বুকানন হ্যামিল্টন - ৪
ব্যানা/ বেনা/বীণা - ৪৪, ৪৫, ১১০, ১১১
বোলওয়াহি - ৪২
বোলবাই - ৩৮, ৬০, ৬২, ৬৩
বোলোভাই - ৭০, ৭২
বৈঠকী গান - ৪০
বৈরাতী -২০
বৈষ্টমের ডারা - ৮৪
ব্যানা কুশান - ৯১, ১১১

ভ

ভাঙ্তি - ৪৭
ভাঙ্গা টিনের বাঁকালি - ৩০
ভুরাভাসানী - ২৩
ভুষাকালি - ১০৮
ভেদেইখেলি - ২১
ভেস্টেশ্বরী পালা - ৩৩, ৮৫
ভেড়াছুবার গান - ৮৩

ম

মটরবাবু - ৬৪
মদনকাম - ১০, ১৫, ২৮, ৯১
মধুমালা-মদনকুমার - ৫২
মরুচমতি - ৫২
মশান নাচ - ৬০
মাইয়্যাবন্ধকী/মায়্যাবন্ধকী - ৩৭, ৭৩
মাঙ্গন - ২৩, ২৭, ২৮, ২৯
মাদারপীর - ১০
মাধবকন্দলী - ৯০
মান পাঁচালী - ৮৫
মানস মজুমদার - ১০৬, ১১০, ১১২
মারেয়া - ১৭
মালাগিরিবর পাঁচালি - ৩০
মাশান - ১০
মাড়েয়ানী - ২১, ২২, ২৩
মুখা নাচ - ৬২
মুখাবাঁশী - ২৯, ৪৬
মুদ্দা - ৬৩
মেজর ফ্রান্সিস জেনকিংস - ৪
মোটা হুলি - ৮৩
মোহম্মদ সূফী - ৩৮, ৩৯, ৬৪, ৬৫
মোহম্মদ সোলেমান - ৬৪
মোড়ল - ৪১, ৬২, ৮৭

য

যশমন্ত সাধুর পালা - ১৯
যোগিনীতন্ত্র - ৪

র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ৫৮
রং পাঁচাল/রঙ্ পাঁচাল - ১৫, ৩২, ৩৩, ৮৫
রাধা ধামালি - ৩০
রাবান - ১৫, ৪৩, ৪৭, ৪৮
রামেশ্বর শ - ১১৪
রিচ্যুয়াল - ৫৭, ৬২
রূপারায় - ২৭

ল

লগ্নি - ৭০, ৭২
লঙ্কা বান্ধা - ৫০
লঙ্কার গান - ৫০
লবকুশ পালা - ৪৬
লক্ষ্মণের শক্তিশেল - ৪৬, ৯২
লাবার/ল্যাবার - ৪১, ৪২, ৪৩
লোকনিরুক্তি - ১১৫

শ

শঙ্করদেব - ৯০, ৯১
শরৎ দাস - ১১১

শাস্তোরী - ১৫, ৩৩, ৩৭, ৭২, ৭৯
শিকোই ঢুলী - ২২
শিবযাত্রা - ১০২
শিবের চাষ - ৬২
শিবের ডারা - ৮৪
শিরনীদান - ১০
শিরুয়া - ৪২
শিশির মজুমদার - ১৪, ৩২, ৪৪, ৪৮, ১০৬, ১০৭, ১১১
শ্রীরাম পাঁচালী - ৮৯

ষ

ষষ্ঠী দেবী - ১৭
ষাইটোল - ১০, ১৫, ১৭

স

সঙের গান - ৬০, ৬২
সত্যপীর - ১০, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯
সনৎ কুমার মিত্র - ৪৪, ১০৬, ১১০
সরু হুলি - ৮৩, ৮৪, ৮৫
সাইকেলসরী - ৭৩
সাঙি ঢাক - ৮৩
সাতালী - ২০
সামশোল ছাড়া - ৬০
সামিয়ানা - ১০৭
সারিন্দা - ৪৫, ৫২, ১১০
সালতামামি - ৩৮, ৩৯
সি. এস. কাল্হন - ৬৪
সুখ ও শান্তির কথা - ৭৬
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় - ৫
সুবোধ চৌধুরী - ৪২
সুমিতা যোগীর গান - ৩৭
সূত্রধর - ৯৮
সূর্যপূজা - ৩৮
সেখ সোলেমান - ৬৪
সোনা রায় - ১৫, ২৪, ২৭
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ - ৩৯

হ

হরিদাস পালিত - ৩৮, ৬০, ৬২, ৬৩
হরিমোহন কুণ্ডু - ১১১
হাগড়ু-ভাদরী পালা - ৭৫, ৭৬
হাটঘুরানী - ২৩
হীরামুচির পালা - ১৯
হুকাতি-ককাতি - ১৮
হুদুম-চুকা - ২৫
হুদুম দ্যাও -১৫, ২৪, ২৫, ২৬
হুলির গান - ৭১, ৭২, ৮৩, ৮৪
হেজাকসরী - ৭৩
হোলিকা- ৮৩
হ্যাজাকবাবু মেন্টালশ্বরী - ৩৩

LIBRARY NBU. DARJEELING